সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩২

গ্রাহক-পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [মফস্বলে ৩৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।

দ্বাত্রিংশ ভাগের সূচি

——০:০——

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার একত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

খ

গ

ঘ

চ

ফ

ব

হ

ক্ষ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

——: ০ :——

পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের 'হরি-বংশ'*

চারি পাঁচ বৎসর হইল, পাবনার সরকারী উকিল বন্ধুবর রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুরের সৌজন্যে কবি ভবানন্দের রচিত 'হরি-বংশ' নামক বৃহৎ পুথিখানা আমাদের হস্তগত হয়। আমরা ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় ঐ পুথিখানার একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি; কিন্তু উহার অল্প কিছু দিন পর হইতেই ঐ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ঐ পুথির বিবরণ বেশীর ভাগই অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে আপনারা পূর্ব্ব-বঙ্গে সমাগত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-বঙ্গে আধুনিক সময়ে দুই একজন শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন কালে তেমন কোনও শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ভবানন্দের 'হরি-বংশ' পুথিখানা পাইয়া, উহার আলোচনা করিয়া আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে যে, পূর্ব্ব-বঙ্গের এই অজ্ঞাত-প্রায় প্রাচীন কবি, পশ্চিম-বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হইলেও, কবি-প্রতিভা ও রচনা-নৈপুণ্যে কবি ভবানন্দের স্থান পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে খুব উচ্চে, এমন কি, সর্ব্ব-উচ্চে নির্দ্দেশ করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না; তাই আজ আপনাদিগের সমক্ষে দেড় শত বৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক প্রাচীন 'হরি-বংশ' পুথিখানি উপস্থিত করিয়া, উহার সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই।

প্রথমেই বক্তব্য যে, কাব্যখানার নাম 'হরি-বংশ' হইলেও এবং কবি তাঁহার কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় 'নারদীয় পুরাণ' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিলেও এই পুথিখানা অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত 'হরি-বংশ' কিংবা নারদীয় পুরাণের অনুবাদ বা অনুসরণ নহে; হরি-বংশ বা নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধার কোনও উল্লেখ বা তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার কোন প্রসঙ্গই নাই। ভাগবতের বর্ণিত ব্রজ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন গোপিকার উল্লেখ থাকিলেও, ভাগবতের ব্রজ-লীলার সহিত ভবানন্দের বর্ণিত লীলার বিশেষ কোনই সাদৃশ্য নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যেরূপ নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনা-প্রসূত নূতন কাব্য, ভবানন্দের 'হরি-বংশ'ও সেরূপই বটে;

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে (মুন্সিগঞ্জে) সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিতও বর্ণনীয় বিষয়ে 'হরি-বংশের' বিশেষ কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না। শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত প্রাচীন বঙ্গ-সমাজে উক্ত কবি-দ্বয়ের এই দুঃসাহস-পূর্ণ পুরাণ-বিরোধিতা তাঁহাদের অসাধারণ কবি-কল্পনার পরিচায়ক হইলেও, দুই জনের পক্ষেই এই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ভাল হয় নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা হরি-বংশ—কোনও কাব্যই সমাদর লাভ করে নাই; সে জন্য দুইখানা কাব্যই একরকম বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি; বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার কাব্য উপেক্ষা করিলেও তাঁহার নামটী উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাই তাঁহারা বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সঙ্গত রস-ভাব-শুদ্ধ পদাবলী রচনা করিয়া, চণ্ডীদাসের নামে সেগুলিকে চালাইয়া কবির ও নিজেদের মুখ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ভবানন্দের হরিবংশ কাব্যখানার সে সৌভাগ্য ঘটে নাই; তাই ভবানন্দের নাম আর তাঁহার কাব্যখানা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যত্নে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তবাবুর সম্পাদকতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যখানি কয়েক বৎসর হইল, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে; পূর্ব্ব-বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ভবানন্দের বিলুপ্ত-প্রায় এই কাব্যখানিও প্রচারিত হইবে না কি? আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন-সাহিত্যের প্রকাশকদিগের সুদৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

'হরি-বংশ' কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের বিশেষ পরিচয় দেওয়ার পূর্ব্বে ঐ কাব্যখানার সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই চারিটী কথা বলিব। 'হরি-বংশ' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মত কেবল সুর-তাল-সংযুক্ত গীত বা পদের দ্বারা পূর্ণ কিংবা উহা উক্ত পরিষদের প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসের মত পদবর্জ্জিত নহে। উহাতে 'পদ-বন্ধ' বা পয়ার ও 'গান-ছন্দ' বা সুর-সংযুক্ত গান অর্থাৎ পদ, উভয়ই পাওয়া যায়। আমাদিগের সংগৃহীত হরি-বংশের প্রাচীনতর ও বৃহত্তর পুথিখানিতে পয়ারের শ্লোকসংখ্যা ৪৪০৯ ও পদের সংখ্যা ১২৮। পদগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব পদাবলী-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়; কিন্তু হরি-বংশের মূল বিষয়টী মহাকাব্যেরই লক্ষণাক্রান্ত। মহাকাব্য মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত, দুই প্রকারই হইতে পারে; কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিয়োগান্ত কাব্য-রচনা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ জন্য ভারতের প্রাচীন কাব্যগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্রই মিলনান্ত সমাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-পূর্ণ ব্রজ-লীলার অবসানে শ্রীকৃষ্ণের কংস-বধের জন্য মথুরা-গমন দ্বারা যে 'মাথুর' বা বিরহ-লীলার আরম্ভ, তাহা নিতান্তই শোকাবহ বলিয়া "রাধামাধবোদয়"-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী, 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি কোনও কোনও বৈষ্ণব কবি তাঁহাদিগের গ্রন্থে মাথুর বা বিরহলীলা মোটেই প্রদর্শন করেন নাই। কীর্ত্তন-গায়কেরা শুধু শ্রোতাদিগের মনস্তুষ্টির জন্যই মাথুরের পদাবলীর শেষে দুই একটি ভাব-সম্মিলন বা স্বপ্ন-সম্মিলনের পদ গাহিয়া পালা শেষ করিয়া থাকেন। এই ভাবে পূর্ব্বরাগ, মান প্রভৃতি সকল পালার শেষেই মিলনের পদ গাহিবার রীতি আছে। এই পালাগুলি গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া, উহাদিগের সমষ্টি দ্বারা যে

সম্পূর্ণ ব্রজলীলা সংগ্রথিত হইয়াছে, উহাতেও গীতি-কাব্য ব্যতীত মহাকাব্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু ভবানন্দ সেই ব্রজলীলা অবলম্বনে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার মূল বিষয়টী সম্পূর্ণ উচ্চাঙ্গের মহাকাব্যের উপযুক্ত। হরিবংশের মূল বিষয়—ভূভার হরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ নারায়ণের সহিত ব্রজলীলার অবসানে, তাঁহারই পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে বিরহশোকাতুরা তিলোত্তমা-নাম্নী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-দেহে বিলয়-প্রাপ্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার এই অচ্ছেদ্য মিলন কবি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ অঙ্গের বিয়োগান্ত কাব্যের ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। আমরা কোনও সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থেই এইরূপ কথা-বস্তু (Plot) দেখিতে পাই নাই ; বোধ হয়, ইহা ভবানন্দেরই কবি-কল্পনা-প্রসূত ; বহু-শ্রুত পৌরাণিক প্রাচীন আখ্যায়িকাটীকে এইরূপ নবীন আকার প্রদান দ্বারা শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, ভবানন্দ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। হরিবংশ কাব্যের বর্ণিত সকল বিষয়ের আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর হইবে না ; তাই শুধু প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসম্ভব কবির ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব ; ভরসা করি, উহা দ্বারা ভবানন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ও তাঁহার কবিত্ব, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পরীক্ষিৎ-কুলজাত জন্মেজয় নৃপতি গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ করিয়া, মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"চারি বেদ বিখ্যাত করিলা মহামুনি।
বিস্তারিয়া হরিবংশ কহ চাহি শুনি॥
ই বড় বিস্ময় মুনি জিজ্ঞাসিব তোমা।
কৃষ্ণ-অঙ্গে লীন কেনে হৈল তিলোত্তমা॥"

ব্যাসদেব রাজার সেই প্রশ্নের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

"শুন শুন জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মুনি।
স্মরণ করিছ ভাল পূর্ব্বের কাহিনী॥
* * *
একচিত্তে শুচি হৈয়া শুন নরেশ্বর।
হরির যথেক গুণ কাব্য-মনোহর॥"

এইরূপে হরিবংশ কাব্যের সূত্রপাত হইল। আমরা দেখিতে পাই, প্রথমেই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা হরির নিকট যাইয়া, তাঁহাকে দানব, অসুর ও দুষ্টদিগের নাশের জন্য স্তব-স্তুতি করায়, তিনি বসুদেবের ঔরসে, দৈবকীর গর্ভে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"দেবের স্তুতিয়ে আমি জন্মিব পৃথিবীত।
কোন্ রূপে যাইবা তুমি আমার সহিত॥"

তাঁহারা উত্তর করিলেন,—

"বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু যাইবা পৃথিবীত্।
নিজ রূপে আমি তুই যাইব সহিত ॥"

শ্রীহরি কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"গর্ভ-বাস হইলে হইব অবতার।
বিনে গর্ভ-বাসে জন্ম নহিবেক তোমার ॥"

লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীহরির সঙ্গে নরদেহ ধারণ করিয়া যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণন করিয়া, পুনরায় সেইরূপ নর-দেহ ধারণের ক্লেশ এড়াইবার জন্য অনেক কান্দাকাটি করিলেন; কিন্তু শ্রীহরি লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া থাকিবেন কি প্রকারে? তাই, তিনি নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনাইয়া লক্ষ্মীর মত জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন; অবশেষে বলিলেন,—

"খেদ পরিহর প্রিয়া চিত্ত কর স্থির।
লীন করি লৈমু তোমা আপন শরীর ॥
তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইবা আমাত।
রাধা হেন নাম হৈব জগত-বিখ্যাত ॥
পঞ্চদশ কলা জন্মিব গোপ-ঘরে।
ভৃগুর উরসে (আর) বিমলা-উদরে ॥
এক কলা জন্ম হৈব বিদর্ভ-নগরে।
কাম-দেব জন্ম হৈব তোমার উদরে ॥"

লক্ষ্মীর কৌতূহল জন্মিল; তিনি সবিস্তারে মদনের জন্ম-কথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—

"কি কার্য্যে হইল মৃত্যু জন্ম হৈল কেনে।
সে সকল কথা প্রভু কহত আপনে ॥"

শ্রীহরি, লক্ষ্মীর নিকট তারকাসুরের বধের জন্য কুমারের জন্মপ্রসঙ্গে মহাদেব কর্ত্তৃক মদনের ভস্মীকরণ, মদনের মৃত্যুতে রতির বিলাপ, রতির প্রতি মহাদেবের অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বর-দান এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিদর্ভ-রাজনন্দিনী রুক্মিণীর গর্ভে কামদেব জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া রতিকে আশ্বাস-প্রদান সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। লক্ষ্মী প্রীত হইয়া তাঁহার আপত্তি ত্যাগ করিলেন। অতঃপর কবি ভবানন্দ অতি সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্য-লীলা বর্ণনা করিয়া, তাঁহার সুবিস্তৃত প্রেম-লীলার অবতারণা করিয়াছেন; আমরা কবির ভাষায়ই উহার পরিচয় দিব।

"তবে প্রভু নারায়ণ শরীর ছাড়িয়া।
দৈবকী-উদরে জন্ম লভিলেক গিয়া ॥

গোকুলে (লইয়া) বসুদেবে থুইল তানে।
মহা মহা অসুর মারিল বৃন্দাবনে ॥
তার পাছে লক্ষ্মী হৈল পঞ্চদশ কলা।
বৃকভানুর ঘরে জন্ম হইল কমলা ॥
এক কলা জনমিল সুগন্ধা-উদরে।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হৈল অবতারে ॥
আনন্দে আছয়ে হরি নন্দ ঘোষালয়।
সর্ব্বলোকে বোলে তানে যশোদা-তনয় ॥
করিয়া বিবিধ কার্য্য দেবের দুষ্কর।
হরিষে গোকুলে বৈসে দেব গদাধর ॥
বৃখভানু-সুতা রাধা লক্ষ্মী-অবতার।
শৈশব-কালে তাহান যৌবন-বিস্তার ॥
(অনুদিন ভক্তি) করি পূজে নারায়ণ।
হরির চরণ বিনে আর নাহি মন ॥
যৌবন দেখিয়া বাপে চিন্তিল উপায়।
ব্রজে আইহন আনি (বিভা দিতে চায়) ॥
যশোদার ভ্রাতা সে পরম রূপবান্।
নন্দের গৌরবে তারে কন্যা দিল দান ॥
রাধার ভক্তিয়ে আর সত্যের কারণ।
করিলা কপট তাতে দেব নারায়ণ ॥
রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেহি দিন।
(সেই দিন হৈতে হৈল) পুরুষত্ব-হীন ॥
নপুংসক হৈল যদি ব্রজে আইহন।
রাধিকার সত্য রক্ষা পাইল সে কারণ ॥
জল আনিবারে রাধা করিল গমন।
(দেখিল যমুনা)-তীরে শ্রীমধুসূদন ॥
বসিয়াছে কানু-আদি বালক সকল।
হেন কালে রাধিকা ভরিতে যায় জল ॥

সকল বালক এড়ি গেল রাধার কাছে।
মধুর কোমল বাক্যে সুন্দরীতে পুছে ॥

শুন সুবদনি (তুমি মোর নিবেদন)।
জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেও কি কারণ ॥
কাহার কুমারী তুমি কাহার বনিতা।
কোন দেশে বৈস তুমি কেনে আইলা এথা ॥

* * *

তোর মত রূপবতী নাহি ক্ষিতি-তলে।
বিধাতা মিলাইল মোরে পূর্ব্বজন্ম-ফলে ॥
(দেখিয়া তোমার মুখ) কমল-মনোহর।
আকাশে থাকিয়া তপ কৈল শশধর ॥
পুনঃ পুনঃ জন্মে চন্দ্র সমান হইতে।
না পারিয়া সাগরেত গেল দুঃখ-চিতে ॥
কমল-(বদনে শোভে কিবা) মৃদু হাস।
সরোবর-মধ্যে যেন কমল প্রকাশ ॥
দিন-মণি মিত্র তাত না হৈল সমান।
নিশিতে থাকিতে হৈল পায়্যা অপমান ॥

* * *

বান্ধুলি কুসুম রঙ্গ ওষ্ঠ অধর।
অরুণ গঞ্জিয়া বিম্ব গেল দুরন্তর ॥
(কিবা শোভে) ঝলমল শ্রবণ-কুণ্ডলে।
চন্দ্র-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থলে ॥

* * *

(নয়নের শোভা হেরি) মনোহর রঙ্গে।
প্রবেশিল বনমাঝে লজ্জায় কুরঙ্গে ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা তোর যেন কাল-সাপ।
কটাক্ষ-সন্ধানে জিনে কন্দর্পের চাপ ॥

* * *

চিকুর চামর জিনি নাহি তার তুল।
দোসর গাঁথনি তাতে মালতীর ফুল ॥

কনক-ডালিম্ব যেন পীন পয়োধর।
অমৃতের ধারা যেন বহে নিরন্তর ॥

হেন মনে (করোঁ তাতে) প্রাণ দেওঁ ডালি।
কে দিছে তোমারে হেন বিচিত্র কাঁচলি॥
করিছে বিচিত্র চিত্র তাহে নাহি কোপ।
কেবা লিখিয়াছে মোর নিজ দশ-রূপ॥
(সিন্ধু) প্রবেশিয়া বেদ করিলু উদ্ধার।
সেই রূপ কাঁচলিতে দেখিয়ে তোমার॥"

ইত্যাদি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাঁচলির বিচিত্র-সূত্র-গ্রথিত দশাবতার-চিত্রের বর্ণন করিয়া, নিজের মনের গূঢ় লালসাটী প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না এবং কৌশলে সমবেদনা প্রকাশ দ্বারা শ্রীরাধার অনুরাগ উদ্দীপন করার জন্য বলিলেন,—

"মুষ্টিয়ে ধরিতে পারি ক্ষীণ কটি তোর।
কেমতে কলস লৈছ ভয় লাগে মোর॥
*　　*　　*
মতি-হীন সেই জন অবোধ কেবল।
হেন যুবতীরে দিছে ভরি নিতে জল॥"

কিন্তু—

"যতেক মধুর বোলে নন্দের কোঁয়র।
শুনিয়া সুন্দরী রাধা না দিল উত্তর॥
কাঁখে কুম্ভ (আঁখি ঠারে) জানাইয়া সখী।
বসনে বদন ঢাকি হাসে চন্দ্র-মুখী॥
কটাক্ষে লাবণ্য ভাসে ফিরি ফিরি চাহে।
বুঝিয়া তাহান মন কানু পাছে ধায়ে॥
রাধা আগে আগে যায় কানু যায় পাছে।
লম্ফ দিয়া ধরে কৃষ্ণ রাধিকার কেশে॥
'এড়' 'এড়' করি রাধা মাগে পরিহার।
কোন্ বিপরীত কর নন্দের কোঁয়ার॥"

অতঃপর হরিবংশে নানা বিচিত্র 'পদ-বন্ধ' ও 'গান-ছন্দ' ব্যাপিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি ও চপলতা চলিয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়ার স্থান আমাদিগের নাই। কবি ভবানন্দের সংক্ষেপ করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, বিষয় পল্লবিত করার শক্তিও সেইরূপ; তথাপি নিতান্ত প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহার রচনা-কৌশলে সুবিস্তৃত বর্ণনায়ও পাঠকের বিরক্তি জন্মে না; পড়িতেই ইচ্ছা হয়। যাহা হউক, জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফলেই হউক, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-মোহন রূপ ও গুণে নিতান্ত বশীভূত হইয়াই হউক, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাভি-যোগ শ্রীরাধা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তখন,—

"কানুর চরিত্রে রাধা শঙ্কিত হৈলা বড় ।
মনে মন-কলা খায়ে মুখে বোলে দড় ॥
দেখিয়া কানুর রূপ বেশ মনোহর ।
কন্দর্প-বিশিখে তনু করিছে জর্জ্জর ॥
কামিনী-মোহন বেশ ধরিছে কানাই ।
অন্তরে বিকল (অতি)মুখে বোলে যাই ॥
কামে অচেতন রাধা প্রাণ নহে স্থির ।
মধুর কোমল ভাযে বোলে ধীরে ধীর ॥

* * *

অয়ে নন্দ-সুত তুমি না বুঝিছ ভাল ।
গৌরব না রাখ তুমি সহজে ছাওয়াল ॥
সাক্ষাতে ভাগিনা তুমি অন্তর (নাহিক) ।
পথে বাটোয়ারি কর বোল ধিকাধিক ॥
কমল-কলিকা আমি একাকিনী নারী ।
পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোলিতে পারি ॥
যদি (আমাতে) তোমার মগ্ন হৈছে মন ।
কেনে লজ্জা দিলা দেখাইয়া সখাগণ ॥
সুহৃদ-সম্বাদে হৈত মন-হিত কাজ ।
না বুয়ায় হেন স্থানে দিতে মোরে লাজ ॥
এই কথা কৈমু নন্দ যশোদার ঠাই ।
তবে কি উত্তর দিবা শুন রে কানাই ॥
মোর নিজ-পতি-জন কেবল দুর্ব্বল ।
কহিব তাহার ঠাই আমারে কর বল ॥
শাশুড়ী ননদী মোরে বোলিব পরিবাদ ।
বৃন্দাবন ছাড়ি যাইব রহিতে নাহি সাধ ॥
বাপ মাও বোলিবেক রাধা (কলঙ্কিনী) ।
যোগিনী হইয়া যাইব গায়ের আগুনি ॥
এড়িয়া দেও রে কালা খাও মোর মাথা ।
নিশা-কালে গেলে মন পুরাইমু সর্ব্বথা ॥"

শ্রীরাধার কাতরোক্তি ও প্রেম-প্রতিশ্রুতি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে,—

"(জল লৈয়া তবে) রাধা নিজ ঘরে যায় ।
খঞ্জন জিনিয়া গতি ফিরি ফিরি চায় ॥

*　　*　　*

মন্দ মন্দ গতি যায় রাধিকা সুন্দরী।
কানুর বিরহে চাহে ঘন ঘন ফিরি॥
এহি মতে কত দূর গেল শশিমুখী।
উলটিয়া চাহে দেখি কালা হৈল (সুখী)॥
ডাক দিয়া বোলিলেক নন্দের কোঁয়র।
মোর বাক্য সুবদনি অবধান কর॥
দেখিয়া তোমার রূপ প্রাণ শাস্ত করি।
বারেক ফিরিয়া (বাক্য শুন ল সুন্দরি)॥"

যাহা হউক, কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের হাত ছাড়াইয়া শ্রীরাধা ঘরে আসিলেন বটে, কিন্তু—

"তেজিয়া জলের কুম্ভ চিন্তিত অন্তরে।
(হৃদয়ের) উতকণ্ঠা সহিতে না পারে॥
কামে জর্জ্জরিত তনু হই ধন্ধাকার।
কানু বিনে সব শূন্য হৈল শ্রীরাধার॥
শাশুড়ী ননদী তবে দেখি বিপরীত।
(রাধারে প্রবোধ তারা) দেয় কালোচিত॥
তবে নিজ পতি আসি জিজ্ঞাসে বিস্তর।
শুনিয়া যুবতী কিছু না দিল উত্তর॥"

গোকুলের যজ্ঞ-সেন নামক গোপের স্ত্রী শ্রীমতী রাধার 'প্রেম-সখী' ছিলেন; তিনি আসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন; তখন—

"সখীর বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী।
(কহিল মরম-কথা) লাজ পরিহরি॥

*　　*　　*

(বরাড়ী রাগ)

অয়ে পরাণ-সই, হের কথা শুন আল মর।
সকল সখীর সঙ্গে　　যমুনা গেছিলু রঙ্গে
জল ভরিয়া আসি ঘর॥ ধ্রু॥
আচম্বিত হেন কালে　　মালতীর মালা গলে
চূড়ায়ে ময়ূর-পুচ্ছ শোভে।
মোতি মালতীর মাল　　শোভা করে (অতি ভাল)
ভ্রমরা না ছাড়ে মধু-লোভে॥

সুরঙ্গ অধরে বাঁশী ইষত মধুর হাসি
তাহে তাহান শোভমান।
যমুনা উজান ধরে (শুক্ক দাউর মুগুরে)
বন্ধু রাগ ধরিছে যে গান॥
আমার নিকটে আসি বলিল কটাক্ষে হাসি
রতি-দান দেও ত সুন্দরি।
যৌবন না (দিলু ডালি) পাঞ্জর করিয়া খালি
প্রাণ মোর লৈয়া গেল হরি॥
যদি না দেখিমু কানু সহজে ছাড়িমু তনু
প্রাণ রাখিলে নাহি কাজ।
(ললাটে আছিল লেখা) ভাগ্যে সে পাইলু দেখা
তিলেক না কৈলু মুই লাজ॥"

ও কালার লাগি
সদায়ে আকুল মোর হিয়া।
(যমুনার জলে গিয়া) বন্ধুরে সমুখে থুয়্যা
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া॥ ধ্রু॥
যে বোলে বলুক লোকে যার মনে যেবা দেখে
ননদিনী বলুক (দুর্ম্মতি)।
(গুরু) গরবিত জনে কুপিত হইয়া মনে
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি॥
শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া যোগিনীর বেশ হৈয়া
যথা তথা যাইব (মন-সুখে)।
কানুর বিরহে মোর তনু হৈল জরজর
কি করিব গোকুলের লোকে॥"

এইরূপ কয়েকটী বিচিত্র গানের ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া প্রাণ-সখীর নিকট হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া, শ্রীরাধা অবশেষে বলিলেন,—

"চল সখি আনি দেহ নন্দের তনয়।
তবে সে (বাঁচিব প্রাণে) মোর মনে লয়॥
তুমি সে সুহৃদ্ মোর আর কেহ নাই।
বিরহ-দুঃখের কথা কৈলু তোর ঠাই॥''

সখী প্রথমে রাধার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; বলিলেন,—

"না কর কপট সই ধরিলু চরণে।
কপট বচন ছাড়ি কহ মোর স্থানে॥
তোর মোর এক প্রাণী তনু দুইখানি।
কপট ছাড়িয়া কহ মরম-কাহিনী॥"

তখন—

"রাধা বোলে প্রাণ-সই কহি বিবরণ।
আনিয়া মিলাও মোরে নন্দের নন্দন॥
তুমি বিনে হেন কর্ম্ম কে করিব মোর।
(মদন)-বিশিখে তনু হইল জর্জ্জর॥
চন্দন হৃদয়ে দিলে না হয় শীতল।
মৃত্যু হৈলে তোর শ্রম হইব বিফল॥"

শ্রীমতী সখী শ্রীরাধাকে নানা প্রকারে সম্‌ঝাইয়া এই দুঃসাধ্য কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু উহাতে কোনও ফল হইল না। তখন তিনি অগত্যা যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে সখাগণের দ্বারা বেষ্টিত দেখিতে পাইয়া, কৌশলে সখীর অবস্থা জানাইবার জন্য হেঁয়ালীর ছন্দে বলিলেন,—

"বিরিঞ্চির নন্দন তার সুত পবন
তার সুত-মিত্র ব্রজ-সুত।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ সখীর হেঁয়ালী অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু যে জন্যই হউক, উহাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না ; সুতরাং অগত্যা সখী বিষণ্ণ-বদনে শ্রীরাধার নিকট ফিরিয়া গেলেন, আর যাইয়া বলিলেন,—

"প্রথমে কহিছি আমি দুর্জ্জন কানাই।
ইহার সহিতে প্রেমে কিছু কার্য্য নাই॥
না শুনিয়া মোর বাক্য পাঠাইলা তথা।
যত অপমান দিল কি কহিব কথা॥
বিস্তর প্রকার করি কৈলুম তোর দুখ।
উত্তর না দিল—দেখি ফিরাইল মুখ॥
লজ্জা পাই আইলু মুঞি কহি তোর ঠাই।
তুমি সে বাড়াইলা প্রেম মোর দায় নাই॥"

সখীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধা শোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ; সখীর নানাপ্রকার চেষ্টাতেও যখন তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল না, তখন—

"এক সখী ধায়্যা গিয়া জানাইল সবারে।
দুঃখিত হইয়া গোপী আইলা দেখিবারে॥
সুন্দরী রাধার স্বামী ননদী শাশুড়ী।
মহা কলরব করে রাধিকারে বেড়ি॥"

এমন সময়ে দৈবাৎ সেখানে রাধার মাতামহী বড়াই বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনিও নানা উপায়ে নাত্নীর চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন—

"কার্য্য লাগি কথা কহে শ্রীমতী সুন্দরী।
হের আইসে নন্দ-সুত দেখ চক্ষু ভরি॥
শুনিয়া সখীর বাক্য মধুর কোমল।
চক্ষু মেলি না দেখিয়া কান্দিয়া বিকল॥
তখনে সকল লোক হরষিত-মন।
যার যার নিজ ঘরে গেল সেহি ক্ষণ॥
রাধা আদি তিন জন রৈল সেইখানে।
বড়াই পুছিল তান নাতিনীর স্থানে॥
শুন সুবদনি রাধা বুদ্ধিমতী হও।
কি হেতু মূর্চ্ছিত হৈলা মোর স্থানে কও॥
চিত্তের মানস তোর পূরিমু নিশ্চয়।
সমগ্র ভাঙ্গিয়া কহ না করিও ভয়॥"

মাতামহী বড়াই বুড়ীর আশ্বাস পাইয়া শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন,—

"(পঠমঞ্জরী রাগ)

আল বড়াই, শুন মোর দুঃখের বিরহে।
গেছিলু যমুনা-জলে দেখিলু কদম্ব-তলে
সেই হৈতে প্রাণ মোর দহে॥ ধ্রু॥
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণখানি
বিদ্যুতের ছটা অভরণ।
দেখিলু পূর্ণিমা-ইন্দু ললাটে চন্দন-বিন্দু
তার মধ্যে আবীর শোভন॥
যুবতী মোহন চূড়া মালতী-কুসুম বেড়া
শিখি-পুচ্ছ তাহার ভূষণ।
মধুর মধুর বোলি মকরন্দ-লোভে অলি
ফিরি ফিরি ধরিছে গুঞ্জন॥

বিমল কমল-আঁখি　　ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি
কটাক্ষ ইষদ মৃদু হাসি।
সুলক্ষণ নখ-চান্দ　　পাতিছে রমণী-ফান্দ
সুন্দর অধরে পূরে বাঁশী ॥
শুনিয়া বাঁশীর সান　　যমুনা ধরে উজান
কদম-তলে বসিয়াছে কালা।
পবন স্থকিত হয়ে　　রবি শশী না চলয়ে
আমি নারী সহজে অবলা ॥
সকল কুসুমে সাজে　　অভিনব যুবরাজে
অবলা নারীরে জিনে বেশে।
সৌরভ-বিহীন ভালা　　গলায় গুঞ্জার মালা
আসিয়া ধরিলা মোর কেশে ॥
বিস্তর প্রণতি করি　　আইলু আপনা পুরী
সেই হৈতে প্রাণ মোর দহে।
দেখিয়া অবধি হনে　　নিবারিতে নারি মনে
হানিছে মোরে বাণের হৃদয়ে ॥"

বড়াইও আগে শ্রীরাধাকে নিরস্ত করিতেই বিধি-মতে চেষ্টা করিলেন; বলিলেন,

"নন্দের নন্দন সে যে বালক-চরিত।
নহে তোর প্রেম-যোগ্য হও গরবিত ॥
হেন জন সনে প্রেম বাড়াইতে দুষ্কর।
মনে যেহি লয় নাতিন সেহি কর্ম্ম কর ॥
একখানি যুক্তি ভাল শুন ল নাতিন।
গরবিত সনে প্রেম নহে কোন দিন ॥
রাধা বোলে—যদি কৃপা করিলা বড়াই।
অবিলম্বে আনি দেহ সুন্দর কানাই ॥
বিলম্ব না কর বড়াই পড়োঁ পদ-তলে।
তিল-মাত্র ব্যাজ হৈলে ঝাপ দিমু জলে ॥"

অগত্যা বড়াই শ্রীরাধার দৌত্য-কার্য্যে—যমুনার কূলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি তখন একাকী ছিলেন; তাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া চতুরা বড়াই তাঁহার উপর একটা শক্ত চাপান দিয়া কহিলেন,—

"সুহি রাগ।

(কহ রে) নন্দের সুত,
কি কর ঘাটের কূলে বসি।
বনে থাক ধেনু রাখ অগরু চন্দন মাখ
গোকুল মজাইবা হেন বাসি ॥ ধ্রু ॥
বাঁশীটী লইয়া হাতে বসি থাক রাজ-পথে
করি বেশ কদম্বের তলে।
কুল-বধূ গোয়ালিনী যে আইসে ভরিতে পানী
তোর রূপ দেখি তারা ভোলে ॥
পাটে রাজা কংসাসুর (মথুরায়) নহে দূর
মুরলি বাজাও হাসি হাসি।
তুমি সে নাগর বড় রসেত মজিলা দড়
নাগরালি ভাল নহে বাসি ॥"

পুনশ্চ—

"বড়াই বোলে—শুন কানু আমার বচন।
মোর নাতিনীর প্রাণ লৈলি কি কারণ ॥
কালা বোলে—'শুন বুড়ী আমার উত্তর।
আমি ত না জানি কেবা নাতিন হয়ে তোর
মিথ্যা কথা কহ তুমি কেমন কারণ।
স্ত্রী-বুদ্ধি হেন হেতু বোল দুর্ব্বচন ॥'
পুনরপি বোলে বুড়ি "শুন রে কানাই।
মোর নাতিনীর কথা কহি তোর ঠাই ॥
রাধা গোপী যে হয়ে সে মোহর নাতিন।
জল ভরিবারে আইল যমুনা-পুলিন ॥
আপনা মন্দিরে যায় ভরি লৈয়া জল।
কেন রাজ-পথে গিয়া তারে কর বল ॥
সেই হৈতে ধন্দ নারী তোমার বিরহে।
ক্ষেণে ধরণীতে পড়ে ক্ষেণে মূর্চ্ছা যায়ে ॥
তার দুঃখ দেখি আইলু তোমার বিদিত।
জানিয়া করহ আজ্ঞা যে হয় উচিত ॥'

শ্রীকৃষ্ণ নিশা-কালে শ্রীরাধার গৃহে অভিসারে গমন করিবেন, এইরূপ সঙ্কেত স্থির করিয়া বড়াই হৃষ্ট-চিত্তে শ্রীরাধার নিকট সমাগত হইল,—

"কহিল সকল কথা রাধিকা-গোচর।
নিশা-কালে আসিবেক নন্দের কোঁয়র॥
ধন্য ধন্য রাধা তুমি বড় ভাগ্যবতী।
বিধাতা মিলাইল ভাল অনুরূপ পতি॥"

এখন কিন্তু শ্রীরাধা মাতামহী বড়াইর সহিত একটু রহস্য করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না; চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রীরাধার মত,—

"রাধা বোলে শুন বড়াই কহি তোর ঠাই।
এমত নিষ্ঠুর পতি মোর দায়ে নাই॥
ভাল হোক মন্দ হোক পতি আইহন।
মোর নিজ পতি জান মোর প্রাণ-ধন॥
এমত দারুণ পতি দায় নাহি মোর।
চল বুড়ী চলি যাও আপনার ঘর॥
মোর প্রাণ-সই গেল তার বিদ্যমানে।
না দিল উত্তর তারে মনের গুমানে॥
জন্ম অবধি ভিন্ন পুরুষ না জানি।
কেমতে করিমু পাপ মুঞি অভাগিনী॥"

বড়াইও সহজ পাত্র নহেন; রাধার চাতুরী বুঝিতে বড়াইর বিলম্ব হইল না।

"রাধার বচন শুনি বোলিল বড়াই।
কি বোল বোলিলা রাধা মুখে লাজ নাই॥
ধরিয়া আমার পাও বোলিলা তখনে।
গর্ব্ব করি কহ এবে মনের গুমানে॥
তোর মায়ের মাও আমি শুন ল অবলা।
কেমতে ভাঁড়িবা মোরে পাতিয়া স্ত্রী-কলা॥
চাতুরী করিলা ব্যক্ত আপনার গর্ব্বে।
ভাগিনাকে লৈয়া রতি ভুঞ্জিয়াছ পুর্ব্বে॥
*   *   *
অখনে ভাঁড়িবা মোরে এহি মত জ্ঞান।
তোর মনে আমি হতে তুমি বড় স্যান॥
বড় নষ্ট বুদ্ধি তোর জানিলু অখনে।
আঁখির চালনে পুরুষ লৈয়া যাহ বনে॥

আমাকে ভাঁড়িবা তুমি কেমন উপায়।
হাসিতে হাসিতে বোলে ঘন-দৃষ্টে চায়॥"

শ্রীরাধা কিন্তু এত সহজে রহস্য পরিত্যাগ করিলেন না; বড়াইর প্রতি তিনি কপট-রোষ প্রদর্শন করিয়া চোখা চোখা বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বড়াই তাঁহাকে নিজের সুদীর্ঘ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন,—

"সলিলের রেখা যেন নারীর যৌবন।
যাইতে বিলম্ব নাহি কিসের যতন॥
কি ছার যৌবন লৈয়া করসি গৌরব।
কুসুম-বিকাশে যেন না রহে সৌরভ॥
হাস পরিহাস কর অতি বড় রঙ্গে।
মরিতে যৌবন কেবা লৈয়া যাব সঙ্গে॥"

পুনশ্চ—

"সঞ্চিত করিলে কিছু ভোগ নহে ধন।
সঞ্চিত করি রাখ কেনে নারীর যৌবন॥
মক্ষিকা-পতঙ্গে যেন সঞ্চয়ে মকরন্দ।
ভাল মতে নাহি জানে কিবা স্বাদ গন্ধ॥
চতুরে দহিয়া মুখ লৈয়া যায় মধু।
তেমত যৌবন ব্যর্থ যাবে ব্রজ-বধু॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতক্ষণ সখী শ্রীমতীর নিকটে বসিয়া দিদিমা নাতনীর রহস্য দেখিতেছিলেন, এইবার বড়াইর হইয়া তিনিও শ্রীরাধাকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। শ্রীরাধার রহস্য আর টিঁকিল না।

"সখীর বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী।
আন গিয়া গোবিন্দেরে বোলে মৃদু করি॥
কর লৈয়া মথুরাতে গিয়াছে আইহন।
আজি না আসিলে কানু নাই প্রয়োজন॥
চল চল বড়াই বিলম্বে নাহি কাজ।
অবিলম্বে আনি দেহ সেহি যুবরাজ॥"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যে রস-পূর্ণ প্রেম-লীলা আরম্ভ হইল, তাহা কবির ভাষায় অনুসরণ করা একান্তই অসম্ভব; ভবানন্দ যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে সেই লীলার বর্ণন করিয়াছেন, তাহার একাংশ প্রদর্শন করারও স্থান নাই। এই প্রেম-লীলা প্রায় সম্পূর্ণই কবি-কল্পিত; ভাগবতের বস্ত্র-হরণ, রাস-লীলা প্রভৃতি বর্ণনা না করিলে শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয়, ভবানন্দ অবান্তর-ঘটনা (Episdoe)রূপে সেগুলিকে নিজের কাব্যে স্থান

দিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ও খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। সত্য বটে, ভবানন্দের বর্ণিত এই প্রেম-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীরাধার দেব-ভাব রক্ষিত হয় নাই,—কিন্তু ইহাতে পদাবলী-সাহিত্যের শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মত আমাদের বঙ্গের পল্লী-সমাজের সাধারণ নায়ক ও নায়িকার যে অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্রটী ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার জন্যই কবি আমাদিগের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-পদাবলীর বর্ণিত দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতিও ভবানন্দের হরি-বংশে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু তাহাও অবান্তর-ঘটনা মাত্র। হরি-বংশের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অতিস্বাভাবিক ও সুমধুর প্রেম; কবি ভবানন্দ যেরূপ অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা ও কবি-প্রতিভার সহিত সেই প্রেমের অশেষ বৈচিত্র্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা-স্থল পদাবলী-সমৃদ্ধ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও বিরল। যাহা হউক, আমরা এখন এই ব্রজ-লীলার বর্ণনা হইতে আরও দুই চারিটী গীত বা গীতাংশ উদ্ধৃত করিয়া, অবশেষে মহাকাব্য হরি-বংশের অতুলনীয় মাথুর বা বিরহ-লীলার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব।

এক দিন শ্রীরাধা সখী শ্রীমতীর সহিত যমুনায় জল আনিতে গিয়াছেন; চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সখীকে গ্রাহ্য না করিয়াই নানারকম চপলতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাধা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

(গান-ছন্দ)

"না ছুইও না ছুইও রাধার অঙ্গ
মোর কালা রে
না ছুইও না ছুইও রাধার অঙ্গ।
একে ত অবলা আমি　　গঞ্জাবরা খান তুমি
পরশিয়া না কর কলঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
কালা গোরা নাহি সাজে　　ভজিমু কেমন কাজে
আরে তুমি ললিত ত্রিভঙ্গ।
বনে থাক ধেনু রাখ　　গায়ে ত আগর মাখ
যুবতী পাইয়া এত রঙ্গ ॥
আমি গরবিত একে　　যদি আসি কেহ দেখে
তোমার আমার মান-ভঙ্গ।
সকল নাগরী-লোকে　　চুণ কালী দিব মুখে
না যুযায় তুমি আমি সঙ্গ ॥"

এইরূপ রস-পূর্ণ নিষেধ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন এবং বেহদ্দ চপলতার অভিনয় করিয়া, অবশেষে রহস্য করার উদ্দেশ্যে কদম্ব-বৃক্ষে যাইয়া লুকাইয়া রহিলেন।

"দেখিতে না দেখে রূপ রাধা আকুলিত।
তরু-ডালে থাকি বাঁশী বায় সুললিত॥
রাধা রাধা বোলি ডাকে মুরলী-সন্ধানে।
রূপ নাহি দেখে রাধা ধন্দ বাঁশীর সানে॥
নাম ধরি ডাকে বাঁশী রূপ নাহি দেখি।
কদম্ব-তরুকে কিছু বোলে চন্দ্র-মুখী॥"

(গান-ছন্দ লাগুদা কলতা মালসী)

"হের রে কদম্ব-তরু,
তুমি নি পাইয়াছ শ্যাম-রায়।
তোমার ডালেত থাকি মোর নাম ধরি ডাকি
নিরবধি বাঁশীটী বাজায়॥ ধ্রু ॥
বসায়া আপন ডালে আপনা ফুলের মালে
রেণুয়ে ভরিয়া তনুখানি।
নবীন পল্লব সনে তোমার কলিকা থানে
অবলা কি হইব মানিনী॥
পরিহরি খগবর তোমাতে মুরলী-ধর
পদ-ধূলি লাগে তোমার গায়।
যখন বৈসয়ে মূলে শীতল ছায়ায় ভুলে
ভাগ্য তোর কহন না যায়॥

* * *

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা হৈয়া অধরে মুরলী থুইয়া
সদায়ে হেলান দিয়া থাকে।
কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন
কৃপা বড় করিল তোমাকে॥"

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে অস্থির হইয়া নানা প্রকার খেদোক্তি করিতে লাগিলেন,—

"আমি এমত না জানি রে বন্ধু, এমত না জানি।
দেখিতে না দেখি যেন মৃগ-ব্যাধ খানি॥
মোর নাম ধরি বাঁশী নিরবধি ডাকে।
তবে কি না দেহ দেখা যদি মনে থাকে॥

* * *

বাঁশী নয় বাঁশী নয় মোর মন-মোহনিয়া।
পাষাণ দরবে যার সু-নাদ শুনিয়া॥

*　　*　　*

মোর কেহ নাই বন্ধু মোর নাহি কেহ।
সঙ্কেতে বাজাহ বাঁশী দেখা সে না দেহ॥
গলায় গাঁথিয়া দিমু যদি লাগ পাম।
দেশে দেশে ভিক্ষা মাগি নাম গুণ গাম॥

*　　*　　*

আমি আর বলিব বা কারে।
পিরিতি-কালিয়া-নাগে দংশিল আমারে॥
ঘরের বাহির নহি কুলীনের ঝি।
কে জানে আসিয়া দেখে করিমু বা কি॥
দেখিতে না পাইলু আমি ঝুরিয়া যে মরি।
যার লাগি এত করু সেহ প্রাণের বৈরী॥
সমীর না বহে ঘনে তরু কেনে হালে।
কে মারে কদম্ব মেলি থাকি তরু-ডালে॥

*　　*　　*

কে আছে বেথিত জন কার কাছে যাব।
কে দিব কানুরে দান কোথা গেলে পাব॥
হিয়ার মাঝে শ্যামের শেল ফুটিছে মরমে।
শুখানে ডুবিব তোর মনের ভরমে॥
নিকড়িয়া কদম্ব-ফুল কত ফেলি মার।
হোর দেখ চাঁপা-ফুল তাকে দিতে নার॥"

প্রিয়তমার কাতরোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন আর্দ্র হইল, তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন।

কবি ভবানন্দ প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিতে এক রকম সিদ্ধ-হস্ত; হাস্য-রস ও বিদ্রূপের চিত্র অঙ্কিত করিতেও তিনি কম নিপুণ নহেন। দান-লীলা, বংশী-হরণ ইত্যাদি বহু স্থলেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা হরিবংশের অন্তর্গত মৃগবতী কন্যার উপাখ্যান হইতে 'বর্ব্বর-ব্যাখ্যান' নামক হাস্য-জনক গল্পটী এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গল্পটী এই,—

"রাজার কুমার আর পাত্রের নন্দন।
মন্ত্রী-কোতোয়াল-সুত এহি চারি জন॥
কৌতুকে ভ্রময়ে চারি আনন্দিত-মন।
তাথে নমস্কার কৈল হীন এক জন॥

রাজপুত্রে বোলে নমস্কার কৈল মোরে।
কোতোয়াল-সুতে বোলে আমি বিনে কারে॥
পাত্র-সুতে বোলে নমস্কার মোরে কৈল।
মন্ত্রী-পুত্রে বোলে আমাকে সম্ভাষিল॥
বিসম্বাদ করি তবে যুক্তি সার কৈল।
যে করিল নমস্কার তার তথা গেল॥
তস্কর বন্ধন যেন করিল গৃহস্থে।
চারি জনে তাহাকে ধরিল হেন মতে॥
মহাভয় পাইয়া সেহি করে পরিহার।
"কি লাগি ধরিছ মোরে কি দোষ আমার॥"
তবে চারি কুমারে বোলিল পুনি পুনি।
"কারে নমস্কার কৈলা কহ চাহি শুনি॥"
হাসিয়া বোলয়ে—"আমি পাপেত ঠেকিল।
এমত বর্ব্বর আমি কোথা না দেখিল॥"
চারি সন্তোষিত হেতু বোলে পুনর্ব্বার।
"যে বড় বর্ব্বর তাকে কৈল নমস্কার॥"
চারি জনে বিবাদ হইল অতি দড়।
অন্যে-অন্যে বোলয়ে "বর্ব্বর আমি বড়॥"
সে বোলে—"কেমনে কমু মর্ম্ম না জানিয়া।
কেমত বর্ব্বর কেবা কহ বাখানিয়া॥"
তবে রাজ-পুত্রে কহে আপনার গুণ।
"যেমত বর্ব্বর আমি ভাল মতে শুন॥
শিশু-কালে বাপে মোরে করাইল বিয়া।
শ্বশুর-বাড়ীতে স্ত্রী আসিল রাখিয়া॥
যুবা হৈলে দরশন নাহি তার মোর।
অন্যের ঔরসে পুত্র হৈল তার ঘর॥
পুত্র হৈছে বিবরণ শুনি লোকমুখে।
দান-ধর্ম্ম বাদ্য-ভাণ্ড করিলু কৌতুকে॥
পুত্রোৎসব-আনন্দ মুঞি করিলু নির্ভর।
লোকে বোলে এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥
এক রাত্রি না রহিছে বনিতার সঙ্গ।
জারজ-পুত্রের লাগি করে এমত রঙ্গ॥

আপনা মহত্ত্ব আমি কহিলাম দড় ।
আমি বহি বর্ব্বর নাহিক আর বড় ॥"
মন্ত্রী-পুত্রে বোলে শুনি রাজ-পুত্রের কথা ।
বিস্তারিয়া কহি শুন মোর বর্ব্বরতা ॥
বাস-স্থান নির্জ্জনে আছিল আমার ।
আশ-পড়শী তথা কেহ নাহি আর ॥
কালোচিতে হৈল পুত্র—শিশু না দেখিল ।
বাপ মাও ডাকিবারে কোথা না শিখিল ॥
পড়শীর পুত্র নাহি ডাকিব বাপ মাও ।
দেখাদেখি বালকে শিখিব সেহি রাও ॥
মন দুঃখে দহে মোর দৈবের বিপাকে ।
কেমতে শিখিব রাও এহিত বালকে ॥
বনিতার সঙ্গে আমি যুক্তি কৈল সার ।
দুই জনে শিখাইল রাও করিবার ॥
স্ত্রী মোকে বাপ ডাকে আমি ডাকি মাও ।
তাক শুনি বালকে শিখিল সেহি রাও ॥
শুনিয়া লোকের হাস্য হৈল অতি দড় ।
লোকে বোলে এহি বেটা বর্ব্বর অতি বড় ॥
রমণীকে মাও ডাকিব বিদ্যমান ।
সেহি সে বর্ব্বর হবে আমার সমান ॥"
তবে কোটোয়াল সুতে লাগে কহিবার ।
"অখনে কহিব যে আমার সমাচার ॥
এক দিন নগর ভ্রমিয়া আইলু ঘরে ।
না ছিল রম্ভার পাত ভাত খাইবারে ॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র তস্করের ভয়ে ।
চাঙ্গের উপরে আছে খগান না যায়ে ॥
ইহাতে হইল বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার ।
বাহিরে না যায় কেহ পত্র কাটিবার ॥
তবে আমি একখানি কথা কৈলু তাত ।
যে আজি রাও কাড়ে সে কাটিব পাত ॥
ইহাক শুনিয়া কেহ না কৈল উত্তর ।
প্রদীপ উজ্জ্বল আছে ঘরের ভিতর ॥

এহি ছিদ্র পায়্যা তবে চোর আইল ঘরে।
লাঁফ দিয়া উঠে মোর কান্ধের উপরে॥
সুবর্ণ-রজত-পাত্র থুইয়াছিল চাঙ্গে।
মোর কান্ধে উঠিয়া পাড়িয়া নিল সাঙ্গে॥
পত্র কাটিবার ডরে রাও নাহি কাড়িঁ।
কান্ধে উঠি চোরে যত রত্ন নিল পাড়ি॥
এ সকল কথা শুনি বিজ্ঞ যত নর।
তারা বোলে এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥"
তবে সে পাত্রের পুত্র লাগিল কহিতে।
"তোমরা সমান নহ আমার সহিতে॥
এক দিন মোর স্ত্রী পরম-সুন্দরী।
চরণে অলক্ত দিয়া বৈসে মান করি॥
আমি তাকে কহিলাম জল আন গিয়া।
সে বোলে পায়ের রঙ্গ জলে নিব ধুয়্যা॥
চিন্তিয়া চাহিল আমি বুদ্ধির সাগর।
আপনার স্ত্রী লইল কান্ধের উপর॥
কাঁখেত কলসী মোর রমণীয়ে লৈল।
জল আনিতে কান্ধে হৈতে পড়ি মৈল॥
ইহা দেখি সব মতিমন্ত যত নর।
মোকে বোলে এহি বেটা কেবল বর্ব্বর॥
আপনা মহত্ত্ব আমি কহিলাম দড়।
আমি বহি বর্ব্বর নাহি আর বড়॥"
এতেক শুনিয়া সেহি বোলিল তখন।
"কেহ ঘাটী নহ যে—সমান চারি জন॥"
চারি বর্ব্বরেরে কৈল চারি নমস্কার।
যত্ন করি বোলিলেক দোষ ক্ষেমিবার॥

এখন হরি-বংশের শেষ-লীলার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এক দিন রজনীতে নানারূপ বিলাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—

"আসিছে কংসের দূত আমারে নিবার।
কি করিমু প্রাণেশ্বরি কর অঙ্গীকার॥
ছাড়িয়া না যায় মোরে দারুণ কংস-চর।
তোমাকে ছাড়িয়া যামু এহি দুঃখ মোর॥

তথা গেলে ব্যাজ মোর সহজেই নাই।
কংসকে মারিয়া পুনি আসিমু এহি ঠাই॥"

তখন—

"সবিশেষ কথা শুনি গোবিন্দের তুণ্ডে।
কুলিশ পড়িল যেন রাধিকার মুণ্ডে॥"

শ্রীরাধা সহজে এই কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না; বলিলেন,—

"ব্রহ্মা হর পুরন্দর কাঁপে যার ডরে।
তারে কি নিবার পারে কংস-অনুচরে॥"

* * *

কানু বোলে—"শুন প্রিয়া আসিয়াছে চর।
গিয়া-মাত্র আসিবাম ব্যাজ নাহি মোর॥
শোক না ভাবিও প্রিয়া কমল-নয়ানি।
এক-চিত্তে হরষিতে দিয়ার মেলানি॥
আসিমু তোমার এথা দিন দুই ব্যাজ।
হাসিয়া মেলানি দেহ না করিও লাজ॥"
পুনরপি বোলে রাধা "শুন প্রাণেশ্বর।
তোর পরিহাস শুনি ধন্দ লাগে মোর॥"
তাহা শুনি গোবিন্দে বোলেন মধুর বাক্যে।
"মিথ্যা কথা তোমাতে কহিমু কোন শক্যে॥
আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রূর।
হাসিয়া মেলানি দেহ যাই মধুপুর॥"

* * *

এহি মতে বার বার বোলে যদু-পতি।
তত ক্ষণে স্বরূপ জানিলা রসবতী॥

সকরুণে কান্দে রাধা ভাবিয়া বিষাদ।
কেমন কুক্ষণে মোর পড়িল প্রমাদ॥
আচম্বিত কথা মুঞি শুনিল শ্রবণে
প্রাণ মোর স্থির নহে—বিকলিত মনে॥
বিষাদ ভাবিয়া গোবিন্দের পায়ে ধরি
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে রাধিকা সুন্দরী॥"

(গান-ছন্দ ভাটিয়ারী রাগ)

"স্বরূপে কহিবা বন্ধু স্বরূপে কহিবা।
দড় নাকি প্রাণ-নাথ মধু-পুরে যাইবা ॥
মুখেত অমৃত তোমার অন্তরেত বিষ।
অখনে জানিল তোমার অন্তরে কুলিশ ॥
মধু-পুরে যাইবা তুমি মোর প্রাণ লৈয়া।
কেবল শরীরখানি মোর ঠাই থুয়্যা ॥"

অতঃপর হরি-বংশে নানা সুরের দশ বারোটী পদে শ্রীরাধার যে করুণ ক্রন্দন চলিয়াছে, উহার ২।৪টি পঙ্‌ক্তি করিয়া উদ্ধৃত করিলে ভবানন্দের প্রতি অবিচার করা হইবে; তাই আমরা অগত্যা সংক্ষেপে প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করিব।

"এহি মত সুবদনী বিলাপিয়া কান্দে।
কর্ম্ম-দোষ আপনার বিধাতাক নিন্দে ॥
গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয়া শুন চন্দ্র-মুখি।
তোমার বিরহে আমি বড় দুখে দুখী ॥
হাসিয়া না বোল যদি যাইতে মধু-পুর।
রহিব নিকটে তোর যাইব অক্রূর ॥
তবে গুণবতী রাধা চিন্তে মনে মনে।
বিরস হইলে প্রভু কি কাজ জীবনে ॥
মৃদু মধু-স্বরে বোলে শুন যুব-রাজ।
তুরিতে আসিহ মাত্র না করিহ ব্যাজ ॥
এত শুনি যদু-পতি হরষিত-মন।
প্রেম-ভাবে রাধিকারে দিলা আলিঙ্গন ॥

* * *

এহি মতে হইল রজনী অবসান।
মাগেন মেলানি হরি রাধিকার স্থান ॥

* * *

রাধা বোলে যদি প্রভু নাহি বাস ভীন।
স্মরণ-পূর্ব্বক মোরে দেহ পদ-চীন ॥
যদি বা বিলম্ব তোমার হয় মধু-পুরে।
তাক দেখি বিরহ-আনল যাইব দূরে ॥
রাধার বিরহ শুনি মাধুরী জন্মিল।
কণ্ঠ হৈতে কৌস্তুভ-মণি খসাইয়া দিল ॥

কৌস্তুভ পাইয়া রাধা হরষিত-মন।
কর-যোড় করি তবে বন্দিল চরণ ॥
গলাগলি করি কৃষ্ণ করিলা বিদায়।
রাধারে মোহিত করি মধুপুরে যায় ॥

পিতা মাতা ও বন্ধু-বর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুষে অক্রূরের রথে মধুপুরীতে প্রস্থান করিয়াছেন,—

"গোকুল ছাড়িলা যদি প্রভু নারায়ণ।
সকল সম্পদ দূর হৈল সেহি ক্ষণ ॥

* * *

আছিল কুসুমময় শ্রীবৃন্দাবন।
সৌরভ মকরন্দ দূর হৈল সেহি ক্ষণ ॥
না করে ঝঙ্কার-শব্দ মধুকর সবে।
কোকিলে পঞ্চম তেজি রহিল নীরবে ॥
মলয়া-পবন বায়ু না বহে তখন।
ময়ূরে বিরস হৈয়া ছাড়িল পেখন ॥
যমুনা কল্লোল যত তখনে ছাড়িল।
থাকিতে যৌবন গর্ব্ব তথাপি টুটিল ॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া শ্রীরাধার শোকের সাগর আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এত দিনে শ্রীরাধার শাশুড়ী, স্বামী প্রভৃতি বহিরঙ্গ লোকেরাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীরাধা লক্ষ্মীরই অবতার, তাঁহার উপর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের কোনও প্রভুত্ব নাই; তাই তখন তাঁহারাও অন্তরঙ্গ সখীদিগের সহিত মিলিয়া শ্রীরাধাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা কিন্তু—

"ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে গড়াগড়ি বাহে।
ভাবিয়া বিষাদ রাধা কান্দে উচ্চ রায়ে ॥
সকরুণ-ভাবে কান্দে বিলাপ করিয়া।
ত্রিভুবন আকুলিত বিলাপ শুনিয়া ॥
এক ঠাঞি স্বর্গ-বাসী হৈয়া দেব-গণ।
রহিয়া নীরবে তারা শুনয়ে কান্দন ॥
পাতালের নাগ আর দৈত্য-লোক শুনে।
সর্ব্ব-লোকের অশ্রু-পাত হয় সকরুণে ॥

কাননের পশু-গণে শুনে ঊর্দ্ধ-মুখে।
ধেনু বৎসে তৃণ পানি নাহি খায় দুখে॥
কল-রব না করে যত পক্ষী বিহঙ্গম।
রাধার করুণায়ে পিকে তেজিল পঞ্চম॥
ধরণী বিদার হয়ে সেহি বিলাপ শুনি।
সমাধি তেজিয়া ধ্যান-ভঙ্গ হয় মুনি॥
যমুনা-কল্লোল টুটে স্রোত বহে ধীর।
না চলে রবির ঘোড়া সূর্য্য হৈল স্থির॥

* * *

গোকুলে আছিল যত গোপের বনিতা।
রাধার ক্রন্দন শুনি আসিলেক তথা॥
যশোদা রোহিণী আদি যতেক গোপিনী।
বিমলা আইল তবে রাধার জননী॥

* * *

কান্দিতে কান্দিত সব হৈয়া আকুলিত।
নিশি অবসান হৈল রাধার পুরীত॥
আঁখিতে পোহাইল নিশি শোকাকুল হৈয়া।
প্রভাতে গেলেন ঘরে বিষাদ ভাবিয়া॥
একাকী রহিলা রাধা হৈয়া বিরহিত।
ঝুরিতে দারুণ শোকে হইল মোহিত॥”

এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধ করিয়া পিতা মাতার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক উগ্রসেনকে মথুরার রাজত্ব প্রদান করিলেন। গোকুল হইতে নন্দ প্রভৃতি যে গোপ-গণ কংসের আহ্বানে মথুরায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইয়া রাজ-কর প্রদানপূর্ব্বক সায়ংকালে গোকুলে ফিরিয়া আসিলেন। এই অভাবনীয় নূতন ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রত্যাগমনের আশা তিরোহিত হওয়ায় গোকুল-বাসীরা অপার শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

“শোকেত আকুল রাধা কান্দে নিরবধি।
দুইটী আঁখির জলে বহি যায় নদী॥
শয়ন ভোজন নাহি নাহি গৃহ-কাম।
আকুলী হইয়া রাধা কান্দে অবিশ্রাম॥
এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন হৈল।
ঘোর নিশি-যোগে রাধা স্বপন দেখিল॥

পরিধান করিয়াছে সুপীত বসন।
নব-জলধর-অঙ্গ কৌস্তুভ-ভূষণ ॥
কদম্ব-বকুল-মালা মালতী দোসর।
কস্তুরী-চন্দন-বিরাজিত কলেবর।
ললাটে চন্দন তাথে আবিরের বিন্দু।
রাহু-গরাসেত যেন দিন-মণি ইন্দু ॥

* * *

সর্ব্বাঙ্গে ফুলের রেণু কটিতে কিঙ্কিণী।
রাঙ্গা-পদে সুমধুর বঙ্করাজ-ধ্বনি ॥
ইন্দ্র-ধনু জিনি ভুরু কামের কামান।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে বরিখয়ে চোখা বাণ ॥
সুরঙ্গ অধর-ওষ্ঠ হস্তেত মুরারি।
রাধার বিছানে আসি বসিলা শ্রীহরি ॥

* * *

মেলিল নয়ন রাধা নিশি অবসানে।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে না দেখিয়া তানে ॥"

এই স্বপ্ন-দর্শনে শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ আবার যেন নবীন হইল। সখী শ্রীমতী শ্রীরাধাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, রজনী-শেষের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না ; শ্রীরাধার প্রাণ-কান্ত আবার নিশ্চিতই অবিলম্বে গোকুলে শুভাগমন করিবেন। যদি তিনি দুই চারি দিনের মধ্যে সেখানে না আসেন, তাহা হইলে শ্রীমতী সখী নিজে মথুরায় যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। এ দিকে—

"উদ্ধবের ঘরে আসি প্রভু নারায়ণ।
আচম্বিতে রাধিকারে হইল স্মরণ ॥
সর্ব্ব-ভূতময় প্রভু লীন তিন লোকে।
অভিপ্রায়ে জানিলেন রাধার যত দুখে ॥
এহি বোলি উদ্ধবের হস্তেত ধরিয়া।
কহিতে লাগিল প্রভু বিনয় করিয়া ॥
শুনহ উদ্ধব ভাই আমার উত্তর।
তোমার অব্যক্ত কিছু গুপ্ত নাহি মোর ॥
গোকুলেত রাধা আছে মোর অনুভাবে।
তথা গিয়া শান্ত করি আসিবা উদ্ধবে ॥

বিনয় করিয়া কৈও সুন্দরীর ঠাই।
অবিলম্বে আসি আমি কিছু ব্যাজ নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ভক্ত-প্রবর উদ্ধব গোকুলে যাইয়া আগে নন্দ ও যশোদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরে শ্রীরাধার মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলেন।

"হইল ঘোষণা যুড়ি গোকুল-নগরী।
রাধারে সাস্তিতে দূত পাঠাইছে হরি ॥
তাক শুনি গোকুলের যতেক যুবতী।
রাধার মন্দিরে গিয়া মিলে শীঘ্র-গতি ॥
শ্রীমতী মহোদা কৈল রাধিকার ঠাঞি।
উদ্ধবে সাস্তিতে তোরে পাঠাইছে গোসাঞি॥
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরষিত-মন।
উঠিয়া বসিল কিছু প্রসন্ন বদন ॥"

আইহন ওরফে আয়ান অভ্যর্থনা করিয়া উদ্ধবকে শ্রীরাধার মন্দিরের ভিতর লইয়া গেলেন।

"শ্রীমতী মহোদা আদি নারী চারি ভিত।
মধ্যে বসিয়াছে রাধা শোকাকুল-চিত ॥
মলিন বস্ত্র পরি আছে শোকে বিরহিণী।
নবীন মেঘেত যেন দেখিয়ে দামিনী ॥
চারি দিকে বেষ্টিত সকল গোপ-দারা।
চন্দ্রের নিকটে যেন শোভিয়াছে তারা ॥
অভিপ্রায়ে উদ্ধবে চিনিল শ্রীরাধারে।
সম্ভ্রমে ভূমিত পড়ি দণ্ডবত করে ॥

*   *   *

ভক্তি-পুরস্কারে যদি বন্দিল চরণ।
লক্ষ্মী-রূপ উদ্ধবে দেখিল সেহি ক্ষণ ॥
প্রণতি করিয়া উদ্ধব করিলেক স্তব।
'নমো মহাজননি নমো অনুভব ॥
নমো সিন্ধু-সুতা নমো কমলা-সুন্দরি।
বিষ্ণু-প্রিয়া বৃন্দাবনি নমো সুরেশ্বরি ॥
সর্ব্ব-জীব-তত্ত্বময়ি নাহি আদি অন্ত।
চরণ-পঙ্কজে মোর প্রণাম অনন্ত ॥'

তুষ্ট হৈয়া বোলে রাধা কোমল বচন।
এত ক্লেশ পাও বাপু কিসের কারণ॥
উঠ উঠ আরে বাপ করোঁ পরিহার।
কহ কহ শুনি প্রভুর কুশল সমাচার॥
উদ্ধবে প্রণাম করি কৈলা নিবেদন।
কুশলে আছেন প্রভু শ্রীমধুসূদন॥
মোরে পাঠাইছে মাও তোমা সান্ত্বিবার।
আসিবেন অবিলম্বে ব্যাজ নাহি আর॥

সদায়ে তোমার গুণ করন্তি বাখান।
পরিহরি রাজ-কার্য্য বিরহিত-জ্ঞান॥
কত নিবেদিমু মাও তোমার চরণে।
চিন্তিত না হৈও মাও আসিব আপনে॥
উদ্ধবের মুখে রাধা এহি কথা শুনি।
নম্র-ভাবে কান্দিয়া বোলেন সুবদনী॥

(গান—ছন্দ গান্ধার)

"শুন প্রাণের উদ্ধব,
কত বা কহিব বিবরণ।
যখনে ছাড়িল বন্ধু—বিফল জীবন॥ ধ্রু॥
নিশি দিশি অবিরত প্রাণখানি ঝুরে।
অখনেও বোল প্রভু রৈল মধু-পুরে॥
যাইতে কহিল হৈব দিন দুই চারি।
ভুলিয়া রহিল বাসি পায়্যা বর-নারী॥
জানিলোঁ জানিলোঁ বন্ধু আর না আসিব।
ঝুরিতে বিরহে মোর তনুখানি যাইব॥"

এই ভাবে আবার নানা সুরের নানা পদে শ্রীরাধা উদ্ধবের নিকট বিরহ-কাহিনী বর্ণন করিতে লাগিলেন; উদ্ধবও যথা-সাধ্য সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু যে জন্যই হউক, তাঁহার ব্রজে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না; বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ছয়টী ঋতু একে একে আগত ও অতীত হইল; শ্রীরাধা প্রাচীন কালের অন্যান্য বিরহিণীদিগের মত প্রিয়-সখীর নিকট "বার-মাস্যা" দুঃখের কাহিনী কহিয়া কহিয়া প্রিয়তমের দর্শন-আশায় সপ্তদশ মাস জীবন রক্ষা করিয়া রহিলেন; আর বুঝি জীবন থাকে না; শ্রীরাধার সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া

সখী শ্রীমতী নিজেই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাত্রা করিলেন ;—কিছু দূরে যাইয়াই একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

দ্বিজে বোলে 'লোক আর মথুরা না রয়।
জরাসন্ধে পুরিয়া করিল ভস্মময় ॥
প্রজাগণ লৈয়া হরি সমুদ্র ভিতর।
করিছে নির্ম্মাণ তথা দ্বারকা-নগর ॥
রুক্মিণী আদি বিভা করিছে অষ্ট জন।
সংসারের দুষ্ট যত করিল নিধন ॥
আমি যাই দ্বারকাতে দেখা করিবার।
কহিল তোমাতে মথুরার সমাচার ॥'
তাহা শুনি শ্রীমতী বোলয়ে হরষিতে।
'আমিও যাইব দ্বিজ তোমার সহিতে ॥'
এহিরূপে দুইজন গেল দ্বারকাত।
অদ্ভুত নগর তবে দেখিল সাক্ষাত ॥
দ্বিধা নাহি স্ত্রী-লোক যাইতে অন্তঃপুর।
রুক্মিণীর পুরে গেল হরিষ প্রচুর ॥
দেখিল রুক্মিণী দেবী অতি মনোরমা।
তেনি হৈতে সুন্দরী দেখিল সত্যভামা ॥
এহি মতে ভ্রমিয়া যে শ্রীমতী দেখিল।
প্রভুর কার্য্য না দেখি বিকল হইল ॥
সভা করি বসিছেন দেব নারায়ণ।
চতুর্দ্দিগে হস্ত-যোড়ে যত প্রজা-গণ ॥
অন্তরে ত থাকি চায়্যা রহিল শ্রীমতী।
সর্ব্ব-ভূতময় প্রভু জানিল সম্প্রতি ॥
উদ্ধবেরে সঙ্গে করি দেব নারায়ণ।
শ্রীমতীর নিকটে গেলেন সেহি ক্ষণ ॥
দেখিয়া প্রভুর পদ শ্রীমতী সুন্দরী।
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে দণ্ডবত করি ॥
প্রভু বোলেন—'করিয়াছ সাহস অপার।
কহ প্রিয়া রাধার কুশল সমাচার ॥'
শ্রীমতী বোলয়ে—'এহি রাধার সন্দেশ।
চাহিতে তোমার পথ তনু হৈল শেষ ॥

জিজ্ঞাসিলা যৎকিঞ্চিৎ কহি সমাচার।
সহজে সজীবে লাগ না পাইবা রাধার ॥"

সময় পাইয়া শ্রীমতী সবিস্তারে বিরহিণী শ্রীরাধার করুণ কাহিনী বর্ণন করিলেন; সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকেও যথাসাধ্য তীব্র ভর্ৎসনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; পরিশেষে বলিলেন,—

"যদ্যপি না যাও তুমি গোকুল-নগরে।
কি কথা কহিমু গিয়া রাধার গোচরে ॥
ভরসায়ে রহিয়াছে অভাগিনী রাধা।
আসিবার কালে কেনে না পড়িল বাধা ॥
কোন লাজে যাইমু মুঞি গোকুল-নগর।
জিজ্ঞাসা করিল যদি কি দিমু উত্তর ॥
এহি লাজে না দেখিমু রাধা হেন সখী।
তোমার উপরে বধ দিমু বিষ ভখি ॥
তোমার দোষ নাহি আমি জানিলু এখন।
কেমত কুমতি নারী বান্ধিয়াছে মন ॥
যত নারী রাধার দাসীর যোগ্য নয়।
তেহুঁ আজ্ঞা-কারী হৈছ এহি সে বিস্ময় ॥"
কান্দিয়া শ্রীমতী কহে করুণা–বচন।
লজ্জিত হইয়া বোলে দৈবকী-নন্দন ॥
'শুন হের চন্দ্র-মুখি নিবেদন মোর।
যত কিছু কহিয়াছ নহে অনাকর ॥
কিন্তু একখানি কথা শুন ল সুন্দরি।
ভাই উদ্ধবেরে তুমি নেও সঙ্গে করি ॥
বিনয় করিয়া তুমি কৈও সুন্দরীত।
ক্রোধ ক্ষেমা করি যেন আইসেন তুরিত ॥'

শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায় অনুসারেই পর দিবস প্রাতে শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া উদ্ধব গোকুলে যাত্রা করিলেন।

"দিন-অবসানে উদ্ধব গোকুলেত আসি।
শ্রীমতীর মন্দিরে বঞ্চিল সেহি নিশি ॥
প্রভাতে উঠিয়া গেল রাধিকার ঘর।
সুন্দরী শ্রীমতী আগে গেল একেশ্বর ॥
মহোদা বোলয়ে হের উঠ গুণবতি।
মধু-পুরী হৈতে আইল সুন্দরীশ্রীমতী ॥

নয়ন মেলিয়া রাধা পরিহরি নিন্দ ।
কহে—'প্রাণ-সখি কোথা রহিছে গোবিন্দ ॥'

(গান-ছন্দ নাগোদা)

"কহ কহ প্রাণ-সখি প্রাণ করোঁ স্থির ।
শুনিয়া কুশল-বার্ত্তা জুড়াউক শরীর ॥
ভরসে রাখিলু্ তনু পাতিয়ান দিয়া ।
আনিবার বন্ধুরে তুমি কৈছ দড়াইয়া ॥
করিছ সাহস বড় মোর হিত লাগি ।
বিলম্ব করিয়া কেনে হও বধ-ভাগী ॥'

* * *

এহি মতে কান্দে রাধা বিষাদ ভাবিয়া ।
শ্রীমতী বোলয়ে কিছু লজ্জিত হইয়া ॥
ক্ষেণেকে বোলয়ে 'সখি কি পুছ আমারে ।
আসিছে উদ্ধব তোমা নিবার অন্তরে ॥
উদ্ধবে শুনিয়া তবে এহি বিবরণ ।
ভক্তি-পুরস্কারে বন্দে রাধার চরণ ॥
প্রণতি-পূর্ব্বকে পরিহার করি বোলে ।
"হইছে প্রভুর আজ্ঞা যাইতা আমা উলে ॥'
শুনিয়া পুরুষ নারী গোকুলের লোকে ।
একত্র হইয়া সবে কান্দে মন-দুখে ॥
গোবিন্দের গমনে গোকুল হৈল ভিন্ন ।
আছিল সুন্দরী রাধা এহি মাত্র চিহ্ন ॥
রাধা তথা গেলে হরি হইব নিষ্ঠুর ।
এত দিনে গোকুলের লক্ষ্মী গেল দূর ॥
পাপিষ্ঠ শ্রীমতী কোন্ কর্ম্ম কৈল গিয়া ।
সকল গোয়ালে কান্দে বিষাদ ভাবিয়া ॥
উদ্ধবে বোলয়ে 'মাও ব্যাজ কর কেনে ।
অবিলম্বে রথে আইস ক্ষেমা করি মনে ॥'
অন্তরে হরিষ রাধা অঙ্গ পুলকিত ।
উত্তর দিবার শক্তি নাহি কদাচিৎ ॥
পুনরপি উদ্ধবে করিল নিবেদন ।
'প্রত্যুত্তর না দেও মাও কেমন কারণ ॥'

রাধা বোলে 'মুঞি হৈছুঁ যেমত কুলিশ।
তোমারে দিবার রত্ন নাহিক সদৃশ ॥
আশীর্ব্বাদ করোঁ বাপু শুন সাবধানে।
কল্যাণে রাখুক তোমা প্রভু ভগবানে ॥'
পুলক-উদ্গম-চারু হৈয়া সুবদনী।
গ্রীবা হৈতে খসাইলা কৌস্তভ-মণি ॥
উদ্ধবেরে মণি তবে দিলেন সুন্দরী।
পুটাঞ্জলি করি লৈল মস্তকেত ধরি ॥
ভক্তিয়ে উদ্ধব কহে যোড় করি হাত।
'এহি মণি দিও মাতা প্রভুর সাক্ষাত ॥
আপনার গলে মাও রাখহ এখন।
অবিলম্বে বিমানে করহ আরোহণ ॥'
তখনে সুন্দরী রাধা হরষিত হৈয়া।
শাশুড়ীর আগে কহে পদ-ধূলি লৈয়া ॥
'ক্ষেমিও সকল মোর যত অবিনয়।'
আইহনেরে সম্বোধিয়া এহি কথা কয় ॥
কান্দিয়া তখনে মায়ে পুত্রে কহে কথা।
'স্নান করি বেশ ধরি তবে যাও তথা ॥'
রাধা বোলে—'বেশে মোর কোন্ প্রয়োজন।
এহি মতে দেখি গিয়া প্রভুর চরণ ॥'
শাশুরীর পদ বন্দি স্বামী সম্ভাষিয়া।
রথে আরোহিল রাধা হরষিত হৈয়া ॥
শ্রীমতী যশোদা স্থানে কহিল সুন্দরী।
'আমারে দেখিও গিয়া দ্বারকা-নগরী ॥'
ননদী সখীর গলে ধরিয়া সুন্দরী।
ক্রমে ক্রমে সম্ভাষিল যত গোপ-নারী ॥
বিষাদ ভাবিয়া শোকে কান্দে ব্রজ-সবে।
তখনে বিমান তবে চালায় উদ্ধবে ॥

* * *

এহি মতে অস্ত-গিরি গেল দিবাকর।
উদ্ধব মিলিল গিয়া দ্বারকা-নগর ॥
উদ্ধবে বোলয়ে 'মাও শুন নিবেদন।

বিদ্যমানে দেখ এহি প্রভুর ভুবন ॥'
রাধা বোলে—'শুন বাপ আমার উত্তর।
পদ-ব্রজে যাইমু আমি প্রভুর গোচর ॥'
তাক শুনি উদ্ধবে রথ রহাইল।
তথনে সুন্দরী রাধা হাটিয়া চলিল ॥
রাধার শরীর-তেজে জলে পুরীখান।
বপু তপ্ত-কাঞ্চন যে দেখিতে সমান ॥
অগ্নি-উল্কা হেন রাধা দেখে সর্ব্ব-জনে।
অনিমিখ-নয়নে দেখিল তত ক্ষণে ॥
সত্যভামার মন্দিরেত প্রভু নারায়ণ।
আসিল সুন্দরী রাধা জানিল তখন ॥
গোবিন্দে বোলয়ে 'শুন দেবি সত্যভামা।
আসিল মোর প্রাণেশ্বরী সেহি তিলোত্তমা ॥'
সত্যভামা বোলে 'প্রভু এথা আন গিয়া।
আমি-সবে দেখি তানে নয়ন ভরিয়া ॥'
গোবিন্দ বোলেন 'শুন অনুব্রজি আনি।
পরিণামে দেখি দুঃখী হইবা কামিনি ॥'
সত্যভামা আদি অষ্ট রমণীর সঙ্গে।
অনুব্রজি আনিতে গোবিন্দ যাই রঙ্গে ॥
উদ্ধবে বোলয়ে 'মাও শুন নিবেদন।
নারী-গণ লৈয়া দেখ আইসে নারায়ণ ॥
এহি অষ্ট সুন্দরী বিবাহ করিছাঞি।
তোমার সম্ভ্রমে তানা আপনে আসিছাঞি ॥'
শুনিয়া সুন্দরী রাধা হরষিত-মনে।
মন্দ মন্দ চলি যাই খঞ্জন-গমনে ॥
হেন কালে যদুপতি দেখিল রাধারে।
অবল শরীর ক্ষীণ হাটিতে না পারে ॥
কালা বস্ত্র পরিধান শোকে আকুলিত।
শ্রীমতীর কথাখানি জন্মিল প্রতীত ॥
রক্ত-গৌর শরীরেত মলিন বসন।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥

শরীরের তেজ বর্ণ উল্কার সমান।
তপ্ত-কাঞ্চন হেন জ্বলে পুরীখান॥
নানা মতে শোভিয়াছে অঙ্গের অভরণ।
কৌস্তুভ-দীপিত-ক্রমে জ্বলে দুই স্তন॥
ভবানীরে জিনে রূপ হেন তিলোত্তমা।
হেরিয়া মূর্চ্ছিত নারী আদি সত্যভামা॥

* * *

রুক্মিণী আদি অষ্ট নারী রৈল সেহি স্থান।
একেশ্বর গেল হরি রাধা বিদ্যমান॥

* * *

প্রভুর রাতুল-পদ দেখি সুবদনী।
তপনের তাপে যেন উনায় কাঁচা ননী॥
দেখিয়া সুন্দরী রাধা পুলকিত অতি।
কুরঙ্গ-আঁখির জলে তিতে বসুমতী॥
প্রদক্ষিণ সপ্ত বার করিয়া সুন্দরী।
কোকিলার স্বরে কহে দণ্ডবত করি॥
'অয়ে প্রভু নারায়ণ শুন নিবেদন।
সপ্তদশ মাসে আজি হৈল দরশন॥
হেনত ভরসা মোর না আছিল মনে।
ভজিমু দুইখানি তোমার রাতুল চরণে॥'
প্রভুর কমল-পদে দিয়া দুই হাত।
কান্দে চন্দ্র-মুখী রাধা হয় অশ্রু-পাত॥
'বিরহ-জ্বালায়ে নিশি-দিসি পুড়ি মরোঁ।
নম অবিবেক-সিন্ধু নমস্কার করোঁ॥
কঠিন হৃদয় তোর কুলিশ-আকার।
সত্য-হীন মিথ্যা-বাদী করোঁ নমস্কার॥'

* * *

এহি মতে শশি-মুখী রাঙ্গা-পদে ধরি।
বিবিধ কাতর বোলে দণ্ডবত করি॥
প্রণাম করিতে তেজ বাড়িল প্রচুর।
মলিন-কুবেশ রাধার সব হৈল দূর॥
প্রচণ্ড অঙ্গের তেজ সেহি ক্ষণ হৈল।

সহিতে না পারে উদ্ধব দূর হৈয়া রৈল ॥
সায়ং-কালে সেহি তেজে জলে পুরীখান।
দ্বারকানিবাসী লোক ত্রাসে কম্পমান ॥
আপনা অনুমান করি কেহ নাহি বুঝে।
সর্ব্ব-লোকের তনু দহে রাধিকার তেজে ॥"

* *

সুন্দরী রাধার কোপ দেখি অতি বড়।
ব্যস্ত হৈয়া শ্রীহরির চিন্তা হৈল দড় ॥
পুটাঞ্জলি করি বোলে শ্রীমধুসূদন।
'শুন হের চন্দ্র-মুখী মোর নিবেদন ॥
আমা হৈতে পর-দার হৈয়াছে বিস্তর।
কৃপা-যুক্ত হৈয়া প্রিয়া মোরে ক্ষেমা কর ॥
এহি রাজ্য সিংহাসন সকলি তোমার।
পাটেশ্বরী হৈয়া প্রিয়া কর অধিকার ॥
পরিহার করোঁ প্রিয়া চরণেত ধরোঁ।
পুনরপি ভর্ৎস যদি তোর আগে মরোঁ ॥'
এইরূপে হস্ত-যোড়ে বোলে যদুপতি।
তবে প্রত্যুত্তর দিলা রাধা গুণবতী ॥
'অয়ে প্রভু মুনি-রাজ কপট-সাগর।
তোমার চরিত্র মুঞি জানোঁ পূর্ব্বাপর ॥
ক্ষেমিতে উচিত এবে জানিছু সকল।
মুখে মাত্র মিষ্ট বোল অন্তরে গরল ॥
জানিছু জানিছু মুঞি তোর যেহি মন।
তবে যে এমত কহ নির্লজ্জ কারণ ॥
সৌতিনের মেলে মুঞি বঞ্চিতে সাহস।
ছাড়িমু পরাণ দড় এহি সে মানস ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ দ্বারকাত মোর বধ।
এহি সে ভাগ্য মোর দেখিলুঁ রাঙ্গা-পদ ॥'
করুণা করিয়া কান্দে রাধা গুণবতী।
রাধার করুণা শুনি দুঃখিত শ্রী-পতি ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাধা হইল মোহিত।
দেখিয়া শ্রী-পতি হৈলা অত্যন্ত দুঃখিত ॥

কি করিলে কি করিব চিন্তে মনে মন।
আকাশে থাকিয়া চিন্তে যত দেব-গণ ॥
বিরিঞ্চি বোলয়ে—'ইন্দ্র প্রমাদ হইব।
বিষ্ণুরে লইয়া লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে আসিব ॥
না মারিব দুষ্ট-জন না খণ্ডিব ভার।
অত্যন্ত প্রচণ্ড কোপ বাড়িল রাধার ॥
ক্ষেমা নাহি করে কোপে করয়ে রোদন।
আসিব প্রভুরে লৈয়া বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥'
সহস্রাক্ষে বোলে—'শুন কমল-আসন।
পরিহার করি কহ প্রভুর চরণ ॥'
তখনেহি পদ্ম-যোনি আসি সেহি স্থানে।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে প্রভুর চরণে ॥

ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-রূপিণী লক্ষ্মীর বহু স্তব-স্তুতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—

"সৃষ্টি-নাশ না করিও প্রভু শক্র-জিৎ।
লক্ষ্মীরে সন্তোষ কর তান মনোহিত ॥"
শ্রী-পতি বোলয়ে 'আত্ম-ইচ্ছা নহে মন।
নিবেদন করি কহ রাধার চরণ ॥'
তখনে বিরিঞ্চি চতুর্ভুজ পুট করি।
পরিহার করি বোলে 'শুনহ সুন্দরি ॥
যাবত অনিষ্ট নাশে প্রভু চক্র-পাণি।
তত দিন মহী-তলে রহিবা কামিনি ॥
যেমত বিলাস ভোগ করিছ গোকুলে।
তেমত কৌতুকে বঞ্চ শ্রীহরির উলে ॥'
রাধা বোলে 'তবে আমি রহিবারে পারি।
গুপ্ত করি রাখে যদি শঙ্খ-চক্র-ধারী ॥'
হরি বোলে 'আমার আছয়ে এহি মতি।
আপনার স্থানে চলি যাহ প্রজাপতি ॥'
প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্মা করিল গমন।
রাধিকার তেজে দহে দ্বারকা-ভুবন ॥
দ্বারকা-নিবাসী সব ত্রাসে কম্পমান।
কোথা গেলা রাম কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ ॥
প্রলয়-কালেত যেন দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড।

তেন মতে দহে তেজে অধিক প্রচণ্ড ॥
তিলোত্তমার রূপ-গুণ তেন প্রজ্বলিত।
মনে মনে রাধা-কান্ত হইল চিন্তিত ॥
নিবেদন ব্রহ্মার লোকের প্রতিকার।
শরীরে রাখিমু রাধা এহি যুক্তি সার ॥
পূর্ব্বে যে রাধার বর হইল স্মরণ।
এতেকে নিশ্চয় কৈল শ্রীমধুসূদন ॥

* * *

মায়ায়ে মোহিত হৈয়া ত্রৈলোক্যের নাথ।
আচম্বিত গোবিন্দের হৈল অশ্রু-পাত ॥
দণ্ডবৎ করি রাধা বন্দিতে হরিরে।
নয়নের জল পড়ে রাধার শরীরে ॥
সেহি ক্ষণে প্রচণ্ড তেজ হইল শীতল।
সর্ব্ব-লোক সন্তোষিত রাধিকা বিকল ॥
তবে ব্রহ্ম-সনাতন হইল বিভোল।
গলে ধরি সুন্দরী রাধারে দিলা কোল ॥
সপ্তদশ মাসে অঙ্গ হৈল মিশামিশি।
মগ্ন হৈল হরি-অঙ্গে রাধিকা রূপসী ॥

* * *

শ্রীহরির প্রেম-রসে হৈলা এক-অঙ্গ।
অঙ্গীকার মহাজনের কেনে হৈব ভঙ্গ ॥

আমাদের এই প্রবন্ধ বিষয়-গৌরবে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, অতঃপর আমরা আর ভবানন্দের এই কাব্যখানার বিশেষত্ব ও কবিত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করিব না। হরি-বংশ হইতে যে পয়ার ও পদগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আমাদিগের বিশ্বাস যে, উহা হইতেই ভবানন্দের কাব্যখানির বিশেষত্ব ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

উপসংহারে ভবানন্দের দেশ ও কাল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। ভবানন্দের এই বৃহৎ কাব্যখানির মাত্র দুইখানা হস্তলিখিত পুথি আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। 'ক' চিহ্নিত প্রথম ও প্রাচীনতর পুথিখানা বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের লিখিত; 'খ' চিহ্নিত পুথিখানি বাঙ্গালা ১২১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল। (ক) পুথিখানি পাবনায় ও (খ) পুথিখানি কুমিল্লায় পাওয়া গিয়াছে। পুথি দুইখানার মধ্যে পদ ও পয়ারের সংখ্যার এরূপ বেশকম এবং পাঠের এত অনৈক্য দেখা যায় যে, পুথি দুইখানাকে একই গ্রন্থের দুইটী বিভিন্ন রূপান্তর (version) বলিলেও চলে। (ক) পুথিখানি ময়মনসিংহের অন্তর্গত

সুসঙ্গ পরগণায় ও (খ) পুথিখানি কুমিল্লার অন্তর্গত মিহিরকুল পরগণায় লিখিত হইয়াছিল। উভয় পুথির মধ্যে যে আটত্রিশ বৎসরের ব্যবধান আছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এরূপ একখানা বৃহৎ গ্রন্থ পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া, 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া এরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ইহা সম্ভবপর মনে হয় না; সুতরাং (ক) পুথি লিখিত হওয়ারও অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর আগে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কবি ভবানন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার এই বৃহৎ ও অপূর্ব্ব কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। হরি-বংশ পুথিখানির কোনও প্রতিলিপি এ যাবৎ পশ্চিম-বঙ্গে পাওয়া যায় নাই; প্রণিধান করিলেই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধৃত স্থল-গুলিতে যে, পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ দেখা যায়, সেগুলি কেবল লিপি-করদিগের কারিকরি নহে; কেন না, সেগুলি এমন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, রচনার ভাব ও ছন্দ ঠিক রাখিয়া উহাদের পরিবর্ত্তে অন্য কোনও শব্দ বসাইতে পারা যায় না। এ জন্য আমরা ভবানন্দকে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ বা কুমিল্লার অধিবাসী বলিয়াই অনুমান করি। হরি-বংশের পয়ার ও গীতগুলিতে যে দুই তিন শত ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, উহার কোথায়ও 'দীন ভবানন্দ' ব্যতীত কবি 'দ্বিজ' বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই; ইহা তাঁহার বিনয়-প্রসূত কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। ভবানন্দের রচনায় তাঁহার সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন সময়ে সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করার জন্য ব্রাহ্মণেতর কোন কোন জাতি, বিশেষতঃ বৈদ্য-জাতীয় ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুশীলন করিতেন; সুতরাং ভবানন্দ ব্রাহ্মণ না হইয়া, বৈদ্য কিংবা অন্য-জাতীয় হওয়াও বিচিত্র নহে। তিনি যেই কালের, যেই দেশের ও যেই জাতির লোকই হউন না কেন, তাঁহার এই 'হরি-বংশ' কাব্য তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অমর ও চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

অর্থশাস্ত্রে সমাজতত্ত্ব *

(৫)

সামাজিক জীবনের প্রকৃতি

অর্থশাস্ত্র-যুগের সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যও অনেক ছিল। মনে হয়, যেন সে সময়ে এখনকার দিনের মত জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না। আমাদের সময়ের মত লোকে আমরণ উদরান্নের চিন্তায় কাটাইত না। যাহার যেমন অবস্থা, সে সেরূপই নিজ সঙ্গতির মধ্যে থাকিয়া অতিচিন্তা বা অতিক্লেশের দাস না হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। কৃষকাদি নিজ নিজ শস্যসম্পদেই জীবননির্ব্বাহের ক্লেশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত। শ্রমজীবীরাও অভাব-পীড়িত ছিল না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা উচ্চ রাজকার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন করিত আর শ্রেষ্ঠী ধনীদিগের ত কথাই ছিল না।

নানা কারণে তখন জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই। লোকে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিত। আজকালের মত এত উচ্চ আশাও ছিল না। আর বিদেশীয় কুশিক্ষার মোহে নিজ নিজ জীবিকার পথ ছাড়িয়া, চাকুরী বা উচ্চ পদের আশায় নিজ সুখস্বচ্ছন্দ্যের পথে কাঁটা দিত না। বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্যও এত প্রবল হয় নাই, আর ব্যবসার নামে দেশের শস্য বা উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির এত ব্যবস্থা ছিল না। দেশের টাকা দেশেই থাকিত। রাজকর্ম্মচারীরাও জিনিসের দর বাঁধিয়া দিতেন। ব্যবসায়ীকে অবাধ স্বাধীনতা দিতেন না। তাহারা ইচ্ছামত দ্রব্যাদির দর বাড়াইতে পারিত না। সরকারও প্রজাসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য আগে দেখিতেন।

লোকে ভোগসুখ করিতেও জানিত। এখনকার মত দারিদ্র্যপীড়নের ফলে নিরানন্দের স্রোত দেশে আসে নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের—এককালীন সেবাই চলিত। ধর্ম্মের নামে এত কাঠোর্য্য আসে নাই। বরঞ্চ অর্থৈষণা দেশে প্রবল ছিল। প্রথম জীবনে বিদ্যাচর্চ্চা, দ্বিতীয়ে ধনাগম—গার্হস্থ্যজীবন, আর শেষ বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল। মুমুক্ষু বা জ্ঞানপিপাসু লোকে ধর্ম্মস্পৃহার জন্য সংঘাদিতে যোগ দিতেন. আর আর্য্যমতাবলম্বীর দল শেষ বয়সে বানপ্রস্থী বা ভিক্ষু হইতেন।

ধর্ম্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করার সুবিধাও ছিল না। মধ্য বয়সে কেহ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিয়া সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে রাজকোপে পড়িতে হইত। আর স্ত্রীলোককে সংঘে যোগদান করাইলে বিশেষ দণ্ড হইত। কেহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনের ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নিজ পরিবারবর্গের ব্যবস্থা করিয়া তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত। নচেৎ রাজা-

* ১৩৩১।২২এ অগ্রহায়ণ একত্রিংশ বার্ষিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দেশে দণ্ডিত হইতে হইত। রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপ লোককে গ্রহণ করিয়া তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন।

প্রকৃত বানপ্রস্থীদিগের জন্য রাজ সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। বানপ্রস্থীরা অনেক বিষয়ে অকর ছিলেন। তাঁহাদের জন্য আবার ব্রহ্মসোমারণ্যাদির ব্যবস্থা থাকিত।

এবার সাধারণ গৃহী লোকের জীবনের কথা বলিব। দুঃখের বিষয়, অর্থশাস্ত্রে লোকের দৈনিক জীবনের কোন কথা নাই। আর বাৎস্যায়নের কামসূত্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থেই উহার বর্ণনা নাই। তবে শেষোক্ত গ্রন্থের বর্ণনা পড়িয়া, অর্থশাস্ত্রের নানা স্থান পর্য্যালোচনায় যাহা বুঝা যায়, তাহা হইতে দৈনিক জীবনের আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইবে। সাধারণতঃ শয্যা হইতে উঠিয়াই লোকে মুখ প্রক্ষালনাদির পর সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, প্রাতরাশ আহারান্তে নিজ নিজ বৃত্ত্যানুযায়ী কার্য্যে মনোযোগ করিত। শ্রমজীবীর দল নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। ধনীরা বিশ্রম্ভালাপে পূর্ব্বাহ্ণ অতীত করিয়া, মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে স্নানাহারে মনোযোগ দিতেন। ধনী দরিদ্র সকলেই নিত্য স্নান করিত (বাৎস্যায়ন বলেন, নিত্যং স্নানং)। আর এই স্নানের আবার বিশেষ ব্যবস্থাও থাকিত। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে স্নানাগারের কথার উল্লেখ আছে। আবার লোককে স্নান করাইবার জন্য স্নাপক (বা পালিভাষায় নহাপক) নামক এক শ্রেণীর লোক থাকিত। স্নানকালে ধনী লোকেরা স্নেহচূর্ণাদি নানা প্রকার দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন ও তদন্তে গন্ধাদিতে শরীর লিপ্ত করিতেন।

স্নান ভিন্ন আবার উৎসাদনের ব্যবস্থা ছিল। (বাৎস্যায়ন বলেন,—দ্বিতীয়ং উৎসাদনং)। স্নানান্তে আহারের ব্যবস্থা ছিল। আহারে বিশেষরূপ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ের ব্যবস্থা থাকিত। আহারান্তে বিশ্রামের পর দরিদ্র লোকে নিজ কার্য্যে মনোযোগ দিত। ধনীর দল বা সৌখীন বিলাসীরা নিদ্রায় মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। তদন্তে তাঁহারা অপরাহ্ণে গোষ্ঠী, মিত্রসমবায়, সমাপানকাদিতে গমন করিয়া, তথায় আনন্দে কালাতিবাহিত করিতেন।

সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের কথা অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু নাই। তবে রাজপ্রণিধি অধ্যায়ে ও নিশান্তপ্রণিধি অধ্যায়ে রাজার দিনকৃত্যের অনেক কথাই পাওয়া যায়। উক্ত অধ্যায়দ্বয় হইতে দেখা যায় যে, রাজা প্রত্যহ অতি প্রাতঃকালেই উঠিতেন। প্রত্যুষেই—এমন কি, রাত্রির শেষ অষ্টম ভাগে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, চিকিৎসক ও মৌহূর্ত্তিকের সহিত সাক্ষাৎ করার পর সবৎসা গাভী ও বৃষ প্রদক্ষিণ করিয়া সভায় উপস্থিত হইতেন। প্রথম অষ্টম ভাগে নিজ আয়-ব্যয় চিন্তা করিয়া, দ্বিতীয়ে সভাগৃহে প্রজাসাধারণের অভাব অভিযোগের চিন্তা করিতেন। অতঃপর তৃতীয়ে স্নান ভোজন সমাপন করিতেন। স্নান ভোজনান্তে যথাক্রমে অধ্যক্ষাদির সহিত কার্য্যচিন্তা করিয়া, মন্ত্রী ও চারবর্গের সহিত পরামর্শ, মন্ত্রণাদি সমাপন ও তদন্তে সৈন্যাদি পরিদর্শন করিয়া, সেনাপতির সহিত সৈন্যাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দিবা শেষ করিতেন।

রাত্রিকালের কর্ত্তব্যও ঐরূপ উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত আছে। রাত্রির দ্বিতীয় অষ্টম ভাগে স্নান

ভোজন সম্পন্ন হইত। উহার পরের দুই ভাগ অন্তঃপুরে নিদ্রাদিতে কাটাইতেন। আর পঞ্চম ভাগ অতীত হইতে না হইতেই জাগরিত হইয়া স্বকার্য্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন।

রাজজীবনে ও প্রজাসাধারণের জীবনে অবশ্য অনেক প্রভেদ ছিল। বাহির হইতে সুখবিলাস-পূর্ণ প্রতীয়মান হইলেও উক্ত যুগের রাজতন্ত্রের রাজ্যেশ্বর কঠোর জীবনই অতিবাহিত করিতেন। শান্তি জীবনে খুব কমই ছিল। প্রতিনিয়তই রাজ্যরক্ষার চিন্তা, প্রাণরক্ষার চিন্তা প্রভৃতিতে রাজহৃদয় অভিভূত হইত। মন্ত্রী, ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র, গুপ্তশত্রু, সকল হইতেই রাজার ভয়ের কারণ ছিল। নানা কারণেই সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন হইত। স্বদেশীয় বা বিদেশীয় গুপ্তশত্রু খাদ্যে বিষ মিশাইতে চেষ্টা করিত। তজ্জন্য খাদ্যের বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন হইত। অগ্রে খাদ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, উহার বর্ণাদি হইতে উহাতে বিষ আছে কি না, তাহা দেখা হইত। পরে রক্ষিত পশু-পক্ষীকে খাওয়াইয়া উহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইত। রাজঅন্তঃপুরে সর্পাদি ছাড়িয়া দিয়া বা অগ্নিপ্রয়োগে গুপ্তহত্যার ভয়ও ছিল। তজ্জন্য নানাপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। রাজ্ঞী বা অন্তঃপুরিকাদিগের উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের উপায় ছিল না। তজ্জন্য অন্তঃপুরে নানাজাতীয় স্ত্রী পুরুষ ষণ্ড বামনাদি প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। বেশ্যা, যবনী, ম্লেচ্ছ রমনীও বিশ্বস্ত প্রহরীর কার্য্য করিত। তাহারা পূর্ব্বে সমস্ত সন্ধান লইয়া রাজাকে সংবাদ দিলে, তবে রাজা মহিষীবিশেষের গৃহে আসিয়া সুরক্ষিতভাবে কালাতিপাত করিতেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়েই রাজগণের এইরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগের ফরাসী রাজ্যে এবং এমন কি, ইদানীন্তন কালের চীনসাম্রাজ্য ও তুর্কসাম্রাজ্যে ঐরূপ ব্যবস্থাই ছিল। যাঁহারা তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব পদচ্যুত সম্রাট্ দ্বিতীয় আবদুল্ হামিদের অন্তঃপুর-জীবন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে না।

সপত্নীবিদ্বেষ-জর্জ্জরিতা বা পুত্রের সিংহাসন-লাভার্থিনী রাজ্ঞীগণও গুপ্তষড়যন্ত্র করিয়া স্বামীর প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ গুপ্ত হত্যার উদাহরণ-স্বরূপ ভদ্রসেন কারূষ (করূষরাজ্যাধিপতি), বিদূরথ ও জনৈক কাশীরাজের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নামগুলি বৃহৎসংহিতা, হর্ষচরিত ও অন্য দুই চারিখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সবের বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত। আত্মরক্ষিক প্রকরণ পাঠ করিলে এ বিষয়ে আরও অনেক কথা জানা যায়। রাজা প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে দশবর্গীয় প্রহরি-পরিবৃত হইয়া যাইতেন। নানা বেশধারী চারবর্গ আসে-পাশে থাকিত। এইরূপেই রাজার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পুত্রগণ হইতেও বিশেষ ভয় ছিল। পুত্রদমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অন্য অধ্যায়ে বিবৃত আছে। দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবার জীবন সম্পর্কে, সাধারণের আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা প্রভৃতির কথা বলিব।

আহার এখনকার দিনের মতই মিশ্রিত ছিল। অন্নতণ্ডুলাদি, গোধূম বা যব হইতে প্রস্তুত

রুটি বা পিষ্টকাদি ও সঙ্গে শাক ব্যঞ্জনাদি, দুগ্ধ, পায়স, ঘৃত, মাংস, মৎস্য, অন্ন মিষ্টাদি লইয়াই লোকের আহার্য্য হইত। তবে মনে হয় যে, তৎকালের আহার পরিমাণে অধিক ছিল এবং উহাতে মৎস্যমাংসাদি উৎকৃষ্ট আহার্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে ভাগ্যক্রমে আমরা অনেক বিশেষ বিবরণ পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের অধ্যায়ে আমরা আহার্য্য দ্রব্য ও উহার পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারি। উক্ত অধ্যায়ে নানা-জাতীয় ধান্য, ফল, স্নেহ, মধু, ক্ষার, শাক লবণাদির কথা বিবৃত হইয়াছে। আরও আমরা জানিতে পারি যে, উৎপন্নের যে অংশ রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন বা রাজক্ষেত্রাদিতে যাহা উৎপন্ন হইত তাহা প্রতিবৎসরে রাজ-কোষ্ঠাগারে সঞ্চিত হইত। উহার অর্দ্ধাংশ হইতে রাজভৃত্য বা পরিজনাদির ভরণ পোষণ হইত। আর বক্রী অর্দ্ধাংশ প্রজাসাধারণের বিপদাদিতে বা দুর্ভিক্ষাদির কালে প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকিত। অসময়েই উহা ব্যয়িত হইত, নচেৎ নহে। (ততোঽর্দ্ধমাপদর্থং রক্ষেৎ, জানপদানাম্ অর্দ্ধমুপভুঞ্জীত—নবে চানবং শোধয়েৎ)।

এই অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে সাধারণ ভদ্রলোকের তৎকালের আহার্য্য-পরিমাণ দেওয়া আছে। খাদ্য পরিমাণের হিসাবে কৌটিল্য বলেন যে, আর্য্য পুরুষবিশেষের একবার ভোজনের জন্য ১ প্রস্থ চাউলের অন্ন, সিকি প্রস্থ সূপ, আর ১/১৬ প্রস্থ তৈল বা ঘৃত লাগে। * আর নিম্নশ্রেণীর লোকের খাদ্যের জন্য ঐ পরিমাণ চাউল এবং ১/৬ প্রস্থ ঘৃত, তৈল ও সূপ হইলেই হইত। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের ৩/৪ ভাগ খাদ্য পরিমাণ ও বালকাদির পক্ষে অর্দ্ধ হইলেই যথেষ্ট।

অন্ন ঘৃত সূপাদি ভিন্ন দালের বিশেষ ব্যবহারই ছিল। অর্থশাস্ত্রে মুদ্গ, মসুর, কুলত্থ মাষ প্রভৃতি দালের ব্যবহারের ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন মৎস্য ও মাংসের ব্যবহারও প্রচুর ছিল বলিয়া বোধ হয়। জীবন্ত মৎস্য ভিন্ন শুষ্ক মৎস্যের ব্যবহারের কথা ও উল্লিখিত হইয়াছে। আর মাংসব্যবহার তখনকার দিনে প্রচুরপরিমাণে চলিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অহিংসাবাদের প্রভাবে নিরামিষপ্রিয়তা বা শাক তৃণাদি ভোজনে শীঘ্র স্বর্গলাভের বাসনা তখনও দেশে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিকযুগে মাংসের প্রচুর ব্যবহার অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে। তৎপরবর্ত্তী যুগে জাতকাদিতেও বহু প্রকার মাংসের ব্যবহার দেখা যায়। দুই একটি জাতক পাঠে দেখা যায় যে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নানা-জাতীয় পশুর—এমন কি, বৃষ বরাহাদির মাংস ভক্ষণও চলিত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ বুদ্ধ কোন ভক্তপ্রদত্ত বরাহমাংস ভক্ষণেও কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি, উক্ত মাংস অতিরিক্ত ভক্ষণে উদরাময়েই তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া লিখিত আছে। আর মহাভারতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মাংসই শ্রেষ্ঠ আহার বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বোক্ত নীতিগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, তৎকালে আঢ্যশ্রেণীর লোকের আহার মাংসপ্রধান ছিল। মধ্যবিত্ত লোকে দুগ্ধ ঘৃতাদি প্রধান আহার করিত আর দরিদ্র লোকেই শাকাদি ভোজনে প্রাণ

* ১ প্রস্থ=৩২পল, ১পল=৪কর্ষ, আর ১কর্ষ=৮০রতি। ইহা হইতেই পরিমাণ বুঝিয়া লউন।

ধারণ করিত ("মাংসপ্রধানমাঢ্যানাং ক্ষীরপ্রধানং মধ্যানাং শাকপ্রধানং দরিদ্রাণাং"। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, দ্রৌপদীর বিবাহ বা উত্তরার বিবাহের বর্ণনায় মাংসের ব্যবহারের বিশেষ বর্ণনা আছে। আর প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিয়া মহাভারতকার রন্তিদেবের উপাখ্যান ও নিহত গবাদি পশুর রক্তে চর্ম্মণ্বতী নদীর উৎপত্তির কথা বিবৃত করিয়াছেন।

ক্রমে অবশ্য অহিংসামতের প্রচার হয়। ব্রাহ্মণ ঋষিগণ ও ক্রমে জৈন. বৌদ্ধাদি উক্ত মতের বহু পোষকতা করেন। মনে হয়, অহিংসার মাহাত্ম্য বর্ণনায়ও লোকে সহজে মাংসাহার হইতে বিরত হয় নাই। আজীবক ও অন্যান্য দলের লোকও অহিংসাকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মাংসাহার একেবারে সহজে বর্জ্জিত হয় নাই।

কৌটিল্যের যুগে মাংসের ভূরি চলন ছিল। যে অধ্যায়ের কথা বলা হইয়াছে, ঐ অধ্যায়েই কৌটিল্য মাংস রন্ধনে ঘৃত তৈলাদির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও অকারণ পশুবধের বিরোধী ছিলেন এবং বহু অধ্যায়ে চাতুর্ম্মাস্য, পর্ব্বদিবস ও সন্ধিপ্রভৃতি দিবসে পশু-বধ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এ ভিন্ন তিনি স্ত্রীপশু, বাল (অল্পবয়স্ক) পশু প্রভৃতি বধ একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। উত্তরকালে অশোকের অনুশাসনগুলিতেও অবাধ পশুবধ নিষিদ্ধ হয়। তিনি কতকগুলি পশুবধ একেবারে রহিত করেন। আর স্ত্রীপশু বা অল্পবয়স্ক পশুবধ নিষিদ্ধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বাদিতেও পশুবধ নিবারণ করেন। অশোক অহিংসাবাদে বিশ্বাসী হইলেও সহজে মাংসাহার ত্যাগ করেন নাই এবং যদিও উহা কমাইয়া দিয়াছিলেন, তথাপি বহু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার রন্ধনাগারে ১টি মৃগ, ৩টি ময়ূর ও অন্য কয়েকটি পশু নিয়তই নিহত হইত।

মাংসাহারের ভূরি প্রচলনবশতঃ রাজকর্ম্মচারীরা উত্তম মাংস যাহাতে সরবরাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেন। সূনাধ্যক্ষ অধ্যায়ে জানা যায় যে, সূনাধ্যক্ষ এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা, পচা বা দূষিতমাংস বিক্রয় রদ করিয়া দিতেন। রুগ্ন পশুর মাংসও বাহিরে বিক্রয় হইত না (মৃগপশূনামনস্থিমাংসং সদ্যোহতং বিক্রীণীরন্)। মাংসে ভেজাল দিলে বা দূষিতমাংস বেচিলে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। গো ও অন্যান্য কতিপয় পশু অবধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। (বৎসো বৃষো ধেনুশ্চৈষামবধ্যাঃ)।

মাংসব্যবহার এত প্রচলিত ছিল যে, সে যুগে লোক নানা প্রকার মাংসের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া এখনকার হোটেলের ন্যায় বিক্রয় করিত। অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে পাকমাংসিক নামে অভিহিত ব্যক্তিদের উল্লেখ দেখা যায়। পাকমাংসিকদিগের ন্যায় ঔদনিক, আপূপিক প্রভৃতি অন্নবিক্রেতারও বহু স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। ইহারা বর্ত্তমানের hotel-keeperএর সহিত তুলিত হইতে পারে। অবশ্য দুই একটি কথা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। তবে মনে হয় যে, উক্তরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে উহার উল্লেখ পাওয়াও দুর্ঘট হইত। তবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোক উক্ত ক্রীত মাংস ব্যবহার করিতেন কি না, তাহা বলা কঠিন।

মাংসের মধ্যে বোধ হয়, অজ অথবা মেষমাংসেরই ভূরি প্রচলন ছিল। তবে মনে হয় যে, ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বা উচ্ছৃঙ্খলদিগের মধ্যে শূকর বা কুক্কুটমাংসও চলিত। কৌটিল্য কোশাভিসংহরণাধ্যায়ে যোনিপোষকদিগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্তপ্রসঙ্গে কুক্কুট ও শূকরপোষকদিগের কথা বলিয়াছেন। উহা দেখিয়া মনে হয় যে, কুক্কুটমাংসও বেশ ব্যবহৃত হইত। "অভক্ষ্যা গ্রাম্যকুক্কুটাঃ" কথাটি বোধ হয়, শিক্ষিত ও সদাচারী ব্রাহ্মণেই মানিতেন। কেন না, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "কুক্কুটো বল্যানাং" কথার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং বাৎস্যায়নও গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যের মধ্যে কুক্কুটপালন উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও বঙ্গ বা আর্য্যাবর্ত্তের বা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন নিম্নজাতীয় লোকেরা কুক্কুটমাংসে বিরত নহে। শূকরমাংসও ঐরূপ জাতকাদিতে উল্লিখিত আছে। তবে উচ্চ বর্ণে বোধ হয়, উহা ব্যবহার করিতেন না। এখনও রাজপুতানা ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে শিকারলব্ধ বরাহমাংস অতি পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষিত হইয়া থাকে।

সে যুগের মাংসরন্ধনাদির বিষয় অর্থশাস্ত্র বা অন্য গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থাদিতে স্থালীপাক ও শূল্য মাংস উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। শকুন্তলায় শূল্যমাংসভূয়িষ্ঠ আহারের কথা অনেকেরই পরিজ্ঞাত। আর মৃচ্ছকটিকে বহুবিধ মাংস রন্ধনের উল্লেখ আছে। ঐ সকল যুগেই রচিত নলপাকদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে মাংসাহারের পারিপাট্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ই জানা যায়। মাংসৌদন অতি প্রাচীন। এমন কি, অথর্ব্ব বেদে উহার বহু উল্লেখ আছে। তবে পরবর্ত্তী যুগে অহিংসাপ্রাধান্যবশতঃ মাংসাহার ও মাংস ব্যবহার অনেক কমিয়া আসে। এখনকার যুগে পলান্নাদি মুসলমানদিগের নিকট গৃহীত বলিয়াই অনেকের ধারণা।

মৎস্যাহারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতি প্রাচীন যুগে ঋগ্বেদাদিতে অবশ্য মৎস্যের বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু কালে উহার ব্যবহার চলিত হয়। মৎস্যবিক্রয়ী কৈবর্ত্ত-দিগের কথা বৈদিক সাহিত্যে বহু স্থানেই আছে। স্মৃতিতেও বহু স্থানে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ মৎস্যের উল্লেখ আছে। জাতকাদিতে মৎস্যাহারের কথা বিলক্ষণই আছে। এমন কি, একটি জাতকের নামই ইল্লীশজাতক। বর্ত্তমানে উত্তর পশ্চিমে অবশ্য মৎস্যাহার ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়। এমন কি, বঙ্গদেশী মৎস্যাহারী ব্রাহ্মণ পশ্চিমবাসীর নিকট অতি ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উক্ত দেশের পণ্ডিতেরা নিজ দেশীয় আচারেই মোহান্ধ হইয়া স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

সুরাপান

মৎস্য মাংসাহারের ভূরি প্রচলনের সঙ্গে সুরাপানেরও বিশেষ প্রচলন ছিল। এ কথা অনেকের নিকটই অপ্রীতিকর হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে সকলকেই সুরাপানের কথা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য সুরাপান মহাপাতক বলিয়া গণিত হইত এবং উহাতে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল (সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণাং সুরাং

পিবেৎ)। মদ্যপানের বিষময় ফলের উপলব্ধি করিয়াই এরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয়। বর্ত্তমান সামাজিক ইতিহাসেও উহা দেখা যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইউরোপের অনেক দেশেই মদ্যপান ও মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকায় এ বিষয়ে বড়ই কঠোর বিধি প্রণীত হইয়াছে। মদ্য প্রস্তুত—এমন কি, আমদানী করিলেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা এবং বিদেশীর সঙ্গে মদ্য থাকিলে উহা বাজেয়াপ্ত হয়, এ কথা অনেকেই জানেন।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের অবশ্য ঐরূপই আচার। শিষ্ট লোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিন্দিত হন। কেহ বা গোপনে মদ্যপান করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটান। মধ্যযুগে তন্ত্রের দোহাই দিয়া "কারণ সেবা" অনেক শাক্তেরই চলিত। এখন কারণ উঠিয়া গেলেও সভ্য ইংরাজী বিধিতে অনেক শিক্ষিত লোকেই মদ্য পান করেন।

প্রাচীন যুগে অবশ্য বিধিব্যবস্থা বিপরীতই ছিল। বৈদিক যুগে সুরার প্রচলন ছিল। আয়ুর্ব্বেদাদিতে মদ্য, সুরা, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। স্বাস্থ্যের জন্য ও উপকারিতার জন্য অনেকেই ঋতুভেদে মদ্যবিশেষ সেবা করিতেন। সাধারণ গৃহী ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির মধ্যে উহা চলিত। সদাচারী ব্রাহ্মণেরা অবশ্য মদ্যপান ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও উহা সদাচারবিহীন উচ্চ বর্ণ বা নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ চলিত ছিল।

অর্থশাস্ত্রের যুগে মদ্যের এত বহুল প্রচার ছিল যে, সুরাধ্যক্ষ নামে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। নগরের বিশিষ্ট স্থানে, স্কন্ধাবারে ও গ্রাম্য প্রদেশের নানা স্থানেই মদ্যের দোকান ছিল। মদ্য-ব্যবসায়ীদিগকে সরকারের অনুমতি লইয়া, উপযুক্ত করদান করিয়া মদের দোকান খুলিতে হইত। যে কোন পরিমাণে মদ্য বেচার ব্যবস্থা ছিল না। লোকবিশেষে ও পরিমাণানুযায়ী মদ্য বেচিতে অনুমতি দেওয়া হইত। অধিক বেচিলে দণ্ডিত হইতে হইত। অর্দ্ধকুড়ুব, অর্দ্ধ প্রস্থ বা ১ প্রস্থের অধিক মদ কাহাকেও বেচিবার অনুমতি ছিল না। আর মদের দোকানে পুলিসের লোক বা গুপ্তচরেরা বসিয়া মদ্যপায়ীদের আচার ব্যবহার বা প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিত। সন্দেহ স্থলে গ্রেপ্তার করিত। ঐরূপ দূষিত বা পচা মদ বেচিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মদের দোকানগুলিতে নেশার বেশ সুব্যবস্থা ছিল। বসিবার স্থান—আসন শয্যাদির ব্যবস্থা ছিল এবং একাংশে ফুল, ফল, খাদ্যাদি ও পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। পাছে মাতাল অবস্থায় লোকের দ্রব্যালঙ্কারাদি চুরি যায়, তার জন্য পুলিশের লোকে সে সবের হিসাব রাখিত ও দোকানদারকে দায়ী করিত।

অর্থশাস্ত্রে মেদক, প্রসন্ন, আসব, অরিষ্ট, মৈরেয় ও মধু, এই কয়জাতীয় মদ্যের উল্লেখ আছে এবং উহাদের প্রস্তুত-বিধিও উল্লিখিত আছে। সাধারণতঃ ধান, গুড় বা চিনি ও সঙ্গে ফল ও মসলাবিশেষ চোঁয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত হইত। নানাপ্রকার উপাদান সঙ্গে দিয়া উহাদের গন্ধ, বর্ণ বা শক্তির আধিক্য করা হইত। সহকার-সুরা, শ্বেতসুরা প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের মদ্য বিশেষ সমাদৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

মদের ব্যবসায় এখনকার মত রাজহস্তে একচেটিয়া ছিল। তবে পর্ব্ব বা উৎসবাদিতে সামান্য কর দিয়া, লোকে ব্যবহারোপযোগী মদ্য বাটীতে প্রস্তুত করার অনুমতি পাইত। উৎসব, সমাজ ও যাত্রাদিতে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল (উৎসবসমাজযাত্রাসু চতুরহঃ সৌরিকো দেয়ঃ, তেষ্বনুজ্ঞাতান্ প্রহ্‌ণান্তং দৈবসিকমত্যয়ং গৃহ্নীয়াৎ।) এবং ঐগুলিতে মদ্যাদির বহুল ব্যবহার ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকে, বিশেষ কর্ম্মকর, ভৃত্যাদি যে মদ বিশেষ ব্যবহার করিত, তাহা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। আর জাতকের বারুণিজাতক বা ইল্লীশজাতকে উহার প্রমাণ আছে। ইল্লীশজাতকে এক দরিদ্র ব্যক্তি কিছু মদ ও মৎস্য কিনিয়া যাইতেছে, এই চিত্রটি আছে। শকুন্তলা নাটকে ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে আনন্দের সময় মদ্য পানের কথা আছে। ঐ গ্রন্থে নগরপাল রাজশ্যাল ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, উহার পয়সায় মদের দোকানে চলিলেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ মদ্যপ্রস্তুতকারী জাতিরাই রাজতত্ত্বাবধানে মদ্য প্রস্তুত করিত। সুরাকার জাতির উৎপত্তি অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে। অর্থশাস্ত্রে সুরা প্রস্তুত সম্পর্কে উক্ত ব্যবসায়ী বা জাতির উল্লেখ আছে (তজ্জাতিসুরাকিণ্বব্যবহারিভিঃ কারয়েৎ)। আসব অরিষ্টাদি চিকিৎসকেরাও ব্যবস্থা করিতেন। কৌটিল্যেও উহার উল্লেখ আছে (চিকিৎসকপ্রমাণাঃ প্রত্যেকশো বিকারাণামরিষ্টাঃ)।

ঐ যুগে ভারতের প্রদেশবিশেষ মদ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। কৌটিল্য কাপিশায়ন, হারহূরক প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনিতেও কপিশা দ্রাক্ষা ও মধু (মদ্যের)র জন্য বিখ্যাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আমোদ প্রমোদ

এই ত গেল আহারাদির কথা। ইহার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু অর্থশাস্ত্রে নাই। অতঃপর আমোদ প্রমোদের কথা বলিব। তৎকালের সমাজে দেশকালানুযায়ী আমোদ প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ধনী ব্যক্তিদিগের সুখ-বিলাসে সময় কাটাইবার জন্য বহুপ্রকার সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। এগুলি বহু নামে অভিহিত ছিল ; যথা—সমবায়, গোষ্ঠী প্রভৃতি। অর্থশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা নাই। তবে বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্রাদি গ্রন্থ ও মহাভারতাদি হইতে আমরা অনেক কথাই জানিতে পারি। এই বিষয়ে নিম্নলিখিতগুলির কথা বর্ণনা করিব। ১। সমবায়—গোষ্ঠী, সরস্বতীসমাজ। ২। সমাপানক। ৩। উৎসব—সমাজ। ৪। দেবরাত্রি—পুণ্যরাত্রি। ৫। প্রেক্ষা—যাত্রা, প্রবহন। ৬। দ্যূতাগার—অক্ষাগার, দ্যূতক্রীড়া। ৭। অন্য প্রকার আমোদ—পক্ষিযুদ্ধ, পশুযুদ্ধ, পশুদৌড়ান। ৮। স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে আমোদ প্রমোদ—নৃত্যগীতাদি।

ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণের আমোদ প্রমোদের জন্য নানাপ্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। উহাদের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিও বিভিন্ন ছিল। দরিদ্র গ্রাম্য জনের জন্য গ্রামে মিলনের স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। উহা এক স্থলে শালা নামে অভিহিত হইয়াছে।

আর ধর্ম্মবিষয়ক সম্মিলনের জন্য আরামাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক, পরিব্রাজকগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি প্রকৃত ধর্ম্মস্থান—বিহার আরামাদিতে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এমন কোন গ্রন্থাদি নাই, যাহাতে ঐগুলির সম্মিলন ও তাহার উদ্দেশ্যাদি আমরা জানিতে পারি।

উপরে বহুবিধ সমবায়েরই নাম করিয়াছি। এখন উহাদিগকে শ্রেণীভেদে বিভক্ত করিয়া উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কতকগুলি সম্মিলন ছিল স্থায়ী ও ধনিলোকপ্রধান। বাৎস্যায়ন ইহাদিগকে কামী নাগরক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

স্থায়ী ধনিপ্রধান কামীর আমোদস্থান হিসাবে গোষ্ঠী, সমবায় বা সরস্বতীসমাজ বা সমাপানকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে ধনী লোক (সাধারণতঃ) অপরাহ্ণ অতীতে বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিলিত হইতেন। সময়ে অহোরাত্রিক উৎসবও চলিত। এখানে বেশ্যা, নটী, নৃত্যগীতকুশলা সুন্দরীরাও উপস্থিত হইত। এখানে কাব্যচর্চ্চা, কলাচর্চ্চা, নৃত্যগীতাদি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। কাব্যসমস্যাপূরণ, কলাসমস্যাপূরণও চলিত।

সমাপানক এক স্থানে বা একের বাটীতে বা ক্রমে এক এক জনের বাটীতে হইত। উহাতে কাব্যকলাদি চর্চ্চার সঙ্গে মদ্য পানাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সমাপানক শব্দ যত দূর জানি, অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে বাৎস্যায়নে উহার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। সেখানে নানাপ্রকার মধু, মৈরেয়, আসব, সুরার ব্যবহার হইত। সঙ্গে বোধ হয়, খাদ্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের ন্যায় বাৎস্যায়নও মধু, সুরা, আসব, মৈরেয় প্রস্তুতের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক আরও অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। বাৎস্যায়ন-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। তন্মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, কুক্কুট-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, দোলায় দোলন, সহকারভঞ্জিকাদি নানা প্রকার ক্রীড়ায় কালাতিপাত করার ব্যবস্থা ছিল।

পূর্ব্বোক্তগুলিকে একরূপ club বা association বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এগুলি ভিন্ন আবার সাময়িক উৎসব বা সমাজের অধিবেশন হইত। উৎসব শব্দের সাধারণ অর্থই আমরা জানি। তবে সমাজ বলিতে বহুপ্রকারে মিলন বুঝায়। সমাজগুলি মাসান্তে বা পক্ষান্তে বা শুভ দিনে সম্মিলিত হইত। অতিপ্রাচীন যুগে বোধ হয়, সমাজের সহিত দেবদেবীবিশেষের পূজার নিকট সম্বন্ধ ছিল। সরস্বতীগৃহে সমাজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার মহাভারতে বারণাবতে পশুপতির সমাজের কথা উল্লিখিত আছে—(পশুপতেঃ সমাজঃ পূজার্থং—মেলকঃ)। সাধারণতঃ সমাজগুলি পূজাকল্পেই অনুষ্ঠিত হইত। এখনও ভজনার্থ মিলন, এই অর্থে সমাজ শব্দ বঙ্গদেশের প্রদেশবিশেষে চলিত আছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবিশেষের মুখে শুনিয়াছি যে, আজিও কাটোয়া অঞ্চলে বৈষ্ণবদিগের "সমাজ" হইয়া থাকে। প্রাথমিক পূজা উদ্দেশ্য হইলেও, সমাজগুলি আমোদের স্থানই হইয়া উঠে। জৈন বৌদ্ধ সাহিত্যে সমাজ, সমজ্যা প্রভৃতির ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। মহাভারতের বহু স্থানে ও হরিবংশে সমাজের

উল্লেখ আছে। সমাজগুলিতে যে মদ্যপান, নৃত্যগীতাদি, ইন্দ্রজাল বা দৈহিক শক্তির প্রদর্শন হইত, তাহা শিগালোবাদসূত্তান্ত হইতে দেখা যায়। আবার অশোকের একটি অনুশাসন হইতে বুঝা যায় যে, সমাজগুলিতে পশুবধ, মদ্যপানাদি ও পান ভোজন চলিত। তজ্জন্যই তিনি এগুলিকে রদ করিবার চেষ্টা করেন। উৎসবগুলিও প্রজ্ঞাত দিবসে হইত। সরস্বতী, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এক এক তিথিতে উৎসবাদি হইত। ঘটা (নিবন্ধন) উপলক্ষ্যে বাৎস্যায়ন ও তৎটীকাকার এ সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে ঐ সকল দ্রষ্টব্য।

এ ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক উৎসবও ছিল। প্রতি মাসেই পর্ব্ব ও সন্ধিদিবসে দেবপূজা, ভূতপূজার ব্যবস্থা ছিল। আর কার্ত্তিকী ও আশ্বিনী পূর্ণিমা ও বসন্তে কোজাগর ও সুবসন্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কালে উক্ত সময়গুলিতে বর্ত্তমানের পূজাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। সে কথা অন্য স্থানে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমানে কোজাগর লক্ষ্মীপূজা ও দোলযাত্রাদি উহার স্থান লইয়াছে।

এগুলি ভিন্ন দেবরাত্রি, পুণ্যরাত্রি, পঞ্চরাত্রি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। শুভ তিথিতে দেববিশেষের উদ্দেশ্যে আমোদ প্রমোদ চলিত। আবার মড়কাদি হইলে সংকীর্ত্তনাদি, কবন্ধ দহনাদি নানা প্রকারের ব্যবস্থা ছিল।

এই সকল পূজা, পাঠ, উৎসবাদির সম্পর্কে আখ্যান, প্রেক্ষা, যাত্রা, প্রবহণাদির অনুষ্ঠান হইত। আখ্যানে বোধ হয়, কোন অতীত ঘটনার কথা ব্যাখ্যাত হইত বা কোন দেবতা বা মহাপুরুষের কার্য্যাবলী বিবৃত হইত। প্রেক্ষা—যাহা হইতে আমাদের বর্ত্তমান থিয়েটার প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও অনুষ্ঠান এই সম্পর্কে। এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান ভারতে অতি প্রাচীন। শৈলূষ শব্দ বৈদিক সাহিত্যে (শুক্ল যজুর্ব্বেদে পাওয়া যায়) ও নট শব্দ পাণিনিতে পাওয়া যায়। আর ভরতনাট্যসূত্রে ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন ও তৎসঙ্গে অভিনয়ের কথা লিখিত আছে। ভারতীয় থিয়েটারের উৎপত্তি লইয়া বহু পণ্ডিতই এখন গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এ সম্বন্ধে এ স্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। তবে এ কথা বলা যায় যে, প্রেক্ষা অতি প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ভিন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্যে (ব্রহ্মজালসূত্রে ও অন্যান্য স্থানে) প্রেক্ষার কথা বিশদ ভাবেই আছে। অর্থশাস্ত্র পড়িলে মনে হয় যে, প্রেক্ষা অতি সাধারণ জিনিসই ছিল। গ্রামের লোকে প্রেক্ষার অনুষ্ঠান করিত। আর ইহাতে সকলকেই চাঁদা দিতে হইত। কেহ না দিলে দণ্ডিত হইত এবং উহাকে উহা দেখিতে দেওয়া হইত না। এ কথা গ্রাম্যজীবনের বর্ণনায় বলিয়াছি।

যাত্রা ও প্রবহণের কথা অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানেই আছে। তবে উহার বর্ণনা কিছু নাই। মনে হয় যে, উহারা প্রাচীন যুগে চলনশীল অভিনয় বা Pageantএর মত ছিল। এবং বর্ত্তমানের রামলীলা বা সঙের সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে।

অন্য প্রকার ক্রীড়া আমোদাদি

এগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার ক্রীড়া, ব্যায়াম ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। কুহকাদি ও নানা প্রকার ইন্দ্রজাল বা বাজি দেখান হইত। বংশনর্ত্তকাদি বাঁশের খেলা দেখাইত। চারণাদি গান করিয়া বেড়াইত। কুশীলবাদি স্থলে স্থলে অভিনয় করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিত। সময়ে সময়ে বা স্থানে স্থানে অশ্বাদি পশু দৌড়াইয়া লোকে আনন্দ করিত। Race খেলা ভারতে অতি প্রাচীন। বৈদিক-সাহিত্যে অশ্বের race এর বহু উল্লেখ আছে। তবে কৌটিল্যে উহার বিশেষ উল্লেখ নাই। পশুযুদ্ধ বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। পশুযুদ্ধের মধ্যে ষণ্ড বা মেষের লড়াই ও কুক্কুটের লড়াই বিশেষ প্রচলিত ছিল। ষণ্ডের যুদ্ধ এত প্রচলিত ছিল যে, উহা নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্টকে আইন করিয়া, দণ্ড দিয়া উহার প্রচলন কমাইবার চেষ্টা করিতে হইত। ঐরূপ শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রী পশুদের যুদ্ধে ব্যাপৃত করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইতে হইত। (২৩৩ পৃষ্ঠা, শৃঙ্গিদংষ্ট্রিনামন্যোন্যং ঘাতয়তঃ পূর্ব্বসাহসদণ্ডঃ)।

দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। স্থানে স্থানে অক্ষশালা স্থাপিত ছিল। কৌটিল্যের সময় দ্যূতাধ্যক্ষ নামে একজন রাজকর্ম্মচারী অক্ষশালার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যেখানে সেখানে উহার আড্ডা থাকিত না। কেহ লুকাইয়া খেলিলে দণ্ডিত হইত। উক্ত ক্রীড়াগারে প্রবেশকালে কিছু প্রবেশ-মূল্য দিতে হইত। আর কেহ বাজী রাখিয়া জিতিলে উহার শতকরা ৫৲ টাকা রাজসরকারে যাইত। খেলায় জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। দ্যূতের বিষময় ফল সকলেরই জ্ঞাত ছিল। ঋগ্‌বেদেও যেমন দ্যূতের কুফলের কথা আছে (ঋগ্‌বেদ ১০।৩৪।), অর্থশাস্ত্রেও সেইরূপ দ্যূত একটি প্রধান ব্যসন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কৌটিল্যে উদাহরণস্বরূপ নল ও যুধিষ্ঠিরের উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। কৌটিল্য আরও বলিয়াছেন যে, দ্যূত হইতেই সংঘে বা রাজকুলে ভেদ উপস্থিত হয় (বিশেষতশ্চ সংঘানাং সংঘধর্ম্মিনাং রাজকুলানাং দ্যূতনিমিত্তো ভেদঃ)।

পরিচ্ছদ

আমোদ প্রমোদের পর পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিব। কারণ, বিশেষ কিছু বলিবার নাই। গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতেই আমরা যৎসামান্য কিছু জানি। আর অর্থশাস্ত্রেও সামান্য কিছু আছে। গ্রীকদিগের মতে লোকে (প্রাচ্য মগধের) ধুতি-চাদরই ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকে কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিত। ধনীরা অবশ্য রেসমের, ক্ষৌমের বা জরির কাজ-করা বস্ত্র ব্যবহার করিত। বঙ্গদেশ সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। কাশীতে উচ্চ শ্রেণীর বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। অপরান্ত প্রভৃতি নানা স্থানেও কার্পাস-বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত।

যোদ্ধৃপুরুষেরা কবচ, লৌহ-বর্ম্মাদি ব্যবহার করিতেন, আয়ুধাগার বর্ণনায় উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আর শীতবস্ত্রের জন্য উর্ণানির্ম্মিত কম্বলাদি হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে নির্ম্মিত হইত। স্ত্রীলোকের বেশভূষার পারিপাট্য ছিল। বহু বর্ণের নানা চিত্রিত বস্ত্র, নানা প্রকার আচ্ছাদন-বস্ত্র ও জামার বহু প্রচার ছিল। স্ত্রীপুরুষের পাদুকা ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল, গ্রন্থান্তরে উহা দেখা যায়। স্মৃতিতে উহার উল্লেখ আছে। তবে অর্থশাস্ত্রে উহার বিশেষ বিবরণ নাই।

গণিকা, বেশ্যা

আমোদ প্রমোদাদির প্রধান অঙ্গস্বরূপ সেই যুগে সমাজে বেশ্যার প্রশস্ত স্থান ছিল। বর্ত্তমানে অবশ্য উহার নাম হইলে সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নাসা কুঞ্চন করিবেন। তবে সে যুগের লোকের মনোবৃত্তি বিপরীতই ছিল। বেশ্যা, বিশেষতঃ গণিকারা সমাজে উচ্চ স্থান পাইত। প্রত্যেক নগরেই গণিকা রাজাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সমাদৃত হইত। বৌদ্ধ-সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই কোশল, বৈশালী, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগরের প্রধানা বেশ্যার নাম অবগত আছেন। তাহার স্থান এত উচ্চে ছিল যে, ভগবান্ বুদ্ধ অম্বপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অনেক গণিকা ও বেশ্যা তাঁহার সংঘে স্থান পাইয়াছিল। অভয়মাতা, অর্দ্ধ-কাশী প্রভৃতি গণিকার নাম থেরীগাথায় উল্লিখিত আছে। পৃথিবীর অন্য অনেক প্রাচীন সভ্যতায়ই গণিকার এইরূপ উচ্চ স্থান দেখা যায়। ব্যাবিলোনিয়ায় গণিকার উচ্চ স্থান ছিল। সীরিয়ায় অনেক স্থানেই স্ত্রীলোকদিগকে জীবনে একবার ধর্ম্মের নামে সাধারণে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হইত। সুসভ্য গ্রীসদেশে অ্যাসপেসিয়ার সঙ্গ করিতে সক্রেটিশ ও পেরিক্লিসের ন্যায় লোকে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। উহার গৃহে রাজনীতি, দর্শন ও সমাজনীতির চর্চ্চাও হইত। অ্যাস্পেসিয়া ও সমসাময়িক অনেক গণিকাই সুপণ্ডিত ও সদালাপী ছিল।

বাৎস্যায়নের গণিকাধ্যায়ে দেখা যায় যে, তিনি স্বৈরিণীদিগকে গণিকা, গর্ভদাসী, বেশ্যা প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া গণিকাদিগকে উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। গণিকারা শিক্ষিতা, কবিত্ব-কুশলা ও কলাভিজ্ঞা হইত বলিয়া বুঝা যায়। সে যুগে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল। এমন কি, কবিবর শূদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিকনাটকে গণিকাদারিকা বসন্তসেনাকে নায়িকা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই বসন্তসেনার রূপ, গুণ, ধন, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি অবগত আছেন। চারুদত্তের বিপদবসানে অবন্তীরাজ বসন্তসেনাকে বধূশব্দে আহ্বান করেন।

অর্থশাস্ত্রে গর্ভদাসী, রূপাজীবা ও গণিকার উল্লেখ আছে। গণিকাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য গণিকাধ্যক্ষ নামে একজন কর্ম্মচারীও নিযুক্ত থাকিতেন। প্রতিনগরেই একজনকে গণিকানামে অভিহিত করিতেন এবং প্রতিগণিকাও একজন থাকিতেন। প্রতিগণিকার উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। গণিকারা রাজতত্ত্বাবধানে থাকিত এবং উহাদের শুল্কাদি রাজা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। কেহ প্রবঞ্চনা করিলে, উহাদের বিত্তাদি অপহরণ করিলে বা উহাদের

আঘাতাদির দ্বারা রূপ নষ্ট করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইতেন। গণিকাদিগকে সময়ে সময়ে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইত এবং রাজাদেশমত শুল্কাদি গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষে আত্মসমর্পণ করিতে হইত। রাজাদেশ লঙ্ঘনে দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত। বেশ্যা, গণিকাদির রাজসরকারে বিশেষ কর দিতে হইত এবং রূপাজীবারা মাসে দুই দিনের বেতন করস্বরূপ দান করিত। গণিকাদির পুত্রেরাও শিক্ষিত হইয়া কুশীলব বা রঙ্গোপজীবী হইত। আট বৎসর বয়স হইতেই বেশ্যাদিগকে রাজসম্পত্তি বলিয়া রাজার তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইত। ২৪০০০ পণ নিষ্ক্রয় দিলে উহারা স্বাধীন হইতে পারিত। আর যাহারা ঐরূপ নিষ্ক্রয় দানে অসমর্থ হইত, বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা রাজান্তঃপুরে ধাত্রী বা পাচিকা নিযুক্ত হইত।

বেশ্যার সম্পত্তি তাহার মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বেশ্যারা রাজদরবারে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি ধারণ করিত, রাজাকে ব্যজন করিত বা সভায় নৃত্যগীতাদি করিত; তজ্জন্য তাহাদের বেতনের ব্যবস্থা ছিল। রাজান্তঃপুরে বা অন্যত্র বেশ্যারা গুপ্তচররূপে নিযুক্ত হইত। বেশ্যাচরের কথা গ্রীক ঐতিহাসিক ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে উল্লিখিত আছে।

বেশ্যাদিগকে তাহাদের দৈনন্দিন আয়ের কথা বা সম্পত্তির কথা রাজসরকারে জ্ঞাপন করিতে হইত। উত্তরাধিকারীর অভাবে বেশ্যার সম্পত্তি রাজসরকারে গৃহীত হইত। এ জিনিষ কেবল ভারতেই নহে; মধ্যযুগের অনেক দেশেই ছিল। ফ্রান্স দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগে বেশ্যাদিগের আয় হইতে প্রচুর কর লাভ করিতেন।

বাৎস্যায়নে বেশ্যা ও গণিকার অনেক কথাই আছে। উহাদিগের শিক্ষার্থই কামসূত্রের গ্রন্থবিশেষ রচিত হয়। দত্তকাচার্য্যের নাম এ হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত। বেশ্যার স্থান ঐ যুগে ও তৎপরবর্ত্তী যুগে উচ্চই ছিল। যাত্রাদির সময় উহাদের দর্শন শুভ বলিয়াই পরিজ্ঞাত হইত। মিলিন্দ প্রশ্নে কোন এক বেশ্যাকে বহু উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সাধারণের শীল, ব্যভিচার, বিলাসিতা ও সাধারণ লোকবৃত্তাদি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া উপসংহার করিব।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো]　　　গোচারণের মাঠে গাইবক

টেলিফটো]　　　সাহেববাঁধের কুঞ্জবনে গাইবক
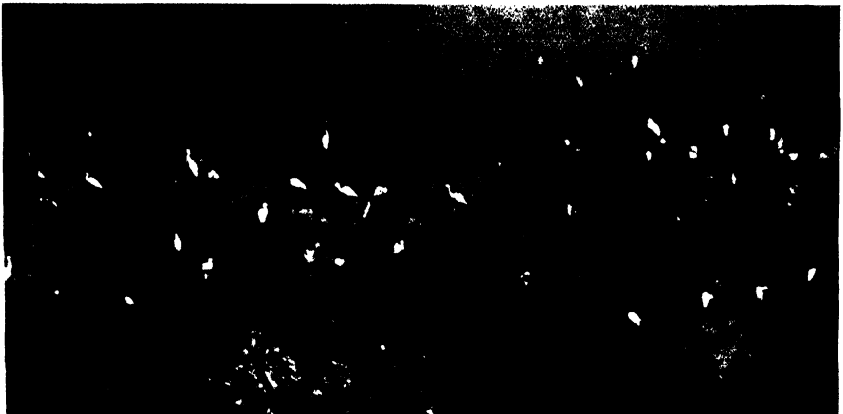
সাহেববাঁধের দ্বীপে পানকৌড়ি, ওয়াকবক ও গাইবক

টেলিফটো—শ্রীসত্যচরণ লাহা কর্ত্তৃক গৃহীত

পুরুলিয়ার পাখী

(২)

ঘন বৃক্ষলতাগুল্মসমাকীর্ণ যে দ্বীপটি সাহেববাঁধের বুকের উপরে জাগিয়া রহিয়াছে, তাহা বিহঙ্গপ্রেমিক মাত্রেরই সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শিকারীর লোলুপ দৃষ্টিও তাহার উপর প্রথমেই নিপতিত হয়; কিন্তু নগরের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিহঙ্গহননিবারণ কল্পে যে বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারই ফলে বক-ষ্টর্ক্-(Stork) পানকৌড়ির দৈনন্দিন জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ তত্রস্থ অধিবাসীর অথবা নবীন আগন্তুকের অবারিতভাবে রহিয়াছে। নৌকা নাই; কাজেই খুব কাছে গিয়া ছবি তুলিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও বাঁধের দক্ষিণ দিকে যে অংশটা কতক দূর পর্য্যন্ত মাটি দিয়া ভরাট করা হইয়াছে, সেখান হইতে ফটো লওয়া যায়। মিউনিসিপ্যালিটি কি উদ্দেশ্যে এই মাটি ভরাট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু ঐ দ্বীপটি অন্তর্হিত হইলে পাখীগুলিকে কি আর ওখানে পাওয়া যাইত? শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক উভয়েরই ক্ষোভের সীমা থাকিত না। দূরবীক্ষণের সাহায্য না লইলেও বেশ দেখা যায়, ঐ দ্বীপের ঘন কুঞ্জবনের এক অংশে শুভ্রপত্র বিহঙ্গের সমাবেশ ও অপর অংশে কৃষ্ণকায় পানকৌড়িমুখরিত লতাবিতান; ঊর্দ্ধে হেমন্ত প্রাতের মেঘহীন আকাশ-পথে দীর্ঘকায় ষ্টর্ক্ (Stork)গুলা সুদূর বাঘমণ্ডি পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দিকে সরল ঋজু গতিতে উড়িয়া আসিয়া চক্রাকারে আবর্ত্তে আবর্ত্তে গতিবেগ মন্দ করিয়া উহাদের মাঝখানে নামিয়া পড়ে; গাই-বকের নীড়গুলির চারিদিকে শাখাপ্রশাখায় উপবিষ্ট নিশ্চিন্ত অসংখ্য বিহঙ্গ সহসা হয়ত সর্পভীতিবশতঃ অথবা অন্য কোনও আততায়ীর ভয়ে উচ্চ কলরবে প্রান্তর মুখরিত করিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে গাছপালা পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে উত্থিত হয়; একটা পানকৌড়ি কুঞ্জভবন ছাড়িয়া দীঘির উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে চকিতে জলের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বাঁধের অপর প্রান্তে দীঘির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তীরবেগে অন্তর্হিত হইয়া গেল; আমাদের মাথার উপরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে কোন অলক্ষ্য নীড় হইতে একটি পূর্ণাবয়ব ওয়াক বক-শিশু বাঁধের জলরেখার সীমান্তে সহসা নিপতিত হইয়া, অসহায় ভাবে আমাদের পায়ের কাছে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল;—নিসর্গচিত্রের এমন আয়োজনপ্রাচুর্য্য সাধারণতঃ অন্য কোনও নগরে বা নগরোপান্তে অত্যন্ত বিরল। এখন এই পাখীগুলিকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাক্।

মানভূমের সর্ব্বত্রই বকপরিবারের অন্তর্গত অনেকগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে অবস্থায়, যে আবেষ্টনের মধ্যে তাহারা সাধারণতঃ বিচরণ করে, সাহেববাঁধে তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। বিভিন্নজাতীয় এতগুলি বকের দলবদ্ধ হইয়া এমনভাবে একত্র অবস্থান অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। গৃহস্থালী আরব্ধ হইয়া গিয়াছে; কোন কোন নীড়স্থ

শাবক আয়তনে ঈষৎ বর্দ্ধিত, কাহারো পতত্র উদ্গত হইয়াছে; কোনও কোনও বকের নীড়রচনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই,—স্ত্রীপক্ষী অর্দ্ধরচিত নীড়াভ্যন্তরে উপবিষ্ট, পুংপক্ষী চঞ্চু-পুটে উপকরণসামগ্রী যোগাইয়া দিতেছে; কেহ বা আকস্মিক ভীতিবশতঃ কুঞ্জবন পরিত্যাগ করিতে করিতে ভুক্ত মৎস্যাদি উদ্গার করিয়া ফেলিতেছে। শাবকজনন ঋতুতে একত্র দলবদ্ধ হওয়া ইহাদের রীতি বটে, কিন্তু একই জাতীয় বক প্রায় একই স্থানে একই বৃক্ষে অথবা কাছাকাছি কয়েকটি বৃক্ষশিরে এক প্রকার দল বাঁধিয়া কালযাপন করে। সাহেব-বাঁধে গাইবকের সঙ্গে ওয়াক বক, কাঁক বক একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেছে।

গাইবক,
Bubulcus cormandus

গাইবক সংখ্যায় এত অধিক যে, বিনা আয়াসে তাহাকে মাঠে, ঘাটে, জঙ্গলে, পথের ধারে নানা অবস্থায় বিচরণ করিতে অথবা উড়িতে দেখা যায়। বাংলা দেশে এত অধিক সংখ্যায় কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। চষা ক্ষেতে অথবা গোচারণের মাঠে রোমন্থনকারী গরুর পশ্চাতে, তাহার অতিসন্নিকটে গাইবক নিঃশঙ্ক বিচরণ করিতে করিতে গোমহিষপদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া সঞ্চরমান কীট ভক্ষণ করিতেছে; ধাবমান রেল গাড়ী অথবা মোটর বস্‌এর আকস্মিক আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া এক ঝাঁক গাইবক দোদুল্যমান তোরণস্রকের মত আকাশপথে দীপ্তি পাইতে থাকে; সাহেববাঁধের ঘন কুঞ্জবন তাহাদের শুভ্র পতত্রে খচিত, তাহাদের দাম্পত্য-আনন্দে লীলায়িত। নীড়ের মধ্যে শাবকগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে; নূতন নীড় রচনার চেষ্টা দেখা যাইতেছে না; গার্হস্থ্য জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। কলকূজনমুখরিত গাঢ় সবুজ গাছপালা লতাপাতা দূর হইতে যেন গুচ্ছে গুচ্ছে শুভ্র কুসুমস্তবকনম্র প্রতিভাত হইতে থাকে। ছবি লইবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন; অথচ এত দূর হইতে টেলিফটো লেন্সএর সাহায্যে এই নিসর্গ-চিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করা নিতান্ত সহজ নহে।

ওয়াক বক,
Nycticorax griseus

ওয়াক বক দিবাভাগে চিত্রার্পিতের মত নিশ্চলভাবে অধিকাংশ সময় যাপন করে; নিশীথের স্তব্ধতার মধ্যে তাহার "ওয়াক" "ওয়াক" ধ্বনি অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত চকিত করিয়া তোলে। এই নিশাচর বিহঙ্গকে দিনের বেলায় সাহেববাঁধের বৃক্ষশাখায় কিন্তু অন্যান্য বক পরি-জনের মধ্যে বেশ কার্য্যতৎপর দেখা যাইতেছে; মুখে কাঠি কুটা লইয়া স্ত্রী-পক্ষীকে নীড় রচনায় সাহায্য করিতেছে; মাঝে মাঝে তাহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছে। সাধারণতঃ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহাদের নীড় রচনা শেষ হইয়া যায় ও ডিম্ব প্রসূত হয়; কার্ত্তিকে নূতন নীড় রচনাচেষ্টা অন্য কোথাও দেখা গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা জুলাই আগষ্ট মাস ইহাদের গর্ভাধান কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই এখানেও নীড়স্থ ওয়াক বকশিশু দেখিয়া অনুমান হয় যে, ভাদ্র মাসে ওয়াক বকের গৃহস্থালী সুরু হইয়া এখন পর্য্যন্ত তাহার দাম্পত্য-জীবনের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ওয়াক বকের যে পূর্ণাবয়ব ছানাটিকে আমরা সাহেববাঁধে পাইলাম, তাহার

দেহের দৈর্ঘ্য ১৬ ইঞ্চি ; পুচ্ছ ১ ইঞ্চি ; চঞ্চু ৩·২৫ ইঞ্চি ; অঙ্ঘ্রি ৩ ইঞ্চি ; পক্ষ ৯ ইঞ্চি। চক্ষু পীতাভ ; চঞ্চুর উপরাংশ ঈষৎ লালচে ধূসর, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, নিম্নাংশ হরিতাভ পীত ; চোখের পাতা নীল ; পদদ্বয়, বক্ষের অনাবৃত নিম্নভাগ ও তলপেট পীতাভ হরিদ্বর্ণ ; মাথার উপরে ও কণ্ঠদেশে কয়েকটি সাদা রোম ; পুচ্ছ পাংশুল,—অগ্রভাগ সাদা। মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত দেহের সমস্ত উপরিভাগের বর্ণ ধূসর ; এই ধূসরতা মস্তকের পুরোভাগে গাঢ়তর হইয়াছে এবং ইহা অনেকগুলি তাম্রবর্ণ রেখায় অঙ্কিত। পৃষ্ঠদেশের পতত্রের অগ্রভাগ পীতবর্ণ ত্রিকোণরেখান্বিত। পক্ষ ধূসর কৃষ্ণাভ, লম্বা পালকগুলির অগ্রভাগ সাদা। আমরা তাহাকে একটা পুরাতন চেয়ারের হাতলের উপর বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলাম ; সেই স্থানটি তাহার এমন অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, দিনের বেলায় বাগানের প্রান্তভাগে একটি অনুচ্চ বৃক্ষ-শাখায় তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিলেও সে তথা হইতে অবতরণ করিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত চেয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করিত। সে আহার করিত রাত্রিতে, দিনের বেলা তাহার আহারের কোনও চেষ্টা দেখা যাইত না। সমস্ত দিন সে হয় এ-পা, নয় ও-পার উপর ভর দিয়া নিশ্চল ভাবে হাতলের উপর দাঁড়াইয়া থাকিত এবং চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা পক্ষ কণ্ডূয়ন করিত। এই সমস্ত ব্যাপারে তাহার জাতিগত সংস্কার বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

কাঁকবক, Ardea cinerea and A. manillensis

কাঁক বক, সাদা ও লাল, প্রত্যহ প্রাতে সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে সাহেববাঁধের দ্বীপের পত্রহীন বৃক্ষশাখার উপরে আসিয়া বসিত। সংখ্যায় অধিক নহে ; আয়তনে খুব বড়। এ স্থানে ইহার নীড় দেখা গেল না।

কুঁড়োবক, Butorides javanica

কুঁড়োবককে সাহেববাঁধে দেখি নাই, কিন্তু পুরুলিয়ায় অন্যত্র দু একটার দেখা পাওয়া গেল। সে যেন সর্ব্বদাই আত্মগোপনে সচেষ্ট ; ঝোপের মধ্যে, বৃক্ষের পত্রান্তরালে অন্তর্হিত হইবার চেষ্টা তাহার প্রবল। নিঃশব্দে উড়িতে উড়িতে সহসা আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িলে আমরা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে না করিতে সে গাছের মধ্যে লুক্কায়িত হয়। দূর হইতে দেখিতে অনেকটা ওয়াক্ বকের মত ; মাথার উপরিভাগ ও দুই পাশ কালো ; মাথার পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটি সরু কালো ঝুঁটি ঋজুভাবে লম্বমান ; কিন্তু ইহার চঞ্চু ওয়াক্ বকের চে'য়ে খুব সরু ; ওয়াক্ বকের চেয়ে ইহার গলা লম্বা ; বুক ও পেট ভস্মবর্ণ ; ওয়াক্ বকের দেহের এই অংশ সাদা। ইহারা সম্পূর্ণ নিশাচর নহে ; দিনের বেলায় ইহারা চলাফেরা করিয়া থাকে।

কোঁচবক, Ardeola grayi

আমাদের দেশে সব সময়ে সাধারণতঃ জলাশয়ের কাছে, পথে ঘাটে যে বক দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুলিয়ায় তাহারও অভাব নাই। কিন্তু এই অত্যন্ত পরিচিত বকের নীড়ের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি আমার হইল না। ঝালদের পাহাড়গাত্রে শিলাখণ্ডের উপরে উপবিষ্ট একটা বক ফটো তুলিতে আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল মাত্র।

এই সমস্ত বক, গাইবক, ওয়াক বক, কাঁক বক, কুঁড়ো বক ও ইহাদের যে সকল পরিজন-বর্গকে দেখিতে পাওয়া গেল, ইহারা কেহই যাযাবর নহে; ঋতুবিশেষে মানভূম পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের কেহই একেবারে চলিয়া যায় না; ইহারা এখানকার স্থায়ী অধিবাসী; এই-খানেই ইহাদের আহার্য্যসংস্থান, এইখানেই ইহাদের দাম্পত্যজীবন নিয়ন্ত্রিত। তবে সকলেই যে সাহেববাঁধে বা বুড়িবাঁধে বা অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট জলাশয়সান্নিধ্যে থাকিতে অভ্যস্ত, তাহা নহে। যে গাছ তাহাদের নিবাসবৃক্ষ, তাহার উপরে দলবদ্ধ হইয়া একত্র অনেকগুলি বক থাকে; কিন্তু আহারের অন্বেষণে তাহারা ইতস্ততঃ অনেক দূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া বেড়ায়; ইহা তাহাদের যাযাবরত্বের পরিচায়ক নহে। এমন কি, ইহারা আংশিক ভাবেও যাযাবর নহে।

পানকৌড়িও যাযাবর নহে; এই অল্পপরিসর দ্বীপের উপরে এই সমস্ত গোষ্ঠীবদ্ধ বকের পাশে সে একটি নাতিক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এই কুঞ্জবন তাহার আবাসস্থান; এইখানে সে নীড় রচনা করিয়া গৃহস্থালি পাতিয়াছে; শাবকগুলি এখন নিতান্ত শিশু নহে; সুবিস্তীর্ণ সাহেববাঁধে তাহারা যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী পাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা দূরে অন্য জলাশয়ে আহার্য্য অন্বেষণে যায় না, তাহা নহে। খুব ছোট জলাশয়ও তাহারা উপেক্ষা করে না। কিন্তু সংখ্যায় এতগুলি পানকৌড়ির পক্ষে একত্র দলবদ্ধ হইয়া এমন ভাবে কালযাপন করা অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। আলিপুরের চিড়িয়াখানার অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে অবশ্যই পানকৌড়ি ও তাহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় "গয়র" পাখীর (Plotus melanogaster) যে উপনিবেশ আছে, তাহাও নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু সেখানে মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক বিহঙ্গের আনুকূল্যে যে পরিবেষ্টনীর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে, পুরুলিয়ার সাহেববাঁধের এই অযত্নসঞ্জাত বন, আর এই বিস্তৃত জলরাশি তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হয়। তীর-ভূমির জলরেখার উপর দিয়া আমাদের এত কাছে ঘেঁসিয়া উড়িতে উড়িতে পানকৌড়ি সহসা জলমধ্যে ডুব দিয়া একেবারে কিছুকালের মত অদৃশ্য হইয়া গেল; তাহাতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না; মনে হয়, যেন সে আগন্তুক মানুষের উপস্থিতিতে আদৌ শঙ্কিত নহে; প্রাণভয়ে সে জলমধ্যে নিমজ্জিত হয় নাই; মৎস্যের সন্ধানে সে ডুব দিল মাত্র। পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার সরল দেহযষ্টিটি এমন ভাবে জলমধ্যে নিমজ্জিত করিল যে, সেখানে কোনও বুদ্‌বুদের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। যদিও তীরের অতি নিকটে নাতিগভীর জলের মধ্যে সে অন্তর্হিত, তবুও আন্দাজে তাহার অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব;—অনেকক্ষণ পরে অনেক দূরে সহসা জলমধ্য হইতে বাহির হইয়া, সে চকিতে আকাশপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। এতক্ষণ সে কি করিতেছিল, কত গভীর জলে সাঁতার দিতেছিল, কোন শিকারের অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়া সফলপ্রযত্ন হইল কি না, এতক্ষণ কি প্রকারে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছিল, একাকী ছিল, না অন্য পানকৌড়ির সহিত জলমধ্যে দল বাঁধিয়া

পানকৌড়ি, Phalacrocorax javanicus

মৎস্যের পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিল; এই সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত কৌতূহলজনক হইলেও বিপুল রহস্যময়। আমরা মুগ্ধ নয়নে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতাম মাত্র; সে যখন আমাদের অত্যন্ত কাছে এক হাঁটু জলের মধ্যে অবলীলাক্রমে ডুব দিল, বুদ্‌বুদের চিহ্নমাত্র রাখিয়া গেল না, তখন আর কয়টা পানকৌড়ি জলমধ্যে অন্যত্র নিমজ্জিত হইল, তাহা হিসাব করিয়া দেখিতাম। এতক্ষণ জলমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাহারা পরস্পরের সঙ্গ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপের কোনও আভাসই পাওয়া গেল না। দলবদ্ধ হইয়া থাকা অথবা কাজ করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কখনও কখনও দেখা যাইত যে, একাধিক পানকৌড়ি ভূমির উপরে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া সিক্ত ডানা শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, তিন রকম পানকৌড়ির মধ্যে পুরুলিয়ায় আমি মাত্র এক রকম দেখিতে পাইলাম; খুব বহুসংখ্যক দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু আয়তনে ইহারা সব চেয়ে ছোট। ইহাদের জাতিবর্গের মধ্যে যেটি আয়তনে সব চেয়ে বড়, সেটি প্রায় তিন ফুট লম্বা; ইহারা কিন্তু পৌনে দু'ফুটের বেশী লম্বা হইবে না। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের যে সকল নীড়, দেখিতে পাওয়া গেল তাহাদের অধিকাংশই তখন পরিত্যক্ত। কার্ত্তিক মাসে ইহাদের গৃহস্থালি একপ্রকার শেষ হইয়া আসিয়াছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পানকৌড়ির সঙ্গে "গয়র"কে দেখিতে পাওয়া যায়, মানভূমেও কেহ কেহ উভয় পাখীকেই দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু পুরুলিয়ায় "গয়র" আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।

গয়র, Plotus melanogaster

পুরুলিয়ার সাহেববাঁধে আরও দুইটি জলচর পাখী আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই,— ডুবুরি ও পানপায়রা। পুরুলিয়া হইতে অনেক দূরে যে জলাশয়ে ইহাদিগকে প্রথম দেখিলাম, তাহা অতীব মনোরম। প্রফুল্ল কমলাচ্ছন্ন সরোবরের স্বচ্ছ জলে ইহারা কেলি করিতেছিল। তাহাদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর দূর হইতে আমরা শুনিতে পাইলাম। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, কমলদলের মধ্যে পান-পায়রা ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, অলস ভাবে ভাসিতেছে, আবার পদ্মপত্রের উপর দ্রুত পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। মানভূমের লোকেরা ইহাকে "দল-কুঁকড়ি" বলে। যেখানে পদ্মপত্র অপেক্ষাকৃত বিরল, ডুবুরি দম্পতী কয়েকটি শাবক লইয়া ডুবিতেছে, আবার ভাসিয়া উঠিতেছে; তাহাদের কণ্ঠ হইতে এক প্রকার ধ্বনি নিঃসৃত হইয়া আবার সহসা থামিয়া যাইতেছে। পান-পায়রাদিগের মধ্যেও ছোট ছোট শাবক জলক্রীড়া করিতেছে। কত নর-নারী এই সরোবরে জল লইতে আসে, স্নান করে, গাত্র মার্জ্জনা করে, ইহারা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। ঝালদে বেড়াইতে গিয়া ঠিক এই রকম পদ্মপুকুরে পান-পায়রা ও ডুবুরি দেখিতে পাওয়া গেল। সাহেববাঁধ বা অন্য যে কোনও "বাঁধে" এই প্রকার পদ্মবন নাই, সেখানে ডুবুরি বা পানপায়রা আশ্রয় গ্রহণ করে না।

পান-পায়রা, Gallinula chloropus

ডুবুরি Podiceps albipennis

বুড়িবাঁধে পদ্মবন আছে, কিন্তু ডুবুরি পানপায়রা দেখা গেল না; জলপিপির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অনেকগুলা জলপিপি সেই প্রকাণ্ডদীঘির উপরে দূরে দূরে ছিল, কিন্তু সবগুলাই একজাতীয়। জলাশয়ের মাঝে মাঝে তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড, তাহার উপরে জলপিপির বাসা; একটা বাসা হইতে তিনটি ডিম্ব সংগ্রহ করা গেল। ডিম্বগুলি অত্যন্ত মসৃণ, বিচিত্র রেখা-সমন্বিত।

জলপিপি, Metopidius indicus

হাড়গিলা এবং তাহার জ্ঞাতিবর্গ Storkজাতীয় যে কয়টা পাখীর দেখা মানভূমে পাওয়া যায়, মাণিকজোড়, মদনটাক, সামকাহাল,—তাহাদের মধ্যে কেবল শেষোক্তটিকে বিশেষ-ভাবে সাহেববাঁধে প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যাইত। সেটি আয়তনে সব চেয়ে ছোট। তাহার চঞ্চুর লক্ষণ দেখিয়া open bill নামকরণ হইয়াছে। চঞ্চু পীতাভ, দেহের উপরিভাগ পাংশুল, ডানা ও পৃষ্ঠের নিম্নাংশ কালো। পাখীটির একটু বিশেষত্ব আছে; প্রত্যহ সকাল বেলায় একই সময়ে কয়েকটি Stork বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের দিক্ হইতে সোজা উড়িয়া আসিয়া সাহেববাঁধের দ্বীপস্থ বৃক্ষের উপরে নামিয়া বসিত। অপরাহ্নে তাহারা সকলেই প্রায় সে স্থান পরিত্যাগ করিত। প্রথমে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, এখানে ইহারা বাসা করে নাই, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় শাবককে নীড়ের মধ্যে খাওয়াইতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ দ্বীপের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি শাবক জন্মিয়াছিল।

হাড়গিলা, Leptoptilus dubius; মানিক জোড় Dissura episcopus; মদনটাক্ Leptoptilus Javaincus সামক-হাল, Anastomus oscitans

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যচরণ লাহা

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

—••—

১০১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর। আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি—

লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন।
সমুখে দাণ্ডাল্য কত পাত্রমিত্রগন ॥
পরাভব পায়্যা রাজা কিছুই না বলে।
অপমানে লঙ্কেস্বর মাথা নাহি তুলে ॥
বিরভাগ পড়ে রাজা সোকে উত্তরোল।
অন্ত[ঃ]পুরে সুনি ক্রন্দনের গণ্ডগোল ॥
মেঘনাদের সোকে কান্দে তাহার জননি।
ইন্দ্রজিতের সোকে কান্দে দিবস রজনি ॥
কোলাহল সুনিয়া কান্দেন দসানন।
মনে মনে ভাবে রাজা বিসাদিত মন ॥
পতিহত জুবতি মজিয়া সোকানলে।
দিবারাত্রি ভাসে তারা[১] নয়ানের জলে ॥
রন্ধন ভোজন নাঞি কান্দে অবিরত।
বিলাপএ নানাভাতি কহিব সে কত ॥
কেহ বলে কুবুদ্ধি লাগিল দসাননে।
মরিতে করিল বাদ শ্রীরামের সনে ॥
বিরসুন্য হৈল লঙ্কা তবু নাহি বুঝে।
আমরা ডুবিল মাত্র সোকসিন্ধু মাঝে ॥
সিতারে আনিয়া মজালেক লঙ্কাপুরি।
এত বলি বিলাপএ সকল সুন্দরি ॥
একচিত্তে সুনে তাহা রাজা দসানন।
ভাল মন্দ কারে কিছু না বলে বচন ॥
পুত্রসোকে বিসাদিত রাজা লঙ্কেস্বর।
জুবতি ক্রন্দনে রাজা হইল জর্জ্জর ॥
রাবনে না করে ভয় জত বধুগন।
বিনায়্যা বিনায়্যা সভে করেন ক্রন্দন ॥
কেহ বলে কুথা গেলে রাবনকুমার।
দেবগন নিরানন্দ প্রতাপে তোমার ॥
সচিপতি বান্ধিয়া আনিলে নিকেতনে।
হেন বির ক্ষয় হৈল মানুসের রনে ॥
কেহ বলে হেন সক্তি মানুসের নাঞি।
রামরূপ ধর্‍্যা আল্য আপনি গোঁসাঞি।
কেহ বলে সুন্য হৈল এই বাসাঘর।
সব য়াছে নাঞি দেখি রাবনকোঙর ।
কেহ বলে সংসার জিনিল দসানন।
নর বানরের হাথে হইল মরন ॥
কেহ বলে রবি সসি অষ্ট লোকপাল।
রাবন জিনিল সভায় বিক্রমে বিসাল ॥

১। পুথিতে 'রাজা' আছে।

ত্রিভুবন বিজয় হৈল রাজা দসানন।
কেহ বলে রাবনে প্রসন্ন ত্রিলোচন॥
ভবানি সঙ্কর কেন এথন না রাথে।
এত বলি জুবতি কান্দএ লাখে লাখে॥

মধ্য,—

সুন সুন মহাশয় আপনার পরিচয়
প্রথমেতে আপনার কথা।
কহি য়ামি অকপটে জন্মিলাম অঞ্জনার পেটে
মহাবলি পবন মোর পিতা॥
কর তুমি অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার জিনি রাযা অধিকার
সুয্যসুত হৈল মহাসুখি॥
পাইয়া বাল্যের ত্রাষ ঋস্যমুখে কৈলাম বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাইতে নারে।
সাঁপ দিল এক ঋসী অতেব নির্ভয় বাসি
নিবেদিলাম তোমার গোচরে॥
মনেতে জন্মিল বেথা ইবে সুন রাম কথা
জে পাকে পাইলাম দরসন।
জানকি লক্ষন সাথে রাম আইল বনপথে
পঞ্চবটী করিল আশ্রম॥
রামের জন্ম সুর্য্যবংসে দসরথ রাজঅংসে
সুনিলাম লক্ষন বদনে।
রামে রাযা দিব রাজা হরাসত জত প্রজা
বনে আইল কৈকৈ বচনে॥
রাজা কৈকৈএর বস না গনিল অপজস
বনে পাঠাইল রঘুমনি।
রাম দুর্ব্বাদলস্যাম রূপে উপজিল কাম
সঙ্গে সিতা জনকনন্দিনি॥
পঞ্চবটি বৃক্ষতলে রাম ছিলা কুতুহলে
সুপ্রনথা আইল সেথানে।
দেখিয়া রামের মুর্ত্তি বড় তার হৈল য়ার্ত্তি
সিতা থাইতে করিলেক মনে॥ ইত্যাদি।

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি অত্যন্ত দীর্ঘ, ২৪ পাতায় আরম্ভ হইয়া ২৭ পাতায় শেষ হইয়াছে। উহাতে রামের বনবাস হইতে লক্ষ্মণের শক্তি-শেল পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত।

শেষ,—

হনুমান পর্ব্বত রাথিল নিজ স্থানে॥
আকাসে হইল বানি সুন হনুমান।
অবিলম্বে গন্ধর্ব্বের দেহ প্রান দান॥
সুসেন ঔষধ নিতে হনু চিন্যাছিল।
পাতালতা নিঙড়িয়া ছড়াইয়া দিল॥
তিন কোটী গন্ধর্ব্ব পাইল প্রান দান।
হনুরে মারিতে জায় বলে হান হান॥
পবননন্দন বির উঠিল আকাসে।
পর্ব্বত থুইয়া আল্য শ্রীরামের পাসে॥
পবননন্দন পড়ে শ্রীরামের পায়।
কহেন করুনাবানি কোলে করি তায়।
হনুমান কি দিয়া সুধিব তোমার ধার।
রাম বলেন কি দিয়া করিব উপগার॥
হনু বলে য়ামি নাই জানি তোমা বিনু।
এত বলি সর্ব্বাঙ্গে মাথিল পদরেনু॥
চরনে ধরিয়া বলি আমি অনুগত।
বিকাইনু রাঙ্গা পায় জনমের মত॥
রাবন মারিয়া কর সিতার উর্দ্ধার।
অজোধ্যায় চল সুধ্যা বিভিসনের ধার॥
দেবের দুল্লভ বড় রাম অবতার।
কত জন্মে ব্রহ্মা য়ানি করিল প্রচার॥
কিত্তিবাস বাথানিল মুনির পুরান।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান॥
সক্তিসেল পুস্তক পুর্ন হৈল এত দুরে।
রাবন বিনে আর বির নাহি লঙ্কাপুরে॥

জে জন গাওয় রাম তোমার মঙ্গল।
আসর সহিত সুখে রাখিবে রাঘব ॥
জেবা পড়ে জেবা সুনে জে জন গাওয়।
ধন পুত্র হয় তার অন্তে সর্গ জায় ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
লঙ্কাকাণ্ডে সক্তিসেল উপাক্ষান কথন ॥

শেষের আট পঙ্‌ক্তি লেখকের যোজনা মনে হয়।

১০২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ। লেখক কনকরাম ধুবী।

শেষ,—

সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল জুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল এক তোলা ॥
দেবসক্তি ঔসদি দিলেন নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥
সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিছিলা ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে ঔসদি দিল আর এক তুলা ॥
শ্রীগোরু স্বরিআ অউসদি দিলা নারায়ন।
এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥
শ্রীগুরুর দুহাই জান বের্থ নাই জাএ।
চৈতনা পাইল লক্ষন চোক্ষু মেলি চাএ ॥
সুসেনে বাটীআ ঔসদি করিআছিল ঝুলা।
শ্রীরামের হস্তে দিল আর এক তুলা ॥
মাতা পিতা স্বরি ঔসদি দিলা নারাঅন।
এই মতে লক্ষন বিরে না হইল চেতন ॥
মাতা সীতার দুহাই জান বের্থ নাহি জায়।
ধর্জ্য না হইল লক্ষন গড়াগড়ি বাএ ॥
ধর্য্য না হইল জদি গুনের ভাই লক্ষন।
কুল হনে ভুমে পেলি জুড়িল কান্দন ॥
দৈব জুগে ঠেকিল রামের ও রাঙ্গা চরনে।
রত্তিআ উঠিলা তবে সমির্ত্তার নন্দন ॥
দাদা বলিআ লক্ষন ডাকিতে লাগিল।
গুনের ভাই লক্ষন বলি রামে কুলে তুলি লইল ॥
লক্ষন জিলেন রামের পুরিল মনের সাদ।
চৌদিগে বানরগনে করে সিঙ্গনাদ ॥
জএক্কর জঅধনি মঙ্গল আরম্ভন।
সর্গে থাকি পুষ্ফ বৃষ্টী করে দেবগন ॥
কবি কিত্তিবাসে বলে শ্রীরামের চরন।
লক্ষনের সক্তিছেল হইল সমাপ্ত ॥

১০৩। রামায়ণ—লঙ্কাণ্ড।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ২০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রথম পাতাখানি পরবর্ত্তী যোজনা।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মির্ত্তু হইয়া গেল জমঘর।
দুতে বার্ত্তা কহিতে জায় রাবন গোচর ॥
হরিসে বসিছে রাজা সিঙ্গাসন উপরে।
পাত্রমিত্র স্থানে রাজা লাগে কহিবারে ॥
জোহ বার জায় পুত্র সেহি বার জিনে।
না জানি বা পুত্র আজি জিনে কতক্ষনে ॥
ভগ্ন দুতে বার্ত্তা কয় যুরি দুই কর।
তোমার পুত্র ইন্দ্রজিত গেল জমঘর ॥

জে কালে সুনিল রাজা পুত্রে মরন কথা।
সিঙ্গাসনে রৈল পদ ভুমে পরে মাথা॥
অচেতন [হ]ইয়া পরে রাজা লঙ্কেস্বর।
পাত্রমিত্র বলে রাজা গেল জমঘর॥
কেহ বলে জমঘরে গেল দসানন।
কেহ বোলে পুত্রসুখে হৈয়াছে বিমন॥
সিতল চন্দন য়ানি কেহ মাথে গায়।
চামরে বাতাস কেহ করে সর্ব্বদায়॥
খেনেকে চৈতন্ন পাইয়া রাজা দসগিরি।
কতক্ষনে কান্দি উঠে পুত্র পুত্র করি॥

মধ্য,—

লাচারি করূণা রাগ॥
ব্যাকুল ভাইএর পাষে ধনু ফালাইআ বৈষে
সুকে রাম ছারএ নিশ্বাস।
অহে ভাই প্রাণেশ্বর সুকে প্রাণ পোরে মর
তোমার তনু দেখীআ বিনাষ॥
বনে আইলাম তিন জন তাথে এত বিরম্বণ
সরিতে মনেত লাগে ব্রেথা।
কুলে লৈএ লক্ষণ বলে রাম নারায়ণ
ওট ভাই সুণ মর কথা॥
তর মর এক প্রাণ তনুমাত্র দুইখাণ
বিদাতা শ্রীজিল ভাগে ভাগে।
হেণ ভাই মৈল রণে ধিক মর জিবণে
কি বলীব ভরথের আগে॥ (পৃ০ ৯।১)

১০৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

হনুমানের ঔষধ আনয়ন।

রচয়িত'—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২৳×৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

১০৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৳×৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
ইত্যাদি শ্লোক।

কটক হইলা পার দিবা অবসানে।
রাম আগে দাণ্ডাইলা সুগ্রব প্রজাসনে॥
সিন্ধু বান্ধি পার হৈলা কমললচন।
অবস্য পাইবো বার্ত্তা রাজা দসানন॥
একত্রে হইলা পার সকল কটক।
কুন বির আজি রাত্রি হইব রক্ষক॥
জাম্বুমান য়াদি বির আনিলা রঘুনাথ।
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিলা সাক্ষাত॥
রামে বোলে সোন তরা মৈক্ষ সেনাপতি।
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাত্রি॥
কটক রাখিতে ভার করে জেই জন।
সে বিরে করোক আজি রাত্রি জাগরন॥

মধ্য,—

লাচাড়ি॥
ভরথে কান্দন করে বিনাইআ নানা স্বরে
কেনে রাম হইলে নিদারূন।
তুমারে দেখিবার কাজে আইলু মুই বনমাঝে
তুমা সনে না হইল দরসন॥১॥
আমার হইল কুদিন না পাইলু তার চিহ্ন
বনে য়াসি না পাইলু লাগ।
জত দুক্ষ পাইলু বনে কহিমু কাহার সনে
চারিভিথে য়াছে বিরভাগ॥২॥

কি বুদ্ধি করিমু মনে না চিনে হনুমানে
কি বলিমু হনুমান গোচর।
তুমার সহদর জানি কৃপা কর জদি খানি
তবে পাই তুমা দরশন ॥৩॥
জদি দ্বার না দেয় ছাড়ি প্রান দিমু অগ্নি পড়ি
বদ হইমু হনুমান উপর।
কিত্তিবাসে বলে বানি মায়া বির ছাড় তুমি
তুমি নহে রামের সহদর ॥৪॥ (পৃ০৮।১)

লাচাড়ি ॥

কান্দে কান্দে বিভিসনা রে
কান্দে বির মাথে দিয়া হাত।
সর্ব্ব সুর্ব ছাড়ি কথা গেলা রঘুনাথ ॥১॥
স্বরন লইলু তুমার বড় আসা করি।
ত্রিভুবনে স্থান নাই রাবন আমার বৈর্ব্রি ॥২॥
কথা গেলা প্রভু রাম ত্রিদেস য়ধিপতি।
মুই পাবিস্‌ট কথা করিমু বসতি ॥৩॥
তুমার চরম বিনে গতি নাহি আর।
কি দুসে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থার ॥৪॥
দুস্‌ট সহদর মর রাজা লঙ্কেস্বর।
স্ত্রি পুত্র ছাড়িআ মুই হইলু দেসান্তর ॥৫॥
কান্দে রাজা বিভিসন করিআ কাগুতি।
সত্রু মারি য়াইস রাম জানকির পতি ॥৬॥
কিত্তিবাসে বলে সুন রাম রঘুপতি।
ভএ কান্দে বিভিসনে কর অব্যাঅতি ॥৭॥
(পৃ০ ১০।১)

শেষ,—
অঙ্গদে বোলে রাবনের বুঝিয়ে চরিত্র।
মন্ত্রনা সোনীতে জুয়ায় হইয়া একভিত ॥
এতেক ভাবিয়া তবে বালির নন্দন[১]।
গোপ্ত ভেস রহে গীয়া প্রাচির উপর ॥

এইরূপে রহিল গীআ বালির নন্দন।
রন করিবারে য়াজ্ঞা করিল রাবন ॥
হস্তির কান্ধেতে বান্ধে সোবর্নের ধ্যজ।
সুর্ন্ন সামন্ত জুঝিতে পড়ে সাজ ॥
পাত্র [মিত্র] য়াসিয়া রাবন রাজা বন্দে।
লাম্পে লাম্পে উঠে সব হস্তির কান্ধে ॥
চতুরদলে য়ারোহিল য়ারসি কুদাড়ি।
রাজার ভাই তাতে আনীলেক চড়ি ॥
সোবর্ন্যের জাটিথান রাজা পাটে [র] তুলি।
[কু]মার ভাগ চলিতে পড়িল বিজোলি ॥
পাইক্যভাগ দেখি রাজার পুত্র য়াপনার।
চারিভেতে কটক সব রাজা বলয়ার ॥
সুবর্নের নির্ম্মিত রাজসিঙ্গাসন।
তার উপর বসিয়াছে রাজা দশানন ॥
হাথে রাখায়াছে * * *
সরদের চন্দ্র জেন ধবল রজনি ॥
ডাইনে তাম্বুল সনে দিয়াছে এক ঝারি।
হেন কালে কুমারভাগ ডাগুাইলা সারি সারি ॥
কুমারভাগে মাথা নয়ায় মাথার [পাগ] খসে।
দুই বিরের পাগে খসি পড়ে দুই পাসে ॥
খঞ্জন জিনিয়া দুইর মকরকুণ্ডল।
মানীক্য জিনিয়া দুইর কর্নের সুভন ॥
কালা চামর জানী খেশের পরিপাটি।
পৃস্‌টেতে লাগিয়া য়াছে দিঘল জোতি ॥
এ তিন ভুবনে যাহার ডরে পাত্র ভিত।
য়াগোবড়ি মাথা নয়ায় কুমার ইন্দ্রজিত ॥
শয়াবতি মায় জার রাবন রাজা বাপ
বিরবাহু মাথা নয়ায় দুর্জ্জয় প্রতাপ ॥
ত্রিশিরায় মাথা নয়ায় করিদগুবত।
প্র[হ]স্থ য়াদি রার্জ্জখণ্ডে করে দণ্ডবত ॥
ইতি শ্রীপাতালখণ্ড সমাপ্ত ॥

—

১। 'কুমার' হইবে।

১০৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ইন্দ্রজিত মৈল বার্ত্তা সোনী মন্দাধরি।
অমনি কান্দিআ উটে পুত্র পুত্র করি॥
পুত্র সোগে মন্দাধরি করিছে রোধন।
কান্দীআ চলিছে রাণী জথাতে রাবন॥
কান্দিআ বসীছে রাজা রত্নসীঙ্গাসনে।
হেন কালে রাণী গেল রাবন বির্দ্দমানে॥
রাণী বলে কি কার্য্য করিলে দসগীরি।
সীতা আনী মজাইলে কনক লঙ্কাপুরী॥
অজ-ীসম্ভবা সীতা জনকদুইতা।
তান সাপে মজিল লঙ্কা আছ দসমাথা॥
জেহি দীন সীতা দেবি আনিলা লঙ্কাতে।
সেহি দিন মজিল লঙ্কা কহিছে তাহাতে॥
তখনে বলীল রাজা দেহ তার কন্যা।
তবে কেনে হইব তোমার অেতেক জন্ত্রনা॥
ইন্দ্রজিত পুত্র মৈল পর্ব্বতের চোড়া।
ডাল বাজি বিক্ষ জেন হইল লাড়ামোড়া॥
মন্দাধরি বোলে রাজা সোন দিআ মন।
সিতা দীআ রাখ তোমার আপনার জিবন॥
এাহ হতে খেমা দেহ লঙ্কার বসত বাস।
দিনে দিনে হইব তোমার কুল জ্ঞাতি নাস॥
জানীআ না জান রাম সোন মতিহিন।
সবান্দবে সোক ভুক কর কিছো দিন॥

মধ্য,—

এহি মতে উর্দ্ধর পথে করিল গমন।
প্রভু রাম হারাইয়া এত বিড়ম্বন॥
রাম নাম লইয়া বির ছাড়এ নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে গেল উর্দ্ধর কৈলাস॥
উর্দ্ধর দুয়ারে দেখে জত জত ধর্ম্ম।
সাধুজন দেখে তাথে না দেখে রামচন্দ্র॥
গোদান কাঞ্চন দান ব্রাহ্মণ ভুজন।
মাত্রি পিত্রি চরনে শেবা করিছে জেহি জন॥
দিঘি পুখরি কিবা বান্দিছে জাঙ্গাল।
উর্দ্ধর দুয়ারে তার ভাল ঠাকুরাল॥
আপনে আশীআ জমে তাহারে শঙ্কাশে।
এহি মতে উর্দ্ধর দ্বারে শাহুজন বৈশে॥
তাহাতে না দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
আর কত দুরে বির করিল গমন॥
হরগৌরি দুই জন আছয়ে বশিয়া।
পার্ব্বতি শিবেকে পুছে হনুমান দেখিয়া॥
দুর্গা বোলে শোন শিব আমার বচন।
কি কারনে আইশে এথা পবননন্দন॥
শবে বোলে শোন দুর্গা না জান কারন।
মহিরাবনে হরি নিছে শ্রীরাম লক্ষন॥
হনুমান শমান ভক্ত নাহি ত্রিভুবন।
রাম লক্ষন হারাইয়া করয়ে ভ্রমন॥
পার্ব্বতি বোলেন তার লক্ষন বুজি বাম
আমি হই শিতামুর্ত্তি তোমি হও রাম॥
হেন কালে তথা আইল পবননন্দন।
এহি মতে শন্দান করিলা দুই জন॥
রাম সিতা মুর্ত্তি বির দেখিয়া তথায়।
বোলে রাম সিতা পাইলাম লক্ষন ভাই কথায়॥
এহি বোলি হনুমান করিল গমন।
হরি হর ভেদ নাই অভেদ শিবরাম॥

হনুমানে বোলে রাম এমত কেনে কৈলা।
সিতাকে পাইয়া তোমি লক্ষনকে ছাড়িলা॥
আইশ আইশ কান্দে করি তোমরা দুই জন।
তোমাকে পাইলাম রাম কথাতে লক্ষন॥
ইহা বোলি হনুমান লাগিল কান্দিতে।
সিংহাঁশনে হর গৌরি লাগিল হাশিতে॥
হনুমানে বোলে রাম বড়ই পামর।
আমারে এত দুক্ষ দিয়া হাশ নিরান্তর॥
ইহা বোলি হনুমান পবন কুঞঁর।
হরগৌরি তোলি লইল মাথার উপর॥
দ্বারে থাকি দেখি তাঁরে দ্বারি নন্দিবর।
ধাইয়া আশিল তবে শিবের গোচর॥
দ্বারি বোলে বেটা তোই থাকচ কথায়।
আমার ঠাকুর কেনে লইলে মাথায়॥
দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর।
কুপ করি আশিলেক হনুমান গোচর॥
হনুমানে বোলে আমি হারাইল রাম।
আমার ঠাকুর আমি নিব তোমায় কিবা কাম॥
এত শোনি নন্দিবির কুপ করি বোলে।
হনুমানকে ধরে বির দুই হাতে গলে॥
হনুমানকে ধার নন্দি হাশে মনে মন।
রাখিতে না পারে নন্দি চমকিত মন॥
বাহু লাড়া দিআ ধরে পবননন্দন।
হুরাহুরি গরাগরি করে দুই জন॥ (৯১ পত্র)

শেষ,—

রাম লক্ষন লইআ বির করিছে গমন।
জেহিথানে বসী আছে জত বানরগন॥
শ্রীরাম দেখীআ তারা বন্দিল চরন।
আসীর্ব্বাদ করিলেন কমললোচন॥
জয় জয় দিআ নাছে জত বানরগন।
হেনকালে দেখে রামে বান্ধা বিভিসন॥
বন্দন মোচন করি কমললুচন।
আনন্দ হইআ নাছে রাজা বিভিসন॥
পুথিখানি তিন হাতের লেখা বেশ বুঝা যায়।

১০৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

মহীরাবণের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{1}{2}$×৫$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

ভগ্নপাইক কহে গিয়ে রাবন গোচরে।
তরুনি পরিল রনে যুন লঙ্কেশ্বরে॥
সুনিয়া রাবন রাজা হইল অচেতন।
ভুমে লোটাইয়া কান্দে রাজা দসানন।
অজ্ঞান হইল রাজা পরিল তখন।
পুত্র পৌত্র ভাতি নাহিক দিতে তর্পন॥
মহাসোকে কান্দিতেছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোথা গেলি তরনি প্রানের দোসড়॥
সকল বির পরিলো মোর বির নাহি আর।
দস মুখে রাবন রাজা করে হাহাকার॥
কান্দিতে কান্দিতে মনে হইল স্মরন॥
পাতালে আছে পুত্র মহি ত রাবন॥
মহিরাবন বলে রাজা ডাকে উশ্চস্বরে।
কোথা গেলি মহি পুত্র দেখা দেহ মোরে॥
কহিলে আমারে তুমি পূর্ব্বে জে কারন।
বিপত্তে পরিলে আমাএ করিহ স্মরন॥
এত জদি কাতরে বলেন লঙ্কেশ্বর।
টনক পরিল মহির মস্তক উপর॥

শেষ,—

হেন কালে দেবি বলেন সুন প্রভু রাম।
আমি রহিব কোথা প্রভু তুমি দেহ স্থান॥
রাম বলেন সুন দেবি আমার বচন।
মহির সোমান পুজা করিবে জগজন॥
যুনিয়া সতুষ্ট মাতা হাঁসিতে লাগিলা।
হনুমানে ডেকে রাম তখন বলিলা॥
ক্ষিরগ্রামে লইয়ে দেবির করহ স্থাপন।
তুমি আইলা আমি তবে বধিব রাবন॥
[এ] কথা যুনিয়া হনু করিলো পয়ান।
দেবি লয়ে গেল হনু জথা খিরগ্রাম॥
[উত্তম] স্থান জে দেবি হরসিত মোন।
সেই স্থানে লাবাইল পবননন্দন॥
বিস্বকর্ম্মায় হনুমান করিলা স্বরন।
সত্যরে আইলা বিস্যকর্ম্মা হনুর বিগুমানে॥
হনু বলে দেবিরে হেথা করিব স্থাপন।
দেবিকে রাখিতে স্থান করহ গটন।
পাথোর আনিয়া হনু দিল বিগুমান।
[ম]সানে অপূর্ব্ব পুরি করিল নির্ম্মান॥
রাত্রের ভিতরে পুরি ক[রি]লা নির্ম্মান।
বিস্বকর্ম্মা পয়ান করিলা নিজ স্থান॥
দেবি বলেন যুন হনু আমার বচন।
মহিরাবন ··· ··· পুজিবে কোন জন॥
আমার সেবক আমার কাছে দিলে বলিদান
নরবলি দিয়া কর্ত্তে পুজার বিধান॥
হনুমান বলে মাতা কহিলাম আমি।
বৎস্বর অন্তর নরবলি পাবে তুমি॥
তোমারে দেখিতে ইচ্ছে করে জেই জনে।
মুক্তিপদ পাবে সে তোমা দরসনে॥
জোগাগু৷ বলিয়া মাতা হলো তোমার নাম।
জে তোমায় দেখিবে তার অবস্য পরিত্রান॥
দেবি বলেন লোকের চাক্ষসে না থাকিবো।
লোকের চাক্ষসে থাকিলে অনাদর হইবো॥
হনু বলে মাতা তুমি ব্রহ্মা অগোচর।
চাক্ষসে না থাকিবে লোকের গোচর॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥ * *
দেবিরে রাখিয়া হনু মন্দির ভিতর।
বাহিরে আসিয়া করে তিন স্বরবর॥
হনুর বিক্রম জেন সিংহের প্রতাপ।
তিন স্থানে মৃত্তিকা তুলিল তিন চাপ॥
তাহারে করিলা বির তিন স্বরবর।
তিন নাম থুইল তার পবনকুমার॥
ধামাতের পুষ্করিনি বলে থুইল এক নাম।
সর্ব্বেসা বলিয়া নাম রাখিলা এখন॥
ক্ষিরদিঘি বলে থুইলা এক নাম।
জোরহাতে করে হনু দেবির বিগুমান॥
তিন স্বরবর কৈলাম করি নিবেদন।
জাহা ইচ্ছা তাহাই কর জেবা লয় মোন।
হনুমান বলে মাতা করিবে বিচার।
আপনার গুনে পুজা করিহ প্রচার॥
এতো বলি প্রনাম করিলা দেবির পায়।
হাঁসিয়া হনুরে মাতা দিলেন বিদায়॥
জোগাদ্যা বলিয়া বির করিলা স্থাপন।
কতো পাপে মুক্তি হইলা দেবির স্বরন॥
বিদায় হইলা হনুমান দেবির চরনে।
এক লম্ফে আইলা হনু রাম বিগুমানে॥
জোর করে বন্দে বির রামের চরনে।
যুগ্রিব আদি বানর দিলা আলিঙ্গন॥
আপদ এরায় বানর ছারে সিংহনাদ।
যুনিয়া রাবন রাজা গনিল প্রমাদ॥
মহি পুত্র পরিল ধ্যানে জানে দসানন।
তে কারনে সিংহনাদ ছারে বানরগন॥
হাহাকার করে রাবন ছারিয়া নিস্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিৎ কৃত্তিবাস॥

১০৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামরাবণের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১, ২, ৪, ৫, । প্রতি পৃষ্ঠায় ৯।১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সভা করি বৈসে রাম কোমললোচন।
বিরভাগ বৈসে জত সুগ্রীব বিভিসন।।
শ্রীরাম বলেন সুন জত রায্যখণ্ড।
রাবন বধিএ বিভিসনে দিব ছত্র দণ্ড।।
হেন কালে হনুমান ছাড়ে সিংহনাদ।
প্রান উড়ে গেল রাবন গুনিল প্রমাদ।।
রাবন বলে সকল গেল রামের সংগ্রামে।
পুত্র পোউত্র উদ্ধার হইলা রাম দরসনে॥
হরগৌরি পুজিতে বসিল লঙ্কেস্বর।
রাবনের পুজা লইতে আইল সঙ্কর॥
রাবনের তরে দয়া করিলা ভবানি।
আইল রাবন কাছে জগতজননি॥
পুজা করি প্রনাম করএ দসানন।
এইবার মোরে রক্ষা কর পঞ্চানন॥
শ্রীরাম লক্ষন জিনি তোমার বরেতে।
সিব বলে হেন বর আমি নারি দিতে॥
রাম মারিতে বর দিব কাহার সকতি।
এত বলি অন্তধ্যান হন পসুপতি॥
রাবন বলে জানি[লা]ম ইহার কারন।
কাল হয়া আইল মোরে নর বানরগন॥
রাবন বলে সুন মাতা করি নিবেদন।
আমা লাগি জাও তুমি সিবের সদন॥
দেবি বলে আমি পুর্ব্বে কহিলাম বিস্তর।
তাহে মোরে ক্রোধ কৈল দেব মহেস্বর॥
রাবন বলে সুন মাতা জগতজননি।
মোর লাগি হরের কাছে চলহ আপনি॥
রাবনের এত বাক্য সুনিঞা সঙ্করি।
সিবের সাক্ষেতে দাণ্ডাইল কর জুড়ি॥
ভবানি বলেন সুন দেব পসুপতি।
কোন গুনে পুজে তোমায় লঙ্কার নৃপতি॥
ধনে প্রানে মজে রাবন শ্রীরামের বানে।
এবার রাবনে রক্ষা কর ত্রিলোচনে॥
দস মুণ্ড কাটী রাবন দিল তোমার পায়।
ছাড়িতে রাবনে নাথ তোমা না জুয়ায়॥
সিব বলে পার্ব্বতি সুনহ বচন।
পাপিষ্ট দুমতি বেটা লঙ্কার রাবন॥
নন্দি সাপিল জখন রাবনের তরে।
নর বানরের হাতে রাবন জাব জমঘরে॥

১০৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা—১—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

বিভিসন বলে তুমি সত্যে হইলে পার।
পিতিজ্ঞা করেছি রামি রাছে তব ধার॥
সিতার উধ্যার হেতু দিলাম রাম্বাস।
সিতাকে রানিতে রামার সির্দ্ধ রভিলাস॥

রাজা হয়া এতেক বলিল বিভিসন।
সিতা বলে শ্রীরামের পড়ে গেল মন ॥
জার নাগি জুদ্ধ করি পাড়িয়া ধনুক।
দস মাস নাই দেখি জানকির মুখ ॥
সুগ্রিব বিভিসনের সঙ্গে করি যনুমান।
সিতায় বাত্রা দিতে রাম পাঠান হনুমান ॥
রাম বলেন সুন বাছা পবননন্দন।
সিতায় তত্ত দিতে জাহ য়সকের বন ॥
সিতা য়াগে কহিবে য়ামার সমাচার।
সবংসে রাবন রাজা হইল সংহার ॥
রাক্ষস বানর সুখি হইল তৃভুবন।
কালি তুমা নিতে য়াসিব ধার্ম্মিক বিভিসন ॥
রামের চরন ধরি করিয়া প্রনাম।
সিতার নিকটে জাত্রা কৈল হনুমান ॥
ধনুক টানিলে জেন সিত্র বান ছুটে।
লাফে লাফে গেল য়সকবনের নিকটে ॥
সনা রূপায় বন্দিয়াছে য়সক গাছের গুড়ি।
তার তলায় বসিয়াছেন জনকঝিয়ারি ॥
অসকের তলে সিতা য়তি অনুপাম।
দুটী হাত তুলিয়া সিতা বলে কবে য়াসিবে রাম ॥
হনুমান ডাণ্ডাইল সিতার গোচর।
চেড়িগুলা বলে য়াইল ঘরপড়া বানর ॥
থরহরি কাপে সভে পাইয়া তরাস।
ভএতে রাক্ষুসিগুলা হইল একপাস ॥
গাছের য়াড়ে ডাণ্ডাইল হয়া য়দরসন।
হেন কালে বানর করে সিতা সম্বাসন ॥
সিতার আগে হনুমান সুয়াইল মাথা।
য়বধানে সুন রামের কুসলবারতা ॥
সুগ্রিবের প্রতাপে য়ার বানরের হানাহানি।
বিভিসনার মন্ত্রনাতে লঙ্কাপুরি জিনি ॥
সবংসে পড়িয়া গেছে রাবনে য়াপার।
বংসনাস হইল জখন তোমাকে দিল তাপ ॥

প্রভাতে দেখিবে গিয়া শ্রীরাম লক্ষন।
কালি তুমায় নিতে য়াসিব ধার্ম্মিক বিভিসন ॥
দুই ভেএর জয়জুক্ত সুনিয়া কাহিনি।
হরসিতে য়াপনা পাসুরে ঠাকুরানি ॥
হনুমানের মুখে সুনি কুসলবারতা।
য়সকের বনে সিতা হেট্ট কৈল মাথা ॥
হনু বলে কেন দেখি বিরসবদন।
কুস[ল] বাত্রার উত্তর না পাই কিসের কারন ॥
তুমার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি।
হেটমাথা করে য়াছ দণ্ড দুই চারি ॥
রাবনের মরনে কিবা দুস্থ হইল মনে।
রিদয়ে য়বুকি হয়া য়াছ তে কারনে ॥
সিতা বলে জে কথা কহিলে মোর পাসে।
য়ানন্দে বেদেছি মুখ বোল নাই য়াইসে ॥
জে কারনে এতক্ষন হেট্ট করি মাথা।
কিবা দিলে সোদ হয় এই করি চিন্তা ॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালে করিয়া অনুমান।
এই বাক্যে হনুমানে কিবা দিব দান ॥
মুনি মুক্তা দি জদি য়মুল্য ভাণ্ডার।
তবু এই বচনের নাহি হব ধার ॥
বিক্রয় হইয়া আছেন য়ভাগিনি সিতা।
কিবা দিব দরিদ্র সে করেছে বিধাতা।
তৃভুবনে তুমার তুলনা নাই দান।
তোমাকে চরনের স্থল দিবেন শ্রীরাম ॥
রাক্ষসের ঘরে মোরে করিলে উর্দ্ধার।
অজুধ্যাকে গেলে তোরে দিব গলার হার ॥
হনুমান বলে মা গো কি করিব ধন।
কত লক্ষ ধন সিতা শ্রীরামের চরন ॥

শেষ,—

অগ্নির ভিতরে থাকি না পুড়ে আগুনি।
পুড়িবার কাজ্য থাকুক গাএ পড়ে পানি ॥

অগ্নি বলেন নেহ রাম য়াপন রমনি।
সিতার দেহে পাপ নাই য়ামি ভালে জানি॥
জত লোক পাপ কৈল য়ামার আনলে।
পবিত্র হইলাম তুমার সিতা লক্ষি কোলে॥
সিতার চরিত্রে তুমি হইয় সন্তোস।
জানকিকে দেখি রাম না করিহ রোস॥
প্রভুর চরনে সিতা করিল প্রনাম।
আপনা য়াপুনি দোস মাগেন শ্রীরাম॥
এক মুখে তুমার গুন কি কহিব য়ার।
বাপকুল সশুরকুল করিলে উধার॥
নিম্মল সরিরে জস পুরিত মেত্বনি।
গগনমণ্ডলে জেন কলাহল যুনি॥
সিতার সাহাস গু সর্ব্ব জনে দেখে।
ধন্ন ধন্ন বলিয়া ডা কল তিন লোকে॥
মরিল স্বরিরে জেন পসিল জিবন।
সিতা দরসনে সভার প্রসন্ন বদন॥
ধন্ন্য ধন্ন্য সিতা গো তুমার ধন্ন্য জিবন।
তুমার জস ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
আপন আপন স্থানে গেল জত দেবগন।
জথনকার জে কাজ্য তাহা জানেন বিভিসন॥
বিশ্বকর্ম্মা ডাকিয়া বিভিসন দিল পান।
রাম সিতার বাসঘর করহ নিম্মান॥
সুবর্ন্নের ঘর দ্বার সুবর্ন্নের চৌওরি।
রত্নময় খাট পাট নেত পাটের তুলি॥
নব য়নুরাগ দুহে জগত মহিতা।
বাসঘরে প্রবেশ করিল রাম সিতা॥
শ্রীরামের পাসে বৈসেন জনকনন্দিনি।
চন্দ্রের সাক্ষাতে জেন বসিল রহিনি॥ * ॥
রাম সিতা দুই জনে রহিল এক ঘরে।
লক্ষি নারায়ন দুহে হইল একত্তরে॥
সয়ন করিল রাম সিতা করি কোলে।
লাজে মুখ ঢাকে সিতা নেতের য়াঞ্চলে॥
হাস পরিহাস করে দুহে দুহা হেরি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে ভমরি॥
জানকি সহিত সুখে য়াত্রি বঞ্চেন রাম।
ভমর কমলে জেন মধু করে পান॥
রাত্রি রঙ্গে সিরাঙ্গে কৌতুকে করে কেলি।
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে কৌকিলি॥
রাম সিতার বাসঘর জেই জন সুনে।
তারে বড় তুষ্ট হন লক্ষি দ(জ)নাদনে॥
ব্রাহ্মন সুনিলে হয় বুদ্ধে বিহপতি।
ক্ষেতি সুনিলে হয় মহাজোধাপতি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাম সিতার মিলন॥

১১০। রামায়ণ—লঙ্কাকা ।

সীতার উদ্ধার।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১—৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

জল ফল আদি করি না করি ভোজণ।
এমতি দেখীব গিআ শ্রীরামচরণ॥
এই কথা বিভিশণ জে কালে শুনিল।
লঙ্কা মৰ্দ্ধে য়েক দুত পাঠাইয়া দিল॥
কহ জাইয়া দুত জথা আছে মন্দাধরি।
দেশে চলি জায়ে শীতা শ্রীরামশুন্দরি॥
দুত জাইয়া বলিলেক মন্দাধরি স্থাণ।
করজোরে কহে কথা জত দুতগণ॥
দেশেতে চলিল শীতা শ্রীরামকামিনি।
তোমার নিকটে এই বলিলাম বানি॥

শীতা দেখীবার জদি তব মণে থাকে।
তরিতগমণে আশী দেখহ তাহাকে ॥
এই কথা মন্দাধরি জে কালে শুণিল।
দশ হাজার রমনি শঙ্গে গমন করিল ॥
এই পুরি মর্দ্ধে নিয়া চৌদল রাখিল।
রাম রাম বলি শীতা গমণ করিল ॥
জাত্রা করি চলিলেক রাজা বিভিশণ।
চৌদল লইয়া শবে করিল গমণ ॥
আণন্দে চলিল তারা জয় শব্দ করি।
হেণ কালে আশীলেক রাণী মন্দাধরি ॥
চৌদল রাখহ বলি ডাকিতে লাগিল।
শ্রীরাম দোহাই দিয়া শমুখেতে গেল ॥
শমুখেতে দাড়াএ গিআ রাণি মন্দাধরি।
চৌদল নামায়ে তথা মহাশব্দ করি ॥
শীতার জে বিগ্রমাণে করিআ স্তবণ।
অম্বণ করিআ দোলার উঠাএ বশণ ॥
মন্দাধরি দাড়াইল বশণ ধরিয়া।
জাণকি রহীলা তবে হেটমণ্ড হৈয়া ॥
করজোরে মন্দাধরি করয়ে স্তবণ।
হেটমুণ্ড হইয়া মাতা রহিলা কি কারণ ॥
অবলা কামীনি তুমি আমী নহে জাণি।
অপরাদ খেমা কর জণকনন্দিনি ॥
আপনি চলিলা মাতা রাম দরশণ।
পাদপর্দ্দে স্থাণ দিয়া স্থীর কর মণ ॥
আমী ত পাতকি বটী কিছু ণহে জানি।
দআ করি রাখ মাতা জগতজণণি ॥
আমীকে বৈমুখ মাতা হয়ো কি কারণ।
সুজনে না ছারে দয়া লইলে শরণ ॥

মধ্য,— নাচারি ॥

কান্দে শীতা দির্ঘ রায় ধরি মন্দাধরীর পাঅ
কেণে শাপ দিলা গ জণনি।
বার মাশ দুর্খ পাইয়া চলিছী হরিশ হৈয়া
তাথে বাম হইলা আপনি ॥
ণা দেখীল গদাধরে বইমুখত হইলা মোরে
আমী বর পাপী অভাগিনি।
হেন বুঝী প্রভু রাম আমাকে হইলা বাম
এখণেতে ছারিব পরাণি ॥
আদি অন্ত বলি মা তুমী মোরে চিণ ণা
আমী বটি তোমার ণন্দীনি।
জখণে বিধাতা মোরে আনিলেক শংশারে
[তুমী] মোর হইতে জণনি ॥
শোণ মন্দাধরি শতি তুমি হৈলা গর্ব্ভবতি
তাথে আইলেণ নারদ অপনি।
রাজা বিগ্রমাণে গিয়া কহীলেক গণিয়া
অমঙ্গল কণক ভুবণে ॥
মন্দাধরির গর্ভ স্থীতি হইবেক জেই স[তী]
[তার] শ্বামী হইবে প্রকাশ।
তোমার শঙ্গে দরশণ মহা ঘোরতর ভুণ
তাথে তুমী হইবা বিণাশ ॥
এ কথা শুনিআ রাজা মণেতে ভাবিলা জাজা
ঝাটিতে চলিলা অন্তশপুরি।
ক্রোধ করি দশ গিরি বলিলা প্রবোদ করি
এই গর্ভ করো * * ॥
ইত্যাদি—(পৃ° ১৫।১-২)

নাচারি ॥

শীতা কান্দে দির্ঘ রায় ধরিয়া রামের পাঅ
কেণে মোরে করিলা বর্জ্জণ।
তুমি বিণে লক্ষ্য পাই দাড়াইব কোণ ঠাই
কেণে মোর ণা জায়ে জিবণ ॥
আশীলাম তোমার ঘরে বঞ্চীত হইলা মোরে
রাজ্য মর্দ্ধে ণা দিলা বশতি।
শকল করিলা ণাশ রার্ধ্য ছারি বণবাশ
ণাণামতে কর অবগতি ॥

রার্য্য ছারি তোমার আশে আশীলাম বণবাশে
তাথে বিধি বিরম্বণ কৈল মোরে।
শোণ শোণ প্রভু রাম জপীতেছী তোমার ণাম
শদাকাল জাগিছে অন্তরে॥
আমার দুক্ষ্যের কথা বলিয়ে তোমার এথা
দয়া কিছ করোহ আমারে।
আমী বড় পাপী হই তোমার চরণে কই
স্থাণ দেও তোমার দাশীরে॥
তুমি গেলা বণান্তরে রাক্ষাশে হরিল মোরে
রাখে নিআ অশোকের বণে।
তাহাতে আমার শাতে দাসী দিল যুতে যুতে
শদাকাল রামণাম মণে॥
তাহাতে রাবণ চেরি পীঠেতে মারয়ে বারি
জিভ্যা টাণে শাড়াশী দিআ।
ত্রজটা রাক্ষ্যশি তাথে তুলিলেক ধরি হাতে
স্থীর মোরে করিল আশীআ॥
মণে দুর্থ শহে ণা তাহাকে বলিল মা
তুমি মোর ধর্ম্মের জণনি।
কি কব তোমার ঠাই দুক্ষ্যের অবধি ণাই
আমী বড় পাপী অভাগিনি॥ ইত্যাদি
(পৃ° ১৯।১-২)

শেষ—

শ্রীরামের ক্রোধ দেখী বলিল জাণকি।
কুণ্ডস্থলে রামচন্দ্রের বিক্রম আগে দেখী॥
কুণ্ড হতে তুলি দিয়া চলি জাও তুমি।
রামচন্দ্র স্থীর করি দেখা দীয়া আমি॥
এতেক শুনিয়া অগ্নি হস্তেতে ধরিয়া।
কুণ্ডের পাড়েতে শীতা দিল উঠাইয়া॥
কুণ্ড হতে শীতা তবে জে কালে উঠিল।
আপনা পুরিতে তবে অগ্নি চলি গেল॥
পুর্ন্ন লক্ষ্যী শীতা তান অনেক মহিমা।
দাড়াইয়া রহিল জেণ কাঞ্চণ পৃতিমা॥
মাআ শীতা দুর হৈয়া শজিব হইল।
পুর্ব্বকথা ভগবানের স্মরণ পরিল॥
শীতাকে দেখিয়া রাম প্রশর্ন্ন হইল।
আইশ আইশ বলি রাম ডাকিতে লাগিল॥
শীতা বলে কোথায়ে রহিলা হণুমাণ।
শদয়ে হইলা মোরে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
শীতা জাইয়া রাম পাশে তখনে দাড়াইল।
হণুমাণ বির আশী প্রণাম করিল॥
রাম শীতা এক ঠাই হইল মিলন।
রাম রাম ধ্বনি দিল জত বাণরগণ॥
লক্ষ্যণ আশীয়া তবে করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈলা তবে জাণকি শ্রীরাম॥
একে একে শর্ব্ব বিরে প্রণাম করিল।
বিভিশণ রাজা তবে দণ্ডবত হইল॥
রাম বোলে শোণ মিত্র শুগ্রিব রাজন।
বিভিশণ করি রাজা জাইআ এইক্ষ্যণ॥
লঙ্কাপুরির অধিকার পাইল বিভিশণে।
রাম শীতা মিলণ হইল শোণ শর্ব্ব জণে॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডিতের জর্ম্ম শুভক্ষ্যণ।
এই অধ্যা শাঙ্গ হইল বেদ রামাঅণ॥
ইতি শীতা উর্দ্ধার পুস্তক শমাপ্ত॥

১১১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

সীতার উদ্ধার পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫+৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। প্রতি পৃষ্ঠায়, ১৩ পংক্তি। লিপিকাল,সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ—

সুনহ সভার পণ্ডিত স্থন দিয়া মন।
সিতা দেবির উর্দ্ধার জে গাহাণ রামায়ন॥

রাবন বধিয়া প্রভু রাম গদাধর।
সভা করি বসীলেন বেষ্টীত বানর॥
হরিসে বসীলা প্রভু রাম রঘুমনি।
হনুমানে স্থানে প্রভু বলীলেণ বানি॥
সুন সুন প্রাণপুত্র পবননন্দণ।
সর্ত্তরে চলহ তোমী অসোকের বন॥
জিএ কি মরিছে সীতা না জানি নিশ্চয়।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীআ সীগ্র আন রে তনয়॥
রাম আজ্ঞা পাইয়া তান বন্দীয়া চরন।
সিতা উর্দ্দেসীতে চলে পবননন্দণ॥
পবনগমণে গেল অসুকের বন।
দণ্ডবতে প্রণমিল জানকিচরন॥
প্রসন্ন বদণে সিতা তাকে দিলেণ বর।
যুগে যুগে হনুমাণ হইয় অমর॥
সিতা বলেণ সুন বাপ পবননন্দণ।
কি কর্ম্ম করেন রাম বধিয়া রাবন॥
আমি তাপীণেরে প্রভু করেনি শ্বরন।
কুণ কর্ম্ম করে সোগ্রীব ভিবিসণ॥
হণুমাণে বলে মাগ সুন নিবেদণ।
সবংসে বধিল রাম রাজা দসানন।
লঙ্কাপুরে রাজা হৈল বির ভিবিসন॥
সভা করি বসীআছে কমললুচণ॥
আমারে পাঠাইছে মায় তুমা সন্নিদান।
বার্ত্তা উর্দ্দেসীয়া নিতে তোমার কল্যাণ॥
তুমার কারণে প্রভু সদাএ ব্যাকুল।
তোমার অর্থে নাস হৈল রাক্ষসের কুল॥
আজ্ঞা কর রাম পাসে করিএ গমন।
পুনি আসীবাম তুমা নিবার কারন॥
সিতা বলে সুন পুত্র পবননন্দণ।
রাম স্থাণে কহিয় মর এক নিবেদণ॥
জেহি রাক্ষসে আনিছে আমা হরন করিয়া।
সেহি রাক্ষসে নিবে মরে কান্দেত করিয়া॥
চল পুত্র হণুমান রাম সন্নীদাণ।
দেখীলে প্রভুর পদ স্থির হয় প্রাণ॥

মধ্য—

পার্ব্বতি সহিতে করি দেব ত্রিলুচণ।
রামের সাক্ষাতে আসী দিল দরসণ॥
সিবে বলে সুণ রাম বলী তোমার ঠাই।
সীতার খরিরে প্রভু কিছো ভুস নাই॥
জেহি দিন রাবন সীতাকে নিল হরি।
সেহি দিন হতে আমি সীতার প্রহরি॥
আমার সেবক হএ রাজা দসানন।
অনুক্ষণ আমি তারে করিছি তারন॥
অণুক্ষণ সীতা রক্ষা করিআছি আমি।
সীতার কারণে সন্দে না করিবা তোমি॥
ভাল বলীআছ তোমি দেব সুলপানি।
তুমার সিশু হৈয়া হরে জনকনন্দীনী॥
ভাল জ্ঞান দিছ তারে সোণ ত্রিলুচণ।
ভাতিজার বধু সঙ্গে করিল রমণ॥
বর লর্গ্যা পাইলা সীব রামের বচণে।
এই কালে দসরত আইলা সেহি স্থাণে॥
রথ আরোহণে পীতা হৈল উপস্থীত।
মৃতা বাপ দেখী রাম হৈলা হরসীত॥
ভক্তিএ বন্দীল রাম পিত্রির চরন।
পার্দ্ব অর্গ দিলা রাম বসীতে আসন॥
রাম প্রতি দসরথ বলীলা বচণ।
সীতা মাকে দুক্ষ রাম দেয় কি কারণ॥
জেহি দিন হতে সীতা নিল দসগীরি।
সেহি দিন হতে আমী সীতার প্রহরি॥
সরূপেঐ জানি আমি সীতার সতির্ত্তা।
সুর্য্যবংস ধর্ম্ম কৈল জনকদুহিতা॥
ত্রিভুবণ ভরিআছে সীতার মাএর জসে।
মর বাক্যে সীতা লৈয়া চল নিজ দেসে॥

দসরথমোথে সুনি এথেক বচণ।
করযুরে কহে রাম কমললুচণ ॥
বিনা পরিক্ষাএ জদি দেসে নেহি সীতা।
লুকমোথে অপকৃত পাইব জথা তথা ॥
পতিব্রতা হইলে অগ্নীর কিবা ডর।
অগ্নীসুর্দ্ধ বিনা সীতা না নিবাম ঘর ॥
(পৃ' ৬১)

শেষ—

রঘোনাথে বলে সুন পবননন্দণ।
সীতা দিয়া আমার জে রাখহ জিবণ ॥
হণুমাণে বলে সুন রাম রঘুমণি।
সীতা আনি দিলে মরে ধন দিবা কি ॥
তোমাকে কি ধন দিব পবনতণয়।
প্রীথিবি তোমাকে দিব কহিল নিশ্চয় ॥
হণু বলে প্রীথীবি দিলা কৈলা দর করি।
প্রীথীবি ত হয় প্রভু তোমার সাম্বুরি ॥
রঘোনাথ তোমার সাম্বুরি মকে দিলা।
তোমার সাম্বুরি মকে দিয়া সাম্বুরিয়া হৈলা ॥
রঘুনাথে বলে সুন পবনতনয়।
এমন দুক্ষের কালে কাব্য উচিত নয় ॥
সীতা দেবি বিনে মর জায়ত পরানি।
আনিয়া দেখায় মরে জনকনন্দীনি ॥
হনুমানে বলে ব্রর্ম্মা সুনহ কাহিনি।
সীগ্র নিয়া দেয় সীতা জনকনন্দীনি ॥
এত সুনি ব্রর্ম্মা দেব করিল গমন।
সীতা নিয়া দিলা জথা কমললুচণ ॥
জখনে হইল দেখা রাম সীতার মিলন।
সর্গের দেবগণ করে পুষ্প বরিসণ ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত কবির্ত্তসীরমনি।
সীতার উর্দ্ধার গাইল অপুর্ব্ব কাহিনী ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতে বলে রাম বল ভাই।
জমলুক তরিবারে আর লক্ষ নাই ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীতের অমৃত লাহরি
রঘোনাথ আনন্দে সবে বল হরি হরি ॥

১১২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

রচয়িতা,—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৬—১৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান বর্দ্ধমান।

রাম বলেন সুন অহে মিতা বিভিসন।
রথ আন দেশে আমী করিব গমন ॥
পুষ্পক রথ বল্যা করিল স্বরণ।
সেইখানে আইল রথ সতেক জোজন ॥
দস জোজন রথখান থাকে সর্ব্বক্ষন।
লক্ষ্য জোজন হইতে পারে জদি করে মন ॥
ব্রহ্মার বরে রথখান অক্ষয় অব্যয় ॥
জত ভাঙ্গে তত হয় নাহিক অপচ্যায় ॥
রথ দেখ্যা রঘুনাথ হইলা আনন্দিতা।
রথেতে চড়িলা রাম হস্তে ধরিয়া সিতা ॥
লক্ষন উঠিলা গিয়া পুষ্পক জে রথে।
রাম সমুখেতে বির ধনুক বান হাতে ॥
রথে রামচন্দ্র কটক ভুমীতলে।
সুমধুর বোল রাম কটকেরে বলে ॥
সুগ্রিবের সঙ্গে বানরের হানাহানি।
বিভিসন স্বহায় দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি ॥
কোন কোন বিরে আমী করিব বাখান।
ভক্তভাবে মোর ঠাঞি সকল সমান ॥
নিজ নিজ দেসে গিয়া করগা ঠাকুরালি।
গলাগালি না দিও না বলো মন্দ বুলি ॥

সভাকার ঠাঞি আমী মাগিলাম মেলানি।
ছলো ছলো করে সব চক্ষে পড়ে পানি ॥

ক্ষীরগ্রামে উগ্রচণ্ডার উল্লেখ আছে। (পৃঃ ১২৮)।

মধ্য—

হনুমান চলিলেন মায়ে সম্ভাসিতে ॥
মলয় পর্ব্বতে আইল বির হনুমান।
অঞ্জনার পায়ে বির করিল প্রনাম ॥
মায়েরে দেখিতে আইলা করি বড় সাধ।
কথা না কহিল না কৈল আসির্ব্বাদ ॥
হনুমান বলে মাগো করি নিবেদন।
আসিষ না কৈলে কেন বিমরিষ মোন ॥
অঞ্জনা বলেন তোমায় কী কহিব কথা।
তো ধিক্ তোর রাম ধিক্ ধিক্ দেবি সিতা ॥
ধিক্ রে রাক্ষষপতি লঙ্কার রাবন।
তোদ্দের সমান মুক্ষু নাহি ত্রিভুবন ॥
এ কথা মুনিয়া বলে বির হনুমান।
কহ কহ মুনি মাগো ইহার সন্ধান ॥
অঞ্জনা বলেন মুন পবননন্দন।
ত্রিভুবন মধ্যে বড় পাগল রাবন ॥
দস হাজার নারি আছে জার অন্তষপুরে।
একা সিতার হেতু কেন সবংসেতে মরে ॥
রামেরে কহিলাম ধিক্ জাহার কারন।
শৃষ্টী করিয়াছেন রাম নারায়ন ॥
না জানে জগতে কি সনার মৃগি আছে।
স্ত্রীর বোলে জান তিনি মৃগির পাছে পাছে ॥
লক্ষিরূপা সিতা বটে জানে ত্রিজগতে।
রাম কহি কান্দে কেন পড়িয়া ভুমিতে ॥
জদী বলে ভস্ম হও লঙ্কার রাবন।
কখন কি বের্থ হয় লক্ষির বচন ॥
তোমারে কহিল ধিক জাহার কারন।
সাগর লঙ্ঘিয়া গেলি লঙ্কা ভুবন ॥
এক চড়ে কেন না মারিলা লঙ্কার রাবন।
রামের সিতা রামে আনি দিত সেইক্ষন ॥
তোরে গর্ব্তে ধরিয়া করিলাম কোন কাম।
কত বান খেয়্যাছেন দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
পর্ব্বতের আড়ে ডাড়াও অভাগির ছেলে।
পরাক্রম দেখ মোর দুদ্ধ দি রে গেলে ॥
মহা ক্রোধে অঞ্জনা এড়িল দুদ্ধধার।
মলয় পর্ব্বত ভেদি হইল দুয়ার ॥
অঞ্জনার চরনে করিয়া নমস্কার।
রামের নিকটে আইল পবনকুমার ॥

(পৃঃ ১২৮।২)

শেষ,—

হনুমানে বিদায় করেন রঘুবির।
জেই তুমি সেই আমী একুই শরির ॥
জগত ভরিয়া হনু তোর হইল জস।
চারি জুগে আমী তোমার হইলাম বস ॥
এতেক বলিয়া জদী কমললোচন।
কান্দিতে লাগিলা বির পবননন্দন ॥
হনুমান বলে তুমী দয়ার ঠাকুর।
কেমনে বলিলেন হেন বচন নিষ্ঠুর ॥
একদণ্ড না বাচিব তোমাদরশনে[১]।
নফরে বিদায় প্রভু করে কোন জনে ॥
হনুর করুনা মুনি কান্দেন লক্ষন।
এস এস বাছা হনু দি রে আলিঙ্গন ॥
সজল নয়ানে হনু করে প্রনিপাত।
আসির্ব্বাদ করিলেন পিষ্টে দিয়া হাথ ॥
গা তুলিয়া হনুমান করে করপুটে।
স্বরন করিলে আমী আছিয়ে নিকটে ॥
জেই কালে হনুমান মাগিলা মেলানি।
রাম সিতার ক্রন্দনেতে তিতিল মেদনি ॥

১। এখানে সন্ধি হইয়াছে। তোমা+অদরশনে = তোমাদরশনে।

বিভিসন বলে প্রভু রাম রঘুবর।
চরনে রাখিহ প্রভু স্বরনপঞ্জর॥
নানা রত্ন দিলা সিতা অভরন হার।
দানে সুন্ন কৈল রামের অনেক ভাণ্ডার॥
একে একে ঠাট কটক হইল বিদায়।
বাল্মিক বন্দিয়া গিত কিত্তিবাষ গায়॥ * ॥
পাত্র মিত্র লয়্যা রাম জুক্তি অনুমানি।
পুষ্পক রথে রাম ডাক দিয়া আনি॥
রাম বলেন রথ তুমী কুবেরের বাহন।
কুবেরের স্থানে তুমি করহ গমন॥
বায়ুগতি গেল রথ কুবেরের স্থানে।
কুবের বলেন রথ কর অবধানে॥
রাবন চড়িল তবে তোমার উপর।
দিন কথক আরোহন কৈল রঘুবর॥
পুনরুপী জাও তুমি জেথানে রঘুপতি।
তবে ত পবিত্র হবে পাইবে মুকতি॥
সুনিয়া আইল রথ শ্রীরামের স্থান।
দেবরুপী রথ বটে জানিলেন রাম॥
বিচিত্র চৌওরা ঘর করিল নির্ম্মান।
তাহাতে রাখিলা রাম পুষ্পক রথখান॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে পরিপুন্ন হইল লঙ্কাকাণ্ড॥ * ॥

১১৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/২×৫৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৭৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭২ মঘী (বঙ্গাব্দ ১২১৭)। সম্পূর্ণ। হস্তাক্ষর পূর্ব্বদেশীয়। মঘী সনের উল্লেখ তাহার অন্যতম প্রমাণ।

আরম্ভ,—প্রথম দুইখানি পাতা গলিয়া গিয়াছে। ৩এর পাতা, ২য় পৃষ্ঠা, ৬ পঙ্‌ক্তি,—

সুভ লগ্নে রথে রাম সপদ আরোহিল।
তিন সর্গে লঙ্কা রাযে্য উপরে চলিল॥
বানর রাক্ষষ লৈয়া আরোহিলা রথ।
পুষ্পরথে চড়ি জাএ গগনের পথ॥
বিভিসনে রথখান চালাএ সর্ব্বরে।
বিদুলি ছটকে জেন নর্ক্ষত্র সঞ্চরে॥
বাউগতি চলে রথ দবের নিস্মান।
আকাসেতে দেবগনে ধরিল জোগান॥
গগন পুরিল সব ঠাটের হুঁঙ্কারে।
কোটি কোটি হস্তি ঘোরা বহুল ফুকারে॥
রাসি রাসি গজমুক্তা রাসি রাসি মনি।
দস দিস পুরি নাচে ইন্দ্রের নাচনি॥
সে রথের চারি পাসে দিঘি সরোবর।
হংস চক্রবাক তথা চরে নিরন্তর॥
লঙ্কাবাসি সকল গন্ধর্ব্বে গাহে গিত।
স্থানে স্থানে বিদ্যাধরি সবে করে নৃত্য॥
চিন্নচরা পতকাএ ভরিল গগন।
কোটি কোটি বাদ্যকে বাজাএ ঘন ঘন॥
লঙ্কাপুরি রথখানে করি প্রদর্ক্ষিন[১]।
ভুমিতে লাগিল রথ লঙ্কার উপর।
ভুমি হোন্তে অন্তরির্ক্ষে সথেক প্রহর॥
কনকের রথখান মনিএ ভুসিত।
তাহাতে বসিল রাম সিতার সহিত॥
চামরে বাতাস করে সুমিত্রানন্দন।
জিজ্ঞাসিল সিতাদেবি উল্লাসিত মন॥
কোনখানে রহিছিলা করিআ সিবির।
কোন স্থানে যুর্দ্ধ কৈল কো কোন বির॥

১। ইহার মেলক পঙ্‌ক্তিটী নাই।

রনস্থল ভুমিখান চাহি দেখিবার।
কোন কোন স্থানে হৈল কাহার সংহার॥
কোন স্থানে থাকি তুহ্মি লঙ্কা কৈলা দৃষ্টি।
কোন স্থানে ছেদ কৈলা মুণ্ড কথ গুটি॥
কুম্ভকর্ন্ন বিরেরে কাটিলা কোন স্থানে।
এহার নির্ন্নয় মতে কহিবা সন্ধানে॥
শ্রীরামে বোলেন তোহ্মা কহিমু সমস্থ।
আহ্মি রহিলাম এই যুবেল পর্ব্বত॥
তাহাতে বসিয়া আহ্মি কটক পাঁচিল।
পুর্ব্বদ্বারে যুর্দ্ধ কৈল সেনাপতি নিল॥
চারি দ্বার হোন্তে মুর্ক্ষ দক্ষিন দুয়ার।
তাতে বসি যুদ্ধ কৈল অঙ্গদ কুমার॥
উর্ত্তর দ্বারে যুর্দ্ধ কৈল বানর ইশ্বর।
পশ্চিমে যুঝিল আহ্মি দুই সহোদর॥
এইখানে পরিলেক ছয় গোটা বির।
দেবান্তক নরান্তক আউল ত্রিসির॥
এই দেখ নিকুম্ভিলা নামে জজ্ঞকুণ্ড।
লর্ক্ষনে কাটিল এথা ইন্দ্রজিতের মুণ্ড॥

ইত্যাদি (পৃঃ ৩।২-৪।১)

অধিকাংশ পুথিতেই রামের প্রত্যাগমন সংক্ষিপ্ত এবং লঙ্কাকাণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত। মধ্য,—

নাচাড়ি॥ দির্ঘছন্দ॥

রাম বোলে হনুমান তুহ্মি হও আগুয়ান
অজধ্যা করিবা অন্বাশন।
দেবের নির্ম্মান রথ লংঘিয়া গগন পথ
দেখ গিয়া সর্ব্ব বন্ধুগন॥ ১॥
চলহ দণ্ডক বন দেখ গিয়া মুনিগন
পঞ্চবটি পাইমু অভস্য।
শুর্পনখার নাক কান কাটা গেছে জেই স্থান
তথা গিয়া করিমু রহঁাস্য॥ ২॥
গুহা চণ্ডালের দেষ তাতে কর পরবেষ
সেহ এক বান্ধব আহ্মার।
অকালে সারথি পানা করিলেক সেই জনা
নৌকা দিয়া গঙ্গা কৈল পার॥ ৩॥
রাম দেসে আগমন স্বর্গে চলে দেবগন
জার জেই বাহন সহিত।
সর্গেত দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
চলি জাএ অজধ্যা পুরিত॥ ৪॥
বৃসে চরে উমাপতি মুসিকেত গনপতি
সিংহ বাহনে গিরিসুতা।
ময়ুরেত সড়ানন বহু হরসিত মন
নাগপিষ্টে হরের দুহিতা॥ ৫॥
হংশরথে আরোহন চলিলা চতুরানন
ঐরাবতে চরে সুরপতি।
মহিসেত আরোহন চলে রবিনন্দন
দুত সব করিয়া সঙ্গতি॥ ৬॥
চন্দ্র সুর্য্য রথ সাজে বহুল দুন্দুভি বাজে
গন্ধর্ব্বাদি চলে বির্দ্যাধর।
রাম জয় সবে বোলে গগন ভরিল রোলে
গিত গাহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ ৭॥
দেবতা সাজিল জথ তাহা বা কহিব কথ
করিবারে রাম অভিশেক।
সর্গ মত্য অধপুর আনন্দিত সুরাশুর
সব চলে মনের বিবেক॥ ৮॥
রামে বোলে হনুমান তুহ্মি হও আগুয়ান
গগনে কি সুনি হুরুস্থলি।
আকাশে দুন্দুভি বাজে বহু রঙ্গে দেব সাজে
শৃষ্টি জেন মেঘে আইশে ঘুরি॥ ৯॥
শ্রীরামের বাক্য সুনি হনুমানে বোলে পুনী
তোহ্মার শুনিয়া সুভ বাত।
কোটি কোটি দেবগন ঘুরি চলে গগন
সর্ব্ব দেব জাএ অজধ্যাতে॥১০॥

হাঁসি বোলে রঘুনাথ তুমি জাও অজধ্যাত
জানাইতে ভরতের স্থান।
শুনিয়া রামের বানি বন্দিয়া সারঙ্গপানি
অজধ্যাতে চলে হনুমান॥ ১১॥
উর্ত্তরাকাণ্ডের গীত কির্ত্তিবাস বিরচিত
প্রনমিয়া শ্রীরামের পাএ।
রাম দেসে য়াগমন সঙ্গে চলে দেবগন
সুনি হনু অজধ্যাতে জাএ॥ ১২॥ *॥
(পৃঃ ১২।১-২)

নাচাড়ি॥ ভাটিয়াল রাগ॥

অএ মুনি না মারিয় দণ্ডের বারি।
আজ্ঞা কর ধিরে ধিরে হাঠি॥
অতি মৃদু রাজার কুমারি।
ভয় পাইয়া হইছে কাতরি॥
রুহিদাস কোল লাগি কানে।
দেবি নহি হাটে কোন কালে॥
ধিরে জাউক হাটিতে ন জানে
বারানসি পাইব কথ দিনে॥
ভোগে সোকে হইয়া তপশ্বি।
কথ দিনে পাইব বারানসি॥
আম্মি কাঁপি তোম্মার তরাশে।
রম্ভা জেন কাঁপএ তরাশে॥
আজি মুই এই শে দিবশে।
মোহারণ্য করিমু প্রবেশে॥
তোম্মারে জে সুর্য্য হেন দেখি।
নিকটে ন আইশে সশিমুখি॥
ভয় পাইয়া হইছে আকুলি।
চন্দ্র জেন দিবশে ব্যাকুলি॥
বোলে মুনি তোম্মার চরণে।
ভয় বর পাইয়াছি মনে॥
রুহিদাস কান্দএ কোলেরে।
আজ্ঞা কর জাই ধিরে ধিরে॥

কির্ত্তিবাসের বচন প্রমান।
উর্ত্তরাকণ্ঠে রছে সাবধান॥ *॥
(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১)

নাচাড়ি॥ ভাটিয়াল রাগ॥

অএ রাজা কেনে তুম্মি লোটাও ধরনি।
নগরে বেচিয়া মোরে ধন দেয় ব্রাহ্মনেরে
তুষ্ট কর বিশ্বামিত্র মুনি॥
আছিলু তোম্মার মায়া পাসর শে সব দয়া
মনে কিছু না করিয় দুঃক।
রুহিদাস পুত্রেরে ধরিছিলু উদরে
বিধি মোরে হইল বিমুক॥
মুনিরে দক্ষিণা দিবা শে ধন কথাএ পাইবা
ইষ্ট মিত্র নাহিক সোহাএ।
সুর্য্যবংশের রাজা তুম্মি তোম্মা কি বলিব আম্মি
আম্মি বিনে নাইক উপাএ॥
পুত্র পরে নাই ধন পত্নি ছার অকারণ
সি ছারের কোন প্রয়োজন।
রুহিদাস পুত্র লইয়া পাসর আপনা মায়া
তোম্মাতে করিলু সমর্পণ॥
তোম্মার চরনে গতি জর্ম্মে জর্ম্মে তুম্মি পতি
হেনহি মনের অভিলাশ।
জর্ম্ম হৈল নারি কুলে তোম্মা পাইলু কর্ম্মফলে
তাতে বিধি করিল নৈরাশ॥
এই মোরে দেয় বর তোম্মা পাম জর্ম্মান্তর
এই জর্ম্মে নাই দরশন।
দেবির ক্রন্দন কথা সুনিয়া উপর্জ্জে বেথা
কির্ত্তিবাশে রছিল শোভন॥*॥
(পৃঃ ১০৭।২-১০৮।১)

নাচাড়ি পঠমঞ্জরি রাগেন গিয়তে॥

কথা গেলা প্রাণ পৃয়া এথ দুঃখ মোরে দিয়া
সোকে মোর দগধে পরাণী।

না দেখি তোহ্মার মুক ধরাইতে না পারি বুক
বিধিএ জিয়াএ মোরে কেনী ॥
তুহ্মি সতি পতিব্রতা কি কৈমু তোহ্মার কথা
না দেখিলে দগধে পরানী।
নানা দুঃখ রাত্রি দিনে সেহ কৈল একমনে
তবে তোহ্মা বেচিলু ব্রাহ্মনে ॥
বিকাইলা জেই কালে ব্রাহ্মনে ধরিল চুলে
চাইল জে কাতর হরিনি।
মনে জথ পাইলা দুঃক না দেখি তোহ্মার মুক
বিধি কেনে রাখিছে পরানী ॥
কথাতে বঞ্চিবা রাত্রি পুত্রের জে সঙ্গতি
ধিক জাউক আহ্মার বচন।
বহু ছিল জলচর ধনহিন বহুতর
ভিক্ষা জানি করএ অথন ॥
তুহ্মি ত পাইলা দুঃখ মোর গেল সর্ব্বসুখ
গগনে না শোভে চন্দ্র বিনে।
রাজা চাহে চারিদিৎ কথা গেলা আচুম্বিৎ
কেনে বিধি দুঃখ দেয় মনে ॥
কির্তিবাসে রহে গিৎ রাজা হৈল মুর্চ্ছিৎ
সোকে রাজা কান্দে দুঃখ পাইয়া।
কেনে হেন কৈল বিধি হাত হোনে নিল নিধি
পাথর হোন্তে অধিক মোর হিয়া ॥
পুনি বোলে কির্তিবাশ উর্দ্ধরা কাঠের আস
সোকে দুঃখে কান্দে বেরাইয়া।
অএ ধর্ম্ম মহাসএ কেনে কান্দ অতিসএ
সোক ছার সান্ত কর হিয়া ॥

(পৃঃ ১১১।২-১১২।১)

নাচাড়ি ॥

অএ ঘাটিয়াল আজ্ঞা কর মরা পুরিবার।
কিছু বস্ত্র নাই মোরে তোহ্মারে দিবার ॥
প্রভু মোরে বেচিল ব্রাহ্মনে।
তভো প্রান না জাএ শসানে ॥
পুত্র মরিল সেই সোথে।
বিধি কৈল এহ্মত বিপাকে ॥
মাও বাপের প্রান শেই জনে।
কথ দুঃখ সহেত পরানে ॥
হরি মোকে দিল এথ তাপ।
না জানি কথ করিআছ পাপ ॥
ঘাটিয়ালকে কহিমু দুঃখের কাহিনি।
ধনজনের আহ্মি সে ধনি ॥
ব্রাহ্মনের দাসি কর্ম্ম করি।
অগোচরে কিছু নহি হরি ॥
চাউল সের পাই দুই জনে।
কথা হোন্তে অপর্জ্জি দান ॥
কথা মোর কহিমু তোহ্মাতে।
মোর দুঃখ জানে জগন্নাথে ॥
তিতা বস্ত্রে রহি আহ্মি পানি।
দ্বিতিয় বস্ত্র আর নাই খানী ॥
অর্দ্ধখান ভাঙ্গি দিমু তোহ্মারে।
আজ্ঞা কর মরা পুরিবারে ॥
তোহ্মাতে কহিতে ভয় বাসি।
আহ্মি হরিচন্দ্রের মহিসী ॥
এই পুত্র রাজার কুমার।
বিধি কৈল সকল সংহার ॥
কোন দেসে গেল মোর স্বামি।
পুত্র খাইল এ কাল নাগিনি ॥
পুত্র মোর মারিলেক সাঁপে।
মোর প্রান রহে এথ তাপে ॥
অগ্নি মধ্যে করিমু প্রবেশ।
তোহ্মা স্থানে কহিলু বিশেস ॥
আজ্ঞা কর অগ্নি কার্য্য করি।
কির্তিবাশে রচিল নাচাড়ি ॥

(পৃঃ ১১৫।১-২)

হরিশ্চন্দ্রের করুণ উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত

কারে প্রায় আদিকাণ্ডের পুথিতেই পাওয়া যায়। এখানকার বর্ণনা অপেক্ষাকৃত

শেষ—অক্ষর অস্পষ্ট।

১১৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরামঃ॥ অথ উত্তরাকাণ্ড লিখ্যতে॥
রামং লক্ষ[ণ]ণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।

ছয়কাণ্ড গাইল শ্রীরামায়ন ভিতরে।
উত্তরা কাণ্ড গাইলে শ্রীরাম দেন বরে॥
উত্তরাকাণ্ড পোথা রামায়ন ভিতর।
ইহাকে স্থনিলে জমের নাহি অধিকার॥
উত্তরাকাণ্ড স্থনিলে গৃহস্তের হয় ধন।
আপনে আশীঞা বর দেন লক্ষ্মী নারায়ন॥
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল তবে ছাতা নব দণ্ড।
উত্তরাতে গাইব এবে অমৃতের ভাণ্ড॥
মধু সর্করা জে খাইঞাছে ভাণ্ডে ভাণ্ড।
সাবধান হৈঞা স্থন উত্তরা [জে] কাণ্ড॥
অজোধ্যাতে রাজা হৈল রাম ধনুর্দ্ধর।
দুষ্ট রাক্ষস মারি ঘুচাইলা ডর॥
সর্ব্ব মুনী বোলেন রাম করিলা পরিত্রান।
অজোধ্যাতে জাই রামের করিতে কল্যান॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষীন।
জত জত মুনিগন আছয়ে প্রবীন॥
সকল মুনি আসিঞা হইঞা য়েক ঠাঞী।
রামকে কল্যান দিতে অজোধ্যাতে জাই॥
এত বলি চতুর্দ্দিগে মুনী আগুসরে।
সকল মুনী চলি গেল শ্রীরামের দুয়ারে॥
রাজ ব্যবহারে দ্বারি রাজাকে নোঙায় মাথা।
জোড় হাথে নিবেদিলা মুনিগনের কথা॥

ইহার পর মুনিগণের নামের এক দীর্ঘ তালিকা। তাহার পর অগস্ত্য কর্ত্তৃক লঙ্কার উৎপত্তি-কথন-প্রসঙ্গে হরগৌরীর বিবাহাদি বর্ণিত (পৃঃ ৩। ২—৭। ২)। এইখানে রন্ধন-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শিব কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন এবং শান্তনু কর্ত্তৃক গঙ্গা বর্জ্জন প্রভৃতি কথার উল্লেখ আছে অনন্তর রাক্ষসগণের জন্ম, কুম্ভকর্ণের তপস্যা, কুবেরের লঙ্কা ত্যাগ, মন্দোদরী সহ রাবণের পরিণয় পরে মন্দোদরী তথা অঙ্গদের জন্মবৃত্তান্ত।

অগস্ত্য বোলেন কথা প্রবন্ধে প্রবন্ধ।
পাত্র মিত্র লইঞা স্থনেন রামচন্দ্র॥
অগোস্ত্য বোলেন কথা স্থন নারায়ণ।
শাবধানে শুন মন্দোদরির জনম॥
ইন্দ্রের নৃত্যকি ছিল চিত্ররেখা নাম।
পরম সুন্দরি কন্যা সর্ব্বগুণধাম॥
এক দিন নৃত্য করে ইন্দ্রের সভাতে।
নৃত্য দেখি শর্ব্ব দেব হইলা মোহিতে॥
নাচিতে নাচিতে তার তাল ভঙ্গ হৈল।
দেখি ক্রোধে ইন্দ্র তবে জলিঞা উঠিল॥
ইন্দ্র বোলে তাল ভঙ্গ করিলি নৃর্ত্তকি।
পৃথিবিতে জন্ম গিঞা হইঞা মণ্ডুকি॥
এত স্থনি নৃর্ত্তকি করিল জোড় হাত।
কেমনে পাইব মুক্ত কহ সুরনাথ॥
সাঁপ দিলা শাপান্ত করহ সচিপতি।
কত দিনে ঘুচিবেক আমার দুর্গতি॥
ইন্দ্র বোলে জাহ তুমি বনের ভিতর।
জেই বনে আছেন সৌভদ্র মুনিবর॥

বহু দিন পৃথিবিতে তোর আছে ভোগ।
আমি কি করিব তাহা দৈবের শঞ্জোগ ॥
এতেক সুনিঞা কৈন্যা গমন করিল।
মণ্ডুক রূপেতে আসি বনে প্রবেসিলো ॥
জে বনেতে আছেন শৌভদ্র মুনিবরে।
শেই তপোবনে থাকে বৃক্ষের কুটিরে ॥
হেন মতে থাকে শেই মহামুনি স্থাণ।
মুনির সমিপে বেঙ্গ নাচিঞা বেড়ান ॥
সন্তুষ্ট হইলা মুনি দেখি মণ্ডুকিরে।
মুনি বোলে তুমি নিত্য থাইক মোর ঘরে ॥
দুগ্ধ আবর্ত্তিঞা তপশ্যাতে জাব আমি।
ইহা আবরিঞা বাছা ঘরে থাক তুমি ॥
নৃত্য নৃত্য জান মুনি তপশ্যা করিবারে।
দুগ্ধ জোগাইঞা মেণ্ডুকি শদা থাকে ঘরে ॥
দৈব জোগে এক দিন শর্পে দুগ্ধ খায়।
তাহা দেখি ভেক তবে করে হায় হায় ॥
আমার শাক্ষাতে দুগ্ধ সর্পেতে খাইল।
দুগ্ধ খাইঞা হলাহল ঢালি থুইল ॥
এই দুগ্ধ মুনি জদি আসিঞা খাইব।
বিশের জ্বালাতে মুনি শরীর তেজিব ॥
এত বলি মণ্ডুকি ভাবিঞা মনে মনে।
দুগ্ধমধ্যে প্রবেসিঞা তেজিল জিবনে ॥
তপশ্যা করিঞা জদি মুনি আইল ঘর।
দুগ্ধ আনিবারে মুনি চলিলা শত্বর ॥
দৃষ্ট প্রসারিঞা চাহে দুগ্ধ পানে।
মণ্ডুকি মরিলা মুনি দেখিলা নঞানে ॥
মণ্ডুকি তুলিঞা মুনি হাতে করি নিল।
মুনি হস্তে পরসিতে দির্ব্ব কন্যা হৈল ॥
কন্যার পালন করেন মুনি তপোধনে।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা মুনির আশ্রমে ॥
পঞ্চ বৎসরের কন্যা হইল জখন।
কন্যা দেখি সদত চিন্তেন তপোধন ॥
এক দিন ময় দানব আইলা শেই বনে।
মৃগয়া করিঞা রাজা ফিরেন কাননে ॥
অপুত্রক ছিল ময়দানব ইশ্বর।
স্নেহেতে তাহারে কন্যা দিল মুনিবর ॥
কন্যা লইঞা দানব আইলা আপণ ভুবণে।
পালিবারে দিল কন্যা ভার্য্যা বিগুমাণে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ দানব অধিকারি।
বাছীঞা তাহার নাম থুইল মন্দোদরি ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা দানব কুতুহলি।
শেই বণে তপশ্যা করেন নিত্য বালি ॥
এক দিন সুন তার দৈবের কারণে।
ময়দানবের কন্যা গেলা শেইখানে ॥
দেখিঞা কন্যার রূপ বানর রাজা বালি।
বলে ধরি শৃঙ্গার করিলা মহাবলি ॥
রহিল বালির বির্য্য কন্যার উদরে।
শেই বির্য্যে গর্ভ তার হইল প্রথরে ॥
কন্যা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
অকুমারি কন্যারে হরিলা কি কারণ ॥
তোমার বির্য্যে পুত্র হৈল আমার উদরে।
এমন জনের বিভা না হবে শংসারে ॥
এ বোল সুনিঞা বোলে কপির ইশ্বর।
তোমাকে করিবেন বিভা লঙ্কার ইশ্বর ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জিনিবে বাহুবলে।
তোমাকে করিবে বিভা আনন্দ মঙ্গলে ॥
মন্দোদরি বোলে রাজা কহিয়ে তোমারে।
বাহির হইবে পুত্র কেমন প্রকারে ॥
মহাপুরুশের বির্য্য নষ্ট নহে কদাচন।
জোনি ক্ষেত হৈলে মোর হবে বিড়ম্বন ॥
এত সুনি বালি রাজা মনেতে চিন্তিল।
নখাঘাত দিঞা তার উরু বিদারিল ॥
তাহাতে হইল পুত্র মহা বলবান।
অঙ্গ হইতে হইল অঙ্গদ শেই না

নারায়ণ চিন্তী বালি হস্ত বুলাইল।
জেমন আছিল উরু তেমনি হইল॥
বালি সম্ভাসিঞা মন্দোদরি গেলা ঘর।
পুত্র লইঞা ঘরে গেলা কপির ইশ্বর॥
তাহার নিকটে দিল করিতে পালন।
পুত্র দেখি তারা দেবি হরশীত মন॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডীত কবিত্ত বিচক্ষণ।
উত্তরাতে গাইল অঙ্গদ কপির জনম॥ * ॥

(পৃঃ ১৮।১-২)

সতদল কমল মদ্ধে হাজারির থানা।
অগম দরিয়ার মাঝে ভাসে কোন জনা॥
অজধ্যাতে জায় দুত রামের গোচর।
দিবাতে নক্ষত্র দেখেন রাম গদাধর॥
প্রাচিরে সকুনিগণ ডাকয়ে বিশেষে।
শ্রামসিংহ কান্দে নগরের চারি পাশে॥
বিপরিত ডাক ছাড়ে সকুনি শ্রীকালি।
রাত্রিতে সপন দেখেন বড়ই জঞ্জালি॥
অমঙ্গল দেখি রাম কমললোচন।
নিরন্তর চিন্তেন রাম ভাই লক্ষ্মণ॥
দশ মাস গেল ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
ভাল মন্দ কিছু বার্ত্তা না জানি তাহারে॥
দণ্ডকেতে কার সঙ্গে হৈঞা থাকে দন্দ।
তে কারণে দেখি এথা অরিষ্ট প্রবন্ধ॥
য়েতেক চিন্তীঞা রাম হইলা উন্মনা।
হেন কালে দুত আশী করিছে করুনা॥
দুত দেখিঞা কথা পুছে নৃপমুণি।
কহ দেখি দুত লক্ষ্মণের বিবরণে॥
তোমার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিভুবণে।
পুর্ব্ব দিগ গিঞাছিল অশ্ব কথক দিনে॥
তথা ঘট নামে দৈত্য করিলে পাসণ্ড।
রাখিল লক্ষ্মণ ঘোড়া তারে করি দণ্ড॥
প্রান লৈঞা পলাইল দৈত্য পাপমতী।
তবে উত্তর দিগে ঘোড়া গেল সিত্রগতি॥
সকল কটকে ঘোড়া রাখে রাত্রি দিনে।
নানা ভোগ দেই ঘোড়ায় বেলী অবসানে॥
আগুলিতে নারে ঘোড়া জায় পবন বেগে।
বিষ্ণুপ্রদা নগরে শামাইল উত্তর দিগে॥
বাল্মীকীর তপোবনে করিল প্রবেশে।
ধরিলেক ঘোড়া সিসু বড়ই হরিশে॥
প্রিয় বাক্য বলিল তারে অনেক প্রকারে।
কদাচ না দিল ঘোড়া দুই মহাবিরে॥
সিসু হৈঞা দুই ভাই হয় বলবান।
সংসারেতে বির নাহি তাহার সমান॥
দণ্ডকেতে অস্ত্র বিষ্টী জুদ্ধ ঘোরতর।
দুই সিসু বান এড়ে দিঞা হুহুঙ্কার॥
বান মুখে জলে জেন জলন্ত অগিনী।
তিন প্রহরে বিনাসিলে য়েক অক্ষোহিনী॥
দুই সিসুর বানে পড়ে শর্ব্ব সেনাগণ।
তার পাছে পড়িল তোমার ভাই লক্ষ্মণ॥
এতেক সুনিঞা রাম হইলা মুর্চ্ছিতে।
অচৈতন্ত হৈঞা রাম পড়িলা ভুমিতে॥
শ্রীরামকে কোলে করি তুলিলা সত্রুঘন।
ভরত আদি জত বির জুড়িলা ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণ বলিঞা রাম কান্দেন উচ্চশ্বরে।
ভুমিতে লোটাঞা কান্দেন গড়াগড়ি পাড়ে॥
একা পাঠাইলাম ভাই ঘোড়া রাখিবারে।
আমারে ছাড়িঞা ভাই গেলা কোথাকারে॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি ভাই গুণে গুণনিধি।
হেন ভাই হারাইলাম পাছে লাগিল বিধি॥
অশ্বমেধ জজ্ঞ ভাই কেনে আরম্ভিল।
জজ্ঞের কারণে ভাই তোমা হারাইল॥
শর্ব্বগুণনিধি ভাই সভার পরান।
হেন ভাইয়ের শোকে মোর না রহে পরান॥
বারেক বাহড় ভাই আইষ পুনর্ব্বার।

তোমার শোকে প্রান আর না রহে আমার ॥
নানা বিলাপ করিঞা করিছেন ক্রন্দন।
শ্রীরামের ক্রন্দনেতে কান্দিছে পাত্র মিত্রগণ ॥
চমৎকার লাগিল শব্দে পাইলেন ত্রাশ।
উত্তরাকাণ্ডে রচিল পণ্ডীত কির্ত্তিবাশ ॥ * ॥

পঠমঞ্জরি রাগ ॥ দির্ঘছন্দ ॥

দুত মুখে সুনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যেথা
শোকাকুলে দহিল সরিরে।
ভাই মোর প্রাণ সম কেবল শরির প্রেম
সিন্ধু জুটে বধিলে তাহারে ॥
আমি ত দুর্গতি বড় দৈব পাশণ্ড বড়
তিন ভাই থুইঞা জুদ্ধপতি।
শেই ভাই প্রচুর বল না দিলাম অনেক দল
দিলু তাকে অশ্বের সংহতি ॥
আমা চারি ভাই যেক দেহ মাত্র ভিন্ন যেক
নাহি ভিন্ন জিবন সম্পদ।
ভাই লক্ষ্মণ জবে মৈল সভার জিবন গেল
এই দিনে হইল বিপদ ॥
গৌর সরির তার সখি মুখ অবতার
কমল লোচন নটবেশ।
আমার অরণ্যবাশে না থাকিলে ভাই দেশে
মোর প্রান গেল এ দিবসে ॥ ইত্যাদি

(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১)

শেষ—

জগ্‌গ্যা স্থান পাইঞা সবে সর্গগ্‌ স্থানে বসি।
লক্ষিমুর্ত্তি সিতা দেবি শ্রীরামের স্থানে আসি ॥
ততক্ষণে হইলা রাম লক্ষ্মীনারায়ণ।
চতুর্ভুজ হইলা রাম দেখে দেবগণ ॥
ব্রহ্মা আদি জত দেবগণে করে স্তুতি।
চতুর্দ্দস ভুবণের তুমি অধিপতি ॥
প্রজা লোক লইঞা রাম সর্গপুরে আইলা।
এই হইতে উত্তরাকাণ্ড সাঙ্গ হইলা ॥
জে সুনে জে ভণে শ্রীরামের স্বর্গারোহণ।
পুত্র পৌত্রে বাড়ে সেই পুর্ন ধন জন ॥
অপুত্রের পুত্র হয় দারিদ্রের হয় ধন।
একচিত্য হঞা জে সুনে রামায়ণ ॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ সুনে জেই নরে।
সকল পাপে মুক্ত হইঞা জায় স্বর্গপুরে ॥
শ্রীরামের কথা সুনিলে লক্ষি পুরায় আস।
সপ্তকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তীবাস ॥

ইতি উত্তরকাণ্ড সমাপ্তঃ ॥

লিখিতং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণঃ·········
ইতি সন ১১৯৪ চৌরানব্বই সাল তারিখ ২১ চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর সরকার মাহামুদাবা[দ] মুতালিকে লস্করপুর ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে।

১১৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪১—২৪৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

রন করিতে আইলি কি পাইলি দেশে ॥
আমার বচন রাবন না হইব আন।
আপনার দোশে তুমি হারাবে পরান ॥
তোর ছার সনে আমি না করিব রন।
জত তোর মনে আছে করহ রাবন ॥
এতেক বলিল জবে কুবের মহারাজ।
রাবনের আমাত্য জত পাইলেক লাজ ॥
জেষ্ট গৌরব ছাড়িলে রাবন দৈব পাসণ্ডা।
কুবেরমস্তকে মারে দারুন গদার বাড়ি ॥

দুই ভাই নিরুপেক্ষ্য করে অস্ত্র অবতার।
নানা বান দুই ভাই করিল সংসার ॥
অগ্নিবান এড়ে কুবের অগ্নি অবতার।
বরুন বান রাবন রাজা করিল সংহার ॥
রাক্ষসমায়া ধরিলেক রাজা দসানন।
নানা মুর্ত্তী ধরিয়া রাবন রাজা করে রন ॥
ব্যাঘ্ররুপ ধরিয়া কাহাকেয়ো কামড়ায়ে মারে।
বরাহরুপ ধরিয়া কাহাকেও দন্তেতে বিদারে ॥
মেঘরুপ ধরিয়া কাথে ফাফর করে জাড়ে।
পর্ব্বতরুপ ধরিয়া রাবন জক্ষের উপর পড়ে ॥
অশেস রুপেতে রাবন জক্ষ সংহারে।
থালীজুলি হয়া থাকে তাথে জক্ষ পড়ে মরে ॥
নানারুপে জক্ষকে কৈল লণ্ড ভণ্ড।
জক্ষ্য সব মারিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥
ক্ষেনে ভুমে জুঝে ক্ষেনে আকাশ উপরে চড়ি।
কুবেরর মুণ্ডে মারে দা[রু]ন গদার বাড়ি ॥
পুস্পক রথ হইতে কুবের পড়ে ভুমিতলে।
ফু(কা)টীল রসককা (গা)ছ পড়ে ডালে মুলে ॥
কুবেরে ধরিয়া কান্দে লয় কুবের অনুচর।
কুবেরে এড়িল লয়া নন্দনবন ভিত্তর ॥

মধ্য,—

"দুই ভাএ রনস্থলে হাসিয়া হাসিয়া বুলে
দেখি বড় হইল চিন্তীত ॥"

ইত্যাদি ত্রিপদীটিতে মধুকণ্ঠের ভণিতা পাওয়া যায়। (পৃঃ ২০৪।১)। কিন্তু পরিষৎ-সংস্করণ উত্তরাকাণ্ডে কৃত্তিবাসেরই ভণিতা আছে।

পরবর্ত্তী ত্রিপদী,—

রাগ পাটমঞ্জরি ॥

রাম বলেন দুই ভাই কহিয়ে তোমার ঠাঞী
দুহেত ফিরিয়া জাহ ঘর।
ঘোড়া আর সস্ত দিয়া তপোবনে রহ গীয়া
প্রসংসা করিব মুনিবর ॥
মকরাক্ষস কুম্ভকর্ন জত রাক্ষস অগ্নিবর্ন
সবংশে মারিল লঙ্কেশ্বর।
মারিচ [দুষণ] খর বধিলাম একেশ্বর
আর জত মাইলাম নিসাচর ॥
রিপুমুখে সপ্ত তাল বানেতে করিলাম ক্ষার
ইঙ্গিতে বধিলাম কপিরাজে।
তোমারা সিসু দুই জন কেমনে করিব রন
বাল্মীকের ঠাঞী পাব লাজ ॥
এত শুনি উত্তর কহে দুই সহদর
সনমুখে জুড়িয়া দুটী হাত।
তুমি পৃথিবির পতি ইথে ধন্ত বশুমতি
ধন্য ধন্য তুমি রঘুনাথ ॥
করিয়াছ মনে মন বালকের সনে রন
জিনিলে নাইক পুরস্কার।
এমন বালক নই বিরবংশে জন্ম হই
এখনে পাইবে প্রতিকার ॥
বয়েশে ছাওাল আমি পিতার সমান তুমি
বিসেষে পরম গুরুজন।
তুমি অস্তে বির বট আগে কেন ধর্ম্ম ঘাট
পশ্চাত করিব আমরা রন ॥
মনে না করিহ রাম না করিমু সংগ্রাম
আমরা ফিরিয়া জাব ঘর।
বাল্মীকের প্রসাদে জননির আশীর্ব্বাদে
তোমার তর্জ্জনে নাই ডর ॥
ডাকি বলে দুই জনে পুস্পক রথে রাম শুনে
মুনিগনে লাগীল তরাস।
না আইলে তপবন দুহার না ভাঙ্গে রন
মধু কহে মিছু মিছু ভাশ ॥(পৃঃ ২০৪।১-২)

২১২।২ পৃষ্ঠার ত্রিপদীটিও মধুকণ্ঠের ভণিতাযুক্ত।

শেষ,—

রাম বলেম অজুদ্ধা নগর জত্ত লক্ষনের কুঙরে।
ভাল দেস চিস্ত নহে করিল দণ্ডধরে ॥
জে দেসে কোন রাজার নাইক সাশন।
জে দেসে বঞীল [নহে] ঋষি মুনিগন ॥
হেন সব দেসের রাজ্যা আনহ লক্ষন !
সেই দুই দেসে রাজা কর দুই জন ॥ ইত্যাদি।

•দসরথের বহু দসরথের নাতি।
জাহার গুন সুনিলে হয় সগ্‌র্গের বসতি ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল সভার আনন্দ।
পোথীর কাহিনি কৈল সুনিয়া সানন্দ ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত কৈল নানা ছন্দে পয়ার।
আনন্দিত হইয়া গেল সকল সংসার ॥
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরকাণ্ড।
সুনিতে সুনিতে নাগে বড় রসভাণ্ড ॥
রামায়ন সুনিলে ভাই পাপের বিমোচনে।
একমন হয়্যা জদি রামায়ন সুনে ॥
জে গায়ায় জে গায় জেবা লেথে রাথে ঘরে।
লক্ষী নাই ছাড়েন তারে জন্মা জন্মান্তরে ॥
কিত্তীবাস পণ্ডীত রচিল রামায়ন।
নিথিতে রহিল রামের সগ্‌গ আরোহন ॥
ইতি উত্তরাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্ত ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত বিষয়গত সাদৃশু যথেষ্টই আছে।

১১৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১-১৫১। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি
তৈলক্ষ্যবিজই রাম মহা ধনুর্দ্ধর।
দুজ্জয় রাক্ষস মারি থণ্ডাইলা ডর ॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলা পরিত্তান।
য়জ্ঞধ্যাকে গিয়া রামকে করিছে কল্যান ॥
সংসারের মুনি গেল রামের দুয়ারে।
দ্ব্যারি সত্তরে গেল রামের গোচরে ॥
রাজব্যবহারে দ্বারি রামে নোয়ায় মাথা।
জোড় হাত করি বলে মনিগোনের কথা ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের জত মনি রিষি।
তোমার দ্বারেতে সভে উপনিত য়াসি ॥
সোওসারের মনি ঋসি ডাণ্ডায়া বাহিরে।
আজ্ঞা কর আনি প্রভু তোমার গোচরে ॥

রাম-সীতার বিলাস বর্ণনে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত সুন্দর সাদৃশু আছে। (পৃ° ৭১।২-৭২।২) সীতার বনবাস' দণ্ডধরারণ্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অংশেও বেশ ঐক্য দেখা যায় (পৃ° ৭৩।২-৮০।১, ১০৩।১-১০৫।২)।

শেষ,—

জেন কালে কহেন রাম সভার ভিতর ॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার ॥
তিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাঁঞি।
আর বার পরক্ষা আমী তব স্থানে চাই ॥
পরিক্ষা করহ সিতা তিভুবনের আগে।
দেথে জেন সর্ব্ব লোকে চমৎকার লাগে ॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
তিভুবনে ঘুচুক আমার অপজস ॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥

অগ্নি প্রেবেস করেছিলাম তোমার বর্জ্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন যুনেছ শ্রবনে ॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আস্বাস।
কোন দোসে আর বার দিলে বনবাস ॥
রাজার গৃহিনি হয়্যা বন সঙ্গে বসি।

১১৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭১/২×৫৪/৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২, ৬-১২, ১৭-২৯, ৩৬, ৩৮-৫৩, ৫৫-৫৮, ৬০-৬১, ৬৩-৬৪, ৬৬-৬৮, ৭০-৭৫, ৭৭-৮১, ৮৩-১৩২, ১৩৪-১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। খণ্ডিত। হরপ পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ।

সোনাতন মুনি আইল আইলন ধব।
বৎস্ব মোহামুনি আইল দেখিত অনুভব ॥
লিখন না জাএ মুনি আসিল অনেক।
... ... হতে আসিল বালমিক ॥
এত মুনি একবারে কোন জনে দেখে।
তা সভার সিস্য সব আছে লাখে লাখে ॥
মুনি সবের সুনে রামে অপুর্ব্ব কথন।
দুই কোসের পত যুরি বসিছে মুনিগন ॥
দস সহস্র উপবাস তবে (করে) জেহ জনা
সিষ্টি ক্ষএ করিতে পারে এক এক জনা ॥
হেন মুনি আইল গোসাঞি তোমার জে দ্বারে।
আজ্ঞ্যা কর মুনি সব আনি তোমার স্থানে ॥
দ্বারির বচন সুনি রাম মোহাবল।
সত্যরে আনহ মুনি আমার গোচর ॥
সিগ্র করি আন মুনি দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আজি মর মুনি দরসন ॥
রামের বচন সুনি দ্বারি জে সত্যর।
সকল মুনি আনিলেক রামের গোচর ॥
মুনি সব আসিল জদি শ্রীরাম বির্দ্যমান।
বৈকুণ্ঠ সম্পদ দেখে রাম ভগবান ॥
অজদ্ধা দেখিল জেন বৈকুণ্ঠ নগরি।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্ম সারঙ্গধারি ॥
দুর্ব্বাধল সাম মুর্ত্তি রূপে মনুহর।
ত্রিলক্ষসোন্দর প্রভু নব জলধর ॥
লক্ষি সরেস্বতি রামের দেখে দুই ভিতে।
সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্ম ধরে চাড়ি হাতে ॥
মালার উপরে মুক্তা দেখিতে সোন্দর।
বদন সোন্দর চারু জেন সসোধর ॥

মধ্য,—

লাচাড়ি ॥ পটমুঞ্জরি রাগ ॥

অএ ভরথ ভাই তোমা সম বির নাই
সিতার কথা কহি তোমার ঠাই।
দণ্ডকা কানন পথে সঙ্গে লক্ষন তাথে
সোকাকুলি সিতাকে হারাই ॥
মোহারাজা বালি মারি সুগ্রিব রাজা সঙ্গে করি
তবে পাইলুম পবনকুমার।
গেলাম সমুদ্র কুল সোকে ভোকে ব্যাকুল
য়তি বড় গহন সাগর ॥
বানমুখে অগ্নি জলে সর্ব্ব জল উথলে
মৎস য়াদি কুম্ভির অপার ॥
সমুদ্রের দরসন সাগর কৈল বন্দন
লঙ্কাপুরি করিল প্রবেস ॥
লঙ্কাপুরি কৈল স্থানা রাক্ষসেরে দিল হানা
সংহারিল রাক্ষস সকল ॥
রাবন বিনাস কৈল দেববরি ঘোচাইল
বিবিসন করিল য়াস্বাস।
সিতা কৈলুম উর্দ্ধার সকলের নিস্তার
অগ্নিতে সিতা করিল প্রবেস।

মূর্দ্ধি কৈল হুত্তাসন   সাক্ষি দিল দেবগন
ব্রহ্মা য়াসি কহিল বচন।
আসিয়া জে দসরথে   সমর্পিল মর হাতে
তবে সিতা করিলুম গৃহন॥
কোন পক্ষে নাহি উন   সিতার জতেক গুন
দোস কিছু য়ামি নহি জানি।
মুই হইলুম লোকবস   সিতার হইল যপজস
বহু দুক্ষে য়ানি সিতা রানি॥
হেন সিতা বনবাস   জিবনের নাহি য়াস
দুক্ষ মাত্র রহিলেক সার।
মরিমু সিতার সোকে   উপাএ বোলহ মকে
সোকসিন্ধু না দেখি নীস্তার॥
শ্রীরাম ভরথ কথা   মনে বড় লাগে বেথা
কান্দে রাম ছাড়িয়া নিস্বাস।
সরেস্বতির চরন   সিরে করি বন্দন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥●॥(পৃ• ৭৩।২)

কুকুর-বিপ্র-সংবাদ অংশে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে। (পৃ• ৭১।১—৭৮।১)।

নাচারি॥

য়াইল মুনি ঘরএ   সিতা নাহি নিজালএ
দেখিলেক সর্ব্বএ ভূবন।
পুষ্পরথ বির্দ্দমান   দেখিল য়াপনা স্থান
য়স্ত্র সব করে য়বরন॥
দেখিলুম বেবহার   ব্যাজ না করিব য়ার
সিসু পাঠাইয়া দিল স্থানে।
মোহামুনি মোহ পাইয়া   তপবনে গেল ধাইয়া
য়স্ব এক দেখিল কাননে॥
বাল্মিকে য়াকুল হইল   য়স্তে বেস্তে ধাইয়া গেল
দেখিলেক য়গ্নির নিকট[১]।

কুসলব সঙ্গে সিতা   পুরিবারে চাহে তথা
প্রচণ্ড জালিয়া মোহানল॥
হেন কালে মোহামুনি   ডাকে উশ্চর্সর বানি
কুসলব বলিয়া জানকি।
ধাইয়া গেল হস্তে বেস্তে   ধরিল সিতার হস্তে
নিরব হইল মুনি দেখি॥
বাল্মিকে কহেন কথা   কহ মকে তত্য কথা
এতেক প্রমাদ কি কারন।
বনে য়াইল কোন জন   কিবা হেতু হইল রন
কেবা য়াইল অগ্নির স্বরন॥
সকল কহিল[১] তত্য   দ্বারে দেখি কার রথ
য়স্ত্র বস্ত্র কার য়লঙ্কার।
গৃহে কেনে ভিন্য রিত   কেবা তোমা দিল ভিত
কিবা হেতু চাহ মরিবার॥
স্তুনিয়া মুনির কথা   কান্দিয়া কহিল সিতা
দুই সিসু ভএ কম্পবান।
জোড় হস্তে লব কুসে   দাড়াইল মনির পাসে
কহে সিতা সর্ব্ব বিবরন॥
তোমার গমনকালে   এই দুই ছাওয়ালে
বলিলা রাখিতে তপবন।
মর কর্ম্মের দোসে   প্রভুর জজ্ঞ য়বিলাসে
এথাএ য়স্ব করিল গমন॥
তপবনে ঘোড়া য়াইল   সিসু পাইয়া বান্দিল
ঘোড়ার রক্ষক সক্রগন।
বিচারিয়া পাইল ঘোড়া   দুই সিসুর খুড়া
তপবনে হইল দরসন॥
কুস লবে না জানিল   অজ্ঞাত সংগ্রাম হইল
সেই তাকে করিল নিধন
স্তুনিয়া লক্ষন য়াইল   সিসু তাকে নিপাতিল
ভরথ য়াইল তার পাছে॥

১। নিকড় হইবে।

১। কহিবে হইবে।

ভ্রাতিবধ প্রভু সুনি আসিলেক য়াপনি
রাক্ষস বানর সন্য লৈয়া।
প্রভুরে মারিল রন সুগ্রিব য়ার বিবিসন
সেই রথে আইল চড়িয়া॥
য়খনে জানিল কাজ পিথ্রি বধি পাইল লাজ
দুই সিসু ভাবিল মরন।
মনের সান্তাপ গেল তোমা দরসন পাইল
যথনে পরিমু হুতাসনে॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ১১৪।১-২)

শেষ,—

বার্ত্তা পাইয়া পুর্ব্বের জত প্রজার সন্ততি।
অজর্দ্ধাত হইয়াছে কুস জে নৃপতি॥
এই বার্ত্তা পাইয়া লোক হরিস য়ন্তর।
সত্যরে আনাইল লোক অজর্দ্ধা নগর॥
জার জেই অধিকারে বসিল প্রচুর।
পুরি বেরি লোক য়রন্য হইল দুর॥
নানা বার্দ্দি মোহৎ[সব] অজর্দ্ধা নগরি।
কুমকুম চন্দন পুষ্প সর্ব্ব জনে পরি॥
জার জে অ[া]শ্রমে গেল জত মুনিগন।
ভ্রাতিগন ডাকি রাজা আনিল সত্যর॥
লোকে চিন্তা পাইলে হইব অরাজ।
দেসে দেসে চলি জায় না করিয় ব্যাজ॥
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া ভ্রাতিগন।
সকলে করিল তান চরন বন্দন॥
একে একে নৃপতির জত ভ্রাতিগন।
আলিঙ্গন দিয়া কৈল ললাটে চুম্বন॥
জার জেই নিজ রাজে চলিল সত্যর।
অজর্দ্ধার রাজা হইল কুস ধনুর্দ্ধর॥
এই মতে নিতি বার্দ্দি নারদে দেথিয়া।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্থানে সকল কহিয়া॥
কুসের চরিত্র ধর্ম্ম সুনিল লক্ষন।
হরিস হইল তবে শ্রীমধুসোধন॥
বাল্মিকে রচিল সপ্ত কাণ্ঠ রামায়ন।
সুনিলে নিকটে নাহি দারুন সমন॥
সর্ব্ব পাপ হরে রামনাম স্বরনে।
মৃগ পলাএ জেন ব্রের্ঘ দরসনে॥
সর্ব্ব দেব হতে শ্রেষ্ট বিষ্ণু এক নাম।
তাহা হতে শ্রেষ্ট হএ রাম এক নাম॥
রাম হেন নাম জেবা শ্রবনে সুনএ।
ভবসিন্ধু তরিব সেই জমের নাহি দাএ॥
গঙ্গার জে পশ্চিম ধার ফলিক নামে গ্রাম।
[তাহাতে বস]তি করে কির্ত্তিবাস নাম॥
সেই কির্ত্তি কহে করি রামরসে ধন্দ।
বাল্মিক শ্লোক ভাঙ্গি কৈল পদ [বন্ধ]॥
রচিলেক কির্ত্তিবাস রামায়ন সপ্তকাণ্ঠ।
এত দিনে সমাপ্ত হইল উত্রা কাণ্ঠ॥

ইতি উত্রা কাণ্ঠ [সমাপ্ত]॥ * ॥ ইতি সন ১২০৫ তেরিখ ১০ পোউস...সহক্ষরং শ্রীমানিক্য দাস প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর মোকাম ছান্দিয়া...পুস্তক শ্রীমানিক্য দাস পিসরে শ্রীমুক্তারাম দাস তান পিসরে শ্রীবেনুরাম [দাস] তান পিসরে শ্রীপ্রসাদ দাস তান পিসরে শ্রীভবানি দাস তান পিসরে শ্রীজদু দাস তান পিসরে শ্রীতিঅরাম দাস তান পিসরে শ্রীগঙ্গ দাস। সাত পুরুস: কস্যব গোত্র॥ গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পরিবার॥ কোন গদাধর প্রিয় গদাধর॥

জএ জগনাথ গৌরাঙ্গ সচির নন্দ[ন]।
ত্রিভুবনে করে জার চরন বন্দন॥
রাম অবতারে গোড়া রাবন বদিলা।
নদিয়ার ভকত সব গোপ সিরজিলা॥
রাইর ভাবে গোড়া গৌর অবতার।
হরে কৃষ্ণ মোহামন্ত্র করিয়া প্রচার॥

বাসুদেব ঘোসে কহে জোড় করি হাত।
জেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই জগনাথ॥ * ॥

১১৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—১৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথে রাজ্য দেআ॥
আরন্যাতে জানকি হারাএ মহাসয়।
কিস্কিন্ধাতে বালি বধ কটক সঞ্চয়॥
যুন্দরায় সাগর বান্ধিআ হৈল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উদ্ধার॥
এই ছয় কাণ্ডের কথা উত্তরায় গায়।
উত্তরা যুনিলে য়স্বমেধের ফল পায়॥
রাবন বধিআ অজধ্যায় আইলা রাম।
উত্তরায় প্রথম হয় লক্ষন ভোজন॥
সভা কোরি অজধ্যায় বোসি রোঘুবরে।
রামে ঘেরি বোসে জত ভোল্যুক বানরে॥
রাক্ষস মানুস কোপি বোসে একাসনে।
অপূর্ব্ব রামের কির্ত্তি এ তিন ভুবনে॥
সিংহাসন উপরে বোসিএ রোঘুমুনি।
বামেতে পেএছে সভা জনকনন্দিনি॥
চামর হাতে দাণ্ডাইএ ভরথ সত্রুঘ্ন।
করজোড়ে স্তুতি করে পবননন্দন॥
ছত্র হস্তে নছমন দাণ্ডাএ পশ্চাতে।
রাজকর দেয় প্রজা রামের অগ্রেতে॥
পুর্ব্ব সত্তে পায় হোএ নিদ্রা আর অলস।
আকর্সে লক্ষন বির হোইলা অবস॥
পশ্চাতে দাণ্ডাএ ছিল সুমিত্রাসন্তান।
ছত্র টলে লক্ষন হোইল সাবধান।
পূর্ব্বকথা স্মিতি করে গোউর বরন।
মৃদু মন্দ বদনেতে হাসিলা লক্ষন॥
পোড়িল সভার দৃষ্টি লক্ষনের পানে।
আশ্চর্য্য লাগিএ গেল সভাকার মনে॥
কি হেতু লক্ষন হাসে না পারি বুঝিতে।
সকলে বিচার করে আপনার চিতে॥
মনে মনে চিন্তা করে রাজিবলোচন।
আমারে দেখিএ বুঝি হাসিলা লক্ষন॥
চারি ভাই রাজপুত্র জন্ম অজধ্যাতে।
রাজ্জের রাজা হোলাম আমি সভাই থাকিতে

মধ্য,—

অগস্তেরে জিজ্ঞাসা করেন রোঘুবর।
কহ মুনি কি কোরিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
মুনি কন রাঘব কথাতে দেহ মন।
কৈলাস নিকটে গেল রাজা দসানন॥
মোধু মাসে বসন্ত বাসাত উপনিত।
কুহু কুহু রবেতে কোকিল গায় গিত॥
মোউর মোউরিগন সঙ্গমেতে ডাকে।
গুন গুন গুঞ্জরে ভ্রমরা লাখে লাখে॥
পূর্ন্নমার জোস্তা তাথে অতি মনহর।
সুগন্ধি মলয় বাউ বনের ভিতর॥
না পেএ পৃকিতি রাজা বসে দু[ঃ]খ মনে।
রম্ভা নামা অপচ্ছ্‌রা চোলেছে সর্ন্নজানে॥
কুটিল কুন্তলে দির্ঘ বেনাএছে বেনি।
বেনির গঠন জেন কালিএ নাগিনি॥
কপাটে সিন্দুর জেন ভানু নিন্দা করে।
চন্দনের বিন্দু তাথে ইন্দু জেন ঘেরে॥
মৃগমদ তিলক নাসার অগ্রে রেখা।
ইন্দ্রধোনু ভুরুভঙ্গি শ্রবনেতে ঠেকা॥

নয়ন ভঙ্গিমা জেন খঞ্জন চঞ্চল।
অধরের জুতি জেন পক্ক বিম্বফল ॥
গজমুক্তার বেসর নাসার অগ্রে দোলে।
বিদ্যুত লোটায় কত হাঁসির হিল্ললে।
জিনিএ হস্তিনিকুম্ভ প্রয়ধর ভার।
তথিমাঝে লম্বিত হোএছে মুক্তাহার॥
মৃগপোতি নিন্দা কোরি কোটি ঔতি খিনি।
খুদ্র ঘুন্টিকা তাথে বাজিছে কিঙ্কিনি॥
বিচিত্র কাচলি সোভা করে বোক্ষস্থলে।
কাঞ্চনপব্বত জেন ঝাপে ইন্দ্রজালে॥
রামরম্ভা জিনি উরু ঔতি মনহর।
সুধা সুকিরন জিনি লাবন্য সুন্দর॥
আচ্ছাদন অঙ্গে আছে নিলবর্ন্ন ভুনি।
চন্দ্রেরে ঘেরেছে যেন নব কাদম্বিনি॥
মোহএ মহেসরিপু পেএ অঙ্গগন্ধ।
সটপদ্ম ধাইএ আইসে মকরন্দ॥
তিমির কোরিএ ধংস বোমপথে জায়।
বোসেছিল দসানন দেখিবারে পায়॥

(পৃঃ ৬৫।১-২)

সোত্রূঘ্রন কাছে জথা বোসি মুনিবর।
বাল্মিক ডাকিছে গিএ কোরি উর্চ্চস্বর॥
জজমান জন্মীআছে সিঘ্র এস মুনি।
বোসিষ্ট কোরিল জাত্রা আদ্যপান্ত জানি॥
আনন্দে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন।
কুটির দুআরে গিএ দিল দরসন॥
কেমন সিতার পুত্র দেখিব নয়নে।
বাহির কোরিএ আনে মুনিপোত্নিগনে॥
জেমন রামের মুখ জেমন নয়ন।
জেমত রামের বর্ন্ন জেমত গঠন॥
বাল্মীকি বোসিষ্ট দোহে একত্রে বোসিএ।
স[ং]গস্কার হেতু জুক্তি বেদ উচ্চারিএ॥

আনহ গঙ্গার জল করাইব স্নান।
সুনিএ বাল্মীক মুনি মুদিল নয়ন॥
জোগাসন কোরিএ বসিবামাত্র মুনি।
সর্গেতে হোইতে নাবেন গঙ্গা মন্দাকিনি॥
জায় বি কোহিছে তবে সুন মুনিবর।
আজ্ঞা হৈলে প্রবেসিএ সুতিকার ঘর॥
উপনিত হৈল গিএ গঙ্গা মন্দাকিনি।
আমি আসিআছি মা জনকনন্দিনি॥
হেনকালে কুবেরদুত এল্য সেই স্থানে।
প্রনাম কোরিছে আসি মুনির চরনে॥
আনিআছি সর্ন্ন থাল তুয়া বিদ্যমান।
রামচন্দ্রের পুত্রে ইহায় করাইতে স্নান॥
বোসিষ্ট গোসাই পরে বেদ উর্চ্চারিএ।
কোরিলেন নাড়িছেদ আপনে জাইএ॥
পুত্র কোলে কোরি মাতা জনককুমারি।
কোন্ননায় রোদন করেন বোসিষ্টকে হেরি॥
এ সুক জোদ্যপি আজ হোত অজধ্যায়।
ঘুচিত মনের খেদ সুধাই তোমায়॥
রামের মনেতে কত জন্মীত আনন্দ।
রতন ব্রাহ্মনে কত দিতেন রামচন্দ্র॥
আমা সম হতভাগি আর কেবা আছে।
সুনিএ বোসিষ্ট কয় জানকির কাছে॥
আর কেন চিন্তা কর জনকনন্দিনি।
ভাগ্যবতি তুমি বট আমি ভালে জানি॥
রাজার রানি ছিলে রাজার মা হৈলে জনকঝি।
সন্তান হোইল তোর আর চিন্তা কি॥
সুনিএ জানকির কত হোইল উল্লাস।
উত্তরাকাণ্ডের কথা রচে কিত্তিবাস॥
পরেতে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন।
সত্তূঘ্রন নিকটেতে দিল দরসন॥
বোসিল বোসিষ্ট মুনি সোত্তূঘ্রন কাছে।
অধমুখে বোসি বির মৌন হোএ আছে॥

জিজ্ঞাসা কোরিছে বির বোসিষ্টের স্থানে।
সন্দেহ আমার এক জন্মিআছে মনে ॥
সুর্য্যবংসের পুরহিত এই মাত্র জানি।
আর তুমার জজমান কিরূপ আছে মুনি ॥
সুনিএ বোসিষ্ট মুনি লাগিল হাসিতে।
তপবনে মুনিগনে হয় জজাইতে ॥
সোত্রুঘন কহে মুনি নিবেদিতে ভয়।
এক মত আমার মনেতে উদয় হয় ॥
পঞ্চ মাস গর্ভবোতি জনকনন্দিনি।
হেন কালে বনবাস দিল রোঘুমুনি ॥
এই মত বনবাস সুনেছি শ্রবনে।
জানকিকে রেখে গেছে বিষ্টুপদার বনে ॥
ভাগ্য বুঝি প্রসন্য হোইল মুনিবর।
সোত্য কথা জিজ্ঞাসিএ তোমার গোচর ॥

(পৃঃ ১১৬।১-২)

ত্রিপদি ছন্দ ॥ রাগ পঠমঞ্জরি ॥

হনুমান জত কহে কৌসল্যা মোনেতে রহে
কতক্ষনে কোহিছেন রানি।
দুটি আখি ছল ছল বোক্ষ বেএ পড়ে জল
মুখে কয় অর্দ্ধ অর্দ্ধ বানি ॥
এস হোনু বোস কাছে বোহু খেদ মোন্নে আছে
সকল কোহিব বিস্তারিএ।
মোরে দুখার্ন্নবে ডারি অজর্দ্ধা আন্ধার কোরি
সিতে লোক্ষি গিএছে ছাড়িএ ॥
রাবন সংহার কোরি রাম হৈল দণ্ডধারি
পাটেশ্বরি হৈল জনকঝি।
এ সকল কিত্য দেখি জুড়ায় দুখিনির আখি
সুখ জত সোস্কা কয় কি ॥
পঞ্চমাস গর্ভবোতি হোইলেন সিতে সোতি
বাড়ি গেল দুগুন আনন্দ।
পঞ্চামৃত দিবার তরে আনিলাম দিজবরে
প্রমাদ ঘটাল্য রামচন্দ্র ॥
কে জানে কার সুনি কথা রথে কোরি লএ সিতা
প্রকার কোরিএ দিল বন।
রাম আজ্ঞা ধোরি মাথে চাপিএ পুষ্পক রথে
বনে রাখি আইল লক্ষন ॥
কি কোহিব বাছা আর প্রান মাত্র হৈল সার
সিতে বিনে সব সর্ন্ন দেখি।
কর হানি বোক্ষপরে কৌসল্যা রোদন করে
কোথা রৈলে জিবন জানকি ॥
হনুমান মুর্ছা হএ ভুমে পড়ে গড়াইএ
হায় রানি কি সুনালি মোরে।
হায় মা জনকঝি উপায় কোরিব কি
হনুমান কান্দে উচ্চস্বরে ॥
হোনুমান গোচরে কৌসল্যা প্রবধ করে
কোপে বির ছাড়এ নিস্বাস।
জলধ গজ্জন জিনি নিশ্বাস আত্তর্স্বনি
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥ * ॥

(পৃঃ ১৩০।১-২)

শেষ,—

ব্রর্থ হনুমান নাম অঞ্জনা গভ্রেতে।
রসাতল অজদ্ধা পাঠাব পদাঘাতে ॥
পুনর্ব্বার জানকিকে অজর্দ্ধায় আনিব।
পুত্র বোটি জননির পালন কোরিব ॥
ইহা কোহি হোনুমান কোরিল গমন।
জলধর সম রবে কোরিছে গজ্জন ॥
পদভরে পৃথিবি কোরিছে টল টল।
নয়নে নিগ্রত হয় জলন্ত আনল ॥
নাসার নিস্বাস জেন প্রলয়ের ঝড়।
ঢাকের রগড় জিনি দন্ত কড়মড় ॥
সভা মাঝে জাইএ ডাড়ায় হনুমান।
দেখিএ সকল লোকের উড়িল পরান ॥
হনুমান জিজ্ঞাসে সুনহ নিল দে।
এমন দুর্ব্বদ্ধি তোমায় ঘটাইল কে ॥

পঞ্চমাস গব্রবোতি আছিলেন সিতে।
উপযুক্ত হয় রাম বনবাস দিতে॥
ওধিক আর রামচন্দ তোমায় কব কি।
কোথা হোতে কর্ন্ন পেতে মন্ত্র লএছি॥
মতান্তর বুঝি তবে উঠি রোঘুনাথ।
উঠিএ ধরেন দুটি হোনুমানের হাত॥
জা হোএছে হোনুমান খেমা দায় মনে।
আছেন জনকষুতা বিষ্টুপদার বনে॥
অশ্বমেধ সাজ কোরি আনিব সিতায়।
পুনরূপি হব রানি পুরি অজর্দ্ধায়।
দেবের ঘটন বাছা কে ঘুচাতে পারে।
দুষ্ট বাক্যে বনবাস দিলাম সিতারে॥
না জানে এ সব তত্ত্ব জত কোপিগন।
জনকনন্দিনি সিতায় গিএছেন বন॥
স্থবর্ন্ন জা নকি দেখি ভ্রম ছিল মনে।
[এ] তত্ত্ব জানি রোদন করএ সর্ব্ব জনে॥
হায় মা জানকি বোলে করএ রোদন।
ঝর ঝর ওস্তুজলে ঝুরে দুনয়ন॥
স্তব্দ হোএ সভাতে বোসিল হোনুমান।
সিতার সোকে ঝর ঝর ঝোরে দুনয়ন॥
কিত্তিবাস ইত্যাদি॥*॥
বোসিলেন রামচন্দ্র পূর্ন্ন সভা মাঝ।
পূর্ন্নমার চন্দ্রিমা দেখিএ পায় লাজ॥
সোত্তুঘ্নে আসিবারে লিখিলেন পাতি।
সিঘ্র কোরি জাত্রা করে সুমন্ত সারথি॥
পত্র পেএ বিসেষ জানিএ সমাচার।
ঘৃত মোধু সাজাইল সহস্তেক ভার॥
অপরঞ্চ দির্ব্ব কত দিল পাঠাইএ।
পস্রাতে সাজিল বির সসোন্ন নইএ॥
জয়র্দ্ধনি দিএ চলে জত সোন্নগন।

১১৯। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৬, ৮-১২, ১৮-১১০, ১১২-১৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

লঙ্কাকাণ্ড গাইল রামের ছত্র নবদণ্ড।
গাইব উত্তরাকাণ্ড অমৃতের ভাণ্ড॥
অমৃত নঞা জদী খায় ভাণ্ড ভাণ্ড।
তাহা হইতে পৃত হয় যুনিলে উত্তরাকাণ্ড॥
ত্রৈলোক্যবিজয় রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারিয়া রাম আইল ঘর॥
মুনি সকল বলে আমরা পাইলাম পরিত্রান।
অজুধ্যাতে গিয়া রামকে করিব কল্যান॥
এতেক বলিয়া জায় জত মুনিগন।
চারি দিগের মুনি আইল অজুধ্যাভুবন॥
মাধব নামে দ্বারি ছিল রামের দুয়ারে।
মুনি বলে সংবাদ জানাও রামের গোচরে॥
মাধব নামে দ্বারি রামে নয়াইল মাথা।
তোমা দেখিতে মুনি আইল তায় যুন কথা॥

মধ্য,—

শ্রীরাগেন গিয়তে॥

সিতার সোকেতে রাম ভুমে গড়াগড়ি জান
কোথা গেল সিতা চন্দ্রমুখি।
প্রানের দুর্ল্লভ সিতা নাহি সিতার মাতা পীত।
কিবা দোসে তেজিল জানকি॥
রাজার ঝিয়ারি হয়্যা মোর সঙ্গে বনে গিয়
কতেক বনেতে পাইল দুঃখ।
দারুন রাক্ষস ঔরি তোমারে করিল চুরি
বিপিনেতে নাহি হল্য সুখ॥

সবংসে রাবন মারি তোমার উর্দ্ধার করি
পরিক্ষা লইল লঙ্কায় ।
ভদিবা আইলাম দেসে লোকে অপজস ঘোষে
পামরে পিতিত নাহি জায় ॥
সিতা ত পরম সতি স্বরুপে জানিয়া মতি
লোকে কহে গঞ্জনা কাহিনি ।
ঘোর দণ্ডক বনে থুয়্যা আইলে লক্ষনে
কেমনে রহিবে একাকিনি ॥
প্রানের লক্ষন ভাই সিতা থুয়্যা এলি কোন ঠাঞি
জাব আমী সিতার তল্লাসে ।
কৌতুক ইঙ্গিতে আমী বুঝিতে নারিলে তুমি
নিশ্চয় রাখিলে বনবাসে ॥
সরিরে নাহিক দয়া সিতাকে নাহিক মায়া
কোথা সিতা পরম সুন্দরি ।
চন্দ্রবদনি বিনা কিছু ত না লয় মনে
সোকে প্রান ধরিতে না পারি ॥
সজল লোচন হরি লোহে ঘন বহে বারি
উর্ত্তা[ল] পরিহরি মহি ।
রামানন্দ দাসে কয় তরাইতে ভবভয়
চরনে স্বরন আমী চাহি ॥*॥
লক্ষন কি নিদ্রা রহিব আমী ঘরে ।
না দেখিয়া সিতা সতি প্রান কি জান করে ॥
সিতা সিতা বলিয়া রাম পড়িল ভুমিতলে ।
সিতার সোকেতে কান্দেন প্রান ব্যাকুলে ॥
কোথা গেলা প্রানসিতা দেহ দরসন ।
না দেখিয়াঁ তুয়া মুখ বিদরে জিবন ॥
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন ।
লক্ষন বলেন গোসাঞি কান্দ কি কারন ॥
লক্ষন বলেন প্রভু কিসের বিলাপ ।
প্রজা লয়্যা রাজ্য কর কিসের সন্তাপ ॥
মন স্থির কর গোসাঞি না হও চঞ্চল ।
সোক সম্বর গোসাঞি না হও বিকল ॥

এতেক লক্ষন কহিল রামের পাস ।
উত্তরায় রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥*॥

(পৃ০ ৭৮।১-২)

৯৬।১ পত্রে নরমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ আছে ।

শেষ,—

বাল্মিক বন্দিয়া গান লব কুশে গায় ।
গাইব অজুধ্যাকাণ্ড আদিকাণ্ড সায় ॥
সুখে রাজ্য করে রাজা অজের নন্দন ।
মাতামহের ঘরে গেলা ভরথ শক্রুঘন ॥
রামে রাজ্য দিতে হইল রাজার অভিলাস ।
রাজ্য না পাইলা রাম গেলা বনবাষ ॥
রাম বনে গেলা তবে কান্দে সর্ব্ব জন ।
সোকেতে হইল দসরথ রাজার মরণ ॥
মধুস্বরে গীত গায় বাজাইয়া বিনা ।
সুনিয়া কান্দেন রাম আর সর্ব্ব জনা ॥
গান সুন্যা রামচন্দ্র হইল বিভোলা ।
গায়কে আনিয়া দেহ সনা সহস্র তোলা ॥
ভাণ্ডারি বাটায় কর্য্যা আনি[ল] কাঞ্চন ।
গিত রহাইয়া কন ভাই দুই জন ॥
গুটী চারি ফলেতে আমাদের উদর ভরে ।
তোমার ধন রাখগা রাম তোমার ভাণ্ডারে ॥
রাম বলেন গান কর মুনির নন্দন ।
ভাল পুরান কর্য্যাছেন বাল্মিক তপধন ॥
রাজার সংকার আজ্ঞা করিল ভরথ ।
রামকে আনিতে জান চিত্রকোট পর্ব্বত ॥

১২০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½× ৪½ ইঞ্চি ; পত্রসংখ্যা, ২-৮৭ । এক এক পৃষ্ঠায়

১০-১২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

হাথে দণ্ড কুমণ্ডলু সর্ব্ব গাত্র রূক্ষ।
তেজিলেক ধন জন সংসারের শুখ॥
অনাহারে থাকয় কেহ বরিষা চারি মাষ।
কোন মুনী সর্ব্ব কাল থাকয় উপবাষ॥
দস সহস্র বচ্ছর কেহ করিছে অনাহার।
অস্তবাড় লাগীয়াছে অস্তী চর্ম্ম সার॥
এত সব মুনী আসীছে তোমার দুয়ারে।
আজ্ঞা কর আনী গোসাঞী তোমার গোচরে॥
রাম বলেন ঝাঁট আন দ্বারে কি কারন।
বড় ভাগ্যে আমার মুনীর সম্ভাষন॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি সত্তর।
মুনি সব লইয়া গেলা রামের গোচর॥

মধ্য,—

জমের আশ্বাসে ইন্দ্র ক্রন্দন সঙ্কুলিগ।
তবে ইন্দ্র রাজা গেল চণ্ডীর গোচরে॥
তোমার বিদ্যমানে দেবি দেবতা সংহারে।
রাবন মারিয়া দেবের কর প্রতিকার॥
চৌসট্টি জোগিনি আছে দেবির সংহতি।
জুঝীতে জোগীনি সব বড় সিগ্রগতি॥
জুঝিতে জোগিনি সব নানা কাছে কাছে।
রক্ত মাংস খাইয়া উন্মত্ত হইআ নাচে॥
দেখীতে জোগীনি সব [মহা] ভয়ঙ্করে।
সতে সতে রাক্ষস একেক জোগীনি সংহারে॥
রাবন বলে চণ্ডী তুমী কর অবধানে।
জুদ্ধ সমপীয়া তুমী চল নিজস্থানে॥
আমারে জীনিলে তোমার কীছু নাহি কাজ।
তুমি হারিলে চণ্ডী বড় পাবে লাজ॥
রাবনের কথা সুনিঞা চণ্ডীর হইল হাস।
জুদ্ধ সমপিয়া দেবি গেলেন কৈলাস॥

ইত্যাদি (পৃঃ৩৮।২)

শেষ,—

রথ লইয়া গেলা ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
সর্ব্বসম্পদ পায়ে লোক রামনাম স্মোঁরনে॥
সরজুর জল গভির পর্ব্বত প্রমান।
সকল সুখাইয়া হইল আঠুর সমান॥
স্থাবর জঙ্গম জত জলের উপর ভাসে।
শরির তেজিয়া লোক গেলা স্বর্গবাসে॥
দিব্য রথে জায়ে সভে দেবদেহ ধরি।
রামের প্রসাদে লোক গেলা স্বর্গপুরি॥
মরনকালে রামনাম বলিব জেই জন।
নিজ স্বরিরে স্থান তারে দেন নারায়ন॥
ভক্তি অনুরূপ স্থান অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দ লোক পায়েত নিস্থার॥
সকল পৃথিবির লোক গেল স্বর্গবাস।
এতেক দেখিয়া ব্রহ্মাঞে লাগিল তরাস॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণুরে করেন স্তুতি।
তোমার নাম স্বরনে গোসাঁঞি পাপির মুকতি॥
আগম পুরান বেদ জত সাস্ত্রগ্রন্থ।
আমি হেনো কোটি ব্রহ্মা না পাইল অন্ত॥
সকল পাপ ঘুচে রামনাম স্বরনে।
পাপমৃগ পালায়ে জেন সিংহ দরসনে॥
চারি বেদ সহস্র নামে জত হয়ে ফল।
এমত কোটি গুন হয়ে রামনামে কেবল॥
রাম নামে রাখিবেক সহস্র ধনুকে।
মাএরামোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত লোকের চিন্তি হিত।
লোক মহিবারে কৈলা রামায়ন গিত॥
সাত কাণ্ড পুথি কৈলা অমৃতের ভাণ্ড।
সুনিলে খণ্ডে লোকের জমপিড়া দণ্ড॥
রামনাম স্বরন করিআ মরেত চণ্ডাল।
সোঁস্বরিরে স্বর্গ জায়ে জর্ম্ম নাহি আর॥

অতয়েব সুন লোক হইয়া একচিত্ত।
অন্য মন ইহাতে না করিবে কদাচিত ॥
সুন সুন আরে ভাই হইয়া একমন।
এত দুরে উত্তরাকাণ্ড হইল সমাপন ॥

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত মিল আছে।

১২১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾×৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৫১, ৫৮-৭৩। এক এক পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

লব কুসের জুর্দ্ধ লিক্ষিতে ॥
বসিষ্ট বলেন ঘোড়া রাখি কাহার সকতি।
শ্রীরাম ডাকিয়া আনিলা লক্ষন জোর্দ্ধাপতি ॥
অশ্বমেধ করিলা রামচন্দ্র গদাধর।
জজ্ঞের ঘোড়া পাঠায়্যা দিয়াছিলা পুরন্দর ॥
মন্ত্রিগনে ডাকিয়া প্রভু রাম অধিপতি।
মুনিগন সঙ্গে লয়্যা করিলা জুগতি ॥
রাম বলেন ঘোড়া কেবা রাখিবেক জতনে।
তোমা বিনে ঘোড়া রাখিতে নারিব অন্য জনে ॥
ঘোড়া রাখিতে নিজোজিলা ঠাকুর লক্ষনে।
জজ্ঞশালে রামচন্দ্র করিলা গমনে ॥
লক্ষন বলেন ঘোড়া রাখিব তোমার আদেসে।
বৎসরেক ভ্রমিব আমি ঘোড়ার জে পাসে ॥
নির্ভয় দান মোরে দেহ মহাসয়।
পরম সুখে বেড়াই জেন হইয়া নির্ভয় ॥
নানারূপে রিপুগন বেড়ায় হরিসে।
নির্ভয়ে বেড়াব গোসাঞি কেমন সাহসে ॥
লক্ষনের বচন সুনিঞা হাসেন রঘুনাথে।
জয়পত্র লিখিয়া দিলেন লক্ষনের হাথে ॥
এই পত্র দেহ লয়্যা ঘোড়ার লম্বাটে।
জুর্দ্ধ করিতে জেন কেহো নাঞি আঁটে ॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়্যা ঠাকুর লক্ষন।
করিতে লাগিলা তেহো ঘোড়ার সাজন ॥

মধ্য,—

১৯।১, ২২।২, ২৩।২, ২৪।১, ২৪।২, ৩০।১, ৩১।১, ১৭।২, পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

রাগ পাহিড়্যা।

আরে বাছা আর না জাইহ তপোবনে।
জানিঞা সুনিঞা মুনি কেনে দিলেন মেলানি
ঘরে বসি থাক দুই জনে ॥
পুর্ব্বে বিষ্ণু আরাধিয়া প্রিথিবিতে জর্ম্ম লয়্যা
বাড়িলাঙ জনকের ঘরে।
পিতা বড় নিদারুন করিল দারুন পন
হরধনু ভাঙ্গিবার তরে ॥
প্রভু দেব নারায়ন এক অংসে চারি জন
ভারথে দুর্ল্লভ জার নাম।
অগোচর চারি বেধ সম নহে অশ্বমেধ
জার নাম লইলে ধর্ম্ম মোক্ষ কাম ॥
হেন প্রভু মোর পতি মাতা মোর বসুমতি
বিধি মোরে করিল নৈরাস।
নাঞি কৈলাঙ অপরাধ দারুন লোকের বাদ
প্রভু মোরে দিল বনবাস ॥
তোমা দুঁহা উদরে ধরি আইলাঙ বনপুরি
না দেখিলাঙ প্রভুর চরন।
তোমা দোহার দেখি মুখ পাসরিলাঙ সব দুখ
সকল দুখ করিলাঙ পাসরন ॥
দাস দাসি জুথে জুথে গমন বিচিত্র রথে
প্রভু মোর রাজরাজেশ্বর।

তোমরা তার তনয় নাঞ্জি দিহ পরিচয়
সঁাপিবেন বাল্মিক মুনিবর ॥
দুই পুত্রের ধরি হাথে দিলেন য়াপন মাথে
মোর বোল না করিহ আন।
রামে বলিহ উর্ত্তর না বলিহ দুরাক্ষর
মোর বোলে হবে সাবধান ॥
জবে চাহেন পরিচয় বলিহ রাজার তনয়
সপ্ত মত্র পাঠাইলা বনে।
ছত্র দণ্ড অধিবাস হেন কালে বনবাস
সম্মানে রাখিহ হনুমানে ॥
সুনিঞা মাএর ঠাঞি দোহে দোহা পানে চাই
লব কুসে লাগিল তরাস।
বিস্ময় লাগিল মনে দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে
নেচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥•॥
(পৃঃ ১৮.২-১৯.১)

শেষ,—
শ্রীরামের অনুচর সব ব্রহ্মার বচন সুনে।
সরজুর জলে প্রান ছাড়ে শ্রীরাম স্বঁঙরনে॥
দুগ্ধ পানেতে জেন সিসুর মোন ভাসে।
শ্রীরাম স্বঁঙরনে প্রান ছাড়িয়া রহিলা স্বর্গবাসে॥
ব্রহ্মা সৃষ্টি সৃজিল শ্রীরাম য়বতার।
ব্রহ্মা বলেন কোন মতে হইব প্রচার॥
চিন্তিয়া গুনিঞা বাল্মিক পাঠাইল স্বরেস্বতি।
তাহাঁর প্রসাদে রামায়ন কৈল বাল্মিক মহাঁমতি॥
পাঠক পোঁথা পড়ে কথক বাখানে।
পোঁথা সুনিবার বেলায় ঘুম য়াদিষ্টানে ॥
কির্ত্তিবাস সৃজিল গিত সুনিতে মোধুর।
জাহার গিত সুনিঞা পাপ জায় দুর ॥
তালে সবদে বাজে নপুর ঝন ঝন।
গিত নাচন সভে সুন রামায়ন ॥
ব্রাহ্মন সুনিলে হয় পায় জজ্ঞ পুজা।
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় প্রিথিবির রাজা ॥
নানা সস্য নানা ধনে বৈশ্যের বাড়ে ঘর।
সুদ্র জাতি সুনিলে হয় পুন্য বিস্তর ॥
সংসার মোহিয়া কির্ত্তিবাসের পাঁচালি।
রামায়ন সুনিলে তার বাড়ে ঠাকুরালি ॥
হেন কির্ত্তিবাসে কল্যান করুন দেবগন।
উর্ত্তরকাণ্ড গাইল শ্রীরামের স্বর্গকে গমন ॥
শ্রীরামের চরিত্র জে জন সুনে একমনে।
সর্ব্ব দুর্খ খণ্ডে তার শ্রীরামের কোল্যানে ॥
চিনি লবাত সংকারা পিয় ভাণ্ড ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উর্ত্তরকাণ্ড ॥

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত স্থানে স্থানে মিল আছে।

১২২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৩৯, ৪২-৪৪। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—
দেবসভা রাজসভা আর মুনিগন।
বসিষ্টেরে করিলা রাম জজ্ঞের বরন ॥
হোতা হৈল বসিষ্ঠ ব্রহ্মা পর্দ্দমুনি।
আপোনে সদষ্য হৈল দেব সুলপানি ॥
সিব পরে পরিলেক সদস্যের ভার।
আপোনে ব্যাষমুনি হইল তন্ত্রধার॥
অগ্নি জালিয়া দিল ব্রহ্মা কুণ্ডের মাঝার।
ভারে ভারে জজ্ঞকাষ্ট বিভিদ প্রকার ॥
ভারে ঘ্রত ঢালে জেন ঢালে জল।
কুণ্ডমধ্যে বসিলেক আপনে আনল ॥
বেদমন্ত্র পরিয়া মুনি দিয়াছে য়াহুতি।
আহুতি লইয়াছে অগ্নী সপ্ত জিভর্ত্তা পাতি ॥

এই মতে করিলেক যজ্ঞের আরম্ভ।
লক্ষনেরে কহে রাম কর এক কর্ম্ম ॥
সভা করি বসি আছে জত মুনিগন।
বস্ত্র অলঙ্কারে কর মুনিরে বরন ॥
একচির্ত্ত হইয়া ভাই সোন আমার কথা।
সোবর্ন্নের তৈজষ দেও সোবর্ন্নে ... .. ॥
মন্দ জেন না বোলে জতেক ব্রর্হ্মনে।
এক ভার সোনা দিবা প্রতি জনে জনে ॥
আর জত আসিয়াছে দারিদ্র ব্রর্হ্মন।
তাহার ঘরে দিবা ভাই নানাবিধি ধন ॥
আজ্ঞাএ করীলা কার্য্য ঠাকুর লক্ষন।
আগে বিদাএ করিল দারিদ্র ব্রর্হ্মন ॥
ধনের অবধি নাহী রামের সংসারে।
আপনে কুবির জাহার ভাণ্ডারে ॥
ধন করি আদী বিপ্র করিলা বিদায়।
মুনির বরন লইয়া আসীল সভায় ॥
সোনার থাল সোনার গারু সোনার অলঙ্কার।
এক গোটা সোনার পৈতা সোনা এক ভার ॥
এক জোরা পট্টবস্ত্র জরিত কাঞ্চন।
সাইট হাজার ভাগ কৈল ঠাকুর লক্ষন ॥
বরনের জত দিব্য হনুমানের হাতে।
গমন করিলা বির লক্ষনের সাতে ॥
হনুমানের সঙ্গে লক্ষন সভামধ্যে গেল।
একেবারে মুনিগনের চরন বন্দিল ॥
বরনদির্ব্ব লৈয়া পাছে পবননন্দন।
মুনি স্থানে গলবাষ ঠাকুর লক্ষন ॥
কোন মুনি উর্দ্ধবাহু কেহ উর্দ্ধরেতা।
কেহ তেজপুঞ্জ কার মুখে নাহী কথা ॥
কার জটা বিগলিত কার জটাভার।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সুমীত্রাকুমার ॥
ভাবিতে লাগিল লক্ষন আপোনার অন্তরে।
এক হতে আর কম নহে মুনিগন।
কারে থুয়া কারে দিব বরন আসন ॥
কর্ম্ম কার্য্যকালে বিধি এত আপদ ঘটে।
লক্ষনে বলেন রাম মোরে ঠেকাইলা সঙ্কটে ॥
দণ্ডে দণ্ডে অভাগীয়ার হএ এত তাপ।
এতেক বলিয়া লক্ষন করএ বিলাপ ॥

বিলাপ দির্ঘচ্ছন্দ।

ভাবিতে ভাবিতে লক্ষন স্থির নাহী পায়।
এমত সঙ্কটকালে রাম রহীলা কথাএ ॥
নিকটে আইস চরন দেখি প্রভু গদাধর।
সঙ্কটে ঠেকিছি তোমার নিজের নফর ॥
আমার কপালের লেখা কি কব তোমারে।
এমন কাজেতে রাম পাঠাও আমারে ॥
বুঝিবারে না পারি তোমার মনের আষ।
আমা হতে হবে বুঝি সুর্য্যবংস নাষ ॥
বাচিয়া নাহীক কার্য্য এখনে না মরি।
আমি বুঝি কর্ম্মীয়াছীলাম বংসনাষকারি ॥
এক মুনি থুইয়া জদি আর মুনি বরি।
জারে না বরি সে সাপীবত করি ॥
কোন মুনি কম নহে দারুন তপস্বী।
কোপমনে সাপ দিয়া করিব ভষ্যরাসি ॥
আমারে জে সাপ দিব তার নাহী ভয়।
এই ভয় মনে পাছে বংসনাষ হয় ॥
দৈবজোগে এমন কার্য্য হইয়া উঠে জদি।
সংসারে ঘুসিবে লোকে আমার অক্ষ্যাতি ॥
এই কথা লোক সবে করিব প্রকাষ।
লক্ষন হতে হইলেক সুর্য্যবংস নাষ ॥
এতেক বলিয়া লক্ষন কান্দিয়া বিকল।
বুক বাহীয়া পরে ধারা নয়ানের জল ॥
না বরিয়া মুনিগন জদি জাই ঘরে।
এখনে হাসিব মোরে জত মুনিগনে ॥
হাসিয়া কহীবেক কথা জত জত হুসি।
বুঝিলাম বুদ্ধীর্ন্ন্য লক্ষন তপস্বী ॥

এতেক বলিয়া লক্ষন সিরে হানে হাত।
এহাতে উপাএ নাহী বিনে রঘুনাথ॥
মরিব মরিব আমী অবষ্য মরিব।
এমন কালে রাম বিনে আর কারে ডাকিব॥
আইষ আইষ রঘুনাথ এই নিবেদন করি।
নিকটে আইষ রামচন্দ্র · দেখিয়া মরি॥
এমন কালে রঘুনাথ রহীলা কথায়।
এমন সঙ্কটে আমার কি হবে উপায়॥
পুর্ব্বে জদি জানিতাম রাম এমত সঙ্কট।
অভাগীয়া না আসিতাম ইহার নিকট॥
জে কার্য্য হইয়াছে এথন উপাএ করি কি।
আসিয়া নফর রক্ষ্যা কর রঘু জি॥
আপোনে আসিয়া রাম কায্য দেও সিমা।
নহে কিস্তু জাবে রামনামের মহীমা॥
একত্র বরিতে পারি মুনি সাইট হাজার।
তবে সে হইতে পারে উপাএ য়েহার॥
ভাবিয়া আকুল লক্ষন স্থির নহে চিত্য।
একা আমী সাইট য়ংষ হইয় কেমত॥
সঙ্কটে করহ রক্ষ্যা বন্দু নারায়ন।
এতেক বলিয়া কান্দে ঠাকুর লক্ষন॥
আইজ জদি হইতে পারি য়ংস ষাইট হাজার।
তবে সে জানিব রাম মহীমা তোমার॥
রঘুনাথের পাদপদ্য মনে করি সার।
এক লক্ষন হইল অংষ সাইট হাজার॥

(পৃ° ৩৭২-৫৭১)

শেষ,—

রামে বলে মুনি গোশাই কহ তত্তকথা।
কোনথানে আছে বল মোর প্রানের সিতা॥
মুনি বোলে নিবেদন শোন রঘুমুনি।
আমার আশ্রমে য়াছে জনকনন্দীনি॥
অনেক দীন হইল সিতা আছে বনবাষে।
রথ পাঠাইয়া সিতা লৈয়া আইষ দেশে॥
রাম বলে শোন কথা লক্ষন ধানুকি।
সিগ্র করি আন গীয়া প্রানের জানকী॥
আজ্ঞা পাইয়া স্তবনে গেলেন লক্ষন।
সিতাকে লইয়া আইস অজোর্দ্ধা ভোবন॥
এতেক য়ুনিয়া লক্ষন গমন করিল।
শিতাকে লইয়া লক্ষন দেশেতে আশীল॥
জয় জয় সব্দ হইল ভরিয়া সংসার।
বনিতা সকলে মিলি দেয়ন্তী জোকার॥
আগীয়া বরিয়া সিতা নিলেক গ্রহেতে।
জজ্ঞ পুর্ন্ন দিলা রাম সপত্নী সহীতে॥
রাম শীতা মিলন হইল দুই জনা।
আনন্দে করেন রাম জজ্ঞের দক্ষীনা॥
জজ্ঞ শাইঙ্গ হইল জদী অজোর্দ্ধা নগরি।
রঘুনাথ আনন্দে [সভে] বলে হরি হরি॥
বালমীক পুরানের কথা কিত্তীবাষে কয়।
অজোর্দ্ধাতে পীতা পুত্রের হইল পরিচয়॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জর্ম্ম শুভক্ষন।
এই অবধি হইল অন্তা সমার্পন॥
সভার চরনে মোর এই নিবেদন করি।
রঘুনাথ আনন্দে সভে বলে হরি হরি॥

ইতি বালমীকী পুরানে উত্তরাকাণ্টে পীতা পুত্রের পরিচয় সমাপ্ত।...এই পুস্তক সন ১২৩৯ সনে ৫ আশ্বীন বৃহস্পতি বার বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল জিলে শুধারাম থানে বেঘমগঞ্জের উত্তরে জোহুরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার পর সন ১২৫৫ সন মাহে মাঘ মোকাম মধুপুরা জিলে ভুলুয়া সমাপ্ত হইল।

১২৩। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ ×

৫১/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৫-৩৩, ৩৫-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

····· রাবনের আগুসার ॥

দক্ষিন কৈলাসে আছে মহাদেবের পুরি।
মহাদেব সম্ভাসি[তে] জায় তরাতরি ॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থানে সোনার সরবন।
রথ সঙ্গে তথি গিয়া ঠেকিল রাবন ॥
বনেতে ঠেকিয়া রথ আগু নাহি সরে।
পাত্র মিত্র লয়্যা রাবন য়নুমান করে ॥
মারিচ রাক্ষস আসি রাবনের কানে কয়।
কুবেরের রথে এক রাক্ষাস নাহি রয় ॥
রথ এড়িয়া রথ চালায় রথ নাহি নড়ে।
মহাদেবের ঠাই রথ ধাইয়া গেল ডরে ॥
না জানিস রাবন তুঞি কৈলাশ সিখর।
গৌরি লয়া কেলি হেথা করেন সঙ্কর ॥
দেব দানব কেহ হেথা নাহি য়াইসে ডরে।
হেথা কেন রাবন আইলি মরিবার তরে ॥
কুপিল রাবন রাজা দুতের বচনে।
রথ হইতে উলিয়া জায় মোহাদেবের স্থানে ॥
নন্দি নামেতে দ্বারি রাবন তথা দেখে।
হাথে জাঠা করিয়া সেই দ্বারখান রাখে ॥[১]
বানরমুখ দেখি মোরে কর উপহাস।
এই বানরমুখে তোর করিবে সর্ব্বনাস।
জে(হে)ন ছারে মারিয়া মোর কোন প্রিওজন।
আপনার দেঁসে তুঞি মরিবি রাবন ॥

শেষ,—

তবে ইন্দ্র রাবনে দুই জনে হই রন ॥
ঐরাবতে আইল ইন্দ্র বজ্র লইয়া হাথে।
রাবন সাজিয়া য়াইল দির্ব্ব রথে ॥
ইন্দ্র হাথে বজ্র করি করএ গর্জ্জন।
যুনিয়া বর্জ্জের শব্দ চিন্তিত রাবন ॥
মহাসব্দে গর্জ্জে বজ্র বিক্রম বিসাল।
সব্দ যুনিয়া সর্গ মর্ত্ত কাপিছে পাতাল ॥
ধাইয়া আইল কুম্ভকর্ন্ন আউদর চুলি।
ইন্দ্রের সমুখে গিয়া রহে মহাবলি ॥
কুম্ভকর্ন্ন [বলে] ইন্দ্র আজি জিবে কোথা।
করিব য়মরাবতির নির্ম্মুল দেবতা ॥
বজ্র বিনে ইন্দ্র তোমার আর নাহি ভাঁড়া।
এড় দেখি বজ্র চিবাইয়া করিব গুড়া ॥
ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ন্ন না কর অহঙ্কার।
বজ্র য়স্ত্রে আজি তোরে করিব সংহার ॥
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বর্জ্জ অস্ত্র এড়ে।
দুই হাথে সাঁপটীয়া গিলিলেক য়াড়ে ॥
বর্জ্জ গিলি কুম্ভকর্ন্ন ছাড়ে সিংহনাদ।
দেখিয়া দেবতা সব গনিল প্রমাদ ॥

১২৪। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গলা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪১/৪ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

অথ শ্রীশ্রীরামায়ন উর্ত্তরাকাণ্ড লিখ্যতে ॥
শ্রীশ্রীহনুমানের বন্দনা আরম্ভ ॥

বন্দিব অঞ্জনাযুন অসিম জাহার গুন
অতিসয় মহাবল হনু।
ফল ভ্রমে সিসুকালে দিবাকর ধরিলে বলে
জেন রাহু গ্রাষে অর্দ্ধতনু ॥
জয় জয় মহাবির পরাক্রম রন ধির
জয় জয় বির মহাবল

১। ইহার পর খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।

দোলযাত্রার উৎপত্তি *

অনেকে মনে করেন, দোলযাত্রা ও বসন্তোৎসব একই। ফাল্গুন-পূর্ণিমা দোলযাত্রার দিন। ফাল্গুন, বসন্ত ঋতুর মাস; পূর্ণিমা চিরদিন হর্ষদায়ক। শীতের অবসানে মধুময় বসন্তের সমাগমে মনের স্ফূর্ত্তি স্বাভাবিক। গীত ও রঞ্জিত চূর্ণ ও জল-নিক্ষেপ, তাহারই আনুষঙ্গিক ফল। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে দোলযাত্রা, হোলি নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে হোলি একটা মহা উৎসব।

কিন্তু হোলির এই উৎপত্তি-কল্পনায় অনেক বাধা আছে। (১) বসন্ত ঋতুরাজ বটে, কিন্তু সঙ্গে মদন না থাকিলে বসন্তের রাজ্য চলিত না। দোলের একমাস পরে চৈত্রমাসে মদনোৎসব ও কন্দর্প-পূজা। দোলযাত্রা বসন্তোৎসব হইলে পরে পরে দুইটা মদনোৎসব হইবার কারণ পাওয়া যায় না। (২) উত্তরভারতে যেখানে হোলির ঘটা, সেখানে ফাল্গুন মাস শীত কাল। শীতকালে বসন্তোৎসব হওয়া সম্ভব নয়। (৩) যদি দোলযাত্রার উৎপত্তি প্রাচীন মনে করি, তাহা হইলে আরও বাধা। কারণ, প্রাচীন কালে ফাল্গুন মাস শীত ঋতু ছিল। জ্যোতিষীরা যাহাকে অয়ন-চলন বলেন, সেই অয়ন-চলন হেতু ফাল্গুন মাসে এখন বরং শীতের ন্যূনতা হইয়াছে। (৪) দোলযাত্রা একটা নয়, দুইটা। ফাল্গুন মাসের দোলের একমাস পরে চৈত্রমাসে আবার দোল আছে। ইহাকে চৈত্র-দোল বলে, ফুল-দোলও বলে। এই দোলেরও পৌরাণিক প্রমাণ আছে। দোলযাত্রা যদি বসন্তোৎসব হইত, তাহা হইলে পরে পরে একই উৎসব দুইবার হওয়ার কারণ কি? (৫) আরও এক দোল আছে। এই দোল হিন্দোল নামে খ্যাত। চলিত বাঙ্গালায়, ঝুলন। দোল ও হিন্দোল শব্দের অর্থ এক, একই দুল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গালা ঝুল ধাতু, সংস্কৃত দুল্ ধাতুর অপভ্রংশ। সুতরাং দোল, হিন্দোল, ঝুলন একই, অর্থ দোলন। দোলযাত্রায় মনে করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ দোল খেলা করেন। ফাল্গুন-পূর্ণিমার রাত্রে এই খেলা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু ঝুলন হয় শ্রাবণ-পূর্ণিমায়। শ্রাবণের ধারায় কার দোলখেলার ইচ্ছা হইবে? (৬) দোলযাত্রার পূর্ব্বরাত্রে বহ্ন্যুৎসব। লোকে বাঁশ ও খড় দিয়া কখনও ছোট ঘরের আকার, কখনও ধ্বজার আকার, কখনও মেষের আকার করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়, বালক ও গ্রাম্যজনের আনন্দের অবধি থাকে না। ইহাকে 'মেড়া পোড়ান' বলে। সংস্কৃতে বলে চর্চ্চরী, বাঙ্গালায় বলে চাঁচর বা চাঁচড়ী খেলা। বসন্ত-সমাগমে পূর্ণিমার রাত্রে দোলখেলার আনন্দ বুঝিতে পারি, কিন্তু অগ্নি-উৎসব কেন? কেনই বা ইহাকে 'মেড়া পোড়ান' বলে? মহারাষ্ট্র দেশে ও পশ্চিম-ভারতে দোল-পূর্ণিমাকে হুতাশনী বলে। হুতাশনী বলিলে ফাল্গুন-পূর্ণিমা বুঝায়। প্রকৃত অর্থ, হুত—যজ্ঞার্থে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত বলি, অশন—ভোজন, যে তিথিতে অগ্নিকাণ্ড করা হয়, কিংবা যে তিথিতে হুত পশু

* ১৩৩২, ২৮শে আষাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ভোজন করা হয়। এই নামের শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা দেশের 'মেড়া পোড়ান' আর হুতাশনীর হুত একই। দোলখেলার সহিত হুতাশনের সম্বন্ধ কি? (৭) দোলযাত্রা লইয়া অনেক পৌরাণিক আখ্যান আছে। সে সবের সহিত বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত দোলযাত্রার সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, আখ্যানে বসন্তোৎসবের নামগন্ধ নাই।

আমাদের পাঁজির ইতিহাস স্মরণ করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কালে নববর্ষারম্ভে যে উৎসব হইত, বহ্ন্যুৎসব-সহ দোলযাত্রা তাহার স্মৃতি। এত প্রাচীন কালের উৎসব যে, লোকে তাহার উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে, নানা পৌরাণিক আখ্যানে সম্ভব অসম্ভব মিশাইয়া নানা আকারে স্মৃতিমাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্য এই, আখ্যানের মধ্যে মূল সত্য এখনও লুপ্ত হয় নাই। এ বিষয়ে পরে বলা যাইবে।

প্রাচীন কাল বলিতে অল্প কাল নয়, দুই এক হাজার বৎসরের গণনা নয়। পরে দেখা যাইবে, এই নববর্ষের আরম্ভ খুঁজিতে চারি পাঁচ হাজার বৎসর অতীতে প্রবেশ করিতে হইবে। এত বৎসর যাহার ব্যবধান, তাহা কদাপি একটী থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ আমরা আরও দুই কালের দুই নববর্ষে উৎসব করিতেছি। আমরা বঙ্গদেশে সৌর মাস গণনা করি এবং সৌর বৈশাখের ১লাকে নববর্ষারম্ভ দিন বলি। এই দিন মহাজন ও বণিক্ নূতন খাতা খুলেন এবং আনন্দোৎসবও করেন। আজি যদি ১লা বৈশাখ ত্যাগ করিয়া ৭ই চৈত্র নববর্ষ আরম্ভ করি, তাহা হইলে ৭ই চৈত্র উৎসব হইবে, পরবর্ত্তী এখনকার ১লা বৈশাখ এবং তখনকার ২৩শে চৈত্র পুনশ্চ উৎসব হইবে। কারণ, স্মৃতি লুপ্ত হইবে না, হেতু না জানিলেও স্মৃতিবশে কৃত্য মনে হইবে। আমাদের পাঁজিতে অনেক পর্ব্ব লেখা আছে, সকলের হেতু লেখা নাই, জানা নাই। অমুক তিথিতে ইহা বিহিত, করিতে হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলির মূল যে জ্যোতিষিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন যুগাদি, কল্পাদি, মন্বন্তর, সংক্রান্তি ইত্যাদি। জ্যোতিষী পাঁজি গণিতেন, তাঁহার স্মরণীয় বিশেষ বিশেষ যোগ স্মরণ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত কিছু-না-কিছু কৃত্য, কর্ত্তব্য বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা যেখানে সেখানে দেবালয় নির্ম্মাণ করেন নাই, যেখানে সেখানে তীর্থস্থানও হয় নাই। যেমন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস না করিলে তপস্যার ক্লেশ সহিতে পারা যায় না, পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে মানবের চঞ্চল চিত্তে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই হেতু অসংখ্য দেবালয় ও তীর্থ, অসংখ্য কৃত্য করিয়া সে কালের ধর্ম্মব্যবস্থাপক, লোককে পুণ্যের পথে চলিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন, পুরাণকারেরা সে কালের লোকের জানাশোনা কথায় কবিত্ব মিশাইয়া ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন।

বহু পূর্ব্বকালের কথা। তখনকার পাঁজি আর এখনকার পাঁজি এক নয়। পাঁজির কোন কোন বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, অনেক বিষয় অবিকল আছে। সূর্য্যোদয় হইলে দিবস বটে, কিন্তু দিবসের প্রভেদ করিবার কোনও নৈসর্গিক উপায় নাই। সূর্য্য দশ দিন পূর্ব্বে যেমন উঠিয়া যেমন অস্ত গিয়াছিলেন, কালিও তেমনি উঠিয়া তেমনই অস্ত গিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্র এরূপ নহেন। কোনও রাত্রে পূর্ণ, কোনও রাত্রে অদৃশ্য, অন্যান্য রাত্রে তাঁহার

ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয়। এই হেতু চন্দ্র হইলেন দিন গণনার ঘড়ীর কাঁটা। অমুক ঘটনা কবে হইয়াছিল? যে রাত্রে চন্দ্র পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর কত রাত্রি গিয়াছে? আজ দশমী রাত্রি, ইত্যাদি। এইরূপে চন্দ্রের যে দিন পাওয়া গেল, তাহার নাম তিথি। অদ্যাপি সমস্ত ভারতবর্ষে তিথির দ্বারা দিন গণা হইতেছে। বঙ্গদেশে ও অন্য দুই এক স্থানে দিন গণনার আর এক বিধি আছে। কিন্তু সেটার প্রয়োজন বৈষয়িক কর্ম্মে; স্মার্ত্ত কর্ম্মে তিথিই গণ্য। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা ত্রিশ তিথি। পঞ্চদশী তিথিতে অমাবস্যা। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা এক মাস। কিন্তু দিবসের ন্যায় এখানেও এক মাস হইতে অপর মাসের প্রভেদ করিবার উপায় নাই। সেই পূর্ণচন্দ্র, সেই অমাবস্যা, সেই ক্ষয়বৃদ্ধি। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের উদয়কালে কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল? এক বা অনেক তারা লইয়া নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল। এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। পূর্ণচন্দ্রের সহিত যে নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল, সেই নক্ষত্রের নাম করিলেই মাস বুঝিতে পারা গেল। চিত্রাযুক্ত পূর্ণমাস,—চৈত্র, ফাল্গুনীযুক্ত পূর্ণমাস,—ফাল্গুন, ইত্যাদি। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস নাম, চান্দ্র।

নক্ষত্র পরিচয় হইয়া গেলে সূর্য্যাস্তের সময় কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, কিংবা কোন্ নক্ষত্রের অস্ত হইল, তাহা দেখিতে এবং সূর্য্যের নক্ষত্র জানিতে কষ্ট রহিল না। সূর্য্য এক নক্ষত্র হইতে গিয়া সেই নক্ষত্রে পুনর্ব্বার আসেন বটে, কিন্তু সেই সময়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। সূর্য্যও প্রত্যহ ঠিক এক স্থান হইতে উঠেন না, এক স্থানে লুক্কায়িত হন না। উত্তর হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে উত্তর, এইরূপ গমনাগমন করিয়া থাকেন। এই গমন সূর্য্যের অয়ন; এক অয়ন শেষ করিতে ১৮০ দিন লাগে। দুই অয়নে বৎসর, বৎসরে ৩৬০ দিন।

ত্রিশ তিথিতে মাস। যদি বার মাসে বৎসর হইত, কোনও চিন্তা থাকিত না। প্রকৃত পক্ষে বার মাসে ৩৫৪ দিন, বৎসর পূর্ণ হইতে আরও ছয় তিথি লাগে। কাজেই বৎসরে বৎসরে তিথি অধিক হইতে লাগিল। পঞ্চম বৎসরে একমাস অধিক হইল, দ্বাদশ মাস না হইয়া ত্রয়োদশ মাস হইল। এই ত্রয়োদশ মাস পরিত্যক্ত হইল, আবার সেই পূর্ব্বের নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্য একদা চলিতে লাগিলেন। সুতরাং অমুক মাসে প্রবল শীত, অমুক মাসে বর্ষা, ইত্যাদি বলিতে বিঘ্ন রহিল না। এই চমৎকার কৌশলের গুণে চান্দ্র মাস সৌর মাসের তুল্য হইল। সূর্য্যপথ প্রায় অচল বার ভাগে বিভক্ত হইল।

কিন্তু কখন্ নূতন বৎসর ধরা হইবে? চারিটি বই সময় নাই। দুই অয়ন সমাপ্তি-কালে, দুই বিষুবে আসিলে। বিষুবদিনে দিবারাত্রি সমান হয়। অয়ন-নিবৃত্তি-দিনে রাত্রি দীর্ঘতম কিংবা হ্রস্বতম হয়। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে এরূপ হয়? সে সে নক্ষত্রের দ্বারা বৎসর চারি সমান ভাগে বিভক্ত হইল। বৎসর আরম্ভ করিতে চারিটীর যে কোন একটি ধরিলেই চলে। চলে বটে, কিন্তু মানুষের মন একটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখানে আদ্য-কালের কথা হইতেছে, সে কালে আর্য্যগণ ভারতের উত্তরে অতিশয় শীতের দেশে বাস

করিতেন। তাঁহারা সূর্য্যের উত্তরায়ণারম্ভ দিন বৎসরের প্রথম দিন ধরিলেন। কয়েক মাস প্রবল শীত ভোগের পর সূর্য্যের আতপ মনোরম বোধ হয়। তা ছাড়া দক্ষিণায়নারম্ভকালে বর্ষা, বর্ষাকালে লোকে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে।

এইরূপ পাঁজি লইয়া কত কাল চলিয়াছিল, কে জানে। পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা, মাস গণনাও চলিয়াছিল। কত কাল পরে কিংবা কবে ইহার পরিবর্ত্তন হইল, তাহাও জানা নাই। পূর্ণিমা ছাড়িয়া অমাবস্যা হইতে মাস আরম্ভ হইল। ফলে যে পূর্ণিমা মাসের আরম্ভ ছিল, সেটা মাসের মাঝে চলিয়া গেল। এ দিকে কিন্তু মাসের নাম পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনই রহিল। পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত, এই দুই মাসের কৃষ্ণ পক্ষ সমান, কিন্তু শুক্ল পক্ষের তিথি এক রহিল না, উভয়ের মধ্যে পনর তিথির ব্যবধান ঘটিল। এখানে এই বিসম্বাদে না গিয়া পূর্ণিমাকে মাসের, সুতরাং অয়নের, বিষুবের ও বৎসরের আরম্ভ ধরা যাইবে। অন্য গণনায় পূর্ব্বের অমাবস্যা ধরিতে হইবে।

এক নৈসর্গিক ব্যাপার হেতু পূর্ব্বকালের অয়ন-নক্ষত্র, সুতরাং বিষুব-নক্ষত্র চিরদিন এক রহিল না। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, অয়নদ্বয়, সুতরাং বিষুবদ্বয় মন্দগতিতে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, প্রায় ৭২ বৎসরে এক অংশ সরিয়া যাইতেছে। মাসে ৩০ ত্রিশ অংশ, প্রায় ২৩০০ বৎসরে একমাস পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত দিই। এখন শারদ বিষুব আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে ঘটিতেছে, এককালে ইহা কার্ত্তিক মাসে, এমন কি, অগ্রহায়ণ মাসে পড়িত, এবং প্রায় ২৬,০০০ বৎসর পূর্ব্বে আশ্বিন মাসে ছিল। এইরূপ অন্য বিষুব এবং দুই অয়ন। কারণ, দুই বিষুব ও দুই অয়ন পরস্পর ছয় মাস দূরে দূরে, এবং দুই বিষুব দুই অয়নের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তবেই এই চারি বিন্দুর অন্তর তিন মাস করিয়া। অতএব—

১। আশ্বিন-পূর্ণিমায় শারদ বিষুব হইলে চৈত্র-পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব হইবে ; পৌষ-পূর্ণিমায় শীতায়ন, এবং আষাঢ়-পূর্ণিমায় গ্রীষ্মায়ন হইবে।

২। কার্ত্তিকে শারদ, বৈশাখে বাসন্ত বিষুব, মাঘে শীত, শ্রাবণে গ্রীষ্ম-অয়ন।

৩। অগ্রহায়ণে শারদ, জ্যৈষ্ঠে বাসন্ত বিষুব, ফাল্গুনে শীত, ভাদ্রে গ্রীষ্ম অয়ন।

এখন মূল প্রস্তাব অনুসরণ করি। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, দোলযাত্রা এক পূর্ব্বকালের নববর্ষ-উৎসব। যদি তাই হয়, সে কালে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় নববর্ষ আরম্ভ হইত। কিন্তু এই মাসে নববর্ষ আরম্ভের কোন লিখিত প্রমাণ আছে কি? লোকমান্য টিলক তাঁহার 'ওরায়ন' নামক ইংরেজী গ্রন্থে বেদের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, এক সময়ে ফাল্গুন মাসে বর্ষ শেষ ও নববর্ষ আরম্ভ হইত। এই ঘটনা সম্ভব ছিল কি না, দেখি। কারণ, অসম্ভব হইলে বুঝিব, বেদ বুঝিতে ভুল হইয়াছে। উল্লিখিত চারিটি স্থানের কোন্ স্থান ফাল্গুনে পড়িতে পারিত? বাসন্ত বিষুব পড়িতে পারিত না ; কারণ, উহা এখন চৈত্রে, সম্মুখে। এই কারণে গ্রীষ্মায়নও পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। শারদ বিষুব এখন আশ্বিনে। ফাল্গুনে শারদ বিষুব প্রায় ১২,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল। বেদের উক্তি এত প্রাচীন না হইতে পারে। অতএব শীতায়ন

অবশিষ্ট থাকিল, এবং অন্য প্রমাণেও আমরা জানি, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে বৎসর আরম্ভ হইত।

কিন্তু ফাল্গুনে শীতায়ন হইলে, শারদ বিষুব নিশ্চয় অগ্রহায়ণে ছিল। অতএব দেখিতেছি, সে কালের ঋতু হইতে এ কালের ঋতু প্রায় দুই মাস পশ্চাতে পড়িয়াছে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, দোলযাত্রার তিথি। খ্রীষ্টের প্রায় ৩,০০০ বৎসর পূর্ব্বে, পাঁজির কলিযুগের আদ্যে, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় উত্তরায়ন আরম্ভ হইত।

এখন শ্রাবণ মাসে হিন্দোল বা ঝুলনের উৎপত্তি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে ভাদ্র মাসে হইত ; ফাল্গুন হইতে সপ্তম মাস ভাদ্র। হয় ত পাঁজির পরিবর্ত্তন হেতু বৈশাখাদি ছয় (সৌর) মাসের দিন-পরিমাণ ত্রিশের অধিক হওয়াতে শ্রাবণে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ফাল্গুনে সূর্য্যের যেরূপ গতি ঘটিত, ভাদ্রে বা শ্রাবণে অন্য অয়নস্থানেও অবিকল তাহাই ঘটিত। বৎসর ধরিয়া সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিলে দোলকের গতির সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষতঃ যদি প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সূর্য্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সূর্য্যকে একটি জ্যোতিষ্মান্ দোলক বোধ হইবে, কেবল নীচে না দুলিয়া ঊর্দ্ধে দুলিতেছেন, এবং এক দোলন অল্পকালে না হইয়া ছয় মাসে সম্পন্ন হয়। রূপকে বলিতে পারা যায়, সূর্য্য দোলায় বসিয়া দোল খাইতেছেন। যখন দোলক এক দিক্ হইতে অন্য দিকে যাইতে আরম্ভ করে, তখনই দোলন-গতি বুঝিতে পারা যায়, অন্য সময়ে মনে হয়, বুঝি একই দিকে বৃত্তপথে চলিতেছে। আমরা বলি, দোল-যাত্রা। যাত্রা অর্থে গতি, গমন ; এবং দোলযাত্রা আর কিছু নয়, দোলন-গতি। উত্তর দেশ হইতে দেখিলে এই দোলন আরও স্পষ্ট বোধ হয়। প্রবল শীতের দিনে এক জ্যোতির্ম্ময় বিম্ব দক্ষিণে নিম্ন আকাশে দেখা যায়। দিনের পর দিন অল্পে অল্পে উপরে উঠিতে থাকেন, তাহাঁর তেজও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ সময়ে সব শুভ। উত্তর দিকে আসিতে আসিতে, তখনও মাথার উপর হইতে বহু দূরে, অকস্মাৎ স্থির হইয়া গেলেন, যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। দক্ষিণ সীমায় গিয়াও এই অবস্থা, যেন দোলারূঢ় হন।

কিন্তু প্রতি বৎসর এই লীলা ঘটিতে থাকে, প্রতি বৎসরই তিনি দোলারূঢ় হন। সে কালে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় এমন কি অভিনব ব্যাপার হইত যে, তাহা স্মরণীয় হইয়া গেল ? ইহার উত্তর পুরাণকারেরা দিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফাল্গুন-পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন নিবৃত্তি হইলে অগ্রহায়ণ মাসে শারদ বিষুব হইত। বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ, এই নাম চলিত আছে। ইহার অর্থ, হায়ন—বৎসর, বৎসরের অগ্র কি না প্রথম মাস। এ সময়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় হইত। এই কারণ এই মাসের প্রকৃত নাম মার্গশীর্ষ, এবং এই নামই সর্ব্বত্র খ্যাত। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সকল গণনার আদি বলিতে বলিতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ বলিয়াছেন।

আপত্তি উঠিবে, ফাল্গুন-পূর্ণিমায় যদি নববর্ষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে মার্গশীর্ষ-পূর্ণিমায় আবার নববর্ষ আরম্ভ কেমন করিয়া হইতে পারে ? কিন্তু আমরা জানি, একই লোকে একই

কালে ভিন্ন ভিন্ন মাস হইতে বৎসর গণিয়া থাকে। বঙ্গদেশে আমরা সৌর বৈশাখ ১লা নববর্ষ দিন বলি, কিন্তু জ্যোতিষীরা পূর্ব্ববর্ত্তী চান্দ্র চৈত্র শুক্ল পক্ষ হইতে গণেন। গ্রাম্যজন কখনও পৌষ (শীত) হইতে, কখনও বর্ষা হইতে (ইহা হইতে বর্ষ অর্থে বৎসর), কখনও দুর্গাপূজা (শরৎ) হইতে বৎসর গণিয়া থাকে। প্রয়োজন কিংবা বিশেষ ঘটনা দেখিয়া একই বৎসরের নানা আরম্ভ ধরা হইয়া থাকে। বৎসরের পরিমাণ অবশ্য সমান থাকে।

মৃগশিরা নক্ষত্রের আকার দেখিয়া বেদে ও পুরাণে বহু আখ্যান রচিত হইয়াছে। গ্রীক পুরাণে এই নক্ষত্র 'ওরায়ন' ব্যাধ নামে খ্যাত। এইখানে বেদের বৃত্রাসুর বলবান্ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, দক্ষযজ্ঞ ভয়ঙ্কর রুদ্র কর্ত্তৃক নষ্ট হয় এবং দক্ষ প্রজাপতির ছাগমুণ্ড হয়। এইখানে বাতাপির সহোদর ইল্বল নামক অসুর মেষের আকারে অশঙ্কচিত্ত ব্রাহ্মণগণের ভোজ্য হইয়া উদর বিদীর্ণ করিত, এবং শেষে মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক ভুক্ত ও জীর্ণ হয়। এই সকল ও অন্যান্য উপাখ্যানের অর্থ, "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" পুস্তকে দেওয়া গিয়াছে। তারা-সমষ্টি নক্ষত্রের আকার নানাবিধ কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু যে তারাসমষ্টি লইয়া মৃগশিরা, সেটাকে পশু বা অসুর কল্পনা সহজে আসে। ইহার বাঙ্গালা নাম কালপুরুষ। এই নামেও প্রাচীন ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। ইনি বৎসর গণনা করিতেছেন, বৎসরের নাম প্রজাপতি ছিল।

প্রাচীন কালের কল্পনা ও গল্প পুরাণকার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, হোলাকা বা হোলিকা নামে এক রাক্ষসী ছিল। সে, পূতনার ন্যায়, শিশুদিগকে বধ করিয়া ভক্ষণ করিত। এই হেতু রাক্ষসীকে দগ্ধ করিয়া মারা হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বহ্ন্যুৎসবকে বলে, 'বুড়ী পোড়ানা'। সে বুড়ী এই হোলাকা। এই রাক্ষসীর নাম হইতে দোলযাত্রার নাম হোলি হইয়াছে। এই নাম পুরাতন কোষে নাই। বোধ হয়, এই নাম দেশজ। মহারাষ্ট্রে ঢুণ্ঢা নাম,—অর্থ ভয়ঙ্কর। বোধ হয়, সংস্কৃত ইল্বকা বা হিল্বকা নামের অপভ্রংশে হোলাকা, এবং তাহা হইতে হোলিকা, হোলি। ইল্বকা, কালপুরুষ নক্ষত্রের কটিতে অবস্থিত তিনটি তারা। লোকে যে রাক্ষসীকে ভয় করিত ও দুর্বাক্য বলিত, তাহার হেতুও আছে। সূর্য্যাস্তকালে পূর্ব্বগগনে হোলাকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিত। হয় ত শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগ, এবং এই রোগে শিশু আক্রান্ত হইলে রক্ষা পাইত না। অগ্রহায়ণ মাস সে সময়কার শরৎ-কাল 'বেদের ঋষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন তিনি শত শরৎ দেখিয়া যাইতে পারেন। যেন একটা শরৎ কাটিলে অন্ততঃ এক বৎসর আয়ু থাকিবে। পরে কার্ত্তিক মাস শরৎ হইল, এবং লোকে এই মাসকে 'যম-দ্রংষ্ট্রা' বলিতে লাগিল। শৈশব কালে শ্রীকৃষ্ণও পূতনার হাতে পড়িয়াছিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তারা পূতনাকে বালরোগের মধ্যে ধরিয়াছেন। হয় ত আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার মধ্যে প্রাচীন কালের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তিনি মাতৃরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। অথচ সিংহারূঢ়া ; আরণ্য মহিষের আকারের এক কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর অসুর বিনাশ করিতেছেন। এ কি, মা ? তাঁহার দশ হস্তে দশ প্রহরণ বুঝিতে পারি, সন্তানের

কল্যাণ কামনায় দশ দিকের শত্রু বধ করিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধাভিনয় কেন? বোধ হয়, সেই পূর্ব্বকালের স্মৃতি।

হোলাকা যে কে, তাহা আর এক পুরাণ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। হোলাকা সম্বতের ভগিনী। সম্বৎ,—বৎসর; হোলাকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসর যায়, নূতন আসে। পুরাতনের মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া নূতনকে স্বরাজ্যে স্থাপন করা হয়। এক রাজা থাকিতে অপর রাজা হইতে পারে না। দোলের পূর্ব্বরাত্রের বহ্ন্যুৎসবের অর্থ এই। কার্ত্তিকে দীপালী অমাবস্যাতেও এইরূপ। কিন্তু দীপান্বিতা অমাবস্যা কেবল একটী নয়। আশ্বিন বা মহালয়া অমাবস্যাও দীপান্বিতা। পুরাতন যায়, নূতন আসে। তাহাতেই হর্ষপ্রকাশ। কিন্তু দুঃখ এই, দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বরাত্রিতে চাঁদের আলো থাকে, চাঁদনী রাত্রি অগ্নিক্রীড়া করিবার যোগ্য নয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে অগ্রহায়ণ মাসে অগ্নিক্রীড়া হইত। কালে দোল ও চর্চ্চরী একত্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উপলক্ষে এখনও অগ্নিক্রীড়া করা হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও তাহাকে 'মেড়া পোড়ানা' বলে।

মাস পূর্ণিমান্ত ধরিয়া উপরের ব্যাখ্যা পাইলাম। যখন মাস অমান্ত হইল, তখন ফাল্গুন-পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী অমাবস্যায় বৎসর শেষ হইতে লাগিল। এই অমাবস্যার নাম মহাশিবরাত্রি। বঙ্গদেশে শিবরাত্রি বলিলে এই কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বুঝায়। কিন্তু শিবরাত্রি একটি নয়, বার মাসে বারটি। শিবরাত্রি বা শুভরাত্রির পর নূতন মাস আরম্ভ। বঙ্গদেশে সৌর মাস-সংক্রান্তি যেমন, চান্দ্র মাস গণনায় শিবরাত্রিও তেমন। কিন্তু দোলের পূর্ব্ব কৃষ্ণচতুর্দ্দশী মহাশিবরাত্রি, সে দিন মাসের শেষ, বৎসরেরও শেষ। এইরূপ কাত্তিক মাসের দীপালী অমাবস্যায় এক কালের বৎসর শেষ হইত। অমান্ত মাস ধরিলে এইরূপ হয়। পূর্ণিমান্ত ধরিলে কাত্তিক-পূর্ণিমায়, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। রাসযাত্রা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মতান্তর আছে। এক মতে রাসপূর্ণিমার নাম ত্রিপুরী পূর্ণিমা। এই দিন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় তারকাসুর বধ করেন। তারকাসুর—অর্থাৎ অসুরাকৃতি তারকাসমষ্টি। দেবসেনাপতির নাম কার্ত্তিকেয় হইবার কারণ এই যে, তাঁহাকে ছয় ভগিনী কৃত্তিকা স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয় তারা। যখন শারদ বিষুব মার্গশীর্ষ-পূর্ণিমা হইতে কাত্তিক-পূর্ণিমায় হটিয়া আসিয়াছিল, সে সময়ে তারকাসুর বধ হইয়াছিল। তখন শীতায়ন ফাল্গুন-পূর্ণিমায় না হইয়া মাঘী পূর্ণিমায় হইত। সে খ্রীষ্টের ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। এই কারণেই মাঘ মাস পুণ্যমাস, এমন পুণ্য যে, মহাভারতে কুরুকুলপতি ভীষ্ম সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়াও এই মাসের অপেক্ষায় থাকিয়া ৫৮ দিন পরে দেহত্যাগ করেন। আর এক মতে তারকাসুর নয়, মহিষাসুর বধ হইয়াছিল। দুর্গাদেবী সে অসুরকে বধ করেন। তিনি সিংহবাহিনী; কারণ, ফল্গুনী নক্ষত্র সিংহরাশিতে। এই হেতু মাদ্রাজ অঞ্চলে দোলযাত্রার নাম "সিংগা" অর্থাৎ সিংহমাসের উৎসব। বিহারে ইহার নাম "ফাগুয়া"; কারণ, ফাল্গুন মাসে এই উৎসব। আরও আশ্চর্য্য এই, কোজাগরী পূর্ণিমাতেও এক অসুর, নাম নিকুম্ভ, বালুকার্ণব হইতে সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে

আসে। এই কারণে লোকে সে রাত্রি জাগিয়া কাটায়। মানব-মনের এ কি চমৎকার রহস্য, কোন্ পুরাকালের স্মৃতি নানা আকারে অদ্যাপি জাগ্রৎ আছে। যে কারণে অসুর কল্পিত ও হত হইয়াছিল, সে কারণ আর নাই, কিন্তু স্মৃতি আছে। দোলযাত্রায় সেই অসুর মেড্রাসুর বা মেণ্টাসুর নামে খ্যাত। অর্থাৎ মেঢ্র বা মেষের আকারের অসুর। অসুরেরা মায়াবী ছিল, ইচ্ছা মতন আকার ধরিতে পারিত। পদ্মপুরাণ বলেন, অগ্নি মন্থন করিয়া তাহাতে 'পশু' নিক্ষেপ করিবে। পশু, যজ্ঞীয় পশু,—যেমন ছাগ, মেষাদি—যাহার মাংস ভোজন করিতে পারা যায়। আশ্চর্য্যের কথা, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে পিঠালির মেষ নির্ম্মিত ও অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা হয়। উত্তরবঙ্গে চাঁচর-রাত্রে খড় বাঁশ দিয়া একটা ছোট ঘর করা হয় এবং তাহার ভিতরে সত্য সত্য একটা মেষ রাখা হয়। পরে মেষ বাহির করিয়া লইয়া ঘরে অগ্নিযোগ এবং পরে মেষ বধ করিয়া তাহার মাংস দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে মেষ পোড়াইয়া খাওয়া হইত। মহর্ষি অগস্ত্য বাতাপীর ভাই মেষরূপধারী ইল্বলকে দগ্ধ করিয়া খাইয়াছিলেন কি না, পুরাণকার লেখেন নাই। কিন্তু দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী অগস্ত্য তারা যে মৃগশিরা নক্ষত্রে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দক্ষিণবঙ্গে কোথাও কোথাও দোলযাত্রায় মেলা বসে। সে মেলায় শর্করার 'মঠ' প্রচুর বিক্রয় হয়। বোধ হয়, এটা সেই মেষের গৃহ এবং গৃহপালিত মেষ উদরসাৎ করা হয়। বস্তুতঃ ইহা বৈদিক যজ্ঞের অগ্নিবেদি। পূর্ব্বকালে ইট দিয়া নির্ম্মিত হইত। পুরাণ-মতে অরুণোদয়কালে দোলের পূজা, এবং বিগ্রহকে দোলমঞ্চে দক্ষিণমুখ করিয়া স্থাপন করিতে হইবে। কেন অরুণোদয়কালে, তাহা বুঝিতেছি। কারণ, সূর্য্যের উদয় হইলেই নূতন বৎসর। দেববিগ্রহ প্রায়ই দক্ষিণ মুখে রাখা হয় না; কিন্তু এখানে তখনও সূর্য্য দক্ষিণ মুখেই থাকেন।

শ্রাবণ-পূর্ণিমায় ঝুলন, আর এক দোল। এই পূর্ণিমা রাখী পূর্ণিমা। এই দিন হরির নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ হয়, এবং তাহার অনুকরণে লোকে আগামী বর্ষে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে হাতে রক্ষাসূত্র পরে। কেহ কেহ বলেন, রাখীপূর্ণিমা ভাদ্র মাসে। তাহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই, ফাল্গুনের সপ্তম মাস ভাদ্র। সে যাহা হউক, উপবীত আর কিছু নহে, অখণ্ড অদিতি বা সূর্য্যপথ। ইহা সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং সূর্য্য যখন পুরাতন পথ সমাপ্ত করিয়া নূতন পথ ধরেন, তাঁহার নূতন উপবীত হয়।

চৈত্র মাসে তৃতীয় দোল। তিথি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই দোলে বহ্ন্যুৎসব নাই, ঝুলনেও নাই। কারণ, শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে মায়াবী অসুর দূরে থাকে, পূর্ব্বআকাশে দৃষ্টিগোচর হয় না। চৈত্র-দোল নিশ্চয় আধুনিক। দোলযাত্রার প্রকৃত অর্থ বিস্মরণের ফল। চৈত্র মাসের প্রাচীন নাম মধুমাস। এই মাসে বৈদিককালে বসন্তোৎসব হইত। রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকে যে মদনোৎসব পড়ি, তাহা এই চৈত্র মাসে হইত। দোলযাত্রাকে বসন্তোৎসব মনে করিয়া পরে বসন্তোৎসবকে দোলযাত্রা মনে করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে যে সময় দেওয়া হইয়াছে, সেই সেই সময় হইতে যে দোলযাত্রা বা রাসযাত্রা প্রচলিত হইয়াছে, এমন নয়। বৈদিক পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের ঋষিগণ অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়, দুই অয়ন ও দুই বিষুব দিনে যজ্ঞ করিতেন। কয়েক বৎসর অন্তরেও যজ্ঞ করিতেন। কয়েক দিবসব্যাপী যজ্ঞও ছিল। সূর্য্যের গতির অনুকরণে সম্পন্ন হইত। যজ্ঞের নানা অভিপ্রায় ছিল। এক অভিপ্রায়, কালগণনা, মাস ঋতু বৎসর গণনা। তখন লেখা পাঁজি ছিল না, অথচ একটা–না–একটা পাঁজি না থাকিলে কৃষিকর্ম্ম ও অন্য বৈষয়িক কর্ম্ম চলে না। যজ্ঞের পূর্ব্বদিন অগ্নিচয়ন করা হইত, এবং যজ্ঞদিনে পশুবলি দেওয়া হইত। কদাচিৎ পুরোডাশ নামক পিষ্টকের বলিও দেওয়া হইত। পরে যখন ক্রিয়াকাণ্ডের স্থানে জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য হইল, পশুযজ্ঞও হ্রাস পাইল। কিন্তু পূর্ব্বকালের স্মৃতি লুপ্ত হইল না, যজ্ঞের রূপান্তর হইল, এবং নূতন উৎসব আরম্ভ হইল। দুর্গাপূজা যে যজ্ঞ, আর যজ্ঞার্থে যে পশুসৃষ্টি, তাহা এই পূজার মন্ত্রেই আছে। কিন্তু যজ্ঞ কেবল ঘৃত দ্বারা হোম নয়, পশু বলিদানের পর সকলে মিলিয়া আনন্দে পশুমাংস ভোজন করিত। যজ্ঞ মাত্রেই সামাজিক উৎসব, সমাজ-বন্ধনের হেতু। এই কারণে দুর্গাপূজা একার উৎসব নয়, শাক্ত বাঙ্গালী মাত্রের সামাজিক উৎসব। বঙ্গের বাহিরে দুর্গাপূজা নাই। কোথাও সরস্বতী পূজা, কোথাও মাত্র নবরাত্রি, ফলমূলাদি দ্বারা পূজা সম্পন্ন হয়। কিন্তু সরস্বতী পূজা হইলেও বলিদান আছে, যদিও সে বলি পশু নয়। দোলযাত্রাও এইরূপ প্রাচীন কালের যজ্ঞের স্মৃতি। সে স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে। শক্তি পূজা, আদ্যাশক্তির পূজা, যে শক্তি সর্ব্বভূতের চেষ্টার কারণ। বিষ্ণুও সেই সর্ব্বব্যাপী শক্তি, কিন্তু পালনে সে শক্তির প্রকাশ। সুতরাং পশুবলি দোলের আর অঙ্গ নাই, যদিও মেড়া পোড়ান ব্যাপারে সে অঙ্গ বিলুপ্ত হয় নাই।

এখানে দোলযাত্রার যে ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে হঠাৎ মনে হইতে পারে, ইহা সূর্য্যপূজাবিশেষ। কিন্তু প্রতিমা পূজার তাৎপর্য্য বুঝিলে এই ভ্রম হইবে না। বহুকাল হইতে সূর্য্য, বিষ্ণুর প্রতিমা বা প্রতীক হইয়া আছেন। বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, সূর্য্যও পালনকর্ত্তা। বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপে ত্রিলোক ব্যাপ্ত ; সূর্য্যও প্রাতঃ, মধ্য ও সায়ং তিন কালে ত্রিপাদ ক্ষেপণ করেন। ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, কিন্তু জড় সূর্য্যকে ধ্যান করেন না। শালগ্রাম শিলা এক খণ্ড গোল কৃষ্ণবর্ণ শিলা, কিন্তু সেই সূর্য্যের, সুতরাং বিষ্ণুর প্রতীকমাত্র। রূপক ব্যতীত যেমন ভাষা নাই, প্রতীক ব্যতীত উপাসনা নাই। ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, যাহাই বলি, প্রতিমা গড়িয়া ধ্যান করি। কিন্তু ইহাও সত্য, অজ্ঞ জনে প্রতিমা ও যাহার প্রতিমা, এই দুই অভেদ করিয়া বসে। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার নিন্দা আছে। সে যাহা হউক, সূর্য্য প্রাচীন কাল হইতে বিষ্ণুর প্রতিমা হইয়া আছেন, সূর্য্যজন্য প্রাকৃতিক ঘটনাও বিষ্ণু পূজার উপলক্ষ হইয়াছে। দোলযাত্রা দ্বারা কালচক্র, ঋতুচক্র স্মরণ হয়। এই চক্র এক বৎসরে পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু ছোট বড় আকারে জগৎ-চক্রের পরিবর্ত্তন ধ্যান করিতে বিঘ্ন হয় না।

যখন শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর এক অবতাররূপে পূজিত হইতে লাগিলেন, বিষ্ণুপ্রতিমা সূর্য্যের কর্ম্মও শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইতে লাগিল। কিন্তু সূর্য্যের সকল কর্ম্ম মানবরূপ শ্রীকৃষ্ণে মিলাইতে পারা গেল না। পুরাণকার নানা কৌশল করিলেও শেষে ভগবানের লীলা বলিলেন। তাঁহার বাল্যকালের অনেক কীর্ত্তি বিদ্বান্ সমালোচককে তুষ্ট করিতে পারিল না। কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিলেন, কেহ ভগবানের লীলা অজ্ঞেয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হয় ত কতকগুলির ব্যাখ্যা সূর্য্যে পাওয়া যাইবে। এখানে একটার উল্লেখ করিতেছি। শৈশব কালে শ্রীকৃষ্ণ এক জোড়া অর্জ্জুন-গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, একটা শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা ভুলিয়াছিল, ফল্গুনী নক্ষত্রের এক বৈদিক নাম অর্জ্জুনী, ফাল্গুনের এক নাম অর্জ্জুন। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, প্রত্যেকেই দুইটি করিয়া তারা, যেন যমল বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। রোহিণী নক্ষত্রের আকার শকটের তুল্য, এই হেতু রোহিণী-শকট নাম প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে যদি অয়ন ঘটে, রোহিণীতে পূর্ব্বস্থিত বিষুব থাকেই। যদি ফল্গুনী হইতে অয়ন সরিয়া যায়, রোহিণী হইতে বিষুবও সরিয়া যাইবে। এই ঘটনা ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যানে বর্ণিত আছে। তখন অগ্রহায়ণ স্থানে কার্ত্তিক প্রথম মাস হইতেছিল। কে জানে, বালকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঙ্গ ও শকটপরিবর্ত্তন এই নৈসর্গিক ঘটনার প্রতিমা নহে?

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-চরিতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের স্থান নয়, উদ্‌ঘাটন আমার সাধ্যও নয়। ইহার প্রয়োজনও নাই। মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রেম ও আনন্দরস ভোগের নিমিত্ত ধাবিত। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা তাঁহার চরিতে প্রচুর উপাদান পাইলেন, এবং স্ব স্ব কল্পনায় সে রস উপভোগও করিতে লাগিলেন। এখানে সম্ভব অসম্ভব বিচারের স্থান নাই। দয়িত জনের কোন্ কর্ম্ম অপ্রিয় হয়? তিনি যদি দোলখেলা করিতে পারেন, রক্তপীতশুক্ল গন্ধচূর্ণক গোপী ও গোপালগণের দেহে কেন নিক্ষেপ না করিবেন? রক্তজলনিক্ষেপ প্রেমের অভিনয়ও বটে। যিনি জীবমাত্রকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া কৃষ্ণ নাম পাইয়াছেন, ভক্ত যে লীলা চায়, সে লীলা দ্বারাই তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব জগৎচরাচর যাঁহার লীলা, নিত্য লীলা, দোলও তাঁহার নিত্য লীলা; যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পায়; চিত্তলীলা অন্যকে বুঝাইবার বস্তু নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

অর্থশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র

(মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাস)

[৬]

লোক-চরিত্র

মৌর্য্যযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। অতঃপর লোকচরিত্র বা শীল সম্বন্ধে, ও দারিদ্র্য বিলাসিতা প্রভৃতির বিষয় কিছু বলিয়াই উপসংহার করিব। লোকচরিত্র বলিলে জনসাধারণের সম্বন্ধেই উহা প্রযোজ্য হইবে, তাহা নহে। অর্থশাস্ত্র রাজ্যশাসন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয় লইয়াই লিখিত ; উহাতে সাধারণ লোকের কথা বড় কম। তবে উক্ত গ্রন্থপাঠে তৎকালের লোক-প্রকৃতির বিশেষত্ব কিছু যে জানা যায় না, তাহা নহে। প্রত্যেক যুগেই মানবের মন কোন এক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়—কোন এক দিকে ধাবিত হয়। অন্য বৃত্তি গুলি যে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে ; তবে অন্য একটি দুইটির প্রাবল্যবশতঃ সেগুলির প্রাথর্য্য বড় বুঝিতে পারা যায় না। জগতের ইতিহাসে এইরূপ যুগে যুগে এক একটি ভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইগুলিকে যুগধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করা যায়। দেখা যায়, কোন যুগে দেশে ধর্ম্মচর্চ্চার স্রোত বহে—ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলনে লোক মত্ত হয়। আবার তৎপরবর্ত্তী যুগে ধর্ম্ম হইতে মন সঞ্চালিত করিয়া অন্য দিকে নিযুক্ত করে। কোন যুগে যুদ্ধ বিগ্রহে, কোন যুগে বা বাণিজ্যে ধন লাভে মানবের মন চালিত হয়। আবার কোন যুগে একেবারে জড়তা আসিয়া পড়ে। বিভিন্ন স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাত, নিরোধ বা প্রবলতা চলিতে থাকে।

অর্থশাস্ত্রের যুগেরও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থশাস্ত্র রচনারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই যুগের পূর্ব্বের ও অব্যবহিত পরযুগেরও ইতিহাসে বিশেষত্ব আছে। ইহার পূর্ব্বের যুগে ধর্ম্মের আন্দোলন লইয়া লোকে মাতিয়াছিল। একরূপ বলিতে গেলে বৈদিক যুগের শেষ হইতেই লোকে পরলোক ও ইহ লোকের সুখদুঃখের কারণ প্রভৃতির অনুসন্ধিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিল। জগতের দুঃখ, ইহার নিবারণের উপায় প্রভৃতি নানা বিষয়েই মন চালিত হইয়াছিল। জগৎ যে দুঃখমাত্রেরই স্থান, কর্ম্ম যে কেবল দুঃখেরই কারণ, কর্ম্মফলে যে মানব পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করে, এই সকল বিশ্বাসই মানবের মনে আধিপত্য করিয়াছিল। এই সকলের ফলে দেশে দুঃখবাদ প্রবল হইয়াছিল (Pessimism)।

অবশ্য ইহার বিপরীতবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকও ছিল—চার্ব্বাক ও বার্হস্পত্য-সম্প্রদায়ের কথা সকলেরই বিদিত আছে। ইহাদের প্রকৃতি ইতিহাস বা বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানি না। তবে বিপরীত সম্প্রদায়ের শ্লেষাত্মক নাম বা বিবরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চার্ব্বাক্ [বা চর্ব্বণকারী—ঐরূপ কণাদ বা কণভুক্ ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক নাম উল্লেখযোগ্য] মতাবল-

ন্থীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান স্বীকার করিতেন না। পার্থিব ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যই স্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের মতে যে কোন উপায়ে শরীরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবদেহ বিনাশের সঙ্গেই সব বিলুপ্ত হইয়া যায়। জগতের নানাবিধ মৌলিক দ্রব্যের সংঘাতেই জীবন বা জ্ঞানের উৎপত্তি। ঈশ্বরাদি কিছুই নাই, ইত্যাদি মতেই তাঁহারা পরিচালিত হইতেন।

এক দিকে যেমন চার্ব্বাকপন্থীরা ছিলেন, তদ্রূপ বিপরীতবাদী পরিব্রাজকাদির দল সংসারকে একেবারে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের চক্ষে কর্ম্মজগতের কোনই স্থান ছিল না। ইঁহারা লোককে গৃহত্যাগ করিতে, সন্ন্যাস লইতে বা কঠোর ভাবে জীবন যাপন করিতে শিখাইতেন। আদিম বৌদ্ধধর্ম্মও এই শ্রেণীর ধর্ম্ম ছিল। উহাতে গৃহী বা গার্হস্থ্যের কোন স্থান ছিল না। উত্তর কালে এই সকল শিক্ষার বিষময় ফলই ফলিয়াছিল। সমাজে উহার প্রভাবে যে দুর্নীতি ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঐ মতের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কৌটিল্য কাঠোর্য্য-বাদের (rigorism) ; প্রতিবাদী প্রাচীনতর ধর্ম্মসূত্রগুলিতেও এই প্রতিবাদের সূত্র পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, কৌটিল্যের এ বিষয়ে মতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পষ্টই বলেন,—

"ন নিঃসুখঃ স্যাৎ। ধর্ম্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত।" ইত্যাদি

এই হিসাবে অর্থশাস্ত্রের ও অর্থশাস্ত্রকারের স্থান হিন্দু সামাজিক ইতিহাসে অতি উচ্চ। তাঁহার মতে জগতে মানবজীবনে সুখের প্রয়োজন। সুখ ভিন্ন, কামবিহীন জীবন নিঃসার হইয়া পড়ে। মানব কষ্টবৈরাগ্যের ফলে কর্ম্ম ভুলিয়া যায়। সমাজবিলুপ্ত হয়। উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়।

এই প্রতিক্রিয়ার সহিত আবার ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। ইহারই ফলে ভারতবাসী রাজনৈতিক জগতে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ম্ম-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকের মানসিক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। লোকে বর্ত্তমান যুগের মত ঐহিক উন্নতির চেষ্টায় মন দিয়াছিল এবং অনেকটা ধর্ম্মভয়হীনও হইয়া পড়িয়াছিল। লোকচরিত্রে উহা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এক দিকে যেমন জড়তার বিলোপ হইয়াছিল, অপর দিকে আবার অর্থৈষণার প্রভাবে অনেকটা নৈতিক অবনতিও ঘটিয়াছিল।

লোকচরিত্রে এই নৈতিক অবনতি পর্য্যালোচনার বিষয়। এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের পাঠকমাত্রেরই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ যুগের অধিকাংশ রাজনৈতিকের মধ্যে [প্রাচীন অর্থশাস্ত্রকারের] নৈতিকতার একেবারে অভাব দেখা যায়। ছলে বলে কৌশলে অভীষ্ট-সিদ্ধি বা শত্রুনিপাত করিতে সকলেই উদ্যোগী। রাজপুত্র দমনের জন্য কেহ বা উহাদের মদ্যপানাদিতে আসক্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কেহ বা মোহচূর্ণাদির দ্বারা উহাদের সংজ্ঞা বিলোপ করিয়া, আবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সকল নীতিকারই ছদ্মবেশধারী চার প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। প্রায় সকল নীতিকারই এ বিষয়ে একমত। এ বিষয়ে কৌটিল্যও বাদ যান নাই। তিনিও ঐ সকল মতের সমর্থন করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনিও প্রায় একই মতাবলম্বী। তবে ভাল করিয়া দেখিলে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যদিও অনেকে তাঁহাকে Machiavelliর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, তথাপি ভাল করিয়া দেখিলে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ আসনে বসাইতে হয়। সে সব বিষয় অন্য স্থানে আলোচনা করিয়াছি ও করিব।

অবশ্য রাজনৈতিকদিগের প্রকৃতি বা মত লইয়া জনসাধারণের নৈতিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করা যায় না। উহাতে সময়ে সময়ে বিশেষ অবিচার বা ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। তবে মোটের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সে যুগের লোকের নৈতিক আদর্শ উচ্চ ছিল না। যে সমাজে গুপ্তহত্যা, বিষদান, অগ্নিদান প্রভৃতির স্থান থাকে ও যে সমাজের রাজনৈতিকেরা ছলে বলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হন না, সে সমাজের লোকের নৈতিক আদর্শ যে বড় উচ্চ নহে, তাহা একবাক্যে বলা যাইতে পারে।

ব্যভিচার

সমাজের যৌন আদর্শও যে বিশেষ উচ্চ ছিল, তাহা নহে। একে ত সমাজে আট প্রকার বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল। তাহার উপর আবার হীন বিবাহে বিবাহ-মোক্ষ ও পুনঃ সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। ইহা সত্ত্বেও ব্যভিচারের মাত্রা যে বড় কম ছিল, তাহা নহে; অর্থশাস্ত্রপাঠক মাত্রেই ইহা পরিজ্ঞাত আছেন। কৌটিল্য নানাপ্রকার যৌন ব্যভিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। (কণ্টকশোধনের অতিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কন্যাপ্রকর্ম্ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, বিবাহ-বয়স অতিক্রম করিলে কন্যা পরগামিনী হইলে সমাজে উহা দোষাবহ হইত না। তবে সমাজ এই সকল স্থলে প্রাতিলোম্যের জন্য বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নবর্ণা স্ত্রী উচ্চবর্ণের পুরুষে আসক্ত হইলে উহার অবশ্য দণ্ড হইত। কিন্তু উচ্চবর্ণা স্ত্রী নীচগামিনী হইলে উহার কঠোরতর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। নানা প্রকার কায়িক দণ্ড, রাজদাস্য, এমন কি—ভীষণ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ব্যভিচারিণীর দণ্ড ত হইতই। গর্ভপাতিনী, স্বামীকে বিষদায়িনী, অগ্নিদাত্রী প্রভৃতির কঠোর দণ্ডে লোকের ঘৃণার ও ভয়ের উদ্রেক হয়।

মোটের উপর মনে হয়, বর্ত্তমানের সমাজ অপেক্ষা ব্যভিচার বিশেষ প্রবল ছিল। নানা শ্রেণীর দূতীর প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রব্রজিতা দূতীর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুই এক স্থলে ব্রাহ্মণীজারকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখা হইয়াছে।

ব্যভিচার-বিষয়ক আইন কঠোর হইলেও, ব্যভিচারিণীর স্থান সমাজে হীন হইলেও মনে হয় যে, ব্যভিচার বলিতে আমরা যেরূপ সামান্য অপরাধকে ঘৃণার চক্ষে দেখি, তখন এরূপ কঠোর আদর্শ ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা ক্রমশঃ যে সকল অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও তদন্তে উহার সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন উহাতে

সমাজে চিরন্তন পাতিত্যই ঘটিয়া থাকে। সামান্য সামান্য অপরাধ—যাহাতে আমাদের সমাজে পাতিত্য ও ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অর্থদণ্ড মাত্রের ব্যবস্থা কৌটিল্যে দেখা যায়। পরপুরুষসম্ভাষণাদি সামান্য সংগ্রহণাপরাধ স্থলে অর্থদণ্ড মাত্রের ব্যবস্থা আছে। সমাজ ঐরূপ দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইত। তখনকার যুগে এই সকল অপরাধে "রজসা শুধ্যতে নারী" এই ব্যবস্থায় দোষ ক্ষালন হইত। পরপুরুষজনিত গর্ভস্থলে অনেক স্মৃতিকার এক বৎসর অধঃশয্যা ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখনকার যুগে সমাজ উন্নত হইয়াছে। সামাজিক আদর্শও অনেক উচ্চ হইয়াছে। ক্ষেত্রজ পুত্রাদি এখন জারজ বলিয়াই পরিগণিত। কানীন, সহোঢ়, শৌদ্র, গূঢ়োৎপন্ন প্রভৃতির সমাজে কোন স্থানই নাই। কুণ্ড, গোলকাদি সন্তান এখন কেহই নিজের বলিয়া গণ্য করে না। সেই হিসাবে আমরা অপেক্ষাকৃত সামান্য অপরাধকে ব্যভিচার ধরিয়া থাকি। তখন আদর্শ হীন ছিল। এখনকার মত সামান্য অপরাধকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত না। তখন অসমর্থ পক্ষে কৌটিল্য রাজাকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বিলাসিতা

বিলাসিতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন সাধারণ সামাজিক জীবনের আদর্শ হিসাবে উহার পুনরুল্লেখ করিব। লোকের জীবনে বর্ত্তমানের অপেক্ষা ভোগস্পৃহা বলবতী ছিল। লোকে এত দারিদ্র্যের পেষণে থাকিয়া ভোগ ভুলিয়া যায় নাই। জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই। কাজেই সময়ও থাকিত। এই সময় অতিবাহনের জন্য নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। ঘোড়দৌড়, পশুযুদ্ধ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, গোষ্ঠ-বিহারাদির কথা উল্লেখ করিয়াছি। নট, নর্ত্তক, গায়ন, বাগ্‌জীবন (ভাঁড়), গন্ধকারী প্রভৃতির কথা বলিয়াছি। সমাজে বিলাসিতা প্রবল থাকায় এই সকল শ্রেণীর লোকের স্থান ছিল। উৎসাদনের জন্য সংবাহক (গা টিপিবার লোক), স্নাপক (যাহারা স্নানে সাহায্য করে, রামায়ণে উক্ষোদকের উল্লেখ আছে), মাল্যকার, আস্তরক প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক যুগ হইতেই ইহাদের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। অভাবে উহারা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

লোক ও বিশ্বাস

তখনকার লোকে আজকালকার মত নানা প্রকার কুসংস্কারাদিতে আস্থা স্থাপন করিত। জ্যোতিষগণনা, ভবিষ্যগণনা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, মারণাদি কার্য্য, অভিচার-ক্রিয়া প্রভৃতিতে তখনকার লোকের বিশেষ আস্থা ছিল। লোকে ভূত, প্রেত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যোনিতে বিশ্বাস করিত। নাগাদির পূজা করিত। নানা প্রকার দেব দেবীর সন্তোষার্থ পূজা উপহারাদি দান করিত।

আবার বিপদাদির সময় লোকে মিলিয়া নানা প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিত। শ্মশানে কবন্ধ-দাহন, শ্মশানে গো,-দোহন, পঞ্চরাত্রি, দেবরাত্রি প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস তখনও লোকের ছিল। সাধু ফকিরাদিতে আস্থা তখনও লোকে স্থাপন করিত। নানাবিধ কুসংস্কারও ছিল, লোকে শুভাশুভক্ষণ, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাদি সমস্তই মানিত। দেবপূজা করিত। প্রতিমা গড়িত। সিদ্ধ তাপসাদি দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইত। এ সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না; প্রায় একরূপই বলিতে হইবে। তবে অনেক বিষয়ে প্রভেদ ছিল। খাদ্যাখাদ্য বিচারও করিত; তবে উহা এখনকার মত কঠোর ছিল না।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য, জলাচরণীয়ত্ব

ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও সামাজিক সম্বন্ধাদি লইয়াও তখন অনেক মতামত বা ভেদাভেদ ছিল। তবে এখনকার মত উহা এত কঠোর ছিল না। উহার কারণ ও উৎপত্তি প্রসঙ্গক্রমে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

আহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে যুগে মৎস্য মাংসাহার বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। জাতকে বরাহমাংস, কুক্কুটমাংস, এমন কি, স্থানবিশেষে বা জাতিবিশেষে, গোমাংসাহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে ধর্ম্মসূত্রগুলিতে অনেক কথা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে,—

(ক) কতকগুলি পশুর মাংস ও কতকগুলি মূল কন্দ অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অভক্ষ্য পশুর মধ্যে মাংসাশী জন্তু মাত্রই অভক্ষ্য ছিল। নখরবিশিষ্ট জলচর, একক্ষুর-বিশিষ্ট জন্তুরাও অভক্ষ্য পরিগণিত হইত। সাধারণতঃ মেষ ও ছাগ, বন্য বরাহ, শিকারলব্ধ মৃগাদি, শশক, শল্লকী, গোধা ও কতকগুলি জন্তুর মাংস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। গ্রাম্য কুক্কুট-মাংস ধর্ম্মসূত্রে অখাদ্য বলিয়া গণ্য হইত। ঐরূপ রসুন কবকাদি কতিপয় মূলও অভক্ষ্য বিবেচিত হইত।

(খ) দ্বিতীয়তঃ কয়েক শ্রেণীর লোকের অন্ন (উহাদের অর্থে প্রস্তুত) অখাদ্য বলিয়া গণিত হইত। ধর্ম্মসূত্রগুলিতে ও মনু প্রভৃতি সংহিতাকারের মধ্যে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য; যথা,—গণান্ন, গণিকান্ন, বার্দ্ধুষিকান্ন, শূদ্রান্ন, চিকিৎসাকান্ন ইত্যাদি। ঐরূপ ব্যাধ, পতিত, রজক, তক্ষক, শৌণ্ডিক, পিশুন, ভার্য্যাট প্রভৃতি ব্যক্তির অন্ন পরিত্যাজ্য (গৌতম, ১৪ অধ্যায়)।

(গ) অতঃপর কয়েকটি জাতির স্পৃষ্ট অন্ন জলাদি অভক্ষ্য ও জাতিভ্রংশকর বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ঘ) ঐরূপ কেশ-কীটাদি-যুক্ত, ধূলি-ভস্মাদিপূর্ণ অন্ন পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মণাদির পক্ষে গুরু ভিন্ন অন্যের উচ্ছিষ্টও পরিত্যাজ্য।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, কালক্রমে সমাজের মধ্যে এই নিয়মগুলি আসিয়াছিল। কতকগুলি স্থলে দেখা যায় যে, সামাজিক অপকার ভয়ে বা স্বাস্থ্যহানির

ভয়ে এই নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যেমন গোমাংস ও বরাহমাংস। কতিপয় স্থলে স্বাস্থ্যহানির ভয়ে ঐরূপ বিধির উৎপত্তি হইয়াছিল। যেমন চর্ম্মকারাদি নীচকার্য্যরত ব্যক্তির অন্ন। উচ্ছিষ্ট ভোজনও বোধ হয় রোগাশঙ্কায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আবার অনেক স্থলে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের ফলে বা অন্য কোন কারণবশতঃ এইরূপ নিষেধের উৎপত্তি। যেমন গণিকান্ন, চিকিৎসক ও সোমবিক্রয়ীর অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন। এই স্থলে সমাজ গণিকাদিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া উহাদের অন্নও দুষ্ট বলিয়া গণ্য করিতেন। চিকিৎসক বার্দ্ধুষিকাদি ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের অন্ন অভক্ষ্য হইত। নীচজাতীয় অন্ত্যজদিগকে আর্য্যসমাজ তখন সমাজভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। জাতকে চণ্ডাল, পুক্কশ, নিষাদাদি জাতির অন্নপানাদি গ্রহণ জাতিভ্রংশকর বলিয়া গণিত হইত। ইহারা গ্রাম নগরের মধ্যে স্থানই পাইত না; গ্রামের বাহিরে বাস করিত। ঘাতক, পাংশুল, ধাবকাদির কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিত। সমাজ ইহাদিগকে বিধর্ম্মী আর্য্যসমাজবহিষ্কৃত বলিয়া পরিগণিত করিত।

এইরূপ যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আবার আরও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ শীল-সদাচারযুক্ত শূদ্রাদি রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইত। গৌতমধর্ম্মসূত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। আপস্তম্বের মতে শূদ্র (২-৩-৯) পাচক অন্নাদি প্রস্তুত করিতে পারে। গৌতমের মতে (১৭ অধ্যায়) অভাবে পড়িলে শূদ্রের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে পারা যায়। আর গোপালক, নাপিত, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত শূদ্র, পরিচারকাদিরও অন্ন গৃহীত হইতে পারে (এই মতটি বোধ হয় রঘুনন্দন কর্ত্তৃকও উদাহৃত হইয়াছে)। পুনশ্চ ব্রাহ্মণ পাককার্য্যে নিযুক্ত হইলে উঁহার পাতিত্য জন্মে, ইহা স্মার্ত্তদিগের মত। এই অবস্থায় মনে হয় যে, এই যুগের মাহানসিক সূপকার, ঔদনিক, পাকমাংসিকাদি শূদ্রজাতীয় ছিল।

পরবর্ত্তী যুগেই বোধ হয়, স্পর্শ-দোষাদি লইয়া কঠোর বিধিসমূহ রচিত হয়। বৌদ্ধ যুগের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতাই বোধ হয়, এই সকল প্রতিক্রিয়ার মূলীভূত কারণ। বৌদ্ধ শিক্ষার ও আচারের ফলে সামাজিক শাসন শিথিল হইলে উহা আবার কঠোর ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। স্পর্শদোষে পাতকাদির কথাও এই সময়ে বিধিবদ্ধ হয়। আচারমাহাত্ম্যমূলক পরবর্ত্তী যুগের যে সকল স্মৃতিগ্রন্থের অংশবিশেষ আমাদের হস্তে আসিয়াছে, সেইগুলিতে উহা বিশদভাবে পরিস্ফুট আছে। নানা কারণেই এইগুলি ঘটিয়াছে। উহার প্রথম কারণ, ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের ভয়। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

এই সকল কারণেই ব্রাহ্মণাদি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নিমিত্ত এই সকল বিধি কঠোর করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ বিধি অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। স্বাতন্ত্র্য রক্ষণার্থ ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট করণের কল্পেই এইগুলির উদ্ভব হয়। জলাচরনীয়ত্বের মূলেও ঐ সকল কারণ নিহিত রহিয়াছে।

অর্থশাস্ত্রেও এইরূপ কয়েকটি আইন দেখা যায়। এক স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, নীচ শূদ্রাদি, ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক অভক্ষ্য ভোজন করাইলে তাহার বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

অর্থশাস্ত্রের যুগেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় বিশেষই পাওয়া যায়। তবে উহারও আবার বিশেষত্ব ছিল। ইউরোপের মত নির্য্যাতন অত্যাচার বড় বিশেষ হইত না। ধর্ম্মে রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার না থাকায় এ বিষয়ে বড় বাড়াবাড়ি হইত না।

তবে পাষণ্ড চণ্ডালাদির স্থান সমাজের বাহিরে ছিল। কৌটিল্যের মতে তাহাদিগকে নগরমধ্যে বাস করিতে দেওয়া অনুচিত। আর গ্রামে উহাদের সঙ্ঘ স্থাপন করিতে দেওয়া হইত না (৪৮ পৃষ্ঠা—বানপ্রস্থাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সময়ানুবন্ধে বা নাস্য জনপদমুপনিবিশেত) ?

উত্তর কালে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে। বৌদ্ধেরা বিষম হিন্দুদ্বেষী হন। এমন কি, ভারতের প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধেরা বিদেশী শত্রুর সহিত যোগদান করেন। এই বিদ্বেষের ফলেই এই সকল বিধি দিন দিন বাড়িতে থাকে।

কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ

অর্থশাস্ত্রের সামাজিক চিত্র সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও যৎসামান্য পর্য্যালোচনায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহা লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছি। এখন কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলিব ও প্রসঙ্গক্রমে সে কাল ও এ কালের পার্থক্য ও তাহার মূলীভূত কারণ লইয়া কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উপসংহার করিব।

অর্থশাস্ত্র হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ অনেক উচ্চই ছিল। উচ্চ বলিলে যে উহা এখনকার হিসাবে উচ্চ, তাহা নহে। এখন লোক-তন্ত্রবাদের দিন (Democracy)। সর্ব্ব লোকের সাম্য (equality) ও মনুষ্য মাত্রেরই সমান অধিকার (equal rights) এই যুগের নীতির ভিত্তি। যদি বর্ত্তমান জগতের আদর্শ লইয়া আমাদিগকে কৌটিল্যের স্থান নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে উচ্চ স্থান দেওয়া অসম্ভব। এক হিসাবে তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের পথানুসারী ছিলেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও বেদপ্রামাণ্যে তাঁহার আস্থাই ছিল। তিনি ভূয়োভূয়ঃই বলিয়াছেন যে,—

চতুর্ব্বর্ণাশ্রমো লোকে কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।
এষ হি রক্ষিতো লোকে প্রসীদতি ন সীদতি ॥

এই সকল বিষয়েই তিনি প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; প্রাচীন আদর্শ বিলোপ করিতে চাহেন নাই; সমাজ ভাঙ্গিতে চাহেন নাই। নূতন কিছু গড়িয়া প্রাচীন সমাজের বিলোপ করিতে চাহেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ।
স্বধর্ম্মং সন্দধানো হি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥

শ্রুতিকে তিনি বিদ্যাসমূহের মধ্যে প্রধানতম স্থানই দিয়াছেন (যথা—ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি-রান্বীক্ষকীতি বিদ্যাঃ)। তাঁহার শাসনবিধিতে ব্রাহ্মণ পরিহারের স্থান আছে, ব্রাহ্মণের অনেক বিশেষ অধিকার আছে। ঐরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিরও বিশেষ বিশেষ অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়।

সাম্যবাদে অবিশ্বাসী বলিয়াই কিন্তু তাঁহাকে আমরা নির্ম্মম, নির্দ্দয় দণ্ডনীতির পরিপোষক রাজনৈতিক বলিতে পারি না। সাম্যবাদ ভারতবর্ষে কখনই প্রবল হয় নাই—আজিও প্রবল হইতেছে না। অনেকে উহা আমাদের জাতিগত অবনতি বা কুসংস্কারজনিত বলিয়া মনে করেন। উহা কি পরিমাণে সত্য, সে সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে আরও একটি কারণ নির্দ্দেশ দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ইউরোপে সাম্যবাদপ্রচারের অনেকগুলি কারণই ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান (কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকারের মতে প্রধানতম) কারণ এই যে, উহা রাজনৈতিক হিসাবে, সামাজিক হিসাবে ও আধ্যাত্মিক ভাবে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের প্রসারের একমাত্র উপায়ই হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে ইউরোপীয় দার্শনিক মাত্রেই জীবনের ভোগসুখ লইয়াই জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদের দেশের কর্ম্মবাদ ও কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি ও অবসান ইউরোপে কখনই প্রবল হয় নাই। ইউরোপীয় দার্শনিক পুনর্জ্জন্মে এত আস্থা কোন কালেই স্থাপন করেন নাই। ইহার ফলে উঁহারা বৈষম্য দেখিলেই উহার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপে এই সংগ্রাম আজিও বিলুপ্ত হয় নাই।

আমাদের দেশে কর্ম্মবাদের প্রভাবে এই বৈষম্য লইয়া লোকে এত ব্যস্ত হয় নাই। এ দেশের মনীষিবৃন্দ একরূপ নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন যে, মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও কখনই প্রত্যেককে সমান সুখে সুখী করিতে পারিবে না। সুখ ও দুঃখ লইয়া যে বৈষম্য, তাহার অনেকটা মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ সদসৎ কর্ম্মেরই ফল।

দ্বিতীয়তঃ এ দেশের সামাজিক গঠনের প্রকৃতি (Principles of Evolution) বিভিন্ন। ইউরোপের ন্যায় ভারতীয় সমাজে জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈষম্য লইয়া এত ভীষণ সমরও হয় নাই। এ দেশে বহুজাতীয় লোকেরই বাস ছিল বা আছে। কিন্তু ইউরোপে যেমন প্রবল দুর্ব্বলের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া, নিজ শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া অপরকে একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে, এ দেশে কখনও তাহা হয় নাই। এক হিসাবে যেমন সাম্যমূলক জাতিগত রাষ্ট্র বাহির হইতে দেখিতে বড় সুন্দর, উহার গঠনের ইতিহাসও তদ্রূপ কদর্য্য। বর্ত্তমানের সীমেতীয় ও ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ রাষ্ট্রপ্রজা মাত্রেরই মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সমতা স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশীয় জাতিমাত্রই তাঁহাদের চক্ষুঃশূল। আর এই সমতা স্থাপন ও নিজ জাতির প্রাধান্য বিস্তার করিতে গিয়া কত বিশাল জাতির অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভারতীয় আর্য্য নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে অথচ অন্যের অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ করে নাই। এক দেশে, এক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা শ্রেণীর লোক নির্ব্বিবাদে বাস করিয়াছে ও করিতেছে। ফলে আজিও সমাজের অঙ্গের মধ্যে নিম্নস্তরের বহু জাতির লোক স্থান পাইয়াছে; তাহাদের অস্তিত্ব আছে। প্রতীচ্যে তাহা হয় নাই। বিজয়ী জাতিই প্রবল হইয়াছে। বিজিত একেবারে

সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক আর বলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র দেখাইতে চাই যে, ভারতে আজিও বহু সভ্য, অসভ্য, নিম্ন বা উন্নত জাতি পাশাপাশি নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে। আর ইউরোপ বা আমেরিকায় বিজিতের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান বা অন্য যাহারা আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহাদের নিত্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

যে কোন কারণেই হউক, কৌটিল্যে সাম্যবাদ নাই। তবে তাই বলিয়া কৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ সঙ্কীর্ণ নহে। কৌটিল্যের বহু স্থলেই জনসাধারণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখিতে পাই। আর এ ভিন্ন তাঁহার আর একটি গৌরবের কথা এই যে, যে যুগে যবন দার্শনিক এরিষ্টটল দাসত্বের সমর্থন করিয়াছেন, সেই যুগেই কৌটিল্য উহার সমূল উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সুসভ্য ইউরোপে বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে দাসত্ব-প্রথা বহু চেষ্টায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর গৌরবের কথা এই যে, ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন ভারতীয় দার্শনিকই উহার উচ্ছেদকল্পে জগতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় লইয়াই কৌটিল্যের সমাজ গঠিত হয় নাই। নিম্ন জাতির লোক মাত্রেরই উহাতে বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মাত্রেরই মত তিনি সমাজকে একটি জীবদেহ মনে করিয়া সকলকেই বিশিষ্ট স্থান দিয়া গিয়াছেন।

প্রজাসাধারণের সহিত রাষ্ট্রশক্তির বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। রাজশক্তি কেবল দুষ্টের দমন করিয়াই পর্য্যবসিত হইত না; প্রজাকে সকল প্রকারে সাহায্য করাই ছিল রাজার ও রাজশক্তির আদর্শ। যে যেরূপ শ্রেণীর লোকই হউক না কেন, রাজা রাজকোষ হইতে তাহার সেইরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন রক্ষা, উৎকর্ষের উপায় ও ঐহিক পারত্রিক উন্নতি, সর্ব্ববিষয়েই রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ছিল। এগুলির সঙ্গে আবার ইউরোপের ন্যায় ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ন ও অত্যাচার মিলিত হইত না। রাজা কখনও প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসে হাত দিতেন না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে রাজার হস্তক্ষেপের কোন উপায়ই ছিল না।

প্রজার স্বায়ত্ব শাসনের বিশেষ উপায় ছিল। গ্রামে গ্রামবাসিগণ, নগরে নগরবাসিগণ, জাতির মধ্যে মণ্ডলেরা, সঙ্ঘের মধ্যে সঙ্ঘমুখ্যেরা কর্তৃত্ব করিতেন। যখন বিপদ্ ইঁহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত হইত, তখন রাজা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজপ্রণীত বিধির ফলে সম্প্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারের উপায় ছিল না। অত্যাচার হিংসা সবই নিবারিত হইত। ধনবান্ কর্তৃক দরিদ্রের উৎপীড়নও নিবারিত হইত। দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ ও কর্ম্মকর দাসাদির বেতন নির্দ্ধারণাদির কথা বলিয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্র লোকহিতৈষণা ও অর্থনৈতিক বিধির উপর স্থাপিত হইয়াছিল।

ক্রমে সেই সকল আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ ভারতবাসীর দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি অশোকের ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্রও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারত ক্রমে বিদেশী আক্রমণকারীর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও জাতীয় জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও লোকে কর্ম্মজীবন

ভুলে নাই। প্রয়োজনমত সংস্কার করিতে বা নূতন করিয়া গড়িতে পারিত। কিছু কাল পরেই হিন্দুশক্তি আবার উঠিয়াছিল। গুপ্ত, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পাল, সেনাদি নরপতিগণ দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু এ পুনরভ্যুদয় চিরস্থায়ী হয় নাই। ভারতীয় সমাজের জীবনীশক্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছিল। ভারতবাসী এক একবার মাথা তুলিলেও নানা কারণে নিজের শক্তি বা তেজ অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। ইহার মূলে অনেকগুলি কারণ নিহিত আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সমালোচনা হয় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, অনেকগুলি কারণেই ভারতবাসী নিজ শক্তির অপচয় করিয়াছে ও করিতেছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ এই,—(ক) কর্ম্মজীবনের আদর্শের বিকার, (খ) সামাজিক অবসাদ, (গ) স্বাধীন চিন্তার তিরোভাব, (ঘ) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, (ঙ) বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার ফল।

এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। ইহা ভারতের ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই অবগত। ভারতবাসী ক্রমে নিজের শক্তি অপচয় করিয়া আসিতেছে। কর্ম্মজীবনের আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভ্রান্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে স্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ প্রাচীন আদর্শের দোহাই দিয়া একেবারে গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে কর্ত্তব্য বিচার করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অবসাদের সঙ্গে অনেক উচ্চ আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজশক্তির বিলোপে, সমাজ-শক্তি ক্ষীণতর হইয়াছে। সর্ব্ব হিসাবেই এখন দৈন্য আসিয়াছে।

ক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে সংশয় আসিয়াছে। আবার মাথা তুলিতে হইলে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, দুর্নীতির বিলোপ করিতে হইবে। এখন জগতের সর্ব্বত্রই অভ্যুদয়ের যুগ। আর এখন গতানুগতিক হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে আমাদিগকে হিন্দুসমাজ পুনরায় গঠিত করিতে হইবে। আর এই পুনর্গঠনে কেবল প্রতীচ্যের আদর্শের অনুকরণে চলিলে হইবে না বা আমাদের নিজস্ব যাহা আছে, তাহার স্মৃতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে আবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে না। দেশানুযায়ী সমাজ আবার নূতন করিয়া স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের "সতসঈ"

আমাদের বঙ্গদেশে হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ সহৃদয় সুপণ্ডিত ব্যক্তির অভাব নাই, তথাপি বলিতে দুঃখ হয়, লজ্জাও হয়, আজ পর্য্যন্ত হিন্দী-সাহিত্যের অদ্বিতীয় ও অমূল্য রত্ন কবি-শ্রেষ্ঠ বিহারীলালের "সতসঈ" অর্থাৎ 'দোহা'-ছন্দে রচিত সপ্ত-শত শ্লোক-পূর্ণ হিন্দী কোষ-কাব্যখানি বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে কেবল অপরিচিত রহিয়াছে তাহা নহে, কবি বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্যের নামও বোধ হয়, অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট নূতন মনে হইবে। প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্বন্ধে বাঙ্গালা মাসিক-পত্রে ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ অল্প-বিস্তর আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু বিহারীলালের এই অতুলনীয় কাব্যের, প্রাচীন ব্রজ-ভাষার অধুনা অপ্রচলন হেতু দুরূহতার জন্যই হউক, কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, উহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিহারীলালের "সতসঈ" কাব্যখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু-সংখ্যক প্রতীচ্য পণ্ডিতের নিকট উহা কিরূপ অসাধারণ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং তাঁহারা উহাকে হিন্দীর পাঠক-বর্গের নিকট সুপাঠ্য ও সুবোধ্য করার জন্য কিরূপ অদ্ভুত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদিগের স্বদেশের প্রায় সকল রত্নেরই প্রকৃত পরিচয় আমরা প্রথমে জানিতে পাইয়াছি সাহেবদিগের নিকট হইতে। এ ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে তাহাই। অন্যের কথা বলিতে পারি না; নিজের কথাই বলিব। যৌবনের প্রারম্ভে যখন কলেজের ডিগ্রী লইয়া বাহির হইলাম, তখন অন্যান্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত হিন্দী-সাহিত্য বলিতে শুধু তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণই বুঝিতাম; হিন্দী-সাহিত্য যে কত বিস্তৃত—উহার গ্রন্থকারের সংখ্যা যে কত অসংখ্য, তাহার কোনও ধারণাই তখন ছিল না। তখন হইতেই বিদ্যাপতির ও অন্যান্য বৈষ্ণব-কবির ব্রজ-বুলি পদাবলী আমাদিগের অতি প্রিয় পাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তখন আমাদের প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, ঐ ব্রজ-বুলি ব্রজ-ধামেরই ভাষা এবং উহা হিন্দীরই রূপান্তর। তাই সেই ব্রজ-বুলি বা ব্রজ-ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য হিন্দী কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করার একটা প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছিল; কিন্তু তুলসীদাসী রামায়ণ বা হিন্দী প্রেম-সাগর পড়িয়া আমাদিগের হিন্দী কাব্য পাঠের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না; বাঙ্গালা রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় উহা সর্ব্বত্র সমাদৃত ও ভক্তি-কথা-পূর্ণ হইলেও কালিদাসের কুমার-সম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য কিংবা বৈষ্ণব-কবিদিগের গীতি-কবিতা যাঁহাদিগের তরল চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাঁহাদের নিকট সে শান্ত-রস-প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ ভাল লাগিবে কি প্রকারে?

তাই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রেম-গীতির ন্যায় না হউক, অন্ততঃ কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের আদি-রস-পূর্ণ রস-রচনার মত কোনও হিন্দী কাব্য পড়ার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, আর হিন্দীতে সেরূপ কোনও কাব্য আছে কি না, অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। ঠিক এমন সময়ে সাহেবদিগের ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ মিশন্‌ প্রেস হইতে প্রকাশিত অল্প মূল্যের একখানি ইংরাজী পুস্তিকায় ভারতের নানা প্রদেশের অধিবাসীদিগের দেশ, জাতি ও ভাষা ইত্যাদির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পড়িতে পড়িতে হিন্দী-সাহিত্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে তুলসীদাসের 'রামায়ণ' ও বিহারীলালের 'সতসঈ' কাব্যের প্রশংসা দেখিতে পাইলাম। প্রায় চল্লিশ বৎসরের আগের কথা—তাই সে পুস্তিকাখানির নাম বা উহাতে লিখিত কথা-গুলি ঠিক মনে নাই; কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, হিন্দী-সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট মাত্র একটী প্যারার মধ্যে হিন্দীর অন্য কোন গ্রন্থের নাম-মাত্রও উল্লেখ ছিল না। লেখক বিহারী-লালের 'সতসঈ' কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত এই কিংবদন্তীরও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, কবি ঐ সাত শত দোহা রচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিপালক মহারাজ জয়সিংহের নিকট হইতে প্রত্যেকটী দোহার পুরস্কারস্বরূপ একটী স্বর্ণময় আশ্‌রফী-মুদ্রার হিসাবে সাত শত আশরফী পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এই বিবরণ পাঠ করিয়া এক খণ্ড 'সতসঈ' কাব্য সংগ্রহ করার জন্য একান্ত আগ্রহ হইল; কিন্তু কোথাও মুদ্রিত 'সতসঈ' কাব্যের ঠিকানা পাইলাম না। এমন সময়েই এক দিন কলিকাতার বটতলায় মুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর খোঁজ করিতে যাইয়া নৃত্যলাল শীলের দ্বারা প্রকাশিত দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত "বিহারী-সতসঈ" দেখিতে পাইয়া দুই আনা মূল্যে উহার এক খণ্ড ক্রয় করিয়া আনিলাম। বটতলার মুদ্রা-যন্ত্রের মাহাত্ম্য সকলেই বেশ জানেন; সুতরাং "বিহারী-সতসঈ" কাব্যের এই সুলভ সংস্করণটী যে কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিবে। এই সংস্করণে কেবল দোহাগুলির নিতান্ত অশুদ্ধি-পূর্ণ মূল-মাত্র দেওয়া হইয়াছিল; টীকা-টিপ্পনী কিছু মাত্র ছিল না; তদ্ভিন্ন হিন্দী গ্রন্থের সনাতন মুদ্রাঙ্কন-রীতি অনুসারে বিভিন্ন শব্দগুলির মধ্যে কোনও ফাঁক না দিয়া,—'মেরী ভব-বাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়' ইত্যাদি স্থলে 'মেরীভববাধাহরৌরাধানাগরিসোয়' ইত্যাদিবৎ মুদ্রিত করায় যে কাব্যকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (অধুনা স্যর) গ্রিয়ার্স ন মহোদয়—'one of the most difficult books in any Indian language' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই কাব্যের মর্ম্ম-গ্রহ করা যে একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তবে তৎপূর্ব্বে হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণ, প্রেম-সাগর, বেতাল-পচিশী প্রভৃতি পাঠ করিয়া হিন্দী ভাষায় একটু জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাই খুব সোজা দুই চারিটী দোহার মোটামুটি অর্থ না বুঝিতে পারিলাম, তাহা নহে। ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, বিহারীলাল কবিত্ব-শক্তিতে সংস্কৃত-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যের রচয়িতা অমরু কিংবা গোবর্দ্ধনাচার্য্য হইতে কম নহেন। তাই বিহারী-সতসঈ কাব্যখানা ভাল করিয়া পড়ার জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মিল। আমরা সটীক সংস্করণ

বলিতে যাহা বুঝি, "বিহারী-সতসঈ" কাব্যের সেরূপ কোনও সংস্করণ তখন পাওয়া যাইত না, তাই লক্ষ্ণৌ সহরের প্রসিদ্ধ হিন্দী-গ্রন্থ-প্রকাশক মুন্সী নওলকিশোরের নিকট লিখিয়া এক টাকা মূল্যে কৃষ্ণ কবক্বিত টীকা-সম্বলিত 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের যে সংস্করণটী আনাইলাম, তাহা পড়িয়া আরও হতাশ হইলাম। দেখিলাম, কৃষ্ণ কবি বিহারীলালের দোহার দুরূহ শব্দের অর্থ কিম্বা সমগ্র বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ না লিখিয়া, কেবল ঐ দোহার মর্ম্ম লইয়া সুদীর্ঘ 'কবিত্ত' ও 'সবৈয়া' ছন্দে নিজের কবিত্ব জাহির করিয়াছেন। এ যেন সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রের সূত্র-ভাষ্য। স্বল্পাক্ষর সূত্রটীর শব্দার্থ দ্বারা মোটামুটি যাহা বুঝা যায়, ভাষ্যের বাগাড়ম্বরে যেন উহাও গোলমাল হইয়া যায়। দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ-জ্ঞানের জন্য ভাষ্য ও টীকার তর্ক-গহনে প্রবেশ না করিলেই চলে না, কিন্তু কাব্যের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন 'বিহারী-সতসঈ' সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুবৃহৎ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'Twenty years ago, I began to translate him in English and after all that time, I have only been convinced of the impossibility of the adequate performance of the task at my hands. As any attempt of mine would spoil the original by weakening its conciseness and by rounding off the polished corners of its many jewels, I shall not venture to give here any examples in English of its beauties.' যেখানে মূলানুযায়ী অনুবাদেই এই দুর্দ্দশা, সেখানে বিহারীলালের দোহার অপরিবর্ত্ত-সহ, সুপ্রযুক্ত কয়েকটী শব্দের পরিবর্ত্তে ভাল-মন্দ অন্ততঃ চতুর্গুণ কথা বলিয়া, উহার মাধুর্য্য বুঝাইতে যাওয়া যে কিরূপ দুঃসাহসের কার্য্য, উহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য। তাই কৃষ্ণ-কবির টীকা (?) বা ছায়া-কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম না। অগত্যা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পুরাণ-পাঠক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত ধরিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রণামীর প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিহারীলালের দোহার অর্থ বুঝিয়া লওয়ার চেষ্টা পাইলাম; কিন্তু আমাদিগের এই চেষ্টাও সফল হইল না। দেখিলাম, পণ্ডিতজী নিজে দোহার অর্থ যেমনই বুঝিয়া থাকুন না কেন, তিনি পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ প্রতিশব্দ দিয়া বুঝাইতে অক্ষম; তাঁহার ব্যাখ্যায় দোহার যে একটা অস্পষ্ট অর্থ পাওয়া গেল, উহার কতটুকু বিহারীলালের, আর কতটুকু তাঁহার নিজস্ব, তাহা বুঝা গেল না; সুতরাং তাঁহার নিকট আমাদের পাঠ লওয়া বন্ধ করিতে হইল। ইহার পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আর আমাদিগের 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের চর্চ্চা করার কোনই সুযোগ ঘটে নাই। তার পরে একদিন কলেজ ষ্ট্রীটে পুরাতন পুস্তকের দোকানে সুলভ মূল্যের ভাল বই তালাস করিতে যাইয়া, বঙ্গবাসী ষ্টিম-মেসিন প্রেসে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত প্রভুদয়ালু পাঁড়ে মহাশয়ের টীকা-সমেত এক খণ্ড "বিহারীকী সতসঈ" দেখিতে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম। এক টাকা মূল্যের বইখানি চারি আনা দিয়া খরিদ করিয়া আনিয়া একরূপ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই বিহারীর কবিত্ব-রসের আস্বাদ

গ্রহণের জন্য লাগিয়া পড়িলাম। এই সংস্করণটী ১৯৫২ সংবতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৯৬ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রাঙ্কনের বোধ হয়, দুই এক বৎসর পরেই উহা আমাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। প্রভুদয়ালু পাড়ে 'টাইটেল-পেজ'এ 'মাথুর চতুর্ব্বেদী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি মথুরা-বাসী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রজ-ভাষার উপর তাঁহার বেশ দখল ছিল; তাই ডাক্তার ফ্যালনের প্রকাশিত সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হিন্দী অভিধানেও 'বিহারী-সতসঙ্গ' কাব্যের যে সকল প্রাদেশিক শব্দ ও প্রচরদ্রূপ (idiomatic) বাক্যের অর্থ খুঁজিয়া পাই নাই, পাঁড়েজীর টীকায় সে সকলের অর্থ এবং সে সম্বন্ধে অনেক স্থলে ভাষা-তত্ত্বালোচনা (philological discussion) দেখিতে পাইলাম। পাঁড়েজী বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালী ব্যাখ্যা-লেখকদিগের ব্যাখ্যা-পদ্ধতির সহিত অপরিচিত ছিলেন না; তাই বাঙ্গালা ছাপাখানার সটীক সংস্কৃত কাব্যের ধরণে মূলের শব্দগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া ছাপাইয়া, প্রথমে দোহার অন্বয়, তার পরে সরল অর্থ এবং অবশেষে শব্দ-ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন। বিহারীলালের কাব্যের প্রকৃত পরিচয় দিতে যাইয়া আমাদিগকে তাঁহার অনেক দোহাই সটীক উদ্ধৃত করিতে হইবে; সুতরাং পাঁড়েজীর টীকার নমুনাস্বরূপ এখানে প্রথম মঙ্গলাচরণের দোহাটী উদ্ধৃত করিলে উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে বলিয়া, আমরা উহা বঙ্গাক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া দিলাম। অতঃপরও এরূপ বঙ্গাক্ষরই ব্যবহার করিব।

মেরী ভব্ বাধা হরো রাধা নাগরি সোই।
জা-তনকী ঝাঁঈ পরৈ শ্যাম হরিত দুতি হোই॥

অন্বয়,—সোই রাধা নাগরি মেরী ভববাধা হরো,
জা তনকী ঝাঁঈ পরৈ শ্যাম দুতি হরতি হোই।

সরলার্থ,—বহী* রাধা নাগরী মেরী সংসারকী যন্ত্রণাকো হরে, জিস্‌কে শরীরকী ছায়া পড়নেসে শ্রীকৃষ্ণকী দ্যুতি হরে বর্ণকী হো জাতী হৈ। মঙ্গলাচরণ হৈ। শ্রীকৃষ্ণকী নীলকমলবৎ কান্তিমেঁ রাধাজীকী পীতচম্পকবৎ কান্তিকী ছায়া পড়নেসে শ্রীকৃষ্ণকী দেহদ্যুতি হরিদ্বর্ণকী হো জাতী হৈ, যুগল-মূর্ত্তিকা ধ্যান হৈ। নীলে ঔর পীলেকে সংযোগসে হরা রঙ্গ সিদ্ধ হোতা হৈ। শব্দব্যুৎপত্তি; নাগরি—নাগরী, নগরকী রহনেবালী, চতুর। ঝাঁঈ—ঝলক, ছায়া॥"

পাঠক দেখিবেন, টীকাটী বেশ সরল। তবে হিন্দী-ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য যেমনটি আবশ্যক—'মেরী,' 'হরো,' 'সোই,' 'তন্' প্রভৃতির স্বতন্ত্র অর্থ দেওয়া হয় নাই; তথাপি সরলার্থের সহিত মিলাইয়া পড়িলে মোটামুটি অর্থ বুঝিতে ক্লেশ হয় না।

এটী বোধ হয়, 'বিহারী-সতসঙ্গ'এর একটি অতি প্রাঞ্জল দোহা, কিন্তু পাঁড়েজীর টীকা পড়িয়া দোহার প্রকৃত তাৎপর্য্য তো বুঝা গেল না। শ্যাম বর্ণের উপর পীত বর্ণের ছটা

* বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব'এর জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর না থাকায় তৎস্থলে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর অনুকরণে 'ব' অক্ষর (উচ্চারণ ইংরাজী 'wa' বা 'va') ব্যবহৃত হইল। উদ্ধৃত হিন্দী অংশে 'স' এর উচ্চারণ ইংরাজী 's' বৎ হইবে।

পড়িলে উভয় বর্ণের মিশ্রণে যে হরিৎ অর্থাৎ সবুজ কান্তির উদ্ভব হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন; যুগল-মূর্ত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই প্রসিদ্ধ অথচ নূতন স্বভাব-বর্ণনা যে, কবির অসাধারণ মৌলিকতার পরিচায়ক, তাহা বেশ বুঝা গেল; কিন্তু ইহা দ্বারা ভব-পীড়া হরণ সম্বন্ধে শ্রীরাধার বিশেষ শক্তিমত্তা যে কোথায়, তাহা প্রকাশ পাইল না,—শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া শ্রীরাধার নিকটে সেরূপ প্রার্থনারও কোন সার্থকতা বুঝা গেল না; সুতরাং মঙ্গলাচরণের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িল। * 'বিহারী-সতসঈ'এর প্রাচীন ও নবীন নানা টীকা পড়িয়া এখন এ কথা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তখন পাঁড়েজীর টীকার বেশী আর যে কিছু অর্থ থাকিতে পারে, এরূপ মনেই হয় নাই। তবে কতকগুলি দোহায় পাঠ-বিভ্রাটের জন্যই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, পাঁড়েজীর ব্যাখ্যাও ভাল লাগিল না। মনে হইল, যেন শুধু দায়ে পড়িয়াই তিনি গোঁজা-মিল্ দিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সে ব্যাখ্যা বুঝি তাঁহার নিজেরও মনঃপূত হয় নাই। তার পরে পাঁড়েজীর সংস্করণে প্রেসের অথবা দপ্তরীর গোলযোগে ২২৫ হইতে ২৫৬ পর্য্যন্ত পাতাগুলি না থাকায় ৫৯৭ হইতে ৬৮২ সংখ্যক দোহার টীকা পাওয়া যায় নাই।† সুতরাং পাঁড়েজীর প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, তাঁহার এই টীকা পড়িয়াও আমরা তেমন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। তাঁহার টীকার সাহায্যে বিহারীলালের কাব্যের রসাস্বাদন অনেকটা সুসাধ্য হওয়ায় উহা পূর্ণ-মাত্রায় উপভোগ করার জন্য বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎসুক হইয়া উঠিলাম। কিন্তু 'বিহারী-সতসঈ'এর প্রাচীন কিম্বা নবীন অন্য কোন টীকাই তখন সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই খুঁজিতে যাইয়া সময়ে সময়ে অচিন্তিত-ভাবে কিরূপ অমূল্য ও অপ্রাপ্য গ্রন্থ-রত্ন হস্তগত হয়, তাহা বোধ হয়, অনেক পাঠকেরই অজ্ঞাত নহে; একবার এ অভ্যাস জন্মিলে তাহা কখনও ছাড়ান যায় না; আমাদিগেরও এই বই খোঁজার বাতিক পুরা মাত্রায়ই জন্মিয়াছিল, তাই সুযোগ পাইলেই কলেজ ষ্ট্রীটের পুরাতন-পুস্তকালয়ে গুপ্ত রত্নোদ্ধারের জন্য অভিযান করিতে পশ্চাৎ-পদ হইতাম না। এইরূপ একটা অভিযানে যাইয়া মিষ্টার (তখন ডাক্তার বা স্যর নহে) গ্রিয়ার্সনের প্রণীত "The Modern Vernacular Literature of Hindusthan" নামক দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। এই বহিখানির 'টাইটেল পেজ'এ লেখা আছে,—printed as a Special Number of the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I for 1888. এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত কোনও গ্রন্থই এক বার ফুরাইলে আর পুনরায় মুদ্রিত হয় না; সুতরাং এই গ্রন্থখানাও এখন অপ্রাপ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রিয়ার্সন মহোদয় Garcin de Tassy প্রণীত "History

* 'মেরী ভব বাধা' ইত্যাদি মঙ্গলাচরণের দোহার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য পরে যথাস্থলে ব্যাখ্যাত হইবে।

† প্রথমে মনে হইয়াছিল, আমাদের বইখানিই বুঝি শুধু খণ্ডিত; পরে কলিকাতায় ও কাশীতে এই সংস্করণের আরও কয়েকখানা বই দেখিয়াছি। সকলগুলির একই অবস্থা।

of Hindui and Hindūstani Literature", মুন্সী নওলকিশোরের লক্ষ্ণৌ প্রেস হইতে প্রকাশিত 'শিব সিং সরোজ' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ অবলম্বনে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভ হইতে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত নয় শত বায়াম জন হিন্দী কবি ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এই বহু জ্ঞাতব্য-পূর্ণ বহিখানিতে আমাদিগের প্রিয় কবি বিহারীলালের সম্বন্ধে কি মন্তব্য লিখা আছে, সাগ্রহে বাহির করিয়া পড়িলাম; গ্রিয়াস´ন লিখিয়াছেন,—"Bihārī Lāl Chaubé of Braj. Fl 1650 A. D.

Sat., Nir., Rāg. One of the most celebrated authors of India, his fame resting on his *Sat Saī* (Rāg), or collection of seven hundred dôhās, for each line of which he received a reward of a gold *ashrafi* from king *Jai Singh*. The elegance, poetic flavour, and ingenuity of expression in this difficult work are considered to have been unapproached by any other poet. * * * *

Bihārī's poem has been dealt with by innumerable commentators. Its difficulty and ingenuity are so great that it is called a veritable *Akṣara-Kāmadhenu*. The best commentary is that by *Surati Misar* (No. 326) Agarwālā.

* * * *

Amongst those who have commented on the Sat Saī may be mentioned *Chandr* (No. 213), *Gopal Saran* (No. 215). *Surati Misar* (No. 326), *Krish'n* (No. 327), *Karan* (No. 346), *Anwar Khan* (No. 397), *Zalfaqār* (No. 409), *Yusuf Khan* (No. 421), *Raghu Nath* (No. 559), *Lal* (No. 561), *Sardar* (No. 571), *Lallū Ji Lāl* (No. 629), *Ganga Dhar* (No. 811), *Ram Bakhsh* (No. 907).

কৃষ্ণ কবির অদ্ভুত টীকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; উহা ছাড়া গ্রিয়াস´নের উল্লিখিত আর কোনও টীকাই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগেরও যে শোচনীয় অজ্ঞতা আছে, তাহা অনেকটা দূর হওয়ায়, হিন্দী-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের খোঁজ পাইয়া, মুন্সী নওলকিশোরের প্রেস হইতে প্রকাশিত মালিক মহম্মদ জায়সীর সুপ্রসিদ্ধ 'পদ্মাবৎ,' কেশবদাসের 'কবি-প্রিয়া,' উদয়নাথের (কবীন্দ্র) 'রস-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি কাব্যগুলি আনাইয়া পাঠ করিলাম, কিন্তু উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণের অভাবে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তথাপি 'গ্রন্থস্ত গ্রন্থান্তরং টীকা'—এই প্রাচীন সূক্তিটীর উপর যথেষ্ট বিশ্বাস থাকায়, এই সকল গ্রন্থ নাড়া-চাড়া করিয়াই একটীর দ্বারা অন্যটীর টীকার কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ ভাবে হিন্দীর কাব্য-চর্চ্চা খুব

বেশী দিন চলিল না। গত দশ বার বৎসর কাল যাবৎ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীর সংগ্রহ, সম্পাদন ও আলোচনায় বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া হিন্দী-সাহিত্যের বড় একটা খোঁজ-খবর লইতে পারি নাই; এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে হিন্দী-সাহিত্যের গ্রন্থ-ভাণ্ডার কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে "প্রবাসী" পত্রিকায় দেখিতে পাই, সংযুক্ত প্রদেশের (United Provinces) বিজনৌর জেলার অন্তর্গত নায়কনগলা (পোঃ চান্দপুর) নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্ম্মা মহাশয় 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের সমালোচনাত্মক একখানা হিন্দী গ্রন্থ লিখিয়া "শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ-পারিতোষিক-সমিতি" হইতে নগদ ১২০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এই সংবাদটী পড়া মাত্রই ঐ সমালোচনা পড়িবার ইচ্ছা প্রবল হইল। হিন্দী ভাষায় দেব-নাগর অক্ষরে পত্রাদি লিখার তেমন অভ্যাস নাই; পণ্ডিতজী ইংরেজী জানেন কি না, তাহাও জানি না; তাই, অগত্যা কোনও প্রকারে তাঁহার নিকট হিন্দীতে একখানা পোষ্ট-কার্ড লিখিয়া এক খণ্ড পুস্তক আমাদিগের ঠিকানায় ভি-পি ডাকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইলাম এবং সাগ্রহে ঐ পুস্তকের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে ভি-পি পার্শ্বেলের পরিবর্ত্তে রেজেষ্টরী বুক-পোষ্টে ঐ পুস্তক ও প্রত্যুত্তরে একখানা পোষ্ট-কার্ড আগত হইল। পণ্ডিতজী নায়কনগলা হইতে ৬—৫—২৩ তারিখে লিখিলেন,—"আপ্‌কা হিন্দী মেঁ লিখা কৃপা-পত্র পাকর পরম প্রসন্নতা হুঈ, বঙ্গভাষা-ভাষী ঔর্ অংগ্রেজীকে বিদ্বান্ হো কর ভী আপ্ হিন্দীপ্রেমী হৈ, যহ্ জানকর্ 'আশ্চর্য্য' হুআ, অস্তু, "বিহারীকী সতসঈ" (ভূমিকাভাগ) আপ্‌কে হিন্দী-প্রেম্‌কে পুরস্কারমেঁ আপ্‌কো ভেজ্ রহা হূঁ, স্বীকার কীজিয়ে, ইস্‌কা দূস্‌রা ভাগ্‌ভী কুছ্ দিনোঁ পীছে ভেজ্‌ংগা, যহাঁ উস্‌কী কোঈ কাপী নহীঁ হৈ যথাসময় যাদ্ দিলাইএ।" পণ্ডিতজীর এই উদারতায় যেরূপ বিস্মিত ও আপ্যায়িত হইলাম, তেমনি বঙ্গভাষা-ভাষী ইংরেজীনবিশ যে হিন্দীর প্রেমিক ও 'বিহারী-সতসঈ'এর গ্রাহক হইতে পারেন, ইহাতে পণ্ডিতজীকে 'আশ্চর্য্য' হইতে দেখিয়া আমাদিগের দশার কথা ভাবিয়া যথেষ্ট লজ্জিত ও দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। পণ্ডিতজী 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের বিশেষজ্ঞ, সুতরাং তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রভুদয়ালু পাঁড়ে মহাশয়ের খণ্ডিত সংস্করণের অপ্রাপ্য অংশের কোনও 'পত্তা' দিলেও দিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আরও ভাল কোন সংস্করণের খোঁজ তাঁহার নিকট পাওয়া যাইতে পারে বিবেচনায় সে সম্বন্ধেও তাঁহার উপদেশ চাহিয়াছিলাম; তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—"প্রভুদয়ালু পাঁড়েকী টীকা 'বঙ্গবাসী প্রেস' কল্‌কত্তাসে প্রকাশিত হুঈ হৈ, বহীঁ সে মিলেগী। ডাক্‌টর গ্রিয়র্সন্ দ্বারা সম্পাদিত হোকর (ইংলিশ ভূমিকা সহিত) গবর্ণমেণ্ট প্রেস কল্‌কত্তাসে সতসঈকী "লালচন্দ্রিকা" টীকা প্রকাশিত হুঈ থী অব্ অপ্রাপ্য হৈ, কহীঁসে প্রাপ্ত হো সকে তো লেকর পঢ়িএ। প্রভুদয়ালুকী টীকা অশুদ্ধ হৈ, ভ্রষ্ট হৈ, উস্ পর আস্থা ন কীজিএ।" ইহারই দুই চারি দিন পরে পুনরায় লিখিলেন,—"আপ

ডাক্‌টর্‌ গ্রিয়র্স ন্‌বালা সংস্করণ কহীসে প্রাপ্ত করকে অবশ্য দেখিয়ে, উস্‌কী অংগ্রেজী ভূমিকা সে সতসঈকে সম্বন্ধমেঁ আপ্‌কো অনেক্‌ জ্ঞাতব্য বাতেঁ বিদিত হোঁগী। উক্ত সংস্করণ বহুত দিন হুএ গবর্ণমেণ্ট্‌ কল্‌কত্তে মেঁ ছপা থা, অব্‌ অপ্রাপ্য হৈ, পর আপ্‌ চাহেঙ্গে তো কিসী প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় যথা ইম্পিরীয়ল লাইব্রেরী কল্‌কত্তা আদিমেঁ আপ্‌ উসে পা সকেঙ্গে। উহ আপ্‌কে লিয়ে অবশ্য দ্রষ্টব্য হৈ। প্রভুদয়ালু পাঁড়েকী টীকা অচ্ছী নহীঁ হৈ, বহুত অশুদ্ধ হৈ। * * * এক্‌ দুস্‌রা টীকাভী বিদ্যার্থিয়োঁকে লিয়ে অচ্ছী নিকলী হৈ—উস্‌কা নাম "বিহারীবোধনী" লালা ভগবান দীনকৃত হৈ। বহ আপ্‌কো "হিন্দী পুস্তক এজেন্সী" ১২৬ হরীসন্‌ রোড কল্‌কত্তা সে ২৲ রূ০ কো মিলেগী, উসে ভী মঙ্গা লী-জিএ।"

কলিকাতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী হইতে ডাক্তার (অধুনা স্যর) গ্রিয়ার্স ন মহোদয়ের সম্পাদিত 'লাল-চন্দ্রিকা' সংগ্রহ করা আমাদিগের পক্ষে সুসাধ্য নহে, তাই হিন্দী-পুস্তক এজেন্সী হইতে ২।০ টাকা মূল্যে লালা ভগবান দীনের কৃত 'বিহারীবোধনী' এক খণ্ড আনাইয়া পাঠ করিলাম। দেখিলাম, ইংরেজী ১৯২১ সালে কাশীর 'সাহিত্যসেবা-সদন' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রত্ন-মালা' গ্রন্থাবলীর ১ম রত্নরূপে উহা কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লালাজী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লালাজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাত-নামা অধ্যাপক ; সুতরাং তাঁহার টীকা 'বিদ্যার্থিয়োঁকে লিয়ে অচ্ছী' হওয়ারই কথা ; বস্তুতঃ লালা-জীর এই টীকাতে নব্য ধরণে একটি নাতি-বিস্তৃত ভূমিকা এবং দোহাগুলির সংখ্যা-সূচক অকারাদি-ক্রমে সূচী-পত্র, গ্রন্থ-শেষে অতি-সংক্ষিপ্ত শব্দ-কোষ সংযোজিত হইয়াছে। 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যে আধুনিক হিন্দীর অপ্রচলিত প্রাচীন ব্রজ- ভাষার শব্দ এত অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে যে, শব্দ-কোষটী ইহার অন্ততঃ চতুর্গুণ বড় হইলেও বুঝি অসঙ্গত হইত না। লালা-জী প্রত্যেক দোহার নীচে 'শব্দার্থ', 'ভাবার্থ', 'বিশেষ', 'অলঙ্কার' ইত্যাদি ছোট ছোট হেডিংএ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রভুদয়ালুর পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকার সহিত তুলনা করার জন্য আমরা তাঁহার প্রথম দোহার টীকাও নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

"দো°—মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়।
জা তন কী ঝাঁঈ পরে স্যাম হরিত দুতি হোয়॥

শব্দার্থ—ভববাধা = জন্ম মরণ কা দুঃখ। জা তন কী = জিসকে শরীর কি। ঝাঁঈ = ছায়া। স্যাম—শ্রীকৃষ্ণ। হরিতদুতি = আনন্দিত।

ভাবার্থ—বে হী রাধা নাগরী মেরে জন্ম মরণ কে দুখোঁ কো দূর করেঁ, জিন্‌কে শরীর কী ছায়া পড়্‌তে হী শ্রীকৃষ্ণ জী ভী (জো স্বয়ং আনন্দমূর্ত্তি হৈঁ) আনন্দিত হো জাতে হৈঁ।

বিশেষ—ইস্‌ দোহে মেঁ কবি শ্রীরাধিকা জাকো কৃষ্ণ সে ভি বড় কর্‌ আনন্দদায়িনী শক্তি মান্‌কর্‌ নিজ্‌ দুঃখ হরণ্‌ কী প্রার্থনা কর্‌তা হৈ।

অলঙ্কার—কাব্যলিঙ্গ। (কাব্যলিঙ্গ জহঁ যুক্তি সোঁ অর্থ সমর্থন হোয়)।

(সূচনা)—হমারী সম্মতি মেঁ 'হরিতদ্যুতি' কা অর্থ হোনা চাহয়ে "হরী গঈ হৈ দ্যুতি জিস্‌কী"। ইসী অর্থ সে রাধিকা জীমেঁ 'ভববাধা' হর্‌নে কী শক্তি কা হোনা প্রতিপাদিত হোকর্‌ 'কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কার সিদ্ধ হো সকৃতা হৈ।

এই দোহাটী প্রভুদয়ালু পাঁড়ের টীকার সহিত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সেখানে দেখিয়াছি যে, পাঁড়েজী তাঁহার টীকায় শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া, শ্রীরাধার নিকট সংসার-তাপ হরণের প্রার্থনার কোনও তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। লালা-জীর সূচনার উক্তি দ্বারা ইহার সুন্দর সমাধান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহার মাত্র ছায়ার সাহায্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-কান্তি অপহৃত হওয়ায় তিনি 'হরিত-দ্যুতি' হইয়া থাকেন, তাঁহার অলৌকিক হরণ-শক্তি এবং উহার প্রভাবে ভক্ত কবির সংসার-তাপ-কালিমা অপহৃত হইবে, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? কিন্তু 'হরিত-দ্যুতি' শব্দের শুধু এই একটী মাত্র অর্থই কি কবির অভিপ্রেত? শ্রীরাধার (পীত-বর্ণের) ছায়া-পাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-কান্তি বিদূরিত হইলে, তৎস্থলে তাঁহার আর একটী কান্তি তো অবশ্যই সঞ্জাত হইবে; সেই কান্তিটী যে কি, তাহা না বলিলে এই বর্ণনা যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অবোধ্য থাকিয়া যায়। বিহারীলাল এরূপ অসতর্ক কবি ছিলেন না; তিনি 'হরিত-দ্যুতি' এই শ্লিষ্ট অর্থাৎ বহু-অর্থ-যুক্ত শব্দটির প্রযোগ দ্বারা বেশী না হউক, অন্ততঃ 'অপহৃত-কান্তি যুক্ত' ও 'সবুজ-কান্তি-যুক্ত' এই দুইটী অর্থই যে লক্ষ্য করিয়াছেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কারণ, উহার কোনও একটী অর্থ স্বীকার করিয়া অন্যটী স্বীকার না করিলে অর্থের গুরুতর অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। কোনও কোনও টীকাকারের স্বীকৃত 'আনন্দিত' অর্থ সম্বন্ধে কিন্তু এই কথা বলা যায় না। ঐ 'আনন্দিত' অর্থ আদৌ কবির অভিপ্রেত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। লালাজীরও বুঝি 'আনন্দিত' অর্থ টী খুব ভাল লাগে নাই, তাই 'ভাবার্থ' বলিয়া প্রাচীন মতের সেই 'আনন্দিত'-অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় সূচনায় 'হমারী সম্মতি মেঁ' বাক্যের দ্বারা নিজের অভীষ্ট ব্যাখ্যাটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যাহা হউক, পাঁড়েজীর টীকায় যে দোহাগুলির অর্থ আমাদিগের মনঃপূত হয় নাই, লালা-জীর টীকায় সেইগুলির অধিকাংশেরই বেশ সঙ্গত অর্থ জানিতে পারিয়া জ্ঞান-পিপাসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্ম্মা মহোদয় কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংসিত ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের সম্পাদিত 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা সংগ্রহ করার জন্য উৎসুক হইলাম। পণ্ডিত-জীর সহিত আমাদিগের সেই অবধি পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল; আমরা 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই জানিয়া, তিনি তাঁহার নিজের ব্যবহার্য্য ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের সংস্করণটী আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পাদিত 'সঞ্জীবন-ভাষ্য' দপ্তরীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসে নাই—অথচ আমরা উহার জন্য নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তাঁহার সঞ্জীবন-ভাষ্যের ফাইলকাপিগুলিও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন। পণ্ডিতজীর ভাষ্য সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী, সুবৃহৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট; আমরা উহার কথা সকলের

শেষে বলিব। তৎপূর্ব্বে 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা ও ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের ভূমিকার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

'লাল-চন্দ্রিকা' টীকাটী কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম কলেজের হিন্দীর অধ্যাপক লাল্লুলাল কর্ত্তৃক রচিত হইয়া ইংরেজী ১৮১৯ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা সহ 'বিহারী-সতসঈ' হিন্দীর অনার-পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। লাল্লুলালের এই সংস্করণ দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রাপ্য হওয়ায় ডাক্তার গ্রিয়ার্সন মহোদয় ইংরেজী ১৮৯৫ সালে কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রেস হইতে উহার পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কন করেন। ইহাতে ২১ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ইংরেজী ভূমিকা, হিন্দী-ভাষার সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ (Rhetoric) 'ভাষা-ভূষণ' ও উহার সটীক ইংরেজী অনুবাদ ১১৪ পৃষ্ঠা, উজ্জ্বল লাল কালীতে মুদ্রিত মূল দোহা সহ 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকা ২৯৩ পৃষ্ঠা, Additional Notes নামে লাল-চন্দ্রিকার অতিরিক্ত হিন্দী-টীকা ২১ পৃষ্ঠা এবং 'লালচন্দ্রিকা', 'হরিপ্রকাশ,' 'অনবরচন্দ্রিকা,' 'কৃষ্ণদত্ত কবির টীকা,' 'শৃঙ্গার-সপ্তশতী' ও 'রসকৌমুদী' টীকাগুলির স্বীকৃত ক্রম অনুসারে দোহাগুলির সংখ্যা-নির্দ্দেশাত্মক সূচীপত্র ৩৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ মোটে বৃহৎ আকারের ৪৮৫ পৃষ্ঠা আছে। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। বিহারীলাল সংস্কৃতের কবিদিগের অনুকরণে 'সতসঈ' কাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের বর্ণিত নানা প্রকারের 'ধ্বনি' ও অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ করায়, অলঙ্কার-শাস্ত্রে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে টীকার অথবা মূল দোহার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, এ জন্যই গ্রিয়ার্সন যশবন্ত সিংহের রচিত 'ভাষা-ভূষণ' নামক প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নাতিবিস্তৃত হিন্দী অলঙ্কার-গ্রন্থখানির মূল ও সটীক ইংরেজী অনুবাদ 'লাল-চন্দ্রিকা' টীকার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ-সম্পাদনে ডাক্তার গ্রিয়ার্সনকে যে কিরূপ অদ্ভুত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা Prefaceএর—"The preparation of this book has been no light task and more than a fair share of my eye-sight lies buried in it" উক্তি হইতেই বুঝা যাইতে পারিবে।

বিহারীর 'সতসঈ' গীতি-কাব্য (Lyric poetry) এবং কোষ-কাব্যের (Detached verses) লক্ষণাক্রান্ত। ইহার বিশেষত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া ডাক্তার গ্রিয়ার্সন তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় সংস্কৃত গীতি-কাব্যের আদর্শস্বরূপ ঋক্‌বেদের স্তোত্র-সমূহের এবং কালিদাসের 'মেঘদূত,' 'ঋতুসংহার' ও চৌর-কবির বিরচিত 'চৌর-পঞ্চাশিকা' কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ গীতি-কাব্য হইতে কোষ-কাব্যের বিশেষত্ব দেখাইতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"The lotus bloom of Indian verse is its lyric poetry" * * * "It is however in its detached verses—sonnets if I may use the expression—that the genius of Indian lyric poetry has reached its full perfection. These brief quatrains, miniatures, each portraying by means of a few lines drawn by a master-hand little pictures complete alike in its

nature and in its art, coloured with all the richness which a copious and flexible language could give, attracted the attention of Western admirers at an early stage of the intercourse between Europe and India." কোষ-কাব্যের অতি প্রাচীন আদর্শ প্রাকৃত-ভাষার গাথা-সপ্তশতী বা হাল-সপ্তশতিকা যে ধ্বনি-প্রধান গীতি-কাব্যের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের অবিদিত নহে। মহাকবি বাণ ভট্ট হর্ষচরিতের প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী শ্রেষ্ঠ কবিদিগের প্রশস্তি-প্রসঙ্গে সাতবাহন ওরফে হাল নৃপতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এই কোষ-কাব্যখানির মুক্ত-কণ্ঠে গুণ-কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। * 'এই প্রাকৃত ভাষার গাথা-সপ্তশতী ও জয়দেব কর্ত্তৃক প্রশংসিত আদি-রসের অদ্বিতীয় কবি † গোবর্দ্ধন আচার্য্যের 'আর্য্যা-সপ্তশতী'—এই দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যের আদর্শে বিহারীলাল হিন্দী-ভাষায় 'সতসঈ' রচনা করেন, সুতরাং তাঁহার কাব্যের প্রকৃত যাচাই করিতে হইলে প্রাকৃতের গাথা-সপ্তশতী ও সংস্কৃতের আর্য্যা-সপ্তশতীর সহিত বিশেষভাবে তুলনা করা আবশ্যক; পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মা ব্যতীত প্রাচীন কিংবা নব্য কোন লেখকই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই।' তাঁহার তুলনাত্মক সমালোচনা এ জন্যই হিন্দী-সাহিত্যে অদ্বিতীয় এবং পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তাপূর্ণ কাব্য-সমালোচনার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বিহারীলালের কাব্যের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে পণ্ডিতজীর তুলনাত্মক সমালোচনা (ভূমিকা-ভাগ) ও 'সঞ্জীবন-ভাষ্যে'র সাহায্য লওয়া অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর কোনও উপায় নাই; সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই উহা হইতে বহু স্থল উদ্ধৃত করিতে হইবে; তৎপূর্ব্বে ডাক্তার (অধুনা স্যর) গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের ন্যায় বহু-ভাষা-বিৎ, সুপণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ভারতের এই অপূর্ব্ব কোষ-কাব্যগুলির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

গ্রিয়ার্সন তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"The oldest and one of the most admired is the Sapta-Śatikā or Seven centuries of Hāla, written somewhere about the fifth century A. D. We have here some seven hundred verses in one of the Prakrit languages, over which critic after critic has exhausted the vocabulary of praise. Professor Weber who first drew attention to this dainty work in 1866 speaks of it as a collection of tiny masterpieces of art, village idylls in the smallest imaginable frames. Dr. Von Schroeder, their latest describer, praises some as purely lyrical and others as resembling the most charming little genre

* অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥ – হর্ষচরিতম্।

† •শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ * * * । – গীতগোবিন্দম্।

pictures, proving once more the talent of the Indians for miniature painting"

* * * * *

"Bihārī-lāl, the author of the 'Sat-saī or Seven Centuries, on which the Lāla-Chandrikā is a commentary was the legitimate successor of Hāla. Like him he wrote in the vernacular of his time seven centuries of verselets, each a complete little poem in itself."

পুনশ্চ—

"Bihārī-lāl has been called the Thompson of India : but I do not think that either he or any of his brother lyric poets of Hindusthan can be usefully campared with any Western poet. I know nothing like his verses in any European language. Let it be remembered that each couplet is complete in itself, and that none of them can contain more than fortyeight syllables, while many of them contain only twenty-six. Each verse must be one whole—an entire picture, —frame and all. These facts will give some idea of the skill necessary for success in this most difficult miniature painting. That he has succeeded is the unanimous verdict of every scholar European or Native who has read the Sat-Saī. I myself was first led to do so by the enthusiastic praises of an old Baptist missionary, a worthy descendant of the great Carey, and during the twenty years, which have since elapsed, I have never failed to find fresh pleasures in its study and fresh beauties in the danity word-colouring of the old master."

পুনশ্চ—"Owing,however, to the extreme conciseness of style rendered necessary by the small scale on which the author worked, it is one of the most difficult books in any Indian language. * * *

"Alliteration, the pun, the paranomasia, in no way makes his verses easy reading and would, indeed, tend to disgust the student brought up in Europe and accustomed to the severer graces of Hellenic poetry, did not the admirable polish and completeness of the whole compensate for the labour involved in ascertaining all his meaning."

বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনায় কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় প্রাচীন কবির ভাগ্যে এরূপ প্রশংসা-লাভ ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহের বিষয়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের ন্যায় প্রতীচ্য মহাত্মগণ নানারূপ অসুবিধার প্রতি দৃক্-পাত না করিয়া যে কাব্যের সমগ্র রস হৃদয়ঙ্গম করার আগ্রহে কোনও পরিশ্রমকেই পরিশ্রম্ বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই, শুধু সেই কাব্যখানির ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালা কোনও অনুবাদ প্রকাশিত না হওয়ায়, পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ আমরা কি না ভারত-বাসী হইয়াও আমাদিগের এই ব্রজ-বাসী কবি-ভ্রাতার সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্য-যুক্ত ও আদ্যোপান্তে ভারতীয় ভাব-পূর্ণ অতুলনীয় কাব্যখানির অনুশীলন করা দূরে থাকুক, উহার সহিত এক প্রকার অপরিচিতই রহিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

পুরুলিয়ার পাখী

(৩)

মানভূমে এত খাল, বিল, দিঘি, বাঁধ যে, সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়, ঋতুবিশেষে যাযাবর হংসজাতীয় বিহঙ্গ কি পরিমাণে এখানে আবির্ভূত হয়। পাশ্চাত্য লেখকদিগের

সরাল, Dendrocycna javanica

পুস্তকে শুধু নয়, স্থানীয় অধিবাসীদিগের মুখে অনেক রকম হাঁসের বর্ণনা পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিমঋতুর প্রাক্কালে আমরা কচিৎ দুই একটি হংস পুরুলিয়ায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। দলে দলে তাহাদের আগমন এখনও রীতিমত আরম্ভ হয় নাই। যে হাঁস দেখিতে পাওয়া গেল, সে যাযাবর নহে; আমরা তাহাকে সরাল বলি। ইংরাজ তাহার নাম দিয়াছেন, Whistling Teal।

সাহেব বাঁধের সব পাখীর উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। বক, পানকৌড়ি, ষ্টর্কের সঙ্গে কুরর, শঙ্খচিল, মাছ-মরালকেও একই বৃক্ষে উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যাইত। ইহারা সকলেই মৎস্য শিকারে পটু। ইহাদের পরিচয় পরে দেওয়া হইয়াছে।

Motacilla alba dukhunensis; হলদে খঞ্জন, M. melanope; M. flava thunbergi

কত খঞ্জন বাঁধের ধারে চরিয়া বেড়াইত, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তিনটি মাত্র বিভিন্ন প্রকারের খঞ্জন দেখিয়াছিলাম; তাহাদের মধ্যে Pied বা সাদা-কালা মিশ্রণের খঞ্জনই সংখ্যায় অধিক।

টিট্টিভ, Sarcogrammus indicus

টিট্টিভ-জাতীয় কয়েকটি পাখীকে ঝাল্‌দের পার্ব্বত্য অঞ্চলে জলাশয়ের ধারে দেখিতে পাওয়া গেল।

ডাহুক, Amaurornis phœnicurus

কাদাখোঁচা, Gallinago Cœlestis

পুরুলিয়ায় ডাহুকের কণ্ঠস্বর প্রত্যহই শুনা যাইত, কিন্তু কাদাখোঁচার বড় বেশী সন্ধান পাই নাই।

টুনটুনি, Orthotomus sutorius

বাংলা দেশে টুনটুনি সুপরিচিত। পুরুলিয়ার ছোট বড় বাগানগুলির মধ্যে দিনের বেলায় দুই এক জোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঝাল্‌দের ঘন জঙ্গলে পাহাড়ের নীচে ইহাকে দেখা গেল; কিন্তু বিশাল মুক্ত প্রান্তরে বন্ধুর ভূমির উপর টুনটুনি বিচরণ করে না।

দুর্গাটুনটুনি, Arachnecthra asiatica

বাংলায় যে দুই রকম দুর্গাটুনটুনি দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে একটা মানভূমে পাইলাম। তাহার সমস্ত দেহটা কালো; একটা খুব উচুঁ শিরিষ গাছের উপরে ফুলের মধু পান করিতেছিল। এখানে কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বিরল।

অশ্বত্থ, বট, কুসুম, পলাশ গাছের উপরে হরিয়াল দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে; বিশেষতঃ যখন অশ্বত্থ বটের ফল পাকিবার সময় হয়, তখন কোথা হইতে ইহারা এ অঞ্চলের পল্লী ও নগরে সহসা অধিক সংখ্যায় আবির্ভূত হয়। গায়ের রং সবুজ

বলিয়া গাছের পাতার মধ্যে কতকটা আত্মগোপন করার সুবিধা ইহাদের আছে। শিকারী সন্ধান করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলে প্রায়ই একাধিক হরিয়াল প্রতিবারে নিহত হয়; কারণ, ইহারা ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া ঝাঁক বাঁধিয়া গাছের উপরে বসে। স্বভাবতঃ ভীরু হইলেও ধাঙ্গড়, কুলি-শ্রেণী মানুষকে তাহারা ভয় করে না—ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল—যখন দেখা গেল যে, ঝালদের লাক্ষা-চাষে রত ধাঙ্গড়গুলার খুব কাছাকাছি গাছের উপরে ইহারা স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

হরিয়াল, Crocopus chlorogaster

ইহাদের জাতি-সম্পর্কীয় অপরাপর পাখীর তুলনায় ইহারা আয়তনে কিছু বড় এবং এ অঞ্চলে সংখ্যায় কিছু বেশী।

আশ্বিনের শেষে কোকিলের ডাক শুনিতে পাওয়া গেল না; তবে মাঝে মাঝে দুই একটা স্ত্রী-কোকিলকে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে চকিতের ন্যায় উড়িয়া যাইতে দেখা যায়; কচিৎ উচ্চ বৃক্ষশাখার পত্রান্তরালে একটা কোকিলকে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই।

কোকিল, Eudynamis honorata

কোকিলের জাতিবর্গীয় আরও কয়েকটা পরভৃত মানভূমের অধিবাসী; কিন্তু কোনটাই এই সময়ে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বাংলা দেশের মত এখানেও কাণাকোয়ার কণ্ঠস্বর আমাদিগকে আকৃষ্ট করে; সহসা হয় ত ইহাকে ভূমিতে অবতরণ করিয়া ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিতে দেখা যায়; অথবা কোনও বৃক্ষকাণ্ডে আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে তাহার লম্বা কালো পুচ্ছটি হয় ত নয়নগোচর হইল, সমগ্র দেহটা কিন্তু ঠিক দেখিতে পাওয়া গেল না।

কাণাকোয়া, Centropus sinensis

এই বংশপত্রবর্ণ লম্বচঞ্চু দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় বিহঙ্গটিকে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আকাশে উড়িতে দেখা যায়। ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল; উড্ডীয়মান ছোট ছোট পোকা ধরিবার জন্য ইহারা অনবরত বৃক্ষশাখা হইতে ইতস্ততঃ আক্রমণ-চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। ভূমির উপরে কোনও ভক্ষ্য কীটকে দেখিতে পাইলে বেগে অবতরণ করিয়া তাহাকে চঞ্চুপুটে লইয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। অনেক সময়ে রেলের ধারে, টেলিগ্রাফের তারে বসিয়া শিকার সন্ধান করে; তীরের মত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বেগে শিকারের উপর পতিত হইয়া নিমেষের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় সেই তারের উপরে আসিয়া বসে। আশ্বিনের শেষে ইহাদিগকে পুরুলিয়ায় বড় একটা দেখি নাই; এই সময়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হইত। কিন্তু পরে যখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, তখন তাহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া গেল।

বাঁশ-পাতি, Merops viridis

বাড়ীর আশে পাশে সহরের মধ্যে বাগানে সর্ব্বত্রই চটকের গতিবিধি। ইহারা গৃহস্থের কাছাকাছি থাকে, প্রান্তরে বা বনে জঙ্গলে অত্যন্ত বিরল। সে সব জায়গায় আর একটি চটকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নাম বন-চড়াই। উচ্চ

চড়াই, Passer domesticus

বৃক্ষশাখা হইতে ইহাদের কলরব বনভূমি মুখরিত করে; দেহটি গৃহচটকের মত নধর ও পরিপুষ্ট নহে; বরং ক্ষীণাঙ্গ এবং অপেক্ষাকৃত লম্বা; পুংশ্চটকের কণ্ঠদেশে একটি হলুদবর্ণের উজ্জ্বল ফোঁটা থাকে। সহরের মধ্যে ইহাদিগকে যে দেখা যায় না, তাহা নহে; বড় রাস্তার দুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণীর উচ্চ শাখায় কয়েকটাকে মাঝে মাঝে দেখা যায়। ইহাদের কণ্ঠস্বর ঠিক প্রথমোক্ত গৃহচটকের মত নহে; পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোন্ জাতীয় চটক, তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারেন।

বন-চড়াই
Gymnorhis flavicollis

ধূলাচেটা পাখী দেখিতে অনেকটা চড়াইএর মত; চটকের গলদেশের যেমন খানিকটা কালো, ইহারও গলদেশ হইতে তলপেট পর্য্যন্ত অনেকটা মসীবর্ণ; স্বভাবও কতকটা চড়াইএর মত; ভূমির উপরে বীজাদি খাদ্য আহরণের চেষ্টা করে; ধূলিলিপ্ত হইয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে ইহারা পটু। সহরের বাহিরে কাঁসাই নদীর পরপারে আকাশ হইতে ইহার সুললিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলে দেখা গেল যে, কয়েকটা পাখী কিছু দূর আকাশে উঠিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই সুন্দর ভঙ্গীতে অনতিদূরে ভূমির উপরে অবতরণ করিতেছে। উর্দ্ধে উঠিবার সময় তাহাদের যত কিছু গান কণ্ঠ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, নিম্নে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহা থামিয়া গেল; ভূমিতে নামিয়া তাহারা আহার্য্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল।

ধূলা-চেটা,
Pyrrhulauda grisea

কাঁসাই নদের পোলে উঠিবার রাস্তার দুই ধারে খর্ব্ব লতাগুল্মের ডালে কয়েকটা মুনিয়াকে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম। ইহার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আর কোনটা আমার চোখে পড়ে নাই; কেবল লাল মুনিয়াকে (Sporæginthus amandava) খাঁচার মধ্যে পালিত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম।

মুনিয়া, পিদ্‌ড়ি,
Munia malabarica

আগিয়া, Mirafra assamica—ইহাকে মাঝে মাঝে ভূমি হইতে শূন্যে উঠিতে উঠিতে গান গাহিতে দেখা যাইত। সংখ্যায় বড় অধিক নহে।

সহরের মধ্যেও প্রায় প্রত্যেক বাগানেই ইহার বিচিত্র কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রকায়, ধূসরবর্ণ পাখীটি অন্য দুই একটি বিভিন্ন বর্ণের "ক্যার-কেটা" হইতে একটু স্বতন্ত্র। বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে, এমন কি, কলিকাতার বড় বড় বাগান বাড়ীতে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহারা কীটভুক্; ভূমির উপর হইতে মানুষের অনিষ্টকর কীটাদি মুখে করিয়া ইহারা গাছের উপরে বসিয়া উদরসাৎ করে; এই জন্য এক হিসাবে ইহারা কৃষিজীবী মানুষের বন্ধু। মানভূমে ইহারা স্থায়িভাবে অবস্থান করে।

ক্যারকেটা,
Lanius cristatus

কয়েকটি ছোট বসন্তবৌরি আমার চোখে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় বড় বসন্তবৌরির একটিও আমি দেখিতে পাই নাই। ইহার স্বভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না; বাংলা দেশেও যেমন, এখানেও তেমনই।

বসন্তবৌরি, ছোট,
Xantholæma hæmatocephala

ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কয়েক জাতীয় (species) কাট্‌ঠোক্‌রা মানভূমে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি কিন্তু পুরুলিয়ায় একটাকে দেখি নাই, কিম্বা উহার কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাই নাই।

কাঠঠোক্‌রা

গৃধ্র—এই বীভৎস পাখীদের দুইটা জাতি সাধারণতঃ খুব বেশী সংখ্যায় পুরুলিয়ার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়,—রাজগৃধ্র, যাহার বৈজ্ঞানিক নাম Otogyps Calvus এবং শকুন, Pseudogyps bengalensis। প্রথম পাখীটার দেহ কালো এবং মসৃণ; মাথা এবং ঘাড়ের লোমহীন অনাবৃত ত্বক্ রক্তবর্ণ; পদদ্বয়ও লালবর্ণের। দ্বিতীয় পাখীটার পিঠে সাদা পতত্র আছে; এই জন্য ইংরাজের নিকটে ইহা White-backed vulture নামে পরিচিত। আরও একটা গৃধ্রকে মানভূমের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ইহার স্বভাব এবং উৎপতনভঙ্গী অপর সমস্ত গৃধ্র হইতে পৃথক্; আকার এবং দৈহিক আয়তনেও সে তাহার অন্যান্য জাতিদের চেয়ে খুব ছোট। গায়ের রং সাদা; ডানাগুলা কাল্‌চে; ঘাড়ের লম্বা লম্বা রোমাবলি লাল্‌চে রংএর। এই পাখীটার বৈজ্ঞানিক নাম Neophron ginginianus। শবভুক্ হইলেও সাধারণতঃ ইহাকে গ্রাম বা নগরের আবর্জ্জনাস্তূপের সান্নিধ্যে বিচরণ করিতে দেখা যায়; প্রায় সঙ্গিহীন থাকে, কচিৎ দুই তিনটা একত্র দৃষ্ট হয়।

কুরর ও মাছ-কোরাল—সাহেব-বাঁধের কুঞ্জবনে ইহাদিগকে বক পানকৌড়ি ইর্কের সঙ্গে প্রায়ই এক বৃক্ষে আসীন দেখা যায়। সাহেব বাঁধে ইহারা প্রচুর শিকার পায়। কুরর অব্যর্থ সন্ধানে পদনখর সাহায্যে জলের মধ্যে হইতে মাছ ধরে এবং মাছ-কোরাল চোরের উপর বাট-পাড়ি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করে। কুররের সাদা মাথা এবং ঘাড়ের মাঝখানে এবং পার্শ্বে ধূসর বর্ণের রেখা আছে; পিঠের রং ধূসর এবং পেটের বর্ণ সাদাটে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Pandion haliaetus। মাছ-কোরালের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ধূসর; মস্তক ও ঘাড়ের দুই পার্শ্ব, কপাল এবং কণ্ঠদেশ সাদা রংএর; পুচ্ছের কিয়দংশও সাদা। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Haliaetus leucoryphus.

কুরর, Pandoin haliaetus

মাছমরাল বা মাছ-কোরাল, Haliaetus leucoryphus;

শঙ্খ চিল, Haliaster indus

চিল, Milvus govinda—পুরুলিয়ায় ইহার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সাহেব-বাঁধের দ্বীপে বৃক্ষের উপর তাহাকে রাত্রিযাপন করিতে দেখা যায়।

শঙ্খচিল, Haliastur indus—মানভূমে এই বিহঙ্গের স্বভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। বাংলা দেশের মত খাল বিল ডোবার সান্নিধ্যে ইহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

শিক্‌রা, Astur badius—ইহা এবং ইহার কয়েকটা জাতিবর্গকে মানভূমের নানা স্থানে দেখিতে পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাদের সকলের classification বা শ্রেণীবিভাগ যথাযথরূপে নির্ণয় করিবার বড় সুযোগ পাই নাই।

পেচক—পুরুলিয়ায় মাত্র দুই একটা প্যাঁচার সন্ধান পাইলাম; তন্মধ্যে একটা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত কুটুরে প্যাঁচা, Athene brama।

মক্ষিকাভুক্ Muscicapidae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যে কয়েকটা বিহঙ্গকে পুরুলিয়ায় দেখিতে পাওয়া গেল, তাহারা প্রায় সকলেই যাযাবর। তাহারা হিমঋতুর আগমনে ভারতবর্ষের নানা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাদের একটার নাম Siphia parva; পুরুলিয়ার অনেক বাগানের মধ্যে তাহাদিগকে আহার্য্য সংগ্রহে রত দেখিলাম। আর একটা যাযাবর পাখী, Cyornis rubeculoides এই সময়ে পুরুলিয়ার নানা স্থানে ক্রমাগত আট দশ দিন ধরিয়া আমাদের নজরে আসিতেছিল; কখনও দুইটা বা তিনটা পাখীকে কাছাকাছি দুই তিনটা স্বতন্ত্র বৃক্ষে দেখিলাম। বেশ বুঝা গেল যে, এখন ইহাদের প্রব্রজনের সময় উপস্থিত এবং ইহারা এখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পুরুলিয়ায় যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে, তাহারা সামান্য কয়েক দিনের জন্য এই সহরের মধ্যে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে; শীঘ্রই সহর পরিত্যাগ করিয়া, ইহাদের উপযোগী স্থান খুঁজিয়া লইবে।

টিয়া, Palæornis torquatus

পুরুলিয়ায় টিয়া সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা আমাদের বাংলা দেশের সুপরিচিত টিয়া, কণ্ঠরেখা-সমন্বিত। কিন্তু ঝাল্‌দের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ফুলটুশী (P. cyanocephalus) বহুসংখ্যক দেখা গেল; ইংরাজ ইহাকে Blossom-headed parrot বলেন। পুংপক্ষীর মাথাটা লাল, স্ত্রীটার মাথার রং বেগুনে। হরিয়াল (সংস্কৃত হারীত) পাখীর সঙ্গে একই অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষের উপর অবস্থান করিয়া ফল ভক্ষণে ইহাকে রত থাকিতে দেখা যায়।

ছাতারে crateropus canorus

বাংলার সমতল ক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বত্র পরিচিত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুরুলিয়ার পথে ঘাটে মাঠে কোথাও ইহাকে এই ঋতুতে দেখিতে পাইলাম না। ঝাল্‌দের পার্ব্বত্য জঙ্গলে কিন্তু ইহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল।

Thamnobia Cambaiensis

ঐ জঙ্গলে আর একটা পাখী দেখিতে পাইলাম,—সাধারণ Indian Robin; আমাদের এই বাংলা দেশে ইহাকে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বেহার অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিমে ইহা গৃহস্থের নিকটে সুপরিচিত। বিলাতী Robinএর মত ইহা ঘরের কাছাকাছি উড়িয়া বেড়ায়। পুরুলিয়ার সহরতলী জায়গায় ইহাকে দেখা গেল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পার্ব্বত্য জঙ্গলে ইহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে।

দোয়েল, copsychus saularis

প্রত্যূষে অথবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাল-গাছের উপরে অথবা পথপার্শ্বস্থ প্রাচীর-গাত্র হইতে বা বাগানের বেড়ার ফাঁকে ইহার সুললিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। সংখ্যায় ইহারা অধিক না হইলেও, ছোট বড় সকল বাগানের ঝোপে ঝাপে ইহারা প্রায়ই থাকে। ঠিক যে পুং-পক্ষীটি একাকী থাকে,

তাহা নহে, ইহার অদূরে যে স্ত্রী-পক্ষীটি আপন মনে শিস্ দিতেছে বা আহার্য্য সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেটি ইহার সহচরী।

ঘুঘু—মানভূমে ইহার নাম পাঁড়কি বা পাঁড়ুক। বাংলার তিলে ঘুঘু (Turtur suratensis) এখানে আছে; তাহা ছাড়া আর দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়,—একটির ঘাড়ে কালো রেখা, অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় লাল্‌চে রংএর ঘুঘু। সকল ঋতুতেই প্রায় ইহাদের নীড়ে ডিম্ব বা শাবক পাওয়া যায়। অক্টোবর মাসের গোড়ায় ইহাদের কয়েকটি শাবক পুরুলিয়ায় ও সুদূর পল্লীমধ্যেও আমাদের নিকট আনীত হইয়াছিল।

ঘুঘু
T. risorius
T. orientalis

পায়রা, গোলা, Columba intermedia—খুব বেশী সংখ্যায় ইহাদিগকে ক্ষেতে ও মাঠে বিচরণ করিতে দেখিলাম।

রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের উপরে, ধান্যক্ষেত্রে, রেল লাইনের ধারে, তারের উপর, বাড়ীর বাগানে, গরুর পিঠের উপরে, ফিঙেকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোনও পাখীর পশ্চাতে ধাবমান ফিঙে প্রায়ই আমাদের নয়নগোচর হয়; অথবা পত্রান্তরালে আসীন ফিঙের শ্রুতিকটু কণ্ঠস্বর দিবাভাগে প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। সব সময়েই যে, সে পাতার গোপন অন্তরালে থাকে, তাহা নহে; তরুশীরে, শাখাগ্রভাগে, বাঁশঝাড়ের ডগায়, বন্ধুর মাঠের উচ্চ ভূখণ্ডে তাহার নিকষ-কৃষ্ণ দেহ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংখ্যায় ইহারা বেশী বলিয়া বোধ হয় না; আহার্য্যান্বেষণে প্রায়ই একাকী নিঃসঙ্গ বিচরণ করে; কখনও বা অনতিদূরে একটি সহচর বা সহচরীকে দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে ইহার একাধিক জ্ঞাতিবর্গ আছে।

ফিঙে, Decrurus ater

বাতাসিয়া, Cypselus affinis—ইংরাজ ইহাকে House Swift আখ্যা দিয়াছেন; বাস্তবিক পুরুলিয়ায় মানববাসে ইহারা যেমন দলে দলে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করে, তাহা দেখিলে এই ইংরাজি নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ঘনবিন্যস্ত ঘরের চালের মধ্যে বাতাসিয়া তীরের মত প্রবেশ করে; পাখীটি এত ছোট ও দ্রুতগামী যে, চালের মধ্যে কোন্ রন্ধ্রে সে প্রবেশ করিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। অপরাহ্নকালে গৃহপ্রাঙ্গণে বাগানের উপরে অনেকগুলা বাতাসিয়া দলবদ্ধ হইয়া আমাদের কাছাকাছি উড়িয়া বেড়াইত। প্রখর রৌদ্রে ইহারা একত্র হইয়া উড়িতে ভালবাসে।

তিতির, Francolinus pondicerianus—পুরুলিয়া হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে ডুম্‌রা-কুড়ি গ্রামের মাঠে তিতিরকে দেখা গেল। ঝাল্‌দে পাহাড়েও তিতির বিরল নহে।

লাওয়া, Perdicula asiatica—(সংস্কৃত লাবক) মানভূমের অধিবাসী বিহঙ্গ। দুইটি পরিপুষ্ট শাবক লইয়া এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। এই Phasinidae পরিবারের অনেক পাখী পার্ব্বত্য অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি এখানে যেমন বৈচিত্র্যময়ী, বিহঙ্গজাতিও তেমনি বিচিত্র।

বন্যকুক্কুট (Gallus ferrugineus), ধনেশ (Cophoceros birostris), Cuckoo-Shrike (Campophaga mela noschista) প্রভৃতি নগরে বা নগরোপকণ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহারা বিরল নহে।

শ্রীসত্যচরণ লাহা

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর

সমাস-স্বর

সমাসের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, লৌকিক সংস্কৃতের ন্যায় দীর্ঘ সমাস বৈদিক-সাহিত্যে ছিল না। দুইটী শব্দ মিশিয়া এক হইলেই সমাস হইত। অতি পরিচিত সমস্ত পদের সহিত কচিৎ আরও একটী পদ জুড়িয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ সমাসের সংখ্যা সমগ্র ঋগ্বেদে পাঁচ-সাতটার বেশী পাওয়া যাইবে না। কাদম্বরী ও দশকুমার-চরিতের দীর্ঘ সমাস প্রকৃত ভাষার বিকাশের লক্ষণ নহে। বরং তাহারা ইহাই সাক্ষ্য দিতেছে যে, তখন সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক গতি অবরুদ্ধ হইয়া একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল সমাসে দুইটী লক্ষণ পরিস্ফুট—(১) এই সকল সমাসের রচয়িতা অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক লোকের বিস্ময় ও ভক্তি কাড়িয়া লইবার অভিপ্রায়ে আত্মহারা হইয়াছিলেন; এবং (২) ধাতুরূপ, শব্দরূপ ও পদবিন্যাস-প্রণালীর ব্যাকরণ-নির্দ্দিষ্ট জটিলতা বর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে চীনদেশীয় ভাষার ন্যায় এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত সন্ধিও এই শ্রেণীর জিনিস ছিল। প্রত্যেক পদ সন্ধির নিয়মে জুড়িয়া সমগ্র বাক্যটীকে একটী শব্দের ন্যায় করিয়া গড়িয়া তোলা আর্য্যভাষার লক্ষণ নহে। আমেরিকার আদিমনিবাসিগণের ভাষায় এই লক্ষণ আছে। এই সকল কারণেই আমাদের ব্যাকরণ-শাসিত সংস্কৃত ভাষা সাধারণের দুরধিগম্য সাহিত্যের ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক পদেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বরস্থিতি আছে। কিন্তু যখন দুইটী ভাব একত্র করিবার জন্য দুইটী পদ জুড়িয়া একটী করা হয়, তখন তাহাদের স্বরস্থিতির প্রকৃতি অধিকাংশ স্থলেই বদলাইয়া যায় এবং দুইটী শব্দের একটী স্বর হয়, দুইটী নহে। সমাস হইলেও ইহাই হয় এবং অন্য উপায়ে দুইটী পদ জুড়িলেও (যেমন ক্রিয়ার সহিত উপসর্গের যোগেও) নবগঠিত পদটীর এক স্বর হয়। সুতরাং সমাসের ধর্ম্ম হইল এই যে, তাহাতে পদদ্বয়ের জন্য একটী মাত্র স্বর থাকিবে। কাদম্বরীর ন্যায় সমাস বেদে থাকিলে এই ভাবে সমস্ত পদের একতা রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইত। তবে পাণিনির ব্যাকরণের নিয়মে বেদের সমাস রচিত হয় নাই। তাই এখানে সমাসরচনার প্রথম চেষ্টার পরিচয় কতকগুলি আম্রেড়িত ও দ্বন্দ্ব (দেবতাদ্বন্দ্ব) সমাসে পাওয়া যায়। আম্রেড়িত সমাসে সুব্ বিভক্তির লোপ হয় না; দুইটী সুবন্ত পদ একত্র সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের একটীর স্বর লোপ করিলেই আম্রেড়িত সমাস রচিত হয়। যেমন—জহ্যেষাং বরং-বরম্ (ইহাদের ভাল-ভাল লোকগুলিকে নিহত কর); অঙ্গাদ্-অঙ্গাল্-লোম্নো-লোম্নঃ পর্বণি পর্ব্বণি (অঙ্গে-অঙ্গে, লোমে-

লোমে, পর্ব্বে-পর্ব্বে) ; ভূয়োভূয়ঃ শ্বঃ-শ্বঃ (পুনঃ-পুনঃ, দিন-দিন) ; দিবে-দিবে বা দ্যবি-দ্যবি (দিন-দিন)। এইরূপে তিঙন্তদ্বয়ের যোগও বেদে দেখা যায়—পিবা-পিব (ঋ°), বারে বারে পান কর। যজস্ব-যজস্ব (শ০ ব্রা), পুনঃ পুনঃ যাগ কর। কিন্তু স্তুহি স্তুহি (ঋ°) (পুনঃ পুনঃ স্তব কর) সমাস নহে ; ইহার দুইটী পদ ও দুইটী স্বর।

ইন্দ্রা-সোমা (ইন্দ্র ও সোম), ইন্দ্রা-বিষ্ণূ, ইন্দ্রা-বৃহস্পতী, অগ্নী-ষোমৌ প্রভৃতি কতকগুলি দ্বন্দ্ব সমাসে উপাদানদ্বয়ের স্বর অক্ষুণ্ণ আছে। কেবল তাহাই নহে, উভয় পদই দ্বিবচনান্ত। বোধ হয়, এই দ্বিবচনেই ইহাদের সমাস-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে ; নতুবা ইহাদিগের একতা-রক্ষা হয় না। দ্যাবা-পৃথিবী ছাড়া চারিবার দিবস্-পৃথিব্যোঃ, এবং অথর্ববেদে দ্যাবা-পৃথিবীভ্যাম্ ও দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ আছে। এই শ্রেণীর কতকগুলি সমস্ত পদে দুই জায়গায় স্বর নাই, অথচ উভয় পদেই দ্বিবচন-চিহ্ন আছে। ইন্দ্রা-পূষ্ণোঃ (কিন্তু ইন্দ্রা-পূষণা), সোমা-পূষভ্যাম্, বাতা-পর্জন্যা, সূর্য্যা-চন্দ্রমসা প্রভৃতি। আবার প্রথম পদে দ্বিবচন-চিহ্নের অভাবও আছে— পর্জন্যবাতা, ইন্দ্র-নাসত্যা, ইন্দ্র-বায়ূ। এই সকল অনিয়মই সজীব ভাষার আত্মবিকাশ-চেষ্টার প্রমাণ ; ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নিয়মে রচনার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নিয়মের বন্ধন ধরিতে না পারিয়া সাধারণ লোকে ভাব প্রকাশের জন্য অন্য সহজ উপায় অবলম্বন করে।

আবার কতকগুলি সমাসে উভয় ভাগে স্বরস্থিতি দেখা যায়—শুনঃ-শেফঃ (কুকুরলেজা), দস্যবে-বৃকঃ (দস্যুর প্রতি বৃক), অপাং-নপাৎ (জলের নাতি), তনূ-নপাৎ (আপনার বংশধর), নরা-শংস (নরের প্রশংসা), নৃ-শংস (ঐ অনুকরণে), নাভা-নেদিষ্ঠ (নিকট জ্ঞাতি),আস্-পাত্র (মুখে দিবার পাত্র, গেলাস-স্থানীয়)। ইহা ছাড়া পতি-শব্দ-যুক্ত যাবতীয় সমাসে দুই দুইটী স্বর। বৃহস্-পতি, গ্নাস্-পতি (গ্নাস্-পত্নী), জাস্-পতি, সদস্-পতি (স্থান-পতি) *সদসস্-পতিঃ), বনস্-পতি, রথস্-পতি, নৃংস্-পতি, শচী-পতি (শক্তির মালিক), ইত্যাদি।

অলুক্ সমাসে পূর্ব্বপদের সুব্ বিভক্তি লোপ না পাইয়াও সমাস রচনা করে। স্বর একটী থাকিলে আর সমাসের একতা স্বীকার করিবার পক্ষেও কোনও বাধা থাকে না। দিবো-দাসঃ, ধনং-জয়ঃ, দিবি-ক্ষিৎ (স্বর্গবাসী), দিবি-চরঃ, রায়স্-কামঃ(ধনাকাঙ্ক্ষী), অবস্থ-বিৎ

(যে কাহাকেও চিনে না), উচ্চৈর্-ঘোষঃ, উচ্চৈঃ-শ্রবাঃ, গবিষ্ঠিরঃ, (গাবিষ্ঠিরঃ), বলাৎকারঃ।

এই সকল অনিয়মের কথা ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বত্রই সমস্ত পদে একটী মাত্র স্বর। এই একমাত্র সমাস-স্বরের স্থিতি চতুর্বিধ। (১)পদদ্বয়ের প্রথমটীর স্বর বজায় থাকে এবং দ্বিতীয়টীর স্বর লুপ্ত হয়। বহুব্রীহি সমাসে সাধারণতঃ এই নিয়ম। রাজ-পুত্রঃ (রাজা যাহার পুত্র), কিন্তু রাজপুত্রঃ (রাজার পুত্র), ইন্দ্র-জ্যেষ্ঠ (ইন্দ্র যাহার জ্যেষ্ঠ), সহস্র-পাৎ, রুষদ্-বৎসা (উজ্জ্বল-বর্ণ বৎস যাহার)। (২) পদদ্বয়ের দ্বিতীয়টীর স্বর বজায় থাকে, প্রথমটী স্বরবিহীন হয়। কর্ম্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাসে এই নিয়ম। মহা-ধন (বহু ধন), যাবয়ৎ-সখ (রক্ষাকারী বন্ধু), রঘু-পত্বন্ (যে শীঘ্র উড়িতে পারে), পুরো-যাবন্ (অগ্রগামী), বীলু-পত্বন্ (বল-গামী), জীব-লোক (জীবিতের লোক), গো-ধূম (বাজ-সনেয়িসং গম) শক-ধূম, যম-রাজা, দেব-যান (দেবগণের নিকট যায় যাহা বা যে)। (৩) উভয় পদের স্বরস্থিতি ছাড়িয়া সর্ব্বান্ত্য স্বরে স্বরস্থিতি হয়। এই বিধিরই সাধারণতঃ বহুল প্রয়োগ। প্রাণাপানৌ, ঋক্-সামে, দেবাসুরাঃ, চন্দ্র-তারকম্, ইন্দ্র-ধনুঃ (ইন্দ্রের ধনুঃ), ব্রহ্ম-গবী (ব্রাহ্মণের গাই), দেব-সুমতি (দেবতার অনুগ্রহ), পরো-বরম্ (পর্য্যায়ক্রমে)। (৪) পদদ্বয়ের একতরের স্বরহীনতা ও অন্যতরের স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম। মেধ-সাতি (মেধ = যজ্ঞ),তিল-মিশ্র (তিল), নেমধীতি (নেম = এক, নেমধীতি = বিচ্ছেদ), পূর্ব-চিত্তি (পূর্ব, পূর্ব্ব হইতে জানা, সূচনা), তুবি-গ্রীব (গ্রীবা, যাহার গ্রীবা শক্ত), পুরু-বীর (বীর) খাদি-হস্ত (খাদি = কঙ্কণ, যাহার হাতে খাদি বা বালা আছে), অমৃত (মৃত, সু-বীর (বীর্য্যবান্)।

ক। দ্বন্দ্ব সমাসের স্বরস্থিতির বৈচিত্র্য বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পরে উল্লেখ-যোগ্য কথা এই যে, সমস্ত পদের শেষার্দ্ধে এবং অধিক স্থলে অন্ত্য বর্ণে স্বরস্থিতিই সাধারণ। অজা-বয়ঃ (অজা ও অবি, ছাগ ও মেষসকল), বিদ্যা-কর্ম্মণী (জ্ঞান ও কর্ম্ম), কৃতাকৃতম্ (কৃত ও অকৃত), কেশ-শ্মশ্রু, ভূত-ভবিষ্যম্ (অতীত ও ভবিষ্যৎ), অহো-রাত্রাণি (দিবারাত্রিসমূহ), উক্থার্কা (স্তব ও গান), নীললোহিতম্ (নীল ও লোহিত), তাম্র-ধূম্র (তাম্র ও ধূম্রবর্ণ), প্রিয়াপ্রিয়াণি (প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুনিচয়)।

খ। দ্বিগু সমাসের বেশী উদাহরণ নাই। পঞ্চ-কপাল (পঞ্চ কপাল বা পাত্রে প্রস্তুত), দ্বিরাজ (দুই রাজার যুদ্ধ), ত্রিযুগ (তিন যুগ), ত্রিযোজন (তিন যোজন স্থান), ত্রিদিব (তিন স্বর্গ), ষড়হ (ছয় দিন সময়), দশাঙ্গুল (দশ অঙ্গুলি পরিমাণ), সহস্রাহ্ন্য (সহস্র দিবসের পথ), পঞ্চ যোজন (স্থানের পরিমাণ)।

গ। অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ—সমক্ষম্ (চক্ষুর সম্মুখে), অনুষ্বধম্ (ইচ্ছানুসারে), অভিপূর্বম্ (পর্য্যায়ক্রমে), আদ্বাদশম্ (দ্বাদশ পর্য্যন্ত), প্রতিদোষম্ (সন্ধ্যাকালে), যথাবাশম্ (ইচ্ছানুসারে), যথাকৃতম্ (ব্যবহারানুযায়ী), যথানাম (নামানুযায়ী), যথ-ভাগম্, যথাঙ্গম্, যথাপরু (অঙ্গে অঙ্গে), যত্র কামম্ (যেখানে-ইচ্ছা), যাবন্মাত্রম্, যাবজ্জীবম্, যাবৎ-সবন্ধু (বন্ধু বা জ্ঞাতির সংখ্যা মত), যথাকাম, যথাক্রতু (শক্তি অনুযায়ী), ঋতে কর্ম্মম্ (বিনা কাজে), নানা-রথম্ (নানা রথে), উভয়দ্যুঃ (উপর্য্যুপরি দুই দিন ধরিয়া)।

ঘ। কর্ম্মধারয় সমাসে অন্ত্য স্বরে স্বরস্থিতি। নীলোৎপল, মহর্ষি, রজত-পাত্র, পুরু-ষ্টুত (যাহার অনেক স্তব করা হইয়াছে), পুনর্ন্নব (অভিনব), ক্ষিপ্রশ্যেন, কৃষ্ণ-শকুনি (কৃষ্ণপক্ষী), দক্ষিণাগ্নি, উরুক্ষিতি (বিস্তৃত গৃহ), রাজ-যক্ষ্ম (রোগের রাজা, প্রধান রোগ), বিশ্ব-মানুষ (প্রতি জন, 'বিশ্ব'), বিশ্ব-দেবাঃ।

ঙ। তৎপুরুষ সমাসেও সাধারণতঃ উত্তরপদে ও অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি। পূর্ব্বেই কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

(অ) দ্বিতীয়াতৎপুরুষ—বেদ-বিৎ, পতঙ্গ, হবিরদ, ভুবন-চ্যব (ভূ-বিকম্পী), মধুদুঘ, কামদুঘ, ব্রাতাব্রুব (যে আপনাকে 'ব্রাতা' বলে), স্বাদু-ক্ষদ্মন্ (মিষ্টান্নদাতা), বহু-সুবন্ (বহু-প্রসবী), পাপ-কৃত্বন্ (পাপাচারী), মনো-মুষি (মনোচর), পুং-সুবন।

(আ) তৃতীয়াতৎপুরুষ—তনূ-শুভ্র, ইন্দ্র-গুপ্ত, অগ্নি-তপ্ত, পিতৃবিত্ত, রথক্রীত, অগ্নিদগ্ধ (অগ্নি-দগ্ধ), কবিশস্ত (কবি-শস্ত), কবি-প্রশস্ত।

(ই) চতুর্থীতৎপুরুষ—তনূ-পান (গাত্ররক্ষা), দেব-হেড়ন (দেবগণের প্রতি ঘৃণা),

গোহিত, দেব-মান (দেবের নিমিত্ত গৃহ, মান), দেব-যজ্ঞ, আস্-পাত্র।

(ঈ) পঞ্চমীতৎপুরুষ—বীর-জাত, শক-ধূম (গোময়ের ধূম)। বৈদিক ভাষায় পঞ্চমী-তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ অতি বিরল।

(উ) ষষ্ঠীতৎপুরুষ—বিশ্‌পতি, প্রজা-পতি, দেব-হেতি, (দেবগণের অস্ত্র), কেশবর্ধন, আয়ুপ্রতরণ (আয়ুর্ব্বর্দ্ধক), সোম-পাবন্ (সোমপায়ী), বলদাবন্ (বলদাতা), পুংসুবন, যম-সাদন (যমের বাড়ী)।

(ঊ) সপ্তমীতৎপুরুষ—ঋত্বিক্, অক্ষপরাজয় (পাশায় হার), অঙ্গ-জ্বর (অঙ্গে বেদনা), নীবিভার্য (নীবিতে বাহ্য), দ্রু-ষদ্বন্ (বৃক্ষে আসীন), রথ-যাবন্ (রথ-যায়ী), তল্প-শীবন্ (তল্পশায়ী)।

প্রথমার্দ্ধে ও প্রথমাক্ষরে স্বরস্থিতির উদাহরণ—ধন-সাতি (ধনলাভ),সোম-পীতি, দেবহূতি (দেবাভ্যর্থনা), নম-উক্তি ('প্রণাম' উচ্চারণ), হব্য-দাতি (হব্য-প্রদান),দিবিষ্ট।

চ। বহুব্রীহিসমাসে সাধারণতঃ প্রথম পদে স্বরস্থিতি। ঘৃতপৃষ্ঠ (ঘৃতবৎ পৃষ্ঠ যাহার), বিশ্বতো-মুখঃ (সকল দিকে মুখ যাহার), দ্রবদশ্বঃ (দ্রুতগামী অশ্ব যাহার), জ্যোতী-রথ (জ্যোতি যাহার রথ, জ্যোতিঃ), দদৃশানপবি (দদৃশান, যাহার পবি দেখা যাইতেছে)। বৈদিক-সাহিত্যে প্রাপ্ত বহুব্রীহি সমাসসমূহের আন্দাজ ⅞ ভাগে প্রথমার্দ্ধে স্বরস্থিতি, ⅛ভাগে পরার্দ্ধে স্বরস্থিতি। পুরু-পুত্র (বহু পুত্র যাহার), বহ্বন্ন, আশু-হেষঃ (দ্রুতগামী অশ্ব যাহার), ঋজুক্রতু (ঋজু কর্ম্মা), বিভু-ক্রতু (বহু-শক্তি), হরি-শিপ্র (স্বর্ণবর্ণ কপোল যাহার), পৃথু-বুধ্ন (প্রশস্ত ভিত্তি যাহার), চতুরক্ষ (চারি চক্ষু যাহার), ত্রি-বন্ধুর (তিনটী আসনযুক্ত), অষ্টা-বন্ধুর (আটটী আসন যাহার), অভ্রাতৃ (ভ্রাতৃহীন)।

ছ। কতকগুলি অনিয়মিত সমাস—অপ্রতি (প্রতিদ্বন্দ্বিহীন), তুবি-প্রতি (প্রবল বিরোধী), ইতিহাস (ইতি হ আস), কুবিৎস (অজ্ঞাত জন), কুহচিদ্বিৎ (যেখানে পাওয়া যায়), পিতামহ, ততামহ (পিতামহ), রায়স্কামো বিশ্বপ্‌স্ন্য (ঋ°, সর্ব্বভোগ্য ধনাকাঙ্ক্ষী), মহাধনে অর্ভে (ঋ°, বড় ও ছোট যুদ্ধে), অংহোর্ উরুচক্রিঃ (ঋ° বিপদে সাহায্যকারী,) অহমুত্তরঃ

(আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ), অগ্রংপূর্ব (শ্রেষ্ঠ হইবার অভিলাষী)।

জ। সংখ্যাবাচক—একাদশ, দ্বাবিংশতি, ত্রিশতম্ (=১০৩), চতুঃ-সহস্রম্ (=১০০৪), একাশতম্ (=১০১), অষ্টাশতম্ (=১০৮), ত্রিংশচ্ছতম্ (১৩০), অষ্টাবিংশতিশতম্ (১২৮), ত্রি-সপ্ত (২১), ত্রিদশ (৩০), ত্রি নব (২৭),দ্বাদশং শতম্ (১১২), ষট্‌ষষ্টং শতম্ (১৬৬), চতুস্ত্রিংশে শতে (২৩৪), দশশতাঃ (১০০০), দ্বিশতম্, দ্বিশতী (২০০), পঞ্চশতানি (৫০০), ত্রীণি সহস্রাণি (৩০০০)।

অব্যয় স্বর

অব্যয় নানাবিধ। সুতরাং স্বরস্থিতিও নানাবিধ।

ক। প্রত্যয়যোগে।

(১) পঞ্চম্যর্থে তস্ প্রত্যয়। অতঃ, ইতঃ, ততঃ, যতঃ, কুতঃ, অমুতঃ, সংতঃ, ইতরতঃ, কতরতঃ। মুখতঃ, অগ্রতঃ, ঋভুতঃ, ঋকৃতঃ হৃত্তঃ, শীরস্তঃ, নস্তঃ, পারতঃ, অন্যতঃ, অন্যতরতঃ, সর্বতঃ, দক্ষিণতঃ, অভীপতঃ, পৎসুতঃ (ঋ একবার)। অভিতঃ পরিতঃ অন্তিতঃ।

(২) স্থানার্থে ত্র ও ত্রা প্রত্যয়। প্রথমটীর পূর্বাক্ষরে স্বরস্থিতি ও দ্বিতীয়টী স্বয়ং স্বরবান্। অত্র, যত্র, তত্র, কুত্র, অমুত্র, অন্যত্র, বিশ্বত্র, সর্বত্র, উভয়ত্র, ইতরত্র, সমানত্র। অস্মত্রা, সত্রা, পুরুত্রা, বহুত্রা, দক্ষিণত্রা, দেবত্রা, মর্ত্যত্রা, পুরুষত্রা, মনুষ্যত্রা, পাকত্রা, শয়ুত্রা, কুরুপঞ্চালত্রা। হস্ত আ দক্ষিণত্রা (ঋ দক্ষিণ হস্তে), পথো দেবত্রা যানান্ (ঋ যে সকল পথ দেবতাদের নিকট যায়)।

(৩) স্থানার্থে হ প্রত্যয়। ইহ, কুহ, বিশ্বহ, বিশ্বহা, বিশ্বাহা (সর্বত্র, সর্বদা)।

(৪) প্রকারার্থে হি প্রত্যয়। উত্তরাহি, দক্ষিণাহি।

(৫) স্থান বা কালনির্দেশ অর্থে তাৎ প্রত্যয়। প্রাকৃতাৎ, উদকৃতাৎ, তাবত্তাৎ। আরাত্তাৎ, উত্তরাত্তাৎ, পরাকাত্তাৎ। পশ্চাতাৎ, অধস্তাৎ, অবস্তাৎ, পরস্তাৎ, পুরস্তাৎ, বহিষ্টাৎ, উপরিষ্টাৎ (স্ কেন? ভবিষ্যপুরাণে 'উদস্তাৎ' আছে)।

(৬) প্রকার অর্থে থ ও থা প্রত্যয়। যথা, তথা, কথা, ইত্থা (কথম্, ইত্থম্ ; শ° ব্রা° ইত্থাৎ), ইমথা (বিরল), অমুথা (বিরল)। অথ, অথা, বিশ্বথা, সর্বথা, অন্যথা, উভয়থা, অপরথা, ইতরথা, যতরথা, যতমথা, পূর্বথা, প্রত্নথা, ঊর্দ্ধথা, তিরশ্চথা, ঋতুথা, নামথা, এবথা। পূর্ব্বাক্ষরে স্বরস্থিতিই সাধারণ। যথা (=ইব) স্বরবিহীন। তায়বো যথা, (ঋ° চৌরগণের ন্যায়)।

(৭) প্রকারার্থে তি প্রত্যয়। ইতি, যতি, ততি, কতি, (কতিপয়)। ইতি শব্দের প্রকারার্থে ব্যবহার—ইত্যগ্রে কৃষত্যথেতি (শত ব্রা°)=প্রথমে এই দিকে (বা এই ভাবে) কর্ষণ (হলচালনা) করিতেছে, পরে ঐ দিকে (বা ঐ ভাবে)।

(৮) প্রকারার্থে ব প্রত্যয়। ইব (স্বরহীন), এব (এবা), এবম্, এবং বিদ্বান্ (এই জানিয়া)। ইব স্থানে 'ব (পালি-প্রাকৃতে ব, বব) অপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়।

(৯) কালার্থে দা, দানীম্, দি। তদা, যদা, কদা, (কদা—ঋ° একবার), ইদা সদা (সদম্), সর্বদা। ইদানীম্, তদানীম্, বিশ্বদানীম্ (বিশ্বদানি,তৈ° ব্রা°, বিশেষণ), যদি, সদদি (মৈ° সং)।

(১০) প্রকারার্থে ধা। একধা, দ্বিধা, (দ্বিধা, দ্বেধা), ত্রিধা (ত্রেধা), ষড্ঢা (ষোঢ়া, ষড্‌ধা) দ্বাদশধা, একান্নবিংশতিধা, সহস্রধা, কতিধা, ততিধা বহুধা, পুরুধা, বিশ্বধা, শশ্বধা, যাবদ্ধা, এতাবদ্ধা, মিত্রধা, প্রিয়ধা, (প্রেধা), ঋজুধা, বহির্ধা। অধ, অধা (ও অথ) অদ্ধা (সত্যই), সহ (সধ-)।

(১১) বারার্থে স্। দ্বিঃ, ত্রিঃ, চতুঃ (*চতুর্স্)।

(১২) বারার্থে কৃৎ, কৃত্বঃ। সকৃৎ, পঞ্চকৃত্বঃ, নবকৃত্বঃ, অপরিমিতকৃত্বঃ, সপ্তকৃত্বঃ, দশকৃত্বঃ, দ্বাদশকৃত্বঃ অষ্টা বেব কৃত্বঃ, ত্রিঃকৃত্বঃ, (পালি 'তিক্খত্তুং')। এটী মূলতঃ প্রত্যয় নহে।

(১৩) দিনার্থে দ্যুঃ। অন্যেদ্যুঃ, উভয়েদ্যুঃ, উভয়দ্যুঃ, পূর্বেদ্যুঃ।

(১৪) বীপ্সার্থে শস্। একশঃ (একে একে, এক এক করিয়া), শতশঃ ঋতুশঃ (কালে কালে), অক্ষরশঃ (অক্ষরে অক্ষরে), গণশঃ (গণে গণে), স্তম্বশঃ (কাঁদি কাঁদি), পরুশ্শঃ

(প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গে), তাবচ্ছঃ (সেই পরিমাণে), সর্বশঃ (সবকে সব), মন্মশঃ (মনে মনে)।

(১৫) প্রকারার্থে বৎ। অঙ্গিরস্বৎ (অঙ্গিরার মত), মনুষ্বৎ (মনুর ন্যায়—ঋ°), পূর্ববৎ, জমদগ্নিবৎ, প্রত্নবৎ, পুরাণবৎ। ত্বাবন্ত্ (তোমার মত), মাবন্ত্ (আমার মত)। দ্রবৎ (শীঘ্র)।

(১৬) ভস্মসাৎ, আত্মসাৎ, বস্তু ব্রাহ্মণসাৎ সর্বং বিত্তমাসীৎ (মহাভা°) প্রভৃতির 'সাৎ' প্রত্যয় বৈদিক সাহিত্যে নাই। সুতরাং স্বরও নাই।

(১৭) বিবিধ প্রত্যয়। প্রাতর্ (প্রথমে, সকালে), সনুতর্ (দূরে), দক্ষিণিৎ (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা). চিকিত্বিৎ (বিবেচনাপূর্ব্বক), নূনম্ (এক্ষণেই), নানানম্ (নানাভাবে)।

খ কারক বিভক্তি যোগে।

(অ) দ্বিতীয়া—(১) সর্ব্বনাম—যদ্ (যদি, যখন, যাহাতে), তদ্ (তাহা হইলে, তখন), কিম্ (কেন ?, কি ?), ইদম্ (এখন, এখানে), অদস্ (ঐ, ওখানে), কদ্, কম্, স্বিদ্, সুনদ্, হদ্, চেদ্ (যদি). নেদ্ (যদি-না), ঈদ্, কুবিদ্. কুচিদ্. নকীম্, মাকীম্, আকীম্।

(২) বিশেষ্য—নাম (নামে), সুখম্ (সুখে), কামম্ (ইচ্ছামত), নক্তম্ (রাত্রে). রহস্ (গোপনে, জনান্তিকে, নির্জনে), ওষম (সত্বর)।

(৩) বিশেষণ—সত্যম্ (সত্য-সত্য), চিরম্ (অনেক-কাল), পূর্বম্ (পুরা), নিত্যম্ (সতত), ভূয়ঃ (আবার)।

(৪) আতিশয্যে (comparison) তরাম্ ও তমাম্। নতরাম্, উচ্চৈস্তরাম্. জ্যোক্তমাম্। এইগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ান্ত বলা যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে নপুংসকলিঙ্গ রূপের সমধিক প্রয়োগ। সংশিতং চিৎ সন্তরং সং শিশাধি (অথ°, যাহা দ্রুত, তাহাকে দ্রুততর কর), বিতরং বি ক্রমস্ব (ঋ° বেশী বেশী লম্বা পা ফেলিয়া চল), প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছ (ঋ°— অধিকতর মঙ্গলের পথে তাহাকে পরিচালিত কর), উদ্ এনমুত্তরং নয় (অথ°—ইহাকে অধিকতর উচ্চে লইয়া চল)।

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

তপন জাহার গুরু ভক্তি মুক্তি কল্পতরু
বন্দো বিরের চরনজুগল ॥
জানকির অন্বাষনে প্রভু ভাই দুই জনে
রিষ্যমুখে করিলা গমন।
করিলে রামের হিত সুগ্রিবে করাল্যে মিত
হেন বিরের বন্দিব চরন ॥
ইঙ্গিতে মহোদধি তরি জানকি ত্রান করি
অক্ষ আদি মারিলে বিরগন।
রাবনেরে চড় মারি কাঁপাইলে লঙ্কাপুরি
চমৎকার হইলা ত্রিভুবন ॥
নল উপলক্ষ হেতু ইঙ্গিতে বান্ধিলে সেতু
সমরেতে তুসিলে শ্রীরাম।
জানকির ত্রানকর্ত্তা লক্ষনের প্রানদাতা
হেন বিরে করোঁ পরনাম ॥
রাবন রনের কালে ময় দানবের সেলে
পড়িলেন ঠাকুর লক্ষন।
আশ্চর্য্য লাগে দেবগনে চমৎকার ত্রিভুবনে
বির আনিলে হে গন্ধমাদন ॥
জয় করি লঙ্কাপুরি বিভিসনে দণ্ডধারি
দেষেরে আনিলে রঘুনাথে।
অভয় পদারবৃন্দে মলয় জে মকরন্দে
হেন বিরে বন্দো জোড় হাথে ॥
হনুমানের চরিত্রগুনে জেবা ষুনে একমনে
রোগ দুখ কিছুই না জানে।
রাম তারে হয়েন ষুখি বর দেন চন্দ্রমুখি
বাড়ে সেই রামের কল্যানে ॥
দ্বিজ রূপরামের আষ হইব রামের দাষ
খণ্ডাবে অসেষ অপরাধ।
রাম গুন চরিত্র গাইব জে দিবারাত্র
তিল আধ না করিব বাদ ॥

ভণিতার রূপরাম লেখক অথবা রামায়ণ গানের একজন প্রধান হইবেন।

শ্রীশ্রীরঘুনাথের বন্দনা আরম্ভ ॥

সর্ব্ব আগে বন্দো সিতা রামের চরন ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম বরের কারন ॥
দক্ষিন বামেতে বন্দো ভরত সত্রুঘন।
সিরে ছত্রধারি বন্দো ঠাকুর লক্ষন ॥
রামের দুই মন্ত্রি বন্দো সুগ্রিব জাম্বুবান।
পদতলে বন্দিয়া গাইব বির হনুমান ॥
রামের দুই ভায্যা বন্দো লক্ষ্মি সরস্বতি।
তিন দেবতা বিনে লোকের অন্য নাঞি গতি ॥
সরস্বতি ক্রপাতে কবির্ত্ত সভার রঞ্জি।
লক্ষ্মি দেবির ক্রপাতে সদাই ষুখে ভুঞ্জি ॥
লব কুষ বন্দো দুই রামের নন্দন।
বিনা নৈয়া বাপের আগে গাইল রামায়ন ॥
জোড় করে বন্দোহুঁ সে ঘটক চরন।
ক্রপা কর ঘটকরাজ নইলাম স্বরন ॥
রাম জন্মিতে ছিল সাটী সহশ্র বছর।
রামকির্ত্তি রচিলা বাল্মিক মুনিবর ॥
রাম না জন্মিতে করিলা রামের অবতার।
হেন মুনির চরনে মোর কোটী নমস্কার ॥
দষরথ রাজা বন্দো রামচন্দ্রের পিতা।
রামরূপ নারায়ন লক্ষ্মিরূপা সিতা ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা কৈকেই রামের জননি।
মা বলিয়া কোলে জার চাপিলা চক্রপানি ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতি ॥
মুখুটী বংষে জন্ম ওঝার জগতে বিদিত।
ফুলিয়াসমাঝে কির্ত্তিবাষ জে পণ্ডিত ॥
পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে ॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
জথা তথা কর‍্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার ॥

বাল্মিকি হইতে হৈল রামায়ন প্রকাষ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কিত্তিবাষ॥

উদ্ধৃত অংশে কৃত্তিবাসের বন্দনা করা হইয়াছে; আবার ভণিতাটিও কৃত্তিবাসের।

শেষ,—

সর্ব্বকাল রাবনের দেবের সঙ্গে বাদ।
দেবতা অসুখি জারে তার পড়িব প্রমাদ॥
বিরোচন রাজার কন্যা নাম বিদ্যুতমালা।
কুম্ভকর্ন বিভা করিল জেন চন্দ্রকলা॥
কন্যা দিঘল বঠে তিন সত জোজন।
সাত সত জোজন দিঘল কুম্ভকর্ন॥
জেন বর তেন কন্যা সোভে দুই জনে।
কুম্ভকর্ন করিল বিভা সেই ত কারনে॥
সয়ম্বরা নামে ছিলা গন্ধর্ব্বকুমারি।
বিভিষন করিল বিভা পরম যুন্দরি॥
মৃগ মারিবার তরে করিল গমনে।
তিন জন আছিল হইল ছয় জনে॥
বিভা করি তিন ভাই করিলা গমন।
লঙ্কায় রাষ্য করে রাবন লৈয়া রাক্ষষগন॥
মন্দোদরির পুত্র জন্মিল নামে মেঘনাদ।
দেখিয়া দেবতাগন করেন বিষাদ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাঁপয়ে জার ডরে॥
মেঘ জেন ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতরে।
মেঘনাদ নাম তার বাপ মায় ধরে॥
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ন নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিষ জোজন ঘর তার বান্ধিল রাবন॥
ত্রিষ জোজন ঘরখান বান্ধিল দিঘল।
দষ জোজন ঘরখান আড়ে পরিষর॥
চারি ক্রোষ ঘরের দুয়ার পরিষর।

১২৫। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

শ্রীরামের অশ্বমেধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪$\frac{১}{২}$×৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ২—২০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

—জত মুনি আইলা জজ্ঞস্থানে॥
জামদগ্নি কৌসিক আইলা পরাসার।
সানন্দ কস্যপ আইলা সান্তনু মুনিবর॥
নারদ মহামুনি আইলা গুনের সাগর।
সুমন্ত পৌলস্ত আইলা পুলষ মুনিবর॥
ভরদ্বাজ সুতিক্ষ্ণ আইলা দুই বেকতি।
দুর্ব্বাষা মুনি আইলেন মহাক্রোধমতি॥
অত্রি অঙ্গিরা আইলা মহাতপোধন।
মৎস্যাকর্ন অগস্ত্য আইলা দুই জন॥

মধ্য,—

জেইখানে রাম তথা আইল দুই জন।
তিন রাম হইল জেন দেখে সর্ব্বজন॥
একই বল বিক্রম একই তিনের ঠাম।
সৈন্য সামন্ত জত দেখে তিন রাম॥
সৈন্য সামন্ত জত প্রধান সেনাপতি।
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
পঞ্চ মাস সিতার গর্ত্ত হইল জখন।
হেন কালে সীতারে রাম করিলা বর্জ্জন॥
সীতারে বর্জ্জিয়া রাম থুইলা বাহিরে।
এই দুই ছাওয়াল হইয়াছে সিতার উদরে॥
রামের তেজ দেখিএ রামের ধনুক বান।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
এই যুক্তি তারা সব অনুমান করে।
সকল মন্ত্রিগন গেল শ্রীরাম গোচরে॥

এই দুই সিসু গোসাঞি তোমার তনয়।
পরিচয় লহ গোসাঞি কিবা হয় নয়॥
তোমার তেজ তোমার রূপ তোমার ধনুকখান।
আকৃতি প্রকৃতি দুহে তোমার সমান॥
আপনি ভাবিয়া গোসাঞি চিন্ত মনে মনে।
পঞ্চ মাষ গর্ভ সিতা থুইলে এই বনে॥
সেই গর্ভে জর্ম্মিয়াছে জমক সহোদর।
ত্রিভুবন জি[নি]তে পারে মহাধনুর্দ্ধর॥
চন্দ্র সুর্য্য সর্গ মর্ত্ত পাতাল জদি ছাড়ে।
তবে রঘুনাথ এই বাক্য নাহি নড়ে॥
ইহা সভার জুর্দ্ধে কার নাহিক জিবন।
প্রান লইয়া দেশে জাই না করিহ রন॥
এই জুক্তি রামেরে বলে সকল সেনাপতি।
হেন কালে রামেরে বলে সুমন্ত সারথি॥

(পৃ ১৪।১-২)

শেষ,—

মুনি বলেন সুন সিতা তোমারে কহি আমি।
দুই পুত্র লইয়া শীতা ঘরে চল তুমি॥
শীতা বলেন দেখি আমি রামের জিবন।
তবে মাএ পোএ ঘরে করিব গমন॥
এতেক সুনিঞা মুনি বসিলা ধেয়ানে।
ত্রিভুবনের জত কথা ধেয়ানে মুনি জানে॥
তপবনে কুণ্ড আছে মৃতু সঞ্চারিনি।
ধ্যান করিয়া তাহা আনিলেন মুনি॥
বার বৎসরের জদি মড়ার অস্তির লাগ পায়।
সেই কুণ্ডের জলে মুনি তাহারে জিয়ায়॥
মুনি বলেন আমার বাক্য সুন সিস্যগন।
এই জল ছড়া দেহ সকল তপবন॥
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটক পড়িয়াছে জত দুরে।
তত দুর ছড়া দেহ জমুনার তিরে॥
তারক মন্ত্রে জল পড়িয়া দিল মুনি।
তপোবনে ছড়াইল মৃর্ত্ত জিবের পানি॥
কটকের হাথ পা আসিয়া লাগে জোড়া।
অসংক্ষ কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া॥
মৃত্ত জিবের পানি জদি হইল পরসন।
শ্রীরাম লক্ষন জিলা ভরথ সত্রুঘন॥

১২৬। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৪/৮ × ৫ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—১৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আরম্ভ,—

কিত্তিব্যাস পণ্ডিতের রামায়ন রচন।
ব্যাসের বচন সুন বাপ পোএ রন॥
জজ্ঞ পুনা দিবেন রাম জজ্ঞ হৈলে সেষ।
হেন কালে গেল ঘোড়া বালমিকের দেষ॥
পবন বেগে ঘোড়া তবে করেতার তরে।
মুনির তপোবন গেলা জমুনার পারে॥
জে দিন জে হবেক বালমিক সব জানে।
লব কুস দুই ভাই ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলেন লব কু[স] সুন ভাল মতে।
আমি চলিলাম আজি চিত্রকোট পর্ব্বতে॥
তথায় বিলম্ব আমার হবেক অনেক দিন।
তপোবন রাখিয় তোমরা দুই ভাই প্রবিন॥
কার সনে না করিহ বাদ বিসর্ব্বাদ।
মুনি সকল জানে জত পড়িবে প্রমাদ॥
বার সত সিস্য লয়্যা গেলেন বালমিকে।
দুই ভাই তোমরা খেনে বেড়াও কোতুকে॥

মধ্য,—

হরি হরি বলিবে রাম সিদ্দি নহে কোন কাম
জজ্ঞ হৈল সংহার কারনে।

তক্ষন জানিলাম মনে জিনিতে নারিব রনে
জখন পড়িল ভাই শত্রুঘন ॥
দুই মিত্র দেসে ছিল দুত গিয়া য়ানাইল
নিপ তিন য়ানিল জতনে।
জতে[ক] করিল গস্ত ইবে বের্থ হৈল সর্ব্ব
অকারনে মোর জিবনে॥
সুদিন কুদিন দুই সভে য়ামি তিন ভাই
এই সে বির হনুমান।[1]
সবংসে সাগররাজ বড় বড় কৈল কাজ
ভগিরথ রাজা ধর্ম্মময়।
হেন বংসে জনমীঞা কুল নিন্দা কৈলসিয়া
জিনে মোরে কাহার তনয়।।
এক কম্মে ক্ষয় নাহি তবে কেনে য়স্ত বহি
বড় য়পজস রহিল আমার।
দসরথ বাপের ডরে দেব গন্ধর্ব্ব কাপে ডরে
সুর্জ্যবংসে তনয় জাহার॥
বিধির লিখনবসে চারি ভাই একু মাসে
প্রান দিল সিস্থর সমরে।
দেখিব কাহার মুখ ঘুচাইব এই দুখ
ত্রিভুবনে য়পজস য়ামার॥(পৃঃ১৪।২)

শেষ,—

বাল্মিকের বচনে সিতা চলিলেন ঘর।
লব কুস দুই ভাই চলিলা সত্তর॥
বালমিক মুনি বলেন সুন জাম্ববান।
ডাক দিয়া ঝাট বিভিসন হনুমান॥
তাহারেঁ বহিল বাল্মিক তপোধন।
মরিয়াছিলে সভে সভার রাক্ষিন জিবন॥
জিয়াইয়া দিল সভার প্রান দান।
ল[ব] কুস সিতার কথা না কহিহ রামের স্থান॥
বাপে পোয়ে হেথা জেন নহে দরসন।
দেশে নিঞা আমি করাব সম্ভাসন॥
লব কুস সিতা মুনিরে নমস্কারি।
বস্ত য়লঙ্কার দিয়া চলিলা য়ন্ত[ঃ]পুরি॥
রাম লক্ষন ভরথ সত্রুঘন বিভিসন।
চারি ভাই দুই মিত্র বন্দে মুনির চরন॥
মরিয়া ছিলাম মুনি তোমার...সাদে।
কোথাকার দুই বালক পাড়িল প্রমাদে।
মুনি বলেন য়ামি না ছিলাম দেসে।
কোথাকার দুই বালক না জানি বিসেষে॥
ঘোড়া লয়্যা রাম তুমি জাহ জজ্ঞস্থান।
সেই দুই বালক লয়্যা জাব তোমার বিগ্যমান॥
রথ অস্ত্র বস্ত মুনি দিল য়ানাইয়া।
জে জাহার য়স্ত বস্ত লইল চিনিঞা॥
হেথায় দুই বালকের না পায় দরসন।
দেসে লয়্যা আমি করাব সম্ভাসন॥
জজ্ঞ পুর্ন্না হেহো গিয়া জজ্ঞ হৈল সেষ।
সসঙ্গ সামন্ত লয়্যা রাম গেল দেস॥
পথে জাইতে জুদ্ধের কথা কহে সর্ব্বজন।
এমন বালকের কথা না সুনি কখন॥
এত দুরে দুই বালকের কথা য়বসান।
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের য়দভুত রচন॥
ইতি পুস্তক সমাপ্ত॥

১২৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রাম বলেন অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ জজ্ঞ সম ফল নাহি আর॥

---

[1] ইহার পর একটু ছাড় হইয়াছে বোধ হয়।

এত জদী কহিলেন কোমললোচন।
যুনিয়া হরিস হইলা ভরথ লক্ষন॥
রাম জজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরসিত।
ডাক দিয়ে বিস্বকম্মে আনিল ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলেন বিস্বকর্ম্মা কর সন্বিধান।
রঘুনাথের জজ্ঞস্থান করহ নিম্মান॥
চলিলেন বিস্বকর্ম্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরথ লক্ষন দোহে আছেন জেথানে॥
বিস্বকর্ম্মায় দেখি হরসিত দুই জন।
জোড হাতে বিস্বকর্ম্মা করেন স্তবন॥
নানা রত্ন আনি দিল বিস্বকর্ম্মার স্থান।
জজ্ঞসালা বিস্বকর্ম্মা করেন নিম্মান॥
ভরথ লক্ষনের টাট দুই অক্ষোহিনি।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বহিআ জে আনি॥
ধৌত প্রবাল রত্ন যুনে জেই দিসে।
বহিআ বহিআ আনে চক্ষুর নিমিসে॥
দিল মনি মানিক্যাদি প্রবাল প্রস্তর।
তিন ক্রোস জুড়ে কুণ্ডু করে পরিসর॥
উভে সভে জজ্ঞকুণ্ডু সতেক জোজন।
নানা রত্নে জজ্ঞকুণ্ডু করিল গঠন॥
আসিবেন পিথিবির যত নরবর।
রাজাদের জন্য করে লক্ষ্য লক্ষ্য ঘর॥
যুবর্ন্নে নিম্মিত গজদন্তের চৌকাট।
যুবর্ন্নে নিম্মিত সব কৈল খাট পাট॥
মনিগনের ঘর নিম্মাইল থরে থর।
বসিবার স্থান কৈল পরম যুন্দর॥
ভক্ষ দ্রব্য নানা জাতি বস্ত অলঙ্কার।
নানা রত্ন ধন লয়্যা পুরিল ভাণ্ডার॥
দধি দুগ্ধ ঘেত মধু আইল ভারে ভার।
আতব তণ্ডুল ধান্য সঙ্খ্যা নাহি তার॥
এক মাসে জজ্ঞস্থান করিল নিম্মান।
নিম্মাইআ বিস্বকর্ম্মা গেল নিজ স্থান॥

মধ্য,—

অজোধ্যাতে গিয়া সিতা করিলা প্রবেস।
আনন্দে অবধি নাই অজোধ্যার দেস॥
সর্ব্ব দেসের লোক আইল অজোধ্যা নগরি।
জয় জয় সুমঙ্গল পড়ে জত নারি॥
রথে হৈতে ভূমে সিতা নাম্বিলা জখন।
দেখিয়া সিতার রূপ মোহ ত্রিভুবন॥
দেখিয়া দেবতাগন হইলা হরসিত।
আছুক অন্যের কাজ ব্রহ্ম[া] চমকিত॥
ধন্য ধন্য রামে সবে করিছে বাখান।
আপনি আসিয়া লক্ষি হৈলা অধিষ্টান॥
জোড় হাতে রহে সিতা রামের গোচর।
হেন কালে বলেন রাম সভার ভিতর॥
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার।
দেবগন জানে তাহা না জানে সংসার॥
ত্রিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাই।
আর বার পরিক্ষা আমি তব স্থানে চাই॥
পরিক্ষা করহ সিতা ত্রিভুবনের আগে।
দেখে জেন সর্ব্ব লোক চমৎকার লাগে॥
পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সাহস।
ত্রিভুবনে ঘুচক আমার অপজষ॥
এত জদি বলেন রাম সভার ভিতরে।
জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে॥
অগ্নি প্রবেস করেছিলাম তোমার বর্জনে।
ব্রহ্মা জাহা বলেছেন যুনেছ শ্রবনে॥
আনিলে দেসের তরে করিয়া আস্বাস।
কোন দোসে আরবার দিলে বনবাস॥
রাজার গ্রিহিনি হয়ে বনমর্দ্ধে বসি।
ফল মুল খাইয়া থাকি নিত্য উপবাসি॥
কোন দোসে রেখেছিলে না জানি বিসেষ।
লবকুস দুই পুত্র পাইলা উর্দ্দেস॥
বেভিচারি প্রতি জেন কহে কটুত্তর।

তেমনি পরিক্ষা চাহ সভার ভিতর ॥
রাজার মহিসি জারা সুখে আছে ঘরে।
পরিক্ষা লইতে আমি আছি বারে বারে॥
জন্ম জন্মান্তরে গোঁসাই তুমি হবে পতি।
আমার লল্যাটে লেখা ঘটিবে দুর্গতি ॥
আমা হেন নারি তোমার নাহি জেন হয়।
এত বলি ছলনয়নে বারিধারা বয় ॥
আমা হৈতে অপজস পেতেছো গোসাই।
এ জনমের মত কিছু মনে করো নাই ॥
এ দাসির জন্যে পৃভূ পাইলা বহু দুখ।
আর না দেখিতে হবে পাপিঅসির মুখ ॥
এ প্রান তেজিব আমি তব বির্দ্দমানে।
বিদায় মাগিলাম প্রভূ তোমার চরনে ॥
সুনিয়া সিতার কথা লোকে লাগে ত্রাস।
হাহাকার করি দোহে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥

(পৃঃ ২৪।২-২৫।১)

শেষ,—

বিষ্টু বলেন সুন ব্রহ্মা আমার বচন।
সংসারের লোক কৈলা সঙ্গে আগমন॥
আসিয়াছে স্বর্গপুরে আমার বচনে।
সকল পিথিবির লোক রবে কোনখানে॥
ব্রহ্মা বলেন সুন পৃভূ আমার উত্তর।
আসিয়াছে অলপ লোক আসিবে বিস্তর॥
রামনাম মুখে বলে হৈলে পতন।
সে হইবে স্বর্গবাসি না জায় খণ্ডন ॥
রাম নাম করে জদি মরেত চণ্ডাল।
সে চণ্ডাল স্বর্গপুরে আসিবে তৎকাল ॥
রাম নামের ফলে মক্ষ পাবেত তক্ষন।
তাহার লাগিয়ে কেন ভাব নারায়ন ॥
এত বলি ব্রহ্মা তবে হইয়া বিদায়।
রামনাম জে করে সে চতুবর্গ পায় ॥
রাম সঙ্গে স্বর্গপুরে গমন তাহার।
মত্ত লোকে কি হইল সুন আর বার ॥
স্বরজুর জল ছিল পর্ব্বত প্রমান।
হেন জল কাদা হইল আটুর সমান ॥
হাহাকার করে জম কান্দে রাত্র দিনে।
বিক্ষ পরে পক্ষ নাহি [নাহি] জন্তু বনে ॥
অসঙ্খ্যায় জিব জন্তু সলিলে প্রবেসে।
স্বরির ছাড়িয়ে সবে চলে স্বর্গবাসে ॥
পক্ষরূপ ছাড়ি সভে বিষ্টরূপ ধরি।
রামের প্রসাদে জায় বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
রামায়ন রচিলা বাল্মিক তপোধন।
রামনামের গুনে হয় বৈকুণ্ঠে গমন ॥
মুক্তি অনুরূপ পথ অসেস প্রকার।
শ্রীরামনামেত্তে হয় জিবের নিস্তার ॥
লক্ষ লক্ষ মহাপাপি গেল স্বর্গবাসে।
তাহা তো দেখিয়া ব্রহ্মা চতুর্মুখে হাসে॥
চতুর্মুখে করে ব্রহ্মা বিষ্টুর স্তবন।
রামনাম তুল্য নাহি নিস্তারের ধন ॥
আমা হেন কোটী ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত।
মহিমা না জানে বেদে তুমি হে অনন্ত ॥
রামায়ন সুনিতে জে করে অভিলাস।
বৈকুণ্ঠেতে কোটী কল্প তাহার নিবাস ॥
অপুত্র সুনিলে পরে পায় পুত্রবর।
মনবাঞ্ছা পুন্ন হয় সুখে থাকে নর ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত লোকে কৈল হিত।
ভাসা মতে প্রকাসিলা রামায়ন গিত ॥
শ্রীরামকর্ত্তন জেন অমৃতের খণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল উত্তরাকাণ্ড ॥

ইতি লবকুসের জুর্দ্ধ সমাপ্ত হইল······লিখিতং শ্রীপ্রেমচাঁদ তাম্র পাটক শ্রীকালাচাঁদ তাস্য সাঃ বঃ দিঘি পরগনে সমরসাহি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুথির নাম 'লবকুশের যুদ্ধ'; কিন্তু আছে

শ্রীরামের অশ্বমেধ হইতে উত্তরকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিতও স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে।

১২৮। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১২; প্রতি পৃষ্ঠায় ১১—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল ১২৬৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ ইত্যাদি।
জখন জাহা হবে তাহা বাল্মীক মনি জাণে।
লব কুস দুইটী ভাই ডাক দিয়া আণে॥
মোনি বলে সীতার পুত্র রহিলে কথাএ।
লবকুস প্রনমিল বাল্মীকের পায়॥
লব কুসে বলে সুন বাল্মীক তপোধন।
প্রাত[:]কালে আমাকে ডাকিছ কি কারন॥
মোনি বলে সুন তোমরা সীতার নন্দণ।
বরুনের জজ্ঞ হেতু করিএ গমন॥
কার সঙ্গে না করিয় বাদ বিসম্বাদ।
আদ্য অন্ত জাণে মোনি ঘটীব প্রমাদ॥
তপবন রক্ষা আজি করিবা দুই ভাই।
তপশ্যা করিতে আজি পাতালেত জাই॥
এতেক বলিয়া তবে বাল্মীক চলীলা।
মোনিকে প্রনাম করি ধনু হাতে লইলা॥
ধনু হাতে দুইটী ভাই করিলা গমণ।
জণণীর চরন জাইয়া করিল বন্দণ॥
মাএর চরণে তবে প্রণাম হইয়া।
ধনু হাতে দুই ভাই চলীল মেলা দিয়া॥
তোরিত গমণে গেল মনির তপুবন।
উদ্যেসে প্রণমিল বাল্মীকের চরন॥
লব পদধুলী কুসে তোলীয়া লইল মাথে।
বিচিত্র ধনু বাণ ধরিল বাম হাতে॥
অবেদ সন্দাণ পোরে বান জত জাণে।
প্রাত[:]কালে ছারিলে বান বৈকালে আইসে টোণে॥
এহি মতে দুই ভাই আছে তপুবন।
অজর্দ্ধাতে সভা করিছে কমললোচণ॥
সত্রোগন গেল জদি মধুরা আশ্রমে।
ভরথ লক্ষন লৈয়া যুক্তি করে রামে॥
রাম বলে সুন ভাই প্রাণের লক্ষন।
রাজসই জজ্ঞ করিতে লএ আমার মন॥
রাবন করিছি বধ সাক্ষাতে ব্রার্হ্মন।
বিনা জজ্ঞে পাপ কভু নহে বিমোচণ॥
বশীষ্টে বলে সুন রাম দয়াময়।
রাজসই জজ্ঞ রাম বর দুক্ষে হয়॥
রাজসই জজ্ঞ পুর্ব্বে কৈল পুরন্দর।
দেবতা মনিস্থে যুর্দ্ধ আছিল বিস্তর॥
এহি জজ্ঞ করিয়াছিল হরিশ্চন্দ্র অধিকারি।
জজ্ঞের দক্ষীণা দিল বেচিয়া পুত্র নারি॥
এহি জজ্ঞ করিআছিল সগর নৃপবর।
ব্রর্হ্মসাপে মৈল তার সাইট হাজার কুমর॥
অশ্বমেদ জজ্ঞ করিলে প্রজা লোকের হিত।
সর্ব্ব কার্য্য সীর্দ্ধি হয় মণের বাঞ্ছীত॥
রাম বলে লক্ষণ আমার মণে লয়।
অশ্বমেদ জজ্ঞ আমি করিব নিশ্চয়॥

মধ্য,—

নাচারি॥

লক্ষন মরন সুনী কান্দে রাম রঘুমনী
সুকাকুলে করি হাহাকার।

বল্মীকের তপুবনে পরিলেক সীসুর বাণে
এ জর্ম্মেতে দেখা নাহি আর ॥
তোমী ভাইর গুন জত আমী আর ব াব কত
জত দুক্ষ পাইলা জে বনে।
হেন গুনের ভাই ছাবি ব্রেথা আমী প্রান ধরি
জায় প্রান লক্ষনের সনে ॥
তোমী জত দুক্ষ পাইলা সমোদ্র বন্দন কৈলা
বানরগনের সঙ্গে শ্রম করি।
তোমার সাহষ বলে লঙ্কা জিনীলাম হেলে
উর্দ্ধারিলাম জণককুমারি ॥

* * *

শ্রীরামের কান্দণে কান্দে পাত্র মিত্রগণে
সুকাকুলে করে হাহাকার।
কিত্তিবাস পণ্ডিতের বানি কান্দ কেনে রঘুমনী
জায় সীগ্র যুর্দ্ধ করিবার ॥ (পৃঃ ৭।২)

ত্রিপদি ॥

সীতা কান্দে ভুমী বসী শ্রীরাম নিকটে আসী
ধরিয়া রামের দুই পায়।
আহা প্রভু প্রাণেশ্বর একবার নঞাণে হের
এ বলীয়া ধরনি লুটায় ॥
জখন হৈলা বনাচারি আনিলা সঙ্গেত করি
সর্ব্বক্ষণ রাখীলা সাদরে।
এখন দিয়া বজ্রাঘাত কথা গেলা প্রাণনাথ
সঙ্গে করি নিয়া জায় মরে ॥
দণ্ডক বণেত ছিল রাবণে হরিয়া নিল
তাথে জত করিল ক্রন্দণ।
নানা বন বিচারিয়া আমার কারন বেস্ত হৈয়া
বিক্ষ ধরি দিলা আলীঙ্গণ ॥
লব কুস দুই ভাই তা সমা নিষ্টোর নাই
বজ্র বুক হইয়া নিষ্টোর।
রায়স্তের অভরন নিসেদিল দুই জণ
মুছীলেক সীসের সীন্দুর ॥
এহি মত করুনা করি জণকের কুমারি
লুটাইল রামের চরন।
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কয় শ্রীরাম মরিতে লয়
না কান্দিয় ধর্য্য হয় মণ ॥ (পৃঃ ১১।১)।

শেষ,—

তপুবণে গীয়া মোনি দেখীল নঞাণে।
সর্ব্ব সৈন্য সমে রাম পরিয়াছে রণে ॥
মন্ত্র পরিয়া মনি দিল জলধারা।
ওটীয়া বসীল রাম সুর্য্যবংসের চোরা ॥
পোণী জল পরি মোণী ডালীয়া দিল।
হস্তি ঘোরা সর্ব্ব সৈন্য বর্ত্তিয়া উটীল ॥
চারি ভাই বসীলেক প্রসন্ন বদণ।
গায় তোলী বন্দে রাম মনির চরন ॥
শ্রীরামে বলেণ সুণ মনি তপুধন।
বল দেখী দুই সীসু কাহার নন্দণ॥
তোমার জজ্ঞে জাব কাইল সীসু সঙ্গে লৈয়া।
পরিচয় দিব কাইল জজ্ঞেত জাইয়া॥
লব কুসেকে ডাক দিয়া বলে মহামোনি।
জজ্ঞ সাঙ্গ দিতে রামের ঘোরা দেয় আণী ॥
ঘোরা লইয়া রামচন্দ্র করিল গমন।
অজর্দ্ধা ভুবণে আসী দিল দরসণ ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের অমৃত লাহরি।
রঘুনাথ আণন্দে সবে বল হরি হরি ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতে কবির্ত্তসীরমনী।
উর্ত্তরার সেস গাইল অপুর্ব্ব কাহিনী ॥
শ্রীরামের কাহিণী সুনিলে বারে বুর্দ্ধি।
এত দুরে সাঙ্গ হৈল লব কুসের বুর্দ্ধ
ইতি লবকুসের যুর্দ্ধ সমাপ্ত ॥
০সক্কল সীথীল শ্রীচন্দ্রকিসের দাষ॥

১২৯। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

(রাম সহ) লবকুশের বাগ্‌যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি
রাবন বিনাস করি শ্রীরাম লক্ষন।
রিক্ষ রাক্ষস কপী রাজা বিভিসন॥
রাজা হইলেন রামচন্দ্র অজুর্দ্ধ্যার পাটে।
দেবাসুর নাগ নর ছত্রতলে খাটে॥
বিরিঞ্চী বাসব বিভু·বৈবসত আদি।
শ্রীরামের পদসেবা করে নিরবদি॥
সভাখণ্ডে রামচন্দ্র বসি সিংহাসনে।
রিক্ষ রাক্ষস কপী বসি স্থানে স্থানে॥
এই মতে আনন্দীত অজুর্দ্ধা নগর।
রাজত্ত করিলেন এগার হাজার বৎসর॥
রামের পালনে প্রেজা দুখ নাহি জানে।
বহু ক্ষিরবতি হৈল সব গাভিগনে॥
চতুস্পদ সস্য * * * বসুমতি।
আনন্দীত সর্ব্বজন সদা সুখ অতি॥
সময়েতে মেঘগন বরিসয়ে নির।
নির্ব্বিরোধে অজুর্দ্ধাতে রাজা রঘুবির॥
দেওান ভাঙ্গিয়া রামচন্দ্র মহাসয়।
উঠিলেন সর্ব্বজন বলি রাম জয়॥
হেন মতে আনন্দীত রাজা রঘুবির।
একদিন স্নানে গেলা সরুজুর তির॥
সরুজু নিকটে এক রজকের ঘর।
বাপঘরে গেল ধোবি স্বামি অগোচর॥
পরদিনে ধোবিনি শ্বশুর আইল ঘরে।
তার পতি অতি ক্রোধে কহিছে ভাজ্জ্যারে॥
রাক্ষসের ঘরে ছিল জনকনন্দিনি।
তাহাকে আনিলা ঘরে রাজা রঘুমুনি॥
তেমন কলঙ্ক আমি রাখিতে নারিব।
রাম রাজা নই জে শ্বশুর তোরে নিব॥
সকর্ন্নে সুনিলা রাম এই সব কথা।
নিচ মুখে অপমান সুনি বড় বেথা॥

মধ্য,—

হেন কালে মুনিশীশু দেখিআ লক্ষনে।
সিগ্রগতি কহে গীয়া বাল্মীক সদনে॥
লক্ষন সহিত সিতা আইল কাননে।
দেখিআ আইলাম মুনি আপন নয়ানে॥
এত সুনি আনন্দীত বাল্মীক তপোধন।
এত দিনে মর গৃহ হইল পুরন॥
রাম রাম বলি মুনি উঠি সীঘ্রগতি।
মুনির শিসুর সঙ্গে জান মহামতি॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সদা জপেন মনে।
লক্ষন সহিত সীতা দেখেন নয়ানে॥
সনমুখেতে দাণ্ডাইলা বাল্মীক তপোধন।
দুই জনে করেন মুনির চরন বন্ধন॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসেন কারন।
তুমি দোহে কেবা বট বলহ এখন॥
মির্থ্যা না কহিবে তুমি সর্ত্ত জেন হঅ।
কিবা নাম কোথা ধাম দেহ পরিচয়॥
লক্ষন বলেন গোসাঞী করি নিবেদন।
পরিচয় দিব আমি সুন তপোধন॥
অজ রাজা পীতামহ দসরথ পীতা।
লক্ষন আমার নাম সঙ্গে মোর সীতা॥
রামের জানকি মুনি দেখ বিদ্দমানে।
বিনা দোসে রামচন্দ্র পাঠাইলেন বনে॥

ইত্যাদি (পৃঃ৩।২-৪।১)

এক কথা কহি সুন মুনির নন্দন।
তোমরা ঘোড়া দায় জত চায় আনি দিব ধন॥
রত্নমালা গলে দিব হেম চাম্প্যা তাথে।
ফনিমুনি জড়িত করিয়া দিব তাথে॥
হিরাতে বান্দিআ দিব সব তপোবন।
অট্টালিকা পুরিয়া আনিআ দিব ধন॥
লব বলেন ধন তুমি দিবে মহাশয়।
কিন্তু লক্ষীছাড়ার কথাতে বিশ্বাস নাহি হয়॥
ঘরের লক্ষী পরের বাক্যে করিলেন বর্জ্জন।
হেন জনার কথা প্রর্ত্তয় না হঅ কথন॥
লক্ষীছাড়া হলে তার বুর্দ্ধি হঅ হত।
জা ইছা তাই বলে পাগলের মত॥
তুমি জদি মরে গোসাঞী দিতে পার ধন।
তবে কেনে সিতা লক্ষী করিলে বর্জ্জন॥
শ্রীকে অন্ন দিতে লার তুমি দিবে ধন।
সেই বলি লক্ষীছাড়ার সদা হঅ ভ্রম॥
ইত্যাদি (পৃঃ২২।২-২৩।১)

শেষ,—

লব কুসে সঙ্গে লইআ বাল্মীক তপোধন।
অজুর্দ্ধ্যাভুবনে গেলা রামের সদন॥
বিনা জন্তো হাথে লইআ ভাই দুই জন।
রামের অর্গে গাইলেন সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
পিতা পুত্রে পরিচয় হইল সেই কালে।
লব কুসে রামচন্দ্র করিলেন কোলে॥
মুখ চুম্ব দুর্ব্বাদল শোকেতে কাতর।
জনকনন্দিনি বলি কান্দেন রঘুবর॥
লক্ষন আনিল সীতা তপোবন হইতে।
বসীলেন জনকসুতা রামের ব্যামেতে॥
আনান্দিত হইল তবে অজুদ্ধ্যা ভুবন।
লক্ষি নারায়ন মন্দিরেতে করিলেন গমন॥
স্রের্দ্ধান্নিত হইআ জেবা করয়ে শ্রবন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
সংখেপে কহিল এই কথা পুরাতন।
সুনিলে দুর্গতি খণ্ডে পাপ বিমচন॥
কিত্তীবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে।
উত্তরাকাণ্ডের কথা করিল রচনে॥
নিজ স্থানে জাত্রা কৈল পবননন্দন।
এইখানে সমাপ্ত হইল এ পুরান॥

১৩০। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১-১৬,১৮-১৯। এক এক পৃষ্ঠায় ১০—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

ভরথ সত্রুঘন বন্দি হৈলা দৈবগতি।
রাম ঠাঞি রথ লঞা আইলা সারথি॥
রামের আগে সারথি জোড় করিল হাথ।
ভরথ সত্রুঘন বন্দি সুন রঘুনাথ॥
বিস্তর করিল রন দুই ভাই সনে।
তভু ভরথ বন্দি পড়িলা দুই ভাএর বানে॥
হাথে গলে ভরথ বন্দি আছে তপবনে।
রথ লঞা আইলাঙ গোশাঞী তোমার কারনে॥
এতেক সুনিঞা প্রভু কুপিলা শ্রীরাম।
কোপে সর্ব্বাঙ্গে নিকলে কাল ঘাম॥
পুষ্পক রথে রামের পড়িল হাকার।
আনিয়া সাজন রথ জোগায় রথকার॥
ব্রহ্মার শ্রীজিত রথ কি কহিব কথা।

রথের উপরে সুভে ইন্দ্র চন্দ্র ছাতা॥
চারি দিগে সভা করে সেত চামর।
রথের উপরে অস্ত্র তুলিল বিস্তর॥
ধবল বর্ন্নের ঘোড়ারাজ পবনে গতি।
রথে নঞা জুড়িল রাজহংস গতি॥
গাএ সানা দিল রাম মাথাএ টোপর।
করে ধরিয়া নিল রাম পুর্ন্ন ধনুসর॥
রুসিঞা লড়িল রাম রনের বিসাল।
জজ্ঞকুণ্ড বন্দিতে গেলেন জজ্ঞসাল॥
রাম বলেন বসিষ্ট না ছাড়িয় জজ্ঞস্থান।
দিনে দিনে জজ্ঞ করিহ না করিহ আন॥
জাত্রা করিয়া লড়িল প্রভু রঘুনাথে।
জয় জয় করিয়া সারথি চালাইল রথে॥

মধ্য,—

'মুনি[কে] প্রনাম হঞা হাথে গাণ্ডিবান নঞা সর্ত্তরে চলিলা দুই ভাই।' 'বাছা আর না জাইয় তপবনে।' 'জানিঞা সুনিঞা মুনিগনে দিল মেলানি', 'ষুন বির্দ্ধ মহাসয় কহিতে বা কিবা ভয়', 'জানিল জানিল রাম তুমি জত দয়াবান', 'দুই ভাই রনস্থলে হাসিঞা হাসিঞা বলে', 'বড়ই সংসয় মুনি পিতাপুত্রে রন সুনি', 'আজ্ঞা দিল মুনিবর দুই ভাই জায় ঘর' ইত্যাদি ত্রিপদী কয়টি পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডে প্রায় ঐরূপই পাওয়া যায়। ১০১২ সংখ্যক পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

শেষ,—

হেথা বালিমিক মুনি করিলা গমন।
সিতার বিদ্যমানে আসি দিলা দরসন॥
বাল্মিকের চরনে সিতা হইলা নমস্কার।
জোড় হাথে কহেন সিতা বিনয় বেবহার॥
তপবোনে নিরন্তর বড় রোল সুনি।
কে হারিল কে জিনিল কিছুই না জানি॥
দস মাস আছিলাম অসোক বোনের ভিতর।
হারিথ রাক্ষস সব জিনিথ বানর॥
মুনি বলেন সিতা সুনহ উত্তর।
আর্চ্চয্য কর্ম্ম করিল আজি দুই সহোদর॥
তিন খুড়া বন্দি করিল জতেক বানর।
পুস্পক রথে জজ্জর হইলা রঘুবর॥
হয় লয় দেখ আসি আপন নয়ানে।
এতেক কটক বন্দি আছিল তপবনে॥
আগে মুনি পাছে সিতা দুই কোঙর।
চারি জনে সান্ধাইল তপবন ভিতর॥
নানা মায়া জানেন সিতা ঠাকুরানি।
মায়া হইতে হইলা সিতা বৃর্দ্ধ বাহ্মনি॥
দেখিলেন জত কটক বন্দি আছে তপবনে।
ভরথ লক্ষন বন্দি আর সত্রুঘনে॥
অঙ্গদ আদি দেখিলেন জত কোপিগন।
হেট মাথায় বন্দি আছেন পবননন্দন॥
সিতা বলেন ষুনহ গোসাঞী কর অবধান।
সভাকে আমার আগে করহ ছাড়ান॥
সকল কটক পাঠাইবে রামের বিদ্যমান।
সভাকে পাঠায়্যা রেখ বীর হনুমান॥
বহ্মমন্ত্র মুনিরাজের তখন মনে পড়ে।
মুনির আর্জ্ঞায় বানরের বর্ন্ধন সব খুলে॥
মুনির আর্জ্ঞায় বৃক্ষে ধরে নানা ফল।
ফল মুল খায়্যা বানর হইল সিতল।
লব কুস দাণ্ডাইলা হাথ করিয়া জোড়া।
মুনি কহেন বাছা আনিয়া দেহ জজ্ঞেন্দ্রঘোড়া।
বাল্মিকবচন দুহে না করিল আন।
ঘোড়া আনিয়া দিল মুনির বিদ্যমান॥
মুনির চরনে দুহে হৈলা নমস্কার।
জজ্ঞের ঘোড়া পাইয়া সভার আগুসার।
সিতার বচন সুনিয়া না করিল আন।
সভাকে পাঠাইয়া রাখিল হনুমান॥

মুনির সঙ্গে হনুমান করিলা গমন।
সিতার বিদ্যমানে গেলা পবননন্দন ॥
সিতাকে দেখিল গীয়া অস্থিচর্ম্মসার।
দেখিয়া হনুমান করে হাহাকার ॥
জেমন দুখি সিতাকে দেখিল তপবনে।
তাহাকে অধিক দুখি রামের বিহনে ॥
সিতাকে প্রনাম হনুমান সহশ্চেক বার।
আসিব্বাদ দিল সিতা আনন্দ আপার ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ত্ত বিচক্ষন।
উর্ত্তরাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান ॥
ইতি লবকুসের পালা কথক সমাপ্ত ॥

১৩১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ৡ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৮। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

ভরথ সক্রঘন বন্দি দৈবের সে গতি।
বার্ত্তা দিতে চলিলেন সুমস্ত শারথি ॥
জজ্ঞস্থাণে বসিঞা আছেন রঘুনাথে।
হেন কালে সুমস্ত দাণ্ডাইল জোড় হাতে ॥
সুমন্ত বোলেন প্রভু করি নিবেদন।
আজি সিশুর হাতে পড়িল ভ্রথ শক্রঘন ॥
এত সুনি রামচন্দ্র পড়িলা ভূমিতলে।
বক্ষ তিতিঞা জায় নঞানের জলে ॥
হাহাকার করিঞা কান্দেন রঘুনাথে।
ভাই ভাই বলি কান্দে লোটাঞা ভূমিতে ॥
য়স্বমেধ জজ্ঞে হৈল এতেক প্রমাদ।
কে জানিবে জজ্ঞ কৈলে হবে বিশম্বাদ ॥
জাম্বুবান বোলে প্রভু সুন রঘুনাথ।
তোমার নিকটে বলি করি প্রনিপাত।
আপনে চলহ প্রভু যুদ্ধ করিবারে।
সিঘ্র করি বিনাসহ য়ে দুই সিসুরে ॥
চল সভে মিলি আজি করিব শংগ্রাম।
মন্ত্রির বচনে প্রবোধ না মানেন রাম ॥
হাহাকার করি রাম কান্দে ভাইএর শোকে।
মুর্চ্ছিত হইলা বাক্য নাহী স্বরে মুখে ॥
কান্দিতে কান্দিতে রামের মহাক্রোধ হৈল
ক্রোধমুর্ত্তে রামচন্দ্র উঠিঞা বসিল ॥
সুমন্তের তরে ডাকি বোলেন নারায়ন।
রথ সর্জ্জ কর যুদ্ধে করিব গমণ ॥
এতেক শুনিঞা তবে সুমন্ত শারথী।
সংগ্রামের রথ শাজাইল সিঘ্রগতী ॥
সুবর্ন্নের রথখান মানিকের চাকা।
ঝলমল করে রথে বিচিত্র পতাকা ॥
চারি দিগে দিল রথের মানিকের ঝারা।
চারি ভিতে শোভা করে মনি মানিক হিরা ॥
হাড়িয়া চামর বান্ধে রথের উপর।
ধবল বর্ন্নে অষ্ট ঘোড়া জোড়ে রথ পর ॥
মউরের পুচ্ছে করে রথের ছাওনি।
চারি ভিতে বাজে রথের বিচিত্র কিঙ্কীনি ॥
নানা অস্ত্র রথ পরে তোলে শারি শারি।
গুহার সাপড়া তোলে ভৃঙ্গারেতে বারি ॥
শাজাইঞা রথখান অতি সিঘ্রগতি।
রামের সম্মুখে লৈঞা করিলা প্রনতি ॥

মধ্য,—

দেখিয়া সিসুর ঠাম কৌতুকে পুছেন রাম
সিসু কোন বংশে তোমার জনম।
ইথে বড় ধনুদ্ধর বিদিত জাহার সর
জাতি বুদ্ধি পুছে কোন জন ॥
জানি হে জানি হে রাম তুমি জত বলবান
পুনঃ পুন কর বিরদাপ।

হাথে ধর গাণ্ডীবান পুরো তুমি সন্ধান
তবে আজি বুঝিব প্রতাপ ॥
বৃদ্ধ য়েক জরা নারি তাহাকে রণেতে মারি
বিরপণা জানাইলা ত্রিভুবণে।
অহল্যা পাশান ছিল তাহে তুমি মুক্ত কৈল
গৌতমের সাপান্ত বচনে ॥
তবে বোল নৌকাখানি কাঞ্চন কর্য়াছি আমি
এ বুদ্ধী পাইলা তুমি কতী।
শৈই ইশ্বরের ইচ্ছা তাহা মনে কর মিছা
শেই কর্ম্মে তোমার কি শক্তী ॥
মিত্র পাত জার শনে তার ভাইএ মার রণে
কে বোলে হে পরম দয়াল।
রাবণ আর কুম্ভকর্ন্ন নাহি গনি এক বর্ন্ন
তারে মারি কর অহঙ্কার॥
আজি আইশ মোর রনে এই ত সংগ্রাম স্থানে
এখনে বুঝিব তব বল।
এত স্থনি রঘুমুনি কোপে জলে জেন অগ্নি
গাণ্ডীব নইলা মহাঁবল॥
কিবা দুই সিস্থ মারি নহে বা আপনে মরি
এত বলি পুরিল টঙ্কার।
স্বর্গে দেখে দেবগণ বিশ্ময় হইল মন
ত্রিভুবণে নাগে চমৎকার॥
এত স্থনি দুই জণে গাণ্ডীব ধরিঞা টানে
মহাঁক্রোধে ছাড়িল নিশ্বাস।
লব কুশ দুই বিরে রাম পর অস্ত্র এড়ে
রচিল পণ্ডীত কির্ত্তীবাশ॥
(পৃঃ৫১-২)

এথা সিতা রামচন্দ্রে দেখিঞা নঞানে।
মুচ্ছিত হইঞা সিতা পড়িলা তখনে॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ছাড়িলা আমারে।
অভাগিকে দয়া কি করিবা গদাধরে॥
আর না দেখিব প্রভুর ও রাঙ্গা চরণ।
আর কি দেখিব আমি অজোধ্যাভূবণ॥
উঠিঞা জানকি পুন চাহে রাম পাণে।
তথা চারি দিগে দৃষ্টী করে নারায়ণে॥
সিতার বদন রাম দেখিতে পাইল।
হা জানকী বলি রাম কান্দিঞা পড়িল॥
সিতা সেতা বলি রাম উঠে অচম্বিত।
আখি ঠারি বোলে মুনি সিতাকে তুরিত॥
স্থনিঞা মুনির বাক্য সিতার গমন।
এথা সিতা না দেখিঞা চিন্তে নারায়ণ॥
রাম বোলে এই ক্ষণে দেখিল সিতারে।
কোথা গেল সিতা মোর বোল মুনিবরে॥
মুনি বলে রামচন্দ্র বলিয়ে তোমায়।
বটআড়ে চন্দ্রছায়া দেখিলে মহাশয়॥
এই বাক্য বলি রামে প্রবোধ করিল।
মুনি প্রতি রামচন্দ্র বলিতে লাগিল॥
য়শ্ব মুক্ত করি তবে দিলা মুনিবর।
বাগডোর ধরিঞা লইল অনুচর॥
রাম বোলে তোমাকে কারলাম নিমন্ত্রন।
জজ্ঞস্থাণে নৈঞা জাবে সিস্থ দুই জণ॥
কালি জেন দুই সিস্থ চলে জজ্ঞস্থাণে।
সিস্থমুখে স্থনিব অপুর্ব্ব রামায়ণে॥
এত স্থনি মুনিবর বোলেন বচন।
অবশ্য লইঞা জাব সিস্থ দুই জণ॥
এত স্থনি আনন্দিত রাম গদাধর।
বিদায় মাগিলা রাম মুনির গোচর॥
মুনির চরণে রাম কৈলা প্রণিপাত।
সসৈন্যেতে রার্থোতে চলিলা রঘুনাথ॥
শ্রীরামে বিদায় করি মুনি গেলা ঘর।
সরজুর পার হৈলা রাম গদাধর॥
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত বিবিধ বাজন।
রাম জয় রাম জয় ডাকে শগ্নগন॥
চারি ভিতে সন্যগণ করে কোলাহল।

প্রবেশ করিলা রাম অজোধ্যানগর ॥
দেখিঞা সকল লোক আনন্দীত মন।
আনন্দীত হৈল তবে অজোধ্যাভুবণ ॥
পাত্র মিত্র সংহতি বসিলা গদাধর।
লক্ষ্মণ ধরিলা ছত্র মাথার উপর ॥
কির্ত্তীবাশ পণ্ডীত কবিত্বে বিচক্ষণ।
রামনাম স্মরণে পাপির পাপ বিমোচন ॥*॥

১৩২। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

লবকুশের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৩¼ × ৪¼ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

ত্রাস পাইয়া রাজা আপনা নেহালে ॥
সন্য সহিত স্ত্রি হৈলাঙ্ড টুটিয়া আইল বলে।
আপন সন্য চিনিতে নারে তাহার মিসানে ॥
মোহাদেবের পায় পড়িয়া কাতরত বোল বলে।
কৃপা কর গোসাঞি মোর সন্য সকলে ॥
উঠ উঠ মহারাজা বলেন মহেস্বর।
পুরুস এড়িয়া তুমি আর মাগ বর॥
মহাদেবের বচন রাজা সুনিঞা দারুন।
দেবির চরনে পড়িয়া রাজ করেন কন্দন ॥
দেবি বলে দেবে[র] বোল আন করিতে নারি।
এক মাস পুরুস হবে এক মাস নারি ॥
এক মাস পুরুস হবে আমার বর দানে।
আক্ষেমা না কর রাজা চল আপন স্থানে ॥
পুরুস হয়্যা স্ত্রি হইলাহোঁ নহিব স্মরন।
স্ত্রি হঞ্যা পু[রুস] হৈলে হবেক পাসরন ॥
জে মাসে হইব সেই সগেয়ান
পূর্ব্ব মাসের বিত্তান্ত সব হব পাসরন ॥
রাজা বলে মাসেক হব পরম সুন্দরি।
মাসেক পুরুস হব রূপের মাধুরি ॥
পরম সুন্দরি রাজা হইলা দেবিবরে।
রাজ্য ছাড়িয়া বুলে রাজা স্ত্রী অনুচরে ॥
শ্রীরামের কথা সুনিয়া ভরথ লক্ষন হাসে।
অদ্ভুত অদ্ভুত বলিয়া কথাকে প্রসংসে ॥
ভরথ লক্ষন বলেন গোসাঞি বড় উপহাস।
স্ত্রী হয়্যা কেমতে রাজা বঞ্চে এক মাস ॥
পুরুস হয়্যা এক মাস কোন মতে বঞ্চে।
এতেক বিপত্য রাজার কত দিনে ঘুচে ॥

প্রকৃতপক্ষে পুথির আরম্ভ ইলা রাজার উপাখ্যানে।

পশ্চিম দিগ জায়ে ঘোড়া আপনার মনে।
হেমগিরি পর্ব্বত সুচুই কাঞ্চনে ॥
সুবর্ন [পর্ব্বত দেখি লাগে চমৎ] কার
বিন্দুগিরি তরিয়া ঘোড়া হইলা পার ॥
মেরুপর্ব্বতে গেল লক্ষন ঘোড়ার গমনে।
মেরুপর্ব্বতে রহে ঘোড়া বেলা অবসানে ॥
মেরুপর্ব্বতের নিকটে পশ্চিম সাগর।
পশ্চিম সাগর বুলিয়া ঘোড়া নড়িলা উত্তর ॥
উত্তর দিগ গেল ঘোড়া দেখিতে সুন্দর।
হিমালয় পর্ব্বত গেল ঘোড়া হিমের নগর ॥
পবন বেগে গেলা ঘোড়া আপনার মনে।
উত্তর সাগরে ঘোড়া বুলে কথক দিনে ॥
নানা দেস ভ্রমে উত্তরের গ্রাম নগর।
পূর্ব্ব দিগ গেলা ঘোড়া দেখিতে সুন্দর ॥
পূর্ব্ব দিগের লোক সকল পিঙ্গল মূর্ত্তি ধরে।
লক্ষনের কটক দেখিয়া জুঝিতে হাঁকারে ॥
নানা অস্ত্র লয়্যা লোক জুঝিবারে সাজে।
শ্রীরামের ঘোড়া দেখিয়া সর্ব্বলোকে পুজে ॥

উদয় গিরি পর্ব্বত বূলে উদয় সেখর।
নানা দেস দেখে জোথা উদয় করে দিবাকর॥
পূর্ব্বসাগর বূলিয়া ঘোড়া চলিল দক্ষিনে।
দক্ষিন দিগ বূলে ঘোড়া বন উপবনে॥
তিন দিগ বূলিয়া ঘোড়া আইল দস মাসে।
দক্ষিন বূলে ঘোড়া বৎসর অবসেসে॥
বন উপবন ঘোড়া সকল নগর বূলে।
বেলা অবসান রহিলা সমুর্দ্রের কূলে॥
নানা দব্য মেলিল আসীয়া মোধুর সুস্বাদ।
সকল দব্য খাইল খণ্ডিল অবসাদ॥
সমুদ্রের কুলে রহিলা লক্ষন জোর্দ্ধাপতি।
পরিস্রমে নিদ্রা জায়ে সন্ত সেনাপতি॥
নাটে গিতে নানা বেসে থাকি নানা বেসে।
ঘোড়ার দিগবিজয় গাইল কিত্তিবাসে॥•॥

(৭—১।২।)

উদ্ধৃত অংশ এবং পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর অনেকটা একরূপ। ইহার পর,—

জজ্ঞ করে রোঘূনাথ লয়া মূনিগনে।
হেন বেলা ঘোড়া গেল শ্রীরামের স্থানে॥
রাম বলেন সুন সকল মুনিগন।
কার্য্য সির্দ্ধ হবেক আমি জানিল কারন॥
জজ্ঞসালাএ ঘোড়া হরিস সকল রিসি।
ধন্য ধন্য বলিয়া সভে ঘো[ড়া]কে প্রসংসী॥
জত জত মুনি সকল বৈসে তপবনে।
সকল মূনি আইলা রামের আমন্তনে॥

ইত্যাদি (৭।২।)

এই অংশ মূল আখ্যানের সহিত সংলগ্ন নহে। শেষের পাতাখানি অন্য পুথির।

১৩৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪২/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪১। সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রবির কিরনে হয় পোহাল সর্ব্বরি।
শ্রীরাম লক্ষন আইলা সিতা সঙ্গে করি॥
মুনির আগে বিদায় মাগে দুই ভাই।
আসির্ব্বাদ কর আমরা বোনবাস জাই॥
সোকেতে মরিয়াছে মোর পিতা দসরথ।
প্রবোধ করিয়া দেসে পাঠাইলাম ভরথ॥
ত্রিরাত্রি পিতারে গিয়া দিব পিণ্ডদান।
মুনিকে গয়ার পথ জিজ্ঞাসিছেন রাম॥
নিবেদন রঘুনাথ করি তোমার পায়[১]
গোলক ছাড়িয়া প্রভু হইলা অবতার।
তোমা হৈতে নির্ভয় হইবে সংসার॥
ব্রাঘ্র ভল্লুক বোনে আছএ গাণ্ডার।
জানাকিকে রাম না করে চক্ষের আড়॥
ভ্রমন না কর রাম অনেক অনেক দেস।
সঙ্গেতে সুকমলা সিতা পাইবে অনেক ক্লেষ॥
নিকটে থাকিহ ঋষি তপস্বি আশ্রমে।
সিতা সঙ্গে করয়া না জেউ দুর বোনে॥
পুজা জপ জজ্ঞ রাম সকল ছাড়িয়া।
রহিলাম রাম কেবল তোমার মুখ চায়্যা॥
প্রনাম করেন রাম ভরদ্বাজের প্রায়।
সকল সিস্য মেলি রামকে করেন বিদায়॥

গয়াকৃত্য শেষ করিয়া রামচন্দ্রের কাশী যাত্রা,—

১। ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় পাড়য়াছে।

রামের বিনয় করে জানকি সুন্দরি।
ধিরে চল রামচন্দ্র হাটিতে না পারি ॥
কভু নাই হই আমি কুটির বাহির।
আজি বিশ্রাম কর প্রভু জাব কত দুর ॥
রামচন্দ্র বলে সুন জানকি রূপসি।
সংসারের দুল্লভ স্থান দেখি গিয়া কাসি ॥
(পৃঃ ৭১-২)

যথাকালে কাশী প্রবেশ,—
সিতা লয়্যা বারানসে করিল প্রবেষ ॥
(পৃঃ ৮।১)

ইহার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া কাশীবাসিগণের খেদ। অনন্তর কাশীরাজ সিংহনরপতি সহ রামাদির মিলন বর্ণিত।

কাসিবাসি লোক দেখ্যা ছাড়য়ে নিস্বাষ।
কোন বিধি করিল রামের বোনবাষ ॥
ধন্য ধন্য কৈকৈ পাসান তোর হিয়া।
কেমনে ধর্যাছে প্রান বোনবাষ দিয়া ॥
সকলের প্রান রাম নয়নের তারা।
সতিসাধ্য পতিব্রথা ঝুরিছেন তারা ॥
অখিলের নাথ রাম দেবাদিদেবা।
ভবনতে লয়্যা চল করি গিয়া সেবা ॥
বারানসির রাজা সিংহনরপতি।
সুমিত্রার পিতা লক্ষণ জার নাতি ॥
লোকমুখে নিপতি সুনিল সম্বাদ।
পরিবার লয়্যা আইল করিতে আসির্ব্বাদ ॥
রাম সিতা লক্ষণে করিয়া সম্বাস।
তিন জনার মুখ হেরি ছাড়িল নিস্বাস ॥
ধন্য ধন্য দসরথ কটিন তোর হিয়া।
কেমনে বেন্ধাছে প্রান বোনবাস দিয়া ॥
রামকে লইয়া হৈল্য কন্দনের রোল।
সম্বত্রিতে নারে কেহ নয়নের জল ॥
রাম বলেন পিতা মরেছে আমাদের সোকে।
চিত্রকুটিতে সংবাদ পাইলাম ভরথের মুখে ॥
মোর সোকে দসরথ তেজেছে পরান।
বিষ্টুপদে আসিয়া করিলাম পিণ্ডদান ॥
চর্দ্দ্য বৎসর আমার নাহি রাজ্যের আস।
এক রাত্রি কাসিতে আমি করিব বাষ ॥
রাম বলে মহারাজা না কর বিসাদ।
বোনবাস করি [ইথে দেহ] আসির্ব্বাদ ॥
বিস্তর বলিলাম লক্ষন না রহিল ঘরে।
বোনবাস এলো মোর দুখিবারে ॥
মা সুমিত্রার প্রানধন লক্ষন গুনের ভাই।
মায়ের কোল সর্ন্ন করি বোনে লয়্যা জাই ॥
রাজা বলে রাম জিবনে নাহি আস।
কার বোলে কোথাকারে জাহ বোনবাস ॥
কত দুখ পাবে রাম থাক মোর দেসে।
জানকি লক্ষন লয়্যা না জায় বোনবাস ॥
সংসারের দুল্লভ আমি কাসির রাজা।
গঙ্গাস্নান কর নিত্য কর সিব পুজা ॥
দিব্ব্য স্থান দেথ রাম ভাগিরথির তির।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ বোনাই কুটির ॥
শ্রীরাম বলেন রাজা এ লয় মনেতে।
ভ্রমিব জতেক তির্থ আছে এ ভারথে ॥
ইত্যাদি (পৃঃ ৮।২-৯।২)

ইহার পর আস্তিক উপাখ্যান ও মাণ্ডব্যের কথা উল্লেখযোগ্য। শেষের দিকে চাতকের, মাছরাঙ্গা পাখীর ও মণ্ডুকের উপাখ্যান পাওয়া যায়। পরে ফল আহরণের নিমিত্ত লক্ষ্মণের মহাদেবের কদলীবনে প্রবেশ, হনুমান্ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের বন্ধন, রামের হাতে হনুমানের পরাজয়, শিব-রামের সংগ্রাম এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক নিবারণ ইত্যাদি বর্ণিত।

শেষ,—
আনন্দে লক্ষন সঙ্গে চলিলা শ্রীহরি।

সনমুখে দেখে রাম রিস্যমুখ গিরি ॥
নানাজাতি বৃক্ষ্য দেখে পর্ব্বত উপর।
ফল ফুলে পরিপুর্ণ অতি মনহর ॥
চারি দিগে সোভা করে চন্দনের তরু।
সারি সারি আছে আর দেবদারু ॥
বকুল পলাস আর দেখিতে উর্জ্জল।
আম্ব কাটাল আর নানাজাতি ফল ॥
পর্ব্বত দেখি রাম হৈলা আনন্দিতা।
এই পর্ব্বতে পাইব সুগ্রিব মিতা ॥
পদশ্রমে ঘাম পড়ে বহিয়া বদন।
হাথে গাণ্ডিবান করি আইলা নারায়ন ॥
লক্ষন সহিত উটে গাণ্ডীবান হাথে।
উটিয়া [জান] জানকিনাথ পর্ব্বত রিস্যমুখে ॥
পর্ব্বতের আনন্দের কথা কে বলিতে পারে।
ব্রহ্মার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে ॥
পর্ব্বত উপরে প্রভু হাথে গাণ্ডিবান।
পর্ব্বত উপরে দাণ্ডাইল রাম ॥
অঙ্গের বরন জেন ইন্দনিলমুনি।
অরুন নিজ্জিত রাঙ্গা চরন দুখানি ॥
সু[ল]লিত জিনিয়া মৃনাল হাথের দণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষ্যয় ত্রন বামে কোদণ্ড ॥
সিংহপুচ্ছ জিনি উচ্ছ মদ্ধ দেসের সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা ॥
রিস্যমুখ দেখি প্রভু রামের উল্লাষ।
আরন্ন কাণ্ড গাইল পণ্ডীত কিত্তীবাস ॥
কির্ত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হৈলা আরন্ন কাণ্ড ॥
লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই প০ জাহানাবাদ।

১৩৪। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা— ১—৩১, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভেতে জানকি হারালেন মহাসয়।
কিস্কিন্দায় মৈহত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
হরি হরি বদনে বল সর্ব্বজন।
কিস্কিন্দাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন ॥
আকুল হইয়া দুই ভাই জানকির সোকে।
সুগ্রিব অন্ধাসন রাম করেন রিস্যমুখে ॥
ভুবনমোহন তনু গাণ্ডিবান হাথে।
সুগ্রিব অন্ধাসন রাম করেন পর্ব্বতে ॥
পঞ্চ বানর সুগ্রিব পর্ব্বতে আছিলা।
দুই ভাইকে দেখি রাজা চমতকার হৈলা ॥
নল নিল সুসেন সম্পাত হনুমান।
পঞ্চ পাত্র লয়্যা রাজা করে অনুমান ॥
রার্জ্জ্য ভুম লয়্যা বালি ক্ষেমা না দিলেক।
মারিবারে তরে দুই বির পাঠাইলেক ॥
নিকট হইলা আসি দুই ধনুকি।
উপদেস না পায় চল লুকাইয়া থাকি ॥
রিস্যমুখে থাকি কেন পরান হারাই।
পঞ্চ জনায় চল মোরা পলাইয়া জাই ॥
হস্তি ঘোড়া পলায় মহিস গাণ্ডার।
পঞ্চ বানর পলায় নাহিক নিস্তার।

মধ্য,—

রাম বুঝাইয়া গেলা ফল আনিবারে।
সর্ন্ন ঘর পায়্যা রাম কান্দে উচ্চ্যস্বরে ॥
পর্ব্বত উপরে কান্দে প্রভু নারায়ন।

অজানুলম্বিত জটা ভুবনমোহন ॥
সঙ্করি সহিত সিব অন্ন পথে চলে।
হেনকালে হরপৃয়া হরিরে নেহালে ॥
অপরূপ পুরুস আশ্চয্য দেখ হোথা।
বিশ্বয় ভাবিয়া সিবে কহে বিশ্বমাতা ॥
সুন সিব সকল সর্ব্বস্ত হও তুমি।
এক বাক্য এখন জিজ্ঞাসা করি আমি ॥
ঐ দেখ আশ্চয্য অপরূপ কায়।
ধৈরজ ধরিতে নারে ধুলায় লোটায় ॥
দুর্ব্বাদল স্যাম দেখি জুড়াইল দে।
অতএব জিজ্ঞাসা করি ঐ জন কে ॥
হর বলে হে দুর্গা হেমন্তের ঝি।
পরিচয়ে পার্ব্বতি তোমার কাজ কি ॥
অভয়া এতেক সুন্যা আরবার কয়।
ইহার বিত্তান্ত কথা না বলিলে নয় ॥
এত সুনি আরবার কন সুলপানি।
তব নাথ আমি দুর্গা মোর নাথ ঔনি ॥
সুর্জ্যবংস দসরথ রাজার নন্দন।
চারি অংসে আপনি জর্ম্মেছে নারায়ন ॥
জম্মিলেন জানকি সে জনকের ঘরে।
তারে বিভা করিলেন দেব গদাধরে ॥
পালিতে পিতার সত্য প্রভু আইল বোন
সঙ্গেতে সুন্দরি সিতা সঙ্গেতে লক্ষন ॥
লক্ষিরে লয়্যা গেছে লঙ্কার রাবন।
কাতর হইয়া তেঞী করিছেন ক্রন্দন ॥
সুন সদাসিব সব [চরনে] নিবেদি।
অখিল ইশ্বর গুরু তার দুস্খ কি ॥
বিশ্বনাথ বলিছে বাল্মিক মুনি আছে।
প্রভু না জম্মিতে সে পুরান করাছে ॥
পুথি পুর্ন্ন হেতু হৈলা দুর্ব্বাদল স্যাম।
ভুক্তবাঞ্চা পুরাইতে কান্দিছেন রাম ॥
দুর্গা বলেন এ কথায় পৃতিৎ নহে চিএ।
সিতারূপে সিধ্র তবে আ স পরিক্ষিএ।
সিধ্রগতি সঙ্করি সিতামুর্ত্তি হইল।
জানিতে জানকিবেস রাম পাসে গেল ॥

(পৃ০ ১৯।২-২০।১)

শেষ,—

পাখা সারিয়া বস্যা সম্প[া]তিনন্দন।
দেখিয়া বানরগনের উড়িল জিবন ॥
আমার জস কির্ত্তি থাকুক তিন লোকে।
মোর পিষ্টে চাপ সকল কটকে ॥
অঙ্গদ বলেন সুন আমার কাহিনি।
উপায় করহ সবে সিতার বার্ত্তা জানি ॥
তোমার পিষ্টে মোরা কেমনে হব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাবে মৎস্য কুম্ভির ॥
বাহুবলে আমরা সমুদ্র হব পার।
রাবন মারিয়া করিব সিতায় উর্দ্ধার ॥
অনাথের নাথ রাম গুনের সাগর।
পোড়া পাখে পাখা উঠে বিশ্বয় বানর ॥
পিতা পুত্রে প্রনাম করে বিরভাগের পায়।
পিতা পুত্রে দুই জনে হইল বিদায় ॥
বাপে পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর কটক গেল দক্ষিন সাগর ॥
কিত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল পুথি কিস্কিন্দাকাণ্ড ॥ * ॥
লিখীতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সা০ শেনাই প০ জাহানাবাদ।

১৩৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪ৡ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৪৯, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড গাইলা গিত রামায়ন ভিতর
পাচ কাণ্ড সুন্দর গিত সুনিতে সুন্দর ॥
বাপে পোয়ে পক্ষ্যরাজা গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা গেলা অঙ্গদ দক্ষিন সাগর ॥
তজ্জন গজ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিছে প্রমাদ ॥
জলজন্তু কোলাহল সাগরের পানি।
ত্রিভূবনে দেবতা বানররূপ আপুনি ॥
জলজন্তু দেখি জেন পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান ॥

মধ্য,—

এত সুনি উগ্রচণ্ডা কহে হনুমানে।
তুমি সে রামের দাস জানিব কেমনে ॥
হনুমান বলে মাতা নিবেদন করি।
এই দেখ শ্রীরামের হাথের অঙ্গরি ॥
অঙ্গরি দেখিয়া দেবি কৈল্য নমস্কার।
হনুমানে উগ্রচণ্ডা কহে পুনর্ব্বার ॥
রাবন হরিয়াছে জদি রামচন্দ্রের সিতা।
বুঝিলাম রাবনে বিধি বিড়ম্বিতা ॥
সেই আমি সেই সিতা ইথে নাহি ভেদ।
পুরানে পণ্ডিতমুখে নাহি সুনি বেদ ॥
জেই জন উতপতি হয় অজনিসম্ভব।
আগ্যসক্তি অংসেতে জন্মিব সেই সব ॥
সেই সিতা সেই আমি এতে নাহি আন।
কৈলাস চলিলাম আমি তেজি এই স্থান ॥
আমারে হরিতে রাবনে দুষ্টমতি।
জানিলাম রাবনে হইয়াছে দুর্ম্মতি ॥
রঘুনাথে বলিবে লঙ্কায় নাহি সঙ্কা।
দগ্ধ কর হনুমান রত্নপুরি লঙ্কা ॥

এত বলি সিংহপিষ্টে দেবি কৈল্য ভর।
কৈলাসে চলিলা দেবি জেখানে সঙ্কর ॥

(পৃঃ ৮১২-৯১১)

অতি মনহর স্থান বিচিত্র গটন।
পঞ্চ পাত্রে বসিয়া আছে বিভিসন।
ইষ্টমন্ত্র জপ তপ দেখিছেন সব।
হনুমান বলে এই পরম বৈষ্টম ॥
বৈষ্টম হইয়া রামের সিতা নাহি রাখে।
সহস্রেক তাহার ভুবনে নাহি থাকে ॥
অতিকার ভুবনে প্রেবেসিলা হনুমান।
দেখি বিচিত্র আসনে বসি করে [হরি নাম] ॥
চন্দনে ভূসিত তুলসির মালা হাথে।
জপিছে হরি[র] নাম তরিতে ভারথে ॥

(পৃঃ ১০১১)

লঙ্কাপুরি খুজি কোথাউ না পাইল উর্দ্দিস।
রাজাঅন্তঃপুরি জেয়্যা করিল প্রেবেস ॥
অতি মনহর দেখে রাজার অন্তপুরি।
দস হাজার ঘর তাহা সোভে সারি সারি ॥
তার মর্দ্ধে ঘর এক পরম সুন্দর।
নানা রত্নে ঘরখান করে ঝলমল ॥
পুষ্পসজ্যায় হইয়াছে গন্ধ আমদিত।
রত্ন পৃদিপ জলে চারি ভিত ॥
দেব দানবের কন্যা জথা জে পায়।
স্ত্রী সজ্যাতে রাবন সুখে নিদ্রা যায় ॥
স্ত্রী সকল লয়্যা রাজা নিদ্রা জায় সুখে।
মন্দদরি রানি দেখে রাবন সনমুখে ॥
সাত পাচ রানি তাহার কাছে দেখি।
রাবনের কোলে জেন এই চন্দ্রামুখি ॥
নানা রত্নে ভুসিতা দানবদুহিতা।
হনুমান বলে তবে এই রামের সিতা ॥
রাজা হৈয়া স্ত্রী গৌরব কে করে।

ভয় পেয়্যা জানকি ভজেন লঙ্কেশ্বরে ॥
দসরথের বধু সিতা জনক ঝিয়ারি।
অন্যকে ভজীবে কেন হারিয়া শ্রীহরি ॥
কেমন বেস কেমন মুর্ত্তি ধরে চন্দ্রামুখি।
রামচন্দ্রের প্রিয় সিতা আমি না দেখি ॥
কে জানে প্রভুর ঠাঞি বিদায় হৈলাম।
শ্রীমুখে সিতার মুর্ত্তি শ্রবনে না সুনিলাম ॥
মলিন বস্ত্র পরিধান গায়ে পড়্যাছে মলি।
রামসোকেতে সিতা হইয়া দুর্ব্বলি ॥
অস্থিচর্ম্মসার হবে নাহি কোন বেস।
সেই সিতা মা হবে সুনেছি সবিসেস ॥
রাজার কোলে রানিগন দেখে নয়ন ভর্য়া।
জানকি রাবন রাজার অপমান করে ॥
পৃয় রানিগন জত ছিল রাজার কোলে।
চুন কালি দেয় সভার হনু গালে ॥
কারু কানের কুণ্ডল লয় কার গলার হার।
কাহার অঙ্গে পরাইল কাহার অলঙ্কার ॥
রাজার কোলে সুয়্যাছিল কর্যা নানা বেস।
পাচচুল্যা করে কারু কাটে মাথার কেস ॥
কোন রানিকে সুয়াইল কোন রানি মুড়া।
অঙ্গের বসন ভূসন সব নিল কেড়্যা ॥
রাবনের কোলে ছিল দানবদুহিতা।
তাহার অপমানের আর কি কহিব কথা ॥
বসন ভুসন কেড়্যা নিল জত ছিল গায়।
রাবনের কেস বান্দে মন্দদারির পায় ॥
সিতা না পাইয়া হনু করে মনস্তাপ।
পরনারিপরেসে কেমনে জাবে পাপ ॥
ঘর ছাড়ি বাহির হইল মনস্তাপে।
বাহির হৈয়া সদা রামনাম জপে ॥

(পৃঃ ১০।২-১১।১)

অগ্নিতে ঘৃত দিলে অধিক সে জলে।
কোপে কর্ম্পবান মা বানরের বলে ॥
রাবন পাছু করি বৈসে আপনার মনে।
আপন ইছায় বলে কথা রাবন রাজা সুনে ॥
জনেকের ঝি আমি দশরথের বহু।
রাম বিনে ত্রিভুবনে আর নাহি কেহু ॥
তারে ভজি তারে পুজি সেই বেদমন্ত্র।
তারে লাগি প্রান আমি রেখ্যাছি দুরন্ত ॥
বলে ছলে রাবন তুই আমায় আনিলে হর্যা।
দিবা রাত্রি তার রূপ দেখি নয়ন ভর্য়া ॥
পাসরিতে চাহি আমি কৌসল্যা কিসরা।
হিয়ার মাঝে জাগে রূপ না জায় পাসরা ॥
জদি মাথায় করাত দিয়া কর খানি খানি।
রাম ছাড়া অন্য রূপ আমি ত না জানি ॥
আপন হস্তে কেটে রাজা কর দুই খান।
তথাচ ছাড়িতে নারি দুর্ব্বাদলস্যাম ॥
ব্রাহ্মনের বেদবিদ্যা ব্রাহ্মনেতে সাজে।
রামের প্রিয় জানকি অন্যে নাহি সাজে ॥
রাবন বলে না বল জটাধারি নাম।
নিজ হস্তে কাটিয়া করিব দুই খান ॥
মারিতে কাটিতে চাহে নাহি করে দয়া।
জানকি বলেন রাম দেহ পদছায়া ॥
রাবনের প্রতাপে জানাকর হৈলা ত্রাস।
সুন্দরাকাণ্ড গাইল পাণ্ডত কিত্তিবাস ॥*।

(পৃঃ ৪।১০২)

শেষ,—

এথা সকল কটক লইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মন।
লঙ্কাপুরে জান রাম করি সুভক্ষ্যন ॥
লঙ্কা জয় করিতে রাম জাঙ্গালে গিয়া চড়ে।
আগে পিছে ভলুক বানর সব নড়ে ॥
গয় গবাক্ষ্য সরভ গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবন্দ্র আর সুসেন চন্দন ॥
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক লড়ে সুগ্রিবের সালা।
এক টাপে কটক লড়ে জেন মেঘমালা ॥

ঋসব কুমুদ লড়ে বির কুথন।
ইন্দ্রজাল দধিকাল সম্পাতি অঞ্জন॥
নল নিল নড়িল অঙ্গদ হনুমান।
সুসেন কেসরি আর মন্ত্রি জাম্বুবান॥
ভুমি আকাষ জুড়ি জায় বানরগন।
চরনের ভরে কম্পে পাতাল [ভুবন]॥
বামে বিভিসন রামের সুগ্রিব দক্ষিনে।
সুভ ক্ষনে পার হইলা লইয়া বানরগনে॥
সুবেল পর্ব্বতে জেয়্যা করিলা সিবির।
ঠাঞি ঠাঞি রহিল সকল মহাবির॥
সুবেল পর্ব্বতে রাম করিলা বিশ্রাম।
এত দূরে সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাধান॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধূরসবানি।
লঙ্কাকাণ্ডে বিরে বিরে হইবে হানাহানি॥

● লিখিতং শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোশাল সাং শেনাই।

১৩৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৫৫, সূচীপত্র ২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ।

আদিকবি বন্দিব বালমিক চরন।
স্লোক ছন্দে সপ্তকাণ্ড রচিল রামায়ন॥
রামায়ন বিক্ষ কৈল সাত কাণ্ড ডাল।
চর্ব্বিস হাজার গ্রন্থ ফল উত্তম রসাল॥
স্লোক ছন্দে রামায়ন পণ্ডিত প্রেবেসে।
পাচালি করিলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥
কির্ত্তিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাণ্ড।
কেবল অমৃতময় পুথি সাত কাণ্ড॥
আদি কাণ্ড রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা।
অজুধ্যাতে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া॥
অরন্নাতে জানকি হারান মহাসয়।
কিচকিন্ধাতে মৈত্র লাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাতে সেতবন্ধ কপি হইলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উর্দ্ধার॥
হরি হরি বল রে সকল বন্ধু জন।
লঙ্কাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
অপুত্রের পুত্র হয় নিধর্নিয়ার ধন।
শ্রবনে পরমানন্দ পাপ বিমচন॥
বন্ধ গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার।
ত্রিভুবনের দেবতা সব দেয় জয়কার॥
দেব হরিসে ফুল বরিসে পড়িছে রামের মাথে।
রাম জয় দিয়া কপি নাচে উর্দ্ধ হাথে॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি জতেক অপছ্‌র্রা।
পুষ্প বিষ্টী করিছেন জতেক দেবতারা॥
সুর্জ্য অস্ত গেল দিবা হইল অবসেষ।
লঙ্কাপুরি জেয়ে হরি করিল প্রেবেস॥

মধ্য,—

বিনয় করিয়া বলে বির্দ্ধ মাল্যবান।
অতি ক্রোধ করিয়া রাবন পানে চান॥
ভাল বোল বলিতে মোরে হইল সাত তাল।
আপনাকে সিংহ বাস পরকে শ্রীকাল॥
গড়ুর গভে গাধা জন্মে নেউলে ইন্দুর।
হস্তি ঘোড়া প্রসবে শ্রীকাল কুকুর॥
কুড়ি গোটা চক্ষু হবে হইল অন্ধ।
দেখিতে না পেলে জে সাগর গেল বন্ধ॥
চর্দ্দ জুগ হইল আমার দেখ আমার প্রমাই।
সাগরে পাথর ভাসে কভু দেখি নাই॥

বনচারি হল্যা হরি জটা বাকল পর্য্যা।
সবংসে মারিবে হরি ধনুর্ব্বান ধর্য্যা॥
ত্রিভুবনে তোমার সমান নাহি ভাগ্যবান।
তোমা হইতে পাইলাম দুর্ব্বাদলস্যাম॥

(পৃঃ ১২।২)

ধার্ম্মিকে পরম ধর্ম্ম রাবন ঔরসে জর্ম্ম
বিরবাহু রাবনকুমার।
মহাবির পরাক্রমে ইন্দ্র কাঁপে জার নামে
মহাবল বির অবতার॥
বিরবাহু ধর্ম্মসিল পাপ নাহি এক তিল
ত্রিভুবনে বড় পুন্নবান।
বৈষ্ণব জানিয়া আমি জুদ্ধ না করিহ তুমি
আন গিয়া কমল নয়ান॥
বিরবাহু সুদ্ধমতি নিয়মেতে বিপ্র প্রিতি
এক লক্ষ করে হরিনাম।
লক্ষ হরিনাম লয়্যা ব্রাহ্মনে দক্ষিনা দিয়া
তবে বির করে জল পান॥
রাম বলেন বিভিসন বৈষ্ণব এমন জন
তবে আমি না করিব রন।
বিভিসনে কহে ডাকি বৈষ্ণব জনেরে দেখি
হেন বিরে দিব আলিঙ্গন॥
বিরভাগে এত বলি গাণ্ডিবান ভুমে ফেলি
আন রাম বিষ্ণু অবতার।
রামপদ করি য়াস বিরচিল কির্ত্তিবাস
বিরভাগ দেয় জয়কার॥*॥

(পৃঃ ৩১।২-৩২।১)

বিভিসন রনস্থলে কাটা মুণ্ড করি কোলে
নয়ানে গলিছে প্রেমধার।
অন্তরে দারুন দুখ চুম্বন করয়ে মুখ
মরি বাছা না দেখিব আর॥
মুখে মুখ দিয়া কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সুনিতে ভারিল কলেবর।
রূপে গুনে ধন্য তুমি তোমার লাগিয়া আমি
ঝুরিয়া মরিব নিরন্তর॥
তোমা পুত্র গুননিধি দিয়া কেন নিলা বিধি
বড় সেল রহিল মরনে।
পুত্রের বদন হেরি কান্দে উচ্চস্বর করি
কাহার নিসেধ নাহি মানে॥

(পৃঃ ৮৯।২)

পঞ্চ বৎসরের রাম রূপে গুনে অনুপাম
তাড়কা মারিচ মারে বানে।
কেবল জানকি ছলে ধনুক ভাঙ্গিল হেলে
হেলায় পরুসরাম জিনে॥
রাম খর দুসন মারে মারিচের বিনাস করে
কবন্ধের কাটিল দুই বাহু।
সয়ন পসগা পায় ভজ রামের রাঙ্গা পায়
রাখিতে নারিবে তোমা কেহ॥
হেন লয় মর মন ছাগ বাগে করে রন
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে।
দুর্জ্জয় লঙ্কার গড়ে কুম্ভকর্ন বির পড়ে
হেন রামকে জিনিবে কেমনে॥

(পৃঃ ১১৩।২-১১৪।১)

সম্পাতি বলেন মা সুন তোমায় কই।
সম্পাতি আমার নাম সুন তোমায় কই॥
প্রভু রাম পাঠাইলেন তোমার গোচর।
বাদ্যভাণ্ড বাজে কেন লঙ্কার ভিতর॥
এত সুনি কন মা জনকনন্দিনি।
বাদ্যের সংবাদ বাছা আমি নাহি জানি॥
দিবা রাত্র জ্ঞান নাহি অসকবনে থাকি।
সয়নে সপনে সদা রাম বলে ডাকি॥
সরমা সিতার বামে বসিয়া আছিল।
সম্পাতিকে দেখে সরমা কহিতে লাগিল॥
সরমা কহেন সম্পাতি করি পরিহার।
প্রাননাথকে জেয়ে মোর কহগা সমাচার॥

মাহিকে মহারাজা এনেছে স্বরন করা।
রাম লক্ষন দুই জনাকে আনিবেক হরা ॥
এত সুনি কন মা জনকের ঝি।
সিতা বলে সরমা গো তবে হবে কি ॥
কি করিব কোথা জাবঁ কি হবে উপায়।
সোনার অঙ্গ জানকির ধুলায় লোটায় ॥
সরমা বলেন মা না করিহ সোক।
রামচন্দ্র জর্ম্মিআছেন ছাড়িয়া গোলক ॥
ক্রন্দন সম্বর মা স্থির হয় তুমি।
সংবাদ জানিয়া মা সিগ্র পাঠাই আমি ॥

(পৃঃ ১৫৫।১-২)

জানকি বলেন দেওর তোমারে সুধাই।
তোমার সাক্ষাতে কি কহিলেন গোসাঞি ॥
লক্ষন বলেন মা করি গো বিনয়।
জে কহিলেন প্রভু তা কহিবার নয় ॥
লক্ষন বলেন সুন জনকের ঝি।
রাম তোমারে ত্যাগ করিলে আমি করিব কি ॥
এ কথা সুনিয়া সিতা লক্ষনের মুখে।
বর্জ্জাঘাত পড়িল জেন জানকির বুকে ॥
পড়িল কদলি জেন বৈসাখের ঝড়ে।
লক্ষন ছাড়িয়া সিতা মুর্ছা হয়্যা পড়ে ॥
অজ্ঞান হইল সিতা মুখে নাহি রা।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়িছে গা ॥
বিস কাঁড়ে ব্যাধ জেন বিন্দিলা হরিনি।
ধুলায় পড়িয়া কান্দে জনকনন্দিনি ॥

(পৃঃ ২০·।১)

রাম পেয়া রানিরা সব করেন বিসাদ।
ভরথে ডাকিয়া রাম করেন সংবাদ ॥
রাম বলেন সুন ভরথ গুনের ভাই।
মা কৈকৈকে কেন দেখিতে না পাই ॥
সক্রঘন বলেন মা কাতর লর্জ্জাতে।
ঐ দেখ মা য়েসেছেন সভার পশ্চাতে ॥
জানকি লক্ষন সঙ্গে ধেয়া চলে রাম।
কেকৈয়ের চরনে জেয়ে করিল প্রনাম ॥
বাহু পসারিয়া রানি তুলে নিল কোলে।
সত সত চুম্ব খায় বদনকোমলে ॥
রাম বলেন লক্ষন কার মুখ চায়।
মা অচে[ত]ন হয়েছে মুখে জল দেয় ॥
রাম বলেন মা আমার পানে চায়।
চেতন হইয়া মা মুখে চুম্ব খায় ॥
কেকৈ বলেন আমি হয়ে না মরিলাম।
তোমা হেন পুত্র আমি বনে পাঠাইলাম ॥
মা হয়া রাম তোমায় দিলাম আমি দুখ।
দেখ না দেখ না রাম চণ্ডালির মুখ ॥
জত দিন বনবাস গিয়াছিলে দুই ভাই।
চর্দ্দ বৎস্যর ভরথ আমাকে মা বলে নাই ॥
দিবা রাত্র ভরথ আমায় দেয় গালাগালি।
নগরের মাঝে আমি মাথা নাহি তুলি ॥
কলঙ্ক ঘুচায় বাছা তবে প্রান রাখি।
রাজা হয়ে প্রজা পাল নয়ান ভরে দেখি ॥
রাম বলেন মা তুমি না কর বিসাদ।
বনবাস কর্য্যা এলাম তোমার আসির্ব্বাদ ॥

(পৃঃ ২৩৪।১-২

শেষ,—

সস্ত সামন্ত আর অজধ্যার প্রজা।
সকলে বিদায় করি দিল রাম রাজা ॥
অতি মনহর পুরি বিচিত্র গঠন।
রাক্ষস কটকে তাহে রহে বিবিসন ॥
সুবর্ন্নের পুরি বিচিত্র নির্ম্মান।
আপনার সেনা লয়্যা রহিলা জাম্বুবান ॥
বিচিত্র নির্ম্মান পুরি অতি মোনহর।
সুগ্রিব রহিলা সব লইয়া বানর ॥
গুহক আদি করি জত পারিসাদ।
সকলে দিলেন রাম রাজপ্রসাদ ॥

ভলুক বানর আর জতেক রাক্ষস।
রামের প্রেমে বিরভাগ সভাই হইল বস ॥
প্রিতিক্ষে প্রিতিক্ষে রাম সকলে দিলা বাসা।
পরম সাদরে সভে করেন জিজ্ঞাসা ॥
রামচন্দ্রে[রি] আজ্ঞা পায়্যা জত বিরভাগে।
নানা দির্ব্ব লয়া জোগায় জাথে জেবা লাগে ॥
পিতি[রি] মাতি[রি] কুলের জত বন্ধু বান্ধব।
সকলে বিদায় করে দিলেন রাঘব ॥
ভরথ সক্রঘন বিদায় করিল শ্রীহরি।
আনন্দে আইলা রাম সিতা অন্ত[ঃ]পুরি ॥
লক্ষি নারায়নে করে ভোগ বিলাস।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাস ॥ * ॥
ইতি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত ॥

০ এই পুস্তক শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দ-কুমারি ঠাকুরানি তস্য পিতা শ্রীযুৎ গোপাল-চন্দ্র বাবুজী মহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা গেল............লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র বসু সাং অম্বিকা নেরপাড়া।

১৩৭। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা—১—১৩৩, ১৩৫, সূচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

আর্দ্দি কবি বন্দিব বাল্মীকের চরন।
সোলক ছন্দে সাত কাণ্ড রচিলা রামায়ন ॥
রাম জন্মিতে ছিল সাটী সহস্র বৎসর।
তার পূর্ব্ব পুথি রচিলেন মুনিবর ॥
রাম না জন্মিতে কৈল রাম অবতার।
হেন মুনিপায়ে মোর কোটী নমস্কার ॥
রামায়ন পুরান কৈলা সাত কাণ্ড ভাল।
চল্লিস হাজার গ্রন্থ উত্তম রসাল ॥
সোলক ছন্দে পুথি পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলেন পণ্ডিত কিত্তিবাসে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
তার কণ্টে মুর্ত্তিমান দেবি স্বরেস্বতি ॥
জেমন গঙ্গা বয়া জায় স্রোত খরসান।
তেমতি রচিলা কবি ভাঙ্গিয়া পুরান ॥
কিত্তিবাস রচিলা করি অমৃতের ভাণ্ড।
পুতক্ষে প্রতক্ষে রচিলেন সাত কাণ্ড ॥
আদ্দ কাণ্ডে রামের জন্ম সিত্যা দেবির বিভা।
অজধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

রাম সিংহাসন হইতে পড়ে মুখে নাই রা।
জল ছাড়া মিন জেমন আছাড়িছে গা ॥
সভা সহিত কান্দেন রাম করে হাহাকার।
সার্থক সুমিত্রার গর্ব্বে জনম তোমার ॥
বাহু পসারিয়া রাম লক্ষনে নিল কোলে।
কত সুরধনি বহে রামের নয়নের জলে ॥
সক্তিসেল নাগপাস বানের আঘাতে।
কত না পাইলে দুখ গিয়া মোর সাথে ॥
রাজ্য ভুম ছাড়িয়া ছাড়িয়া নিজ নারি।
নানা দুখ পাইল্যা ভাই হয়্যা বনচারি ॥
দারুন সেলের চিহ্ন তোমা ভায়্যার বুকে।
অপজস আমার ঘুসিব সর্ব্ব লোকে ॥
সোকে দুখে ভাই তোমার অস্তি চর্ম্ম সার।
তোমা হইতে হইল মোর জানকির উর্দ্ধার ॥
ভাল মন্দ আমি কিছু বিচার না করিলাম।
তোমারে না দিয়া রাজ্য আমি লইলাম ॥

গৌহাটী-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস এম্ এ

অধিবেশন-সংখ্যা—৭। নিম্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকগণের নাম দেওয়া হইল,—

১। বৌদ্ধশাসনে রমণী, লেখক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

২। ভুল (ব্যঙ্গাত্মক), লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

৩। মিরি জাতি (জাতি-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে

৪। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ (জ্যোতিষ-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রত্ন-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ

৬। বলডার কাহিনী (পুরাণ কথা), লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

৭। আঙ্গামী নাগা (জাতি-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস্

৮। কৈলাস পর্ব্বত (ভৌগোলিক-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

৯ মেমি নাগা (জাতি-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস্

১০। হাস্যরস—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ

১১। বড় গীত (গীত-তত্ত্ব), লেখক—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে

১২। সূর্য্যোদয় (জ্যোতিষিক), লেখক—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ

১৩। তিব্বতে মৃতের সৎকার, লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন

১৪। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

রঙ্গপুর-শাখা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন—২, বিশিষ্ট—৫, অধ্যাপক—৮, সহায়ক—১৪, সাধারণ—১৪৩, ছাত্র—৩০।

অধিবেশন-সংখ্যা—৬। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। ভারত-সাহিত্য-সমস্যা (১ম ও ২য় অংশ)—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

২। সমাজপতির সাহিত্য-সেবা— „ কালীপদ বাগছী

৩। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান (আলোচনা)— „ সুদর্শনচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

৪। গায়ের জোর বনাম মনের জোর— „ গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য

৫। গায়ত্রী নামক উপহৃত পুস্তকের সমালোচনা।

এতদ্ভিন্ন অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শিত হয় এবং ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ করা হয়।

পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের সুবিধার্থে পরিষৎ একটি মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের আয়—২১৯।৯, গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—১৫১৩।/৬, ব্যয় ২১৫৵৬, উদ্বৃত্ত—১৫১৭।৶৯।

ভাগলপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন এম্ এ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায়

অধিবেশন-সংখ্যা—৩। নিম্নে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম দেওয়া হইল,—

১। সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

২। প্রাচীন ভারতে বহুপতিত্ব—শ্রীযুক্ত নীলমণি আচার্য্য এম্ এ, বি এল

৩। মধুস্মৃতি—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ বি এল্। মাইকেল মধুসূদনের শতবার্ষিক স্মৃতি-সভায় আবৃত্তি ও বক্তৃতা হয়।

৪। মাইকেল মধুসূদন (হিন্দী)—শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বর্ম্মা

পুস্তক-সংখ্যা—২৮৮।

গৃহনির্ম্মাণের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে।

বারাণসী-শাখা

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা—২৩৫, অধিবেশন—মাসিক ৫, বিশেষ ২, মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ,—

১। পঞ্জিকা-বিভ্রাট—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

২। যাস্ক—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

৩। দর্শন-শাস্ত্রে বাঙ্গালীর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য (১ম প্রস্তাব),—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী

৪। ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা—শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

৫। নৈষধ-চরিত্র ও শ্রীহর্ষ—শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম্ এ

১ম বিশেষ অধিবেশনে—৺জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, ৺রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

এম্ এ, বি এল, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-গণের জন্য শোক-প্রকাশ করা হয়।

২য় বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য "কালিদাসের রচনা বৈদর্ভী, না গৌড়ী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পুস্তক-সংখ্যা—২৩৪৫

শাখার সম্পাদক নিজ ব্যয়ে পরিষদের নামে ত্রৈমাসিক "বঙ্গসাহিত্য" প্রকাশ করিয়াছেন।

বরোদার মহারাজা শাখা-পরিষৎকে এককালীন ১০০৲ দান করিয়াছেন।

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—২৩৭৸১২৷৷০, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৬৭৫৲, ব্যয় ৪৪৫।১০, উদ্বৃত্ত—৪৬৭।২৷৷০।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল

সদস্য-সংখ্যা—সাধারণ-সদস্য—১২৮, অভিভাবক—১০, অধ্যাপক—৩

অধিবেশন-সংখ্যা—সাপ্তাহিক ৩৬, মাসিক ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, নাট্য-সমিতি ৩, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৯, পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি ১২, মন্দির-নির্ম্মাণ-সমিতি ১, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ৭, মোট ৭৫।

পঠিত প্রবন্ধ—

১। শক্তিপূজা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল

২। প্রাণ— ”

৩। মৃত্যুর পর ”

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

৫। জ্যোতিশ্চন্দ্রের জীবনী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন

৬। সন্তবাণী—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ

৭। মাদুরের চাষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র বি এল

৮। বিজয়ার আলিঙ্গন—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল

পুস্তক-সংখ্যা—১০৩২, প্রাচীন পুথির সংখ্যা—১৪৭, সংগৃহীত মূর্ত্তি ও প্রস্তর-ফলকের নাম—বিষ্ণুমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি, নাড়ুগোপাল মূর্ত্তি, একটি ভগ্ন মূর্ত্তি ও মুসলমান আমলের শিলালিপি।

শোক-সংবাদ—সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্ এ, বি এল, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয়গণের মৃত্যুতে শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির—মন্দির-নির্ম্মাণ তহবিলে ১১৭৩।২৷৷ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, এবং আরও ৫৮৮৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

মাধবী—শাখা-পরিষৎ 'মাধবী' নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন, উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল।

শাখা-বিস্তার—চন্দ্রকোণায় এই শাখার প্রশাখা-সভা স্থাপিত হইয়াছে।

বার্ষিক অধিবেশন—সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ সি এস্। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিক যোগদান করেন।

আয়-ব্যয়—আয় ৩৭৮৷৵৫, ব্যয় ৩১০।৵, উদ্বৃত্ত ৬৮।৵৫।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল

সদস্য-সংখ্যা—৪০, অধিবেশন-সংখ্যা—১০, এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত হয়,—

১। ভারতীয় সঙ্গীতের পাশ্চাত্য দেশে আদর লাভের সম্ভাবনা—শ্রীযুক্ত দিলীপ-কুমার রায়

২। তিব্বত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

(অধিবেশনে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শিত হয়)

৩। কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব (বক্তৃতা)—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ

৪। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের বহির্বাণিজ্য—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ

৫। ভারতের বহির্বাণিজ্য ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা—শ্রীযুক্ত রায় ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী বাহাদুর

৬। বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী

৭। কাব্য-রস—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি

৮। রামায়ণ-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ

৯। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী-রচিত "মন্ত্র-শক্তি" সমালোচনা—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্ম এম্ এ

১০। পল্লীর মেয়ে (কবিতা)—শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন সিংহ

একটি অধিবেশনে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরের বিদায় উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল "বিদায়-সম্ভাষণ" পাঠ করেন। একটি অধিবেশনে ৺অশ্বিনী-কুমার দত্ত এবং ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের জন্য শোক-প্রকাশ করা হয় এবং আর একটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রহ্ম এম্ এ মহাশয়ের 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্মানিত করা হয়।

রামগোপাল টাউনহলে ও পাবলিক্ লাইব্রেরী-গৃহে শাখার অধিবেশনাদি হয়।

চট্টগ্রাম-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ রায়

অধিবেশন-সংখ্যা—১৭, প্রবন্ধ-সংখ্যা—২১, সদস্য-সংখ্যা—১২১ এবং পুস্তক-সংখ্যা ৬৩৭।

দিল্লী-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিবেশন-সংখ্যা—২, সদস্য-সংখ্যা—২০, আয় ৬০৲, ব্যয় ৫৫৷৶১০

শাখার কার্য্যালয় ও পাঠাগার—ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত নিশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি মহাশয়ের গৃহ।

উত্তরপাড়া (হুগলী)-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

অধিবেশন-সংখ্যা—২, নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

১। সমবায়ের সার্থকতা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

২। সমবায়-সমিতি—শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুস্তক-সংখ্যা—১৫৫১।

আয়-ব্যয়—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—৩৷৶০, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৩০৭৷০, ব্যয় ৩০২৲, উদ্বৃত্ত ৯৶০

শাখার প্রকাশিত "উত্তরপাড়া-বিবরণ" ৪৬ খণ্ড মূল-পরিষদের দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরা-শাখা

সভাপতি—মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেব-বর্ম্মণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস বি এল

সভ্য-সংখ্যা—১২০, অধিবেশন-সংখ্যা—৭, প্রাচীন পুথির সংখ্যা ১০০। এই শাখা হইতেই "ময়নামতীর গান" সংগৃহীত হয় ও তাহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা নগরে কোন ভদ্রলোকের গৃহে অষ্টকোণ প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহার এক পৃষ্ঠে "শ্রীগোপীনাথ সিংহ নৃপস্য" ও অন্য পৃষ্ঠে "শকাব্দা ১৫০৮" খোদিত আছে।

স্থানীয় তত্ত্বজ্ঞান-সমিতি-গৃহে শাখার কার্য্যালয় রহিয়াছে এবং টাউন-হলে সভাদির অধিবেশন হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের চাঁদাদাতৃগণ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর		৫৲
শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর		৫৲
” ”	নরেন্দ্রনাথ লাহা	৪৲
”	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৲
”	প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত	২৲
”	গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲
” রায়	চুণীলাল বসু বাহাদুর	২৲
”	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
” ডাঃ	পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
”	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১৲
”	হেমচন্দ্র সরকার	১৲
”	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
”	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৲
” রায়	রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর	১৲
” ডাঃ	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
”	ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
”	নিবারণচন্দ্র রায়	১৲
”	যোগীন্দ্রনাথ বসু	১৲
”	নরেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
”	জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
”	নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৲
” রায়	যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	৷৷০
		৪০৷৷০

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬৭৪৯/০
২।	প্রবেশিকা	৭৫৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭২৪৻৬
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭৭৬/০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩৯৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮১৫।৵৫
৭।	এককালীন দান	২৪০০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১৫৩৷৶৬
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৩৬।/০
১০।	বিবিধ আয়	১৫।০
১১।	হাওলাত আদায়	৪৬৩৷৯
১২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৭২৸০
১৩।	হাওলাত জমা	৬২৩৲
১৪।	আমানত জমা	২৫৪৷০
১৫।	স্থায়ী তহবিল	১০০৲
১৬।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	২০০৲
		১৩৪৯৭৷৵২

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	১৯১২৸৵৬
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১১৫৪।/৩
৩।	পুস্তকালয়	১৮৭০।৩
৪।	পুথিশালা	৬৫৯৸৵০
৫।	চিত্রশালা	১৫৬৶৬
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	১৯৯৸/৬
৭।	ডাকমাশুল	১০৮২৸৵৬
৮।	বাড়ী মেরামত	৬৫০৲
৯।	ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পাখার বিল	২৭০৷৶৩
১০।	ইলেক্‌ট্রিক তার বদল ও মেরামতের বিল	১৩০৲
১১।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	৭৲
১২।	ভৃত্যাদিগের ঘরভাড়া	৮৮৲
১৩।	ভৃত্যাদিগের পোষাক	১০৷৵০
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	১৮৪৷৶০
১৫।	নূতন আসবাব	১৯৷/০
১৬।	গাড়ীভাড়া	৯৪৸৶৩
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৩৪১৷৶৯
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১১৫৷৵৩
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২৫৸০
২০।	পদক ও পুরস্কার	৭০৲
২১।	বেতন	৩৩৮১।৵৩
২২।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৫৭৶৩
২৩।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	৩১৩৷৯
২৪।	বিবিধ ব্যয়	১১৩/৯
২৫।	হাওলাত দাদন	৪০৯৻৬
২৬।	আমানত শোধ	৩৬৪৷০
২৭।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিসাবে খরচ,	১০৫।৵৫
		১৪০৮৯৵১১

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত		২৫৬৩৫॥১১
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ ডাকঘর হইতে জমা)		১২৬৭৪॥৵২
		৩৮৩০৮৶১
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয় (বাদ ডাকঘরের গচ্ছিত জন্য খরচ)		১৩৯৮৩৵৬
উদ্বৃত্ত		২৪৩২৪।৵৭

উদ্বৃত্ত টাকার জায়

১। সাধারণ তহবিল		১৩১৩৵১০
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	১০৬৭৵০	
কার্য্যালয়ে ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	১৫৮।৯	
কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট মজুত	২॥৶৩	
ডাকঘরে মজুত—	৮৫॥৶১০	
	১৩১৩৵১০	
২। বিশিষ্ট ভাণ্ডার—		২৩০১০॥৯
কোম্পানীর কাগজ মজুত	১৪৮০০৲	
পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
টারমিনেবল্ ওয়ার লোন্	১০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	১৫০০৲	
ডাকঘরে মজুত	৭১০॥৯	
	২৩০১০॥৯	
		২৪৩২৪।৵৭

শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির স্থগিত দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি।
১৯।৩।৩১

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক
আয়-ব্যয় বিভাগ।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২০।২।৩১

১৩৩০ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন—————————৪৭৩॥৯

বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন———————৪০৯৻৬

৮৮২॥/৩

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়———৪৬৩॥৯

৪১৯৻৬

তায়—

১। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়———২০৲

২। বিরাজুদ্দিন দপ্তরী————————১০০৲

৩। রমেশ-ভবন কমিটি——————২৫৯৻৬

৪১৯৻৬

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২০।২।৩১

১৩৩০ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা———   ——৩৩৮।০

বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা——   --- ২৫৪॥০

৫৯৩৲

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ-   -৩৬৪॥০

২২৮॥০

ব্যয়—

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়———৬৲

২। বিদ্যাপতির পদাবলী বিক্রয় জন্য
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র
মহাশয়ের নামে জমা————৭॥০

৩। পাচু জমাদার (জামীন স্বরূপ)——৫০৲

৪। শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী————৪॥০
(পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যয় জন্য)

৫। পুস্তকালয়ে গচ্ছিত জন্য—————১৫৯৲

৬। চাঁদা বাবদ————————১॥০

২২৮॥০

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২০।২।৩১

১৩৩০ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায় কোং কাগজ	ডাকঘরে	পরিষৎ
১	সাধারণ স্থায়ী-তহবিল	১০৫৩৫৷৵৯	১০০৲	১০৬৩৫৷৵৯	...	১০৬৩৫৷৵৯	৬৫০০৲	...	৪১৩৫৷৵৯
২	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী-তহবিল	১৩০১২৷৷/৬	৭২৬৷/০	১৩৭৩৮৸৬	৭৩৩৷৵৯	১৩০০৫/৯	১৩০০০৲	...	৫/৯
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৫১৵৩	১৷৷৶৬	৬৫২৸/৯	...	৬৫২৸/৯	...	...	৬৫২৸/৯
৪	অক্ষয়কুমার বড়াল „ „	২২০৲	১০৲	২৩০৲	...	২৩০৲	২০০৲	...	৩০৲
৫	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-তহবিল	৯১/০	...	৯১/০	১৩৷৵০	৭৭৷৶০	...	...	৭৭৷৶
৬	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার	...	১০০৲	১০০৲	৪১৲	৫৯৲	...	...	৫৯৲
৭	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৭০৯৷/৩	৭২৸০	১৭৮২/৩	...	১৭৮২/৩	১৬০০৲	...	১৮২/৩
৮	অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-তহবিল	১০০০৲	৫৫৲	১০৫৫৲	...	১০৫৫৲	১০০০৲	...	৫৫৲
৯	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৭৫৷০	...	৭৫৷০	১০৲	৬৫৷০	...	...	৬৫৷০
	মোট	২৭২৯৪৸৯	১০৬৫৷৷৵৬	২৮৩৬০৷৶৩	৭৯৮৷৯	২৭৫৬২৵৬	২২৩০০৲	...	৫২৬২৵৬

এতদ্ভিন্ন নিম্নে অপরাপর তহবিলের হিসাব দেওয়া গেল

	বিবরণ	উদ্বৃত্ত	ডাকঘরে মজুত	পরিষৎ
(ক)	রজনীকান্ত স্মৃতি-তহবিল	৩৪৷৵০	৩৪৷৵০	...
(খ)	কাশীরাম „ „	২৮৬৵৯	২৪৬৵৯	৪০৲
(গ)	গ্রন্থপ্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার-তহবিল	২৩৯৭৲	...	২৩৯৭৲
(ঘ)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	১৭৮৪৵৯	৪৩০৲	১৩৫৪৵৯
(ঙ)	অক্ষয়চন্দ্র সরকার „ „	১৷৶৩	...	১৷৶৩
(চ)	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী „ „	২৪৲	...	২৪৲
(ছ)	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী „ „	৫০৲	...	৫০৲
(জ)	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি „ „	১০০৲	...	১০০৲
(ঝ)	সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি	১৭০৲	...	১৭০৲
(ঞ)	কুমারদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ভাণ্ডার	৬৲	...	৬৲
(ট)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল	৪৫৲	...	৪৫৲
(ঠ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মর-মূর্ত্তি-তহবিল	৪২৸৵৯	...	৪২৸৵৯
		৪৯৪১/৬	৭১০৷৷৯	৪২৩০৷৷৯

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি
শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির
অধিবেশনের সভাপতি
১৯।৩।৩১

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক
শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
২।৩।৩১

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১৩৩১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১।	চাঁদা	৭৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭৫০৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৫০৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮০০৲
৭।	এককালীন দান	৩০০০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০
১০।	বিবিধ আয়	৫০৲
১১।	হাওলাত আদায়	৪১৯৲
১২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার	৭১৲
১৩।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৪।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১২২৮৲
		১৫০১৮৲

ব্যয়

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকা মুদ্রণ	১৬০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৬০০৲
৪।	পুথিশালা	৭০০৲
৫।	চিত্রশালা	৫০০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২০০৲
৭।	ডাকমাশুল	১০০০৲
৮।	বাড়ী মেরামত	৫০০৲
৯।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখা	২৫০৲
১০।	ঐ তার বদল ও মেরামত	২৫০৲
১১।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	১২৷৷০
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১২০৲
১৩।	ভৃত্যদিগের পোসাক	৫০৲
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	১৫০৲
১৫।	নূতন আসবাব	২৫৲
১৬।	গাড়ী ভাড়া	৭৫৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২০০৲
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৫০
২০।	" খরচ	৫
২১।	দেনা শোধ	৫০০
২২।	পদক ও পুরস্কার	৫০
২৩।	বেতন	৩২৫০৲
২৪।	কমিশন	৪০০৲
২৫।	বিবিধ	৭৫৲
		১৫৩০৭৷৷০

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
২৫।৩।১৩৩১

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের "সতসঈ"

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

আমাদিগের সৌভাগ্য যে, পণ্ডিত পদ্মসিংহ মহাশয়ের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের পারদর্শী ব্যক্তি বিহারীলালের সমালোচক ও ভাষ্যকার হইয়া হিন্দীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পণ্ডিতজী রীতিমত ইংরেজীনবিশ না হইলেও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সহৃদয়তা ও রসজ্ঞতাই তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগেরও সম-কক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। তাই স্যর গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের ন্যায় বিহারীলালের বিশেষজ্ঞকেও পণ্ডিতজীর তুলনাত্মক সমালোচনা পড়িয়া বলিতে হইয়াছে,—"Full of instructive information. I am much interested in your comparison of the Sat-Saı with Hāla's Sapta-Satika and other works. It throws quite a new light on Bihari"

পণ্ডিতজীর ভূমিকা-ভাগটী ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার আকারের ২৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে 'বক্তব্য' ১৬ পৃষ্ঠা, 'সতসঈকা উদ্ভব', 'সতসঈকে আদর্শ গ্রন্থ', 'অর্থাপহরণ-বিচার', 'সতসঈকে দোহে' ও 'বিবেচনা-বিনোদ' বিষয়ক আলোচনাপূর্ণ তুলনাত্মক সমালোচনা ১৬ পৃষ্ঠা, যথাক্রমে গাথা-সপ্তশতী, আর্য্যা-সপ্তশতী, অমরু-শতক, অন্যান্য সংস্কৃত কবি ও উর্দু কবিদিগের কাব্যের সহিত তুলনামূলক 'সতসঈকা সৌষ্ঠব' ৫৭ পৃষ্ঠা, যথাক্রমে হিন্দী কবি কেশব, সুন্দর, সেনাপতি, তোষনিধি, পদ্মাকর, ঘাসীরাম, কালিদাস ও রসখানের কবিতার সহিত বিহারীর সতসঈ কাব্যের তুলনা, অন্যান্য হিন্দী 'সতসঈ' কাব্যগুলির সহিত তুলনা, 'শৃঙ্গার-সতসঈ', 'বিক্রম-সতসঈ' ও 'রতন-হজারা' কাব্যগুলির সহিত তুলনা, বিহারীর বিরহ-বর্ণন, অন্যান্য হিন্দী কবিদিগের বিরহ-বর্ণনের সহিত তুলনা, বিহারীলালের কবিত্ব ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য, বিহারীলালের দোষপরিহার ও উপসংহার—এই বিষয়গুলির আলোচনা ১৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। মূলতঃ ইহা বিহারীলালের কাব্যের সমালোচনা হইলেও ইহা পাঠ করিলে সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যগুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ ও কাব্য-রসাস্বাদন করা যায়; সুতরাং যাঁহারা ঐ সকল কাব্যের রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পণ্ডিতজীর এই গ্রন্থের ন্যায় উপযোগী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই—ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। বিহারীলালের কাব্যের সমালোচনায় পণ্ডিতজী যেরূপ অনন্যসাধারণ রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কচিৎ কোনও স্থলে নিরপেক্ষতার ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিতে দেখা গেলেও তাঁহার তুলনাত্মক সমালোচনা ও 'সঞ্জীবন ভাষ্য' না পড়িলে 'বিহারী-সতসঈ' কাব্যের সৌন্দর্য্য বেশীর ভাগই সুধী পাঠকেরও অনাস্বাদিত থাকিয়া যাইবে—ইহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

এত পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সত্ত্বেও পণ্ডিতজী বিনয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। তিনি বহু স্থলেই সত্যের অনুরোধে প্রাচীন টীকা-কারদিগের বহু ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধার জনাই লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন্ টীকাকারোঁ নে ইস্ সমুদ্রকো অচ্ছী তরহ্ যথাশক্তি যথাসম্ভব মথ্ ডালা হৈ, নয়ে টীকাকারোঁকে লিয়ে অপ্‌নী সমঝ্ মেঁ কুছ্ ছোড় নহীঁ গয়ে হৈ, প্রাচীন্ টীকাওঁকো দেখ্‌তে হুএ তো যহী মালুম্ হোতা হৈ কি ইস্ খান্‌কে সব রত্ন নিকালে জা চুকে হৈ, অব কুছ্ হাথ্ পল্লে ন পড়েগা, পর্ সরস্বতীকা ভণ্ডার কুছ্ ঐসা অলৌকিক্ ঔর্ অক্ষয় হৈ কি নীলকণ্ঠ দীক্ষিতকে কথনানুসার্ উস্‌মেঁ কভী কমী নহীঁ হৈ—

> "পশ্যেয়মেকস্য কবেঃ কৃতিং চেৎ
> সারস্বতং কোশমবৈমি রিক্তম্।
> অন্তঃ প্রবিশ্যাম্মরেক্ষিতশ্চেৎ
> কোণে প্রবিষ্টা কবি-কোটিরেষা ॥"

যহ্ সব কুছ্ সহী সহী, পর্ পহলে বহাঁতক্ পহুঁচ্ হো তব ন ?"

পুনশ্চ—'ইস্ ভাষ্যাভাস্‌কী কুৎসিত কন্থা মেঁ কোই চমকৃতা হুআ কীমতী টুকড়া কহী দিখাই দে তো বহ্ ইন্‌হোঁ কী খান্ যা দুকান্‌কা হৈ। ভ্রান্তি-বৃকা ঔর্ অনৌচিত্য-মৎকুণ্‌কা দোষ-দংশ বিদগ্ধতাকে সুকুমার্ শরীর্ মেঁ কহীঁ চুভ্‌তা হুআ প্রতীত্ হো তো উস্‌কে উৎপাদন্‌কা অপরাধোঁ লেখক্‌কা অজ্ঞান্-প্রস্বেদ হৈ।'

যে তুলনাত্মক সমালোচনার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি বিখ্যাত, সেই সমালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন,—"তুলনাত্মক সমালোচনা" কে তৌর্ পর্ জো কুছ্ লিখা গয়া হৈ উস্‌কী যথার্থতা মেঁ সন্দেহকা পূরা অবকাশ্ হৈ ক্যোঁকি যহ্ মার্গ লেখক্‌কো স্বয়ং ঢুংঢ্ ভাল্‌কর্ নির্মাণ্ করনা পড়া হৈ, ইস্ পর্ কিসী "চন্দ্রিকা" যা "প্রকাশ" নে প্রকাশ্ নহীঁ ডালা, ইস্ মেঁ কিসী প্রাচীন যা নবীন্ টীকা সে রত্তী ভর্ য়া ইঞ্চ্ বরাবর্ সহায়তা উসে নহীঁ মিলী। ইস্‌কী ভূলোঁকা উত্তরদায়িত্ব কেবল্ উসী পর্ হৈ। আজ্‌কল্‌কা সুশিক্ষিত্ সমাজ্ প্রাচীন্ টীকাওঁসে কুছ্ ইস্ লিয়ে ভী সন্তুষ্ট নহীঁ হৈ কি উন্ মেঁ তুলনাত্মক সমালোচনা সে কহীঁ ভী কাম্ নহীঁ লিয়া গয়া, বর্ত্তমান্ শিক্ষিত সমাজ্‌কী সন্তুষ্টি কেবল্ শব্দার্থ-ব্যাখ্যা, অলঙ্কার্-নির্দ্দেশ্ ঔর্ শঙ্কা-সমাধান্ সে নহীঁ হোতী, উন্‌কী ইস্ রুচিকা বিচার্ করকে হী ইস্ নবীন্ ঔর্ দুর্গম্ মার্গ মেঁ চল্‌নেকা দুঃসাহস্ কিয়া গয়া হৈ।"

এই সুবিবেচনা ও সত্যপ্রিয়তার জন্যই তিনি তাঁহার সঞ্জীবন-ভাষ্যের রচনা-পদ্ধতির পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রাচীন্ টীকাওঁসে সত্‌সঙ্গ সঞ্জীবন্‌কী রচনা মেঁ জো অমূল্য সাহায্য মিলা হৈ, বহ্ নামোল্লেখপূর্ব্বক্ প্রায়ঃ উন্‌হোঁকে শব্দোঁ মেঁ, কহী অপ্‌নী ভাষামেঁ লিখ্ দিয়া হৈ। অলঙ্কারাদি নির্দেশ্ মেঁ ইন্‌হোঁকে ভাবোঁকো অভিব্যক্ত করনেকে অভিপ্রায়্ সে, কুবলয়ানন্দ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশাদি সংস্কৃত গ্রন্থোঁসে তথা "ভাষা-ভূষণ" আদিসে অবতরণ্ দেকর্

লক্ষণ্ সমন্বয়্ কর্ দিয়া হৈ। 'গাথা-সপ্তশতী', 'আর্য্যাসপ্তশতী' আদি ইস্ বিষয়্ কে আকর্ গ্রন্থোঁসে দোহোঁকে উপজীব্য পদ্য উদ্ধৃত কর্ কে যথামতি তুলনাত্মক্ সমালোচনা লিখ দী হৈ। সমানার্থক্ সুক্তিয়াঁ দে দী হৈ।"

বিহারীলালের এক একটী দোহা যে কত গভীর অর্থ-পূর্ণ, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা এখানে পণ্ডিতজীর গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত মঙ্গলাচরণ-দোহাটীর ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়।
জা তনকী ঝাঁঈ পরেঁ স্যাম হরিত-দুতি হোয়॥

অর্থ—(সোয়্) বহ পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ পরদুঃখ-কাতরা ভক্তবৎসলা (রাধা নাগরি)—নাগরী—ভক্তোঁকে ভয়্ হর্ নে মেঁ পরম্ প্রবীণ শ্রীরাধিকা জী, (মেরী ভববাধা হরৌ)—মেরে জন্মমরণ্ কী পীড়া ঔর্ সাংসারিক্ দুঃখোঁকা দূর করেঁ। বহ রাধা জী কৈসী হৈঁ—(জা তনকী ঝাঁঈ পরেঁ)—জিস্ কী কায়াকী কান্তি পড়্ নেসে (স্যাম্ হরিতদুতি হোয়) শ্রীকৃষ্ণ জী হরে—পরমানন্দিত্ হো জাতে হৈঁ।

"হরা হোনা" মুহাবরে মেঁ প্রসন্ন য়া খুশ্ হোনেকো কহতে হৈ। জৈসে কিসী অত্যন্ত স্নেহ-শীল্ মিত্রকে বিষয়মেঁ কহতে হৈ কি বহ হমেঁ দেখ্ কর্ হরে হো জাতে হৈ।

২—অথবা—জিন্ রাধিকাজীকে পীতবর্ণকী কান্তি পড়্ নেসে শ্রীকৃষ্ণজীকা শ্যাম্ রঙ্গ্ হরা—(হরে রঙ্গ্ কা)—হো জাতা হৈ। পীলা ঔর্ নীলা রঙ্গ্ মিল্ নেসে হরা রঙ্গ্ বন্ জাতা হৈ—য়হ প্রসিদ্ধ হৈ।

হরিত্ রঙ্গ্ কী ঝাঁই (কান্তি—ছায়া) মেঁ সন্তাপ্-হরণ্ কা সামর্থ্য সর্বাধিক্ হৈ, ফির্ জিস্ ছায়া সে শ্যাম্ (তমোগুণ) ভী হরিত—দূসরোঁ কে শান্তি দেনেবালা বন্ জাতা হৈ উস্ কা স্বয়ং ভববাধা হর্ নেমেঁ অনুপম্ সামর্থ্যশালী হোনা উচিত হী হৈ!

হরিতদ্যুতি ন চম্পকবর্ণী রাধাকী হৈ ঔর্ ন ঘনশ্যাম্ কী। কিন্তু ইন্ দোনোঁকে—রাধা শ্যাম্ কে—মেল্ সে শান্তিপ্রদ হরিতবর্ণকী উৎপত্তি হৈ, ইস্ অর্থ সে কবিকা ভাব য়হ ধ্বনিত হোতা হৈ কি শক্তি-শূন্য ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মবিরহিত শক্তিকী উপাসনা মেঁ শান্তি নহীঁ হৈ। জো ভক্তজন্ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম অথবা সগুণ ব্রহ্মকে উপাসক্ হৈ, বহ ভববাধা সে ছুট্ কর্ শান্তি পাতে হৈ।

৩—অথবা 'হরা হোনা' ঔর্ 'সরস্' কহনা, এক্ হী বাত হৈ। জিস্ পদার্থ মেঁ 'রস' হোতা হৈ বহী 'হরা' কহলাতা হৈ। জৈসে 'হরী টহনী':—

'জামেঁ রস সোই হর্যো য়হ জানত সব কোয়্।
গৌর শ্যাম দ্বৈ রঙ্গ্ বিন্ হর্যো বনত নহিঁ কোয়্॥"
(নাগরীদাস জী)

ইস্ সে য়হ ভাব প্রকট হোতা হৈ কি রাধাজীকী ছায়াসে—কৃপাসে—শ্রীকৃষ্ণ 'সরস্' হোতে হৈ—'রসিক্ বিহারী'—কহলাতে হৈ।

৪—"জা তনকী ঝাঁঈ—(জিস্ রাধাকে অঙ্গকী কান্তি) স্যাম্ পরেঁ—(কৃষ্ণকা প্রতিবিম্ব পড়্নে সে) হরিত-দুতি হোই—(হরী) হোতী হৈ।"—য়হ উল্‌টা—(আধারাধেয়ভাব-বৈপরীত্যাত্মক্) অর্থ—'বিহারীবিহার' কে কর্ত্তা শ্রীব্যাস জীকা হৈ !

"মেরী ভববাধা" শব্দমেঁ উপাসকবোধক "মেরী" পদ্‌সে—"জগন্নাথস্যায়ং সুরধুনি! সমুদ্ধারসময়ঃ" কে সমান্ অপ্‌নী অধমাতিশয়তা-দ্যোতন্ দ্বারা ইষ্টদেবকী নিরতিশয় মহিমাকী ধ্বনি নিকল্‌তী হৈ। অর্থাৎ মুঝ্ জৈসে আদর্শ অধম্‌কী নিরবধিক্ ভববাধা দূর্ করনেমেঁ বহী শ্রীরাধারাণী জী সমর্থ হৈ জিন্‌কী আরাধনাকে অভিলাষী ইন্দ্রাদিকে উপাস্য দেব ত্রিলোকীনাথ্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ ভী রহতে হৈ। জিত্‌না ভারী পাপী হো উসে পার্ উতারনেবালা ভী উত্‌না হী অধিক্ সমর্থ হোনা চাহিয়ে। তথা উপাস্য দেবতা শ্রীরাধা জীকে সাথ্ প্রযুক্ত "নাগরী"—

("নাগরং মুস্তকে শুণ্ঠ্যাং 'বিদগ্ধে' নগরোদ্ভবে।" ইতি মেদিনী।) বিশেষণ্ ভী পাপাপনোদনপটুতাকা দ্যোতক্ হৈ। জিত্‌না কষ্টসাধ্য রোগী হো উস্‌কে লিয়ে উত্‌না হী দিব্যৌষধ-সম্পন্ন পীযূষপাণি বৈদ্য অপেক্ষিত্ হৈ।

কাব্যপ্রকাশ্‌কে ধ্বনিপ্রকরণোদাহৃত—

"ত্বামস্মি বচ্মি বিদুষাং সমবায়োঽত্র তিষ্ঠতি।
আত্মীয়াং মতিমাস্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ॥"

পদ্যকে 'ত্বাং' 'অস্মি' 'বিদুষাং' আদি পদোঁকে সমান্ 'মেরী' পদ্‌মেঁ লক্ষণামূলক্ অবিবক্ষিতবাচ্য অর্থান্তরসংক্রমিত-রূপ্ ধ্বনি হৈ।

কোঈ—"মেরী" পদ্‌কা অর্থ "মমতা" (পুত্র, মিত্র, কলত্রাদিমেঁ মমত্ব বুদ্ধি) করতে হৈ অর্থাৎ "মেরী" মমতারূপ ভববাধাকো হরো। কৌঁযাকি সংসারমেঁ "মমতা" হী অনর্থোঁকা মূল্ হৈ।"

অতঃপর পণ্ডিতজী 'কুবলয়ানন্দ', 'ভাষা-ভূষণ, প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থের কারিকা উদ্ধৃত করিয়া এই দোহার 'কাব্য-লিঙ্গ', 'পরিকর', 'হেতু', 'উল্লাস' ও 'শ্লেষাভাস' অলঙ্কারগুলির বিশ্লেষণে দুই পৃষ্ঠার অধিক স্থান পূর্ণ করিয়াছেন ; এই অলঙ্কারের বিচার বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ পাঠকের সহজ-বোধ্য কিংবা প্রীতিকর হইবে না বিবেচনায় আমরা পরিত্যাগ করিলাম। পণ্ডিতজী ইহার পরে উক্ত দোহার আরও দুই রকম ভক্তি-রসাত্মক ও তিন রকম আদি-রসাত্মক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"৫—অথবা—জিন্‌কে তন্‌কী ঝাঁঈ (জ্যোতিঃ) পড়্‌নেসে—ধ্যান্‌মেঁ আনেসে—শ্যামত্ব—"অন্ধকারবিশিষ্ট তমোগুণ, য়া হৃদয়ান্ধকার"—হরিত—দূর—হোকর্ 'দ্যুতি'—প্রকাশ্ বিশিষ্ট সত্ত্বগুণ্ চমক্ উঠ্‌তা হৈ। বহ রাধা মেরী ভববাধা হরো। ইস্ অর্থমেঁ ভী "কাব্যলিঙ্গ" হী অলঙ্কার্ হৈ।

(নোট্ :—য়হাঁ য়হ আশঙ্কা হোতী হৈ কি অপ্‌নী ঝাঁঈসে শ্রীকৃষ্ণকো হরা করনা তো ভববাধা হরণকা পোষক্ নহীঁ হৈ, ফির্ অসম্বদ্ধ বিশেষণ্ কেঁযা ? উত্তর্ য়হ হৈ কি জিন্‌কী ঝাঁঈ

পড়্নে সে—ধ্যানগোচর্ হোনেসে—শ্যাম্ হরিত্—পাপ্কা হরণ্—হোতা হৈ ঔর্ ছুতি হোই—দিব্য দেহ হোতা হৈ"—ব্যাসজী)

৬—অথবা—কহীঁ "রাধানাগর"—ঐসা পাঠ ভী হৈ। ইস্ দশামেঁ শ্রীকৃষ্ণপরক অর্থ—অর্থাৎ বহ "রাধানাগর" শ্রীকৃষ্ণজী, জিন্কী মূর্ত্তিকী ঝলক্ পড়্নে সে—ভক্তজনোঁকে ধ্যান্মেঁ শ্যাম্ (কৃষ্ণ) কে আতে হী বহ (ভক্ত) অপ্না রূপ্ তজ্কর্ হরি-রূপ্কো প্রাপ্ত হো "সারূপ্য মুক্তি" পা জাতে হৈ। ইস্ অর্থমেঁ "তদ্গুণালঙ্কার" হৈ।

* * * *

(মঙ্গলাচরণ্কা শৃঙ্গার-পরক অর্থ)

বহুত্সে সহৃদয় রসিকশিরোমণি ইস্ প্রকার্ রূখে ফীকে ভক্তিভাবনাভরিত্ শ্রোত্রিয়-সমাদৃত্ বিরক্তজিজ্ঞাসুজনোচিত্ মঙ্গলাচরণ্কো শুন্ কর্ নাক্ ভেঁৗ চঢ়াতে হৈ ঔর্ কহতে হৈ কি য়হ "গঙ্গাকী গৈল্মেঁ মদার্কে গীত" কৈসে! বিহারীসে শৃঙ্গারী কবিকী শৃঙ্গার্ময়ী রচনামেঁ, জো পরমবিহারী গোপিকাচীরহারী রাধিকাহৃদয়চারী শ্রীমুরারি ঔর্ বৃষভানুদুলারী শ্রীরাধাপ্যারীকী রহঃকেলিয়োঁকে রহস্যোদ্ঘাটনার্থ রচী গয়ী হৈ, ঐসা মঙ্গলাচরণ্ নিতান্ত "অমঙ্গলাচরণ্" হৈ। ঔর্ য়হ 'অমরুশতক' কী শান্ত-রস-পরক্ টীকাকো লক্ষ্য কর্কে কহে হুএ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদজীকে শব্দোঁ মেঁ—

"রহসি রতিসময়ে প্রৌঢ়বধূনাং বেদপাঠ ইব সহৃদয়শিরঃশূলমুৎপাদয়তি।"

ঐসে মহানুভবোঁকে সন্তোষার্থ শ্রীহরি কবিনে ইস্ মঙ্গলাচরণ্ কো শৃঙ্গারপক্ষ মেঁ ভী পরিণমিত কিয়া হৈ, সো ভী সুনিয়ে :—

১—অথবা—নায়িকা (শ্রীরাধা) কো মানিনী দেখ্কর্ নায়ক (শ্রীকৃষ্ণ) প্রার্থনা (মিন্নত, .খুশামদ্) কর্তে হৈ কি "হে রাধা নাগরি! মেরী ভৌ-(ভয়) বাধা হরৌ, অর্থাৎ তুম্হার মান্ (কোপ্—নারা.জগী) দেখ্ কর্ মুঝে ভৌ (ভয়)—হৈ উস্সে উৎপন্ন বাধা (দুঃখ) কো হরো। অভিপ্রায়্ য়হ হৈ কি মান্ ছোড়্ প্রসন্ন হো জাও। (অগ্লী বাত্ .জরা গোপ্য হৈ, "সভ্য সমাজ" ক্ষমা করে, "অনুবাদী ন দুষ্যতি"—নায়ক মহাত্মা মান্ ছোড়্নেকা ঢঙ্ বতাতে হৈ ঔর কামকী বাত্ পর্ আতে হৈ—"ক্যা কর্কে, "সোয়"—য়া কো অর্থ হমারে পাশ্ শয়ন্ করিকৈ।" তুম্হারে তন্কী কান্তি পড়্নে সে হমারা (শ্রীকৃষ্ণকা) জো য়হ শ্যাম শরীর হৈ সো "সানন্দ হোত হৈ॥" ক্যোঁ ন হো? হুআ হী চাহে!

২—অথবা—তুম্হারে তনকী ঝাঁঈ (কান্তি) জব্ মিলাপ্কে (সমাগম্কে) সময়্ হমারে শরীর্মেঁ পড়্তী হৈ তব্ শ্যাম্— শ্যামবর্ণ শৃঙ্গাররস্ য়া (রতিপতি) কাম্—"সো পল্লবিত হোত হৈ।"

কামদেব ঔর্ শৃঙ্গাররস্ দোনোঁকা বর্ণ 'শ্যাম্' হৈ। সো য়হাঁ "সাধ্যবসানা" লক্ষণা কর্কে 'শ্যাম' পদ্ সে শ্যামবর্ণবিশিষ্ট 'কাম্' য়া 'শৃঙ্গার্' কা গ্রহণ কর্না চাহিয়ে। "সাধ্যবসানা" লক্ষণাকা লক্ষণ্ য়হ হৈ :—

"বিষয্যন্তঃ কৃতেঽন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা।" বিষয়িণা—আরোপ্যমাণেন, অন্তঃকৃতে—নিগীর্ণে, অন্যস্মিন্—আরোপবিষয়ে সতি, সাধ্যবসানা স্যাৎ—(কাব্যপ্রকাশ, দ্বিতীয়োল্লাস)।

অর্থাৎ জহাঁ বিষয়িমাত্র=(কেবল 'উপমান' পদ্—পশু আদি) কা নির্দ্দেশ্ কিয়া জায়্, ঔর্ বিষয্ =(উপমেয়, দেবদত্তাদি) কা ন কিয়া জায়্, বহাঁ "সাধ্যবসানা" লক্ষণা হোতী হৈ। জৈসে—"দেবদত্ত পশু জাতা হৈ"—ঐসা ন কহ্ কর্ "য়হ পশু জাতা হৈ"—ইত্না হী কহা জায়্ তো "সাধ্যবসানা" লক্ষণা হোগী। ক্যোঁকি য়হাঁ বিষয়ী (আরোপ্যমাণ)='পশু' পদ্সে অন্য (আরোপ-বিষয়)='দেবদত্ত' নিগীর্ণ—(ছিপা হুআ) হৈ। ইসী প্রকার য়হাঁ প্রকৃত মেঁ 'আরোপ্যমাণ' শ্যামগুণসে 'আরোপ্য' (শ্যাম-বর্ণবিশিষ্ট) 'শৃঙ্গার' য়া 'কাম' লক্ষিত হোতা হৈ।

৩—অথবা—তুম্হে দেখে ঔর্ তুম্সে মিলে বিনা হমেঁ কুছ্ নহীঁ সুঝ্তা, চারোঁ ওর্ অন্ধকার্ হী অন্ধকার্ দীখ্তা হৈ, জব্ তুম্হারী প্রভা পড়্তী হৈ তব্ হী 'শ্যাম হরিত্'= অন্ধকারাবৃত দিশাওঁ মেঁ দ্যুতি—প্রকাশ্ হোতা হৈ। ('দিশস্তু ককুভঃ কাষ্ঠা আশাশ্চ হরিতশ্চ তাঃ)'।

জিস্ মে অত্যাসক্তি হোতী হৈ উস্কে বিনা সর্বত্র অন্ধকার্ হী প্রতীত্ হোতা হৈ। ভর্তৃহরিজী লিখ্তে হৈ :—

'সতি প্রদীপে সত্যগ্নৌ সৎসু তারারবীন্দুষু।
বিনা মে মৃগশাবাক্ষ্যা তমোভূতমিদং জগৎ॥'

অর্থ—প্রদীপ্, অগ্নি, তারাগণ্, চন্দ্র ঔর্ সূর্য্য—ইন্ সব্ জ্যোতিষ্মান্ পদার্থোঁকে হোতে হুএ ভী মৃগনয়নী নায়িকাকে বিনা মেরে লিয়ে য়হ সারা সংসার্ অন্ধকারময়্ হো হৈ॥

'শৃঙ্গার' রসকী শ্যামবর্ণতামেঁ প্রমাণ :—"শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ" (সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ শৃঙ্গার কা বর্ণ "শ্যাম" ঔর্ দেবতা 'বিষ্ণু' হৈ॥

'কাম্' কে শ্যাম্ হোনে মেঁ প্রমাণ্ স্বরূপ হিন্দী কবি 'কালিদাস্' কী য়হ সুন্দর্ সূক্তি সহৃদয়্ পাঠকোঁ কে মনোরঞ্জনার্থ উদ্ধৃত হৈ। কাব্য-মর্ম্মজ্ঞ দেখেঁ কি শৃঙ্গার পক্ষকে দ্বিতীয় অর্থ (তুম্হারে তন্কী ঝাঁঙ্গী জব্ মিলাপ্কে সময় হমারে শরীর্ মেঁ পড়্তী হৈ) কা ক্যা হী সাফ্ শব্দচিত্র ইস্ পদ্যমেঁ খিঁচা হৈ। ইস্সে অচ্ছা কালে গোরেকা মেল্ কহীঁ ন দেখ হোগা!—

"কুন্দনকী ছরী আবনূসকী ছরী সোঁ মিলী
সোনজুহী-মাল্ কৈধোঁ কুবলয়হার্ সোঁ,
কৈধোঁ চন্দ্র-চন্দ্রিকা কলঙ্ক সোঁ কলিত ভঙ্গী,
কৈধোঁ রতি ললিত বলিত ভঙ্গী মার সোঁ।
'কালিদাস' মেঘ মাঁহি দামিনী মিলী হৈ কৈধোঁ
অনল্কী জ্বাল্ মিলী কৈধোঁ ধূম-ধার সোঁ।

কেলি সমৈ কামিনী কন্হৈয়া সোঁ লপটি রহী
কৈধোঁ লপটানী হৈ জুন্হৈয়া অন্ধকার সোঁ ॥"

পণ্ডিতজীর ভাষ্য কিরূপ পাণ্ডিত্য ও নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা-পূর্ণ, সুধী পাঠক এই একটি দোহার ব্যাখ্যা হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন ; সুতরাং আমরা এখানে আর ভাষ্য উদ্ধৃত করিব না; অতঃপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে যখন আমরা বিহারীলালের 'সত্‌সঈ' হইতে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও লোক-চরিত্রের পরিচায়ক নানা ভাবের বিচিত্র দোহাবলির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, তখন বহুসংখ্যক দোহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন টীকা-কারদিগের মত-ভেদের মীমাংসার জন্য আমাদিগকে পণ্ডিতজীর টীকা হইতে বহু স্থলই উদ্ধৃত করিতে হইবে। আমরা অদ্য পণ্ডিতজীর গ্রন্থ হইতে আলোচ্য 'সতসঈ' সম্বন্ধে তাঁহার সার-গর্ভ মত উদ্ধৃত করিয়া, 'সতসঈ' কাব্যখানি অনুবাদের অতীত হইলেও হিন্দীভাষায় অজ্ঞ পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য উহার কতকগুলি দোহা, অন্বয় ও বাঙ্গালা শব্দার্থ সহ প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"সতসঈকা উদ্ভব

'সতসঈ' ঔর্ 'সতসৈয়া' শব্দ সংস্কৃতকে 'সপ্ত-শতী' ঔর্ 'সপ্তশতিকা' শব্দোঁকা রূপান্তর্ হৈ, জো "সাত্ সৌ পদ্যোঁকা সংগ্রহ" ইস্ অর্থ মেঁ কুছ্ যোগ-রূঢ় সে হো গয়ে হৈ।

বিহারী সে পূর্ব দো সপ্তশতী প্রসিদ্ধ থীঁ ; এক্ প্রাকৃত মেঁ সাতবাহন্-সংগৃহীত "গাথা-সপ্তশতী" ঔর্ দূসরী সংস্কৃতমেঁ গোবর্দ্ধনাচার্য্যপ্রণীত "আর্য্যা-সপ্তশতী"। যদ্যপি "শ্রীমার্কণ্ডেয়" পুরাণান্তর্গত "দুর্গা-সপ্তশতী" ভী এক সুপ্রসিদ্ধ সপ্তশতী হৈ, পর্ নাম-সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত অন্য বিষয়্ মেঁ সমালোচ্য সতসঈ সে উস্‌সে কুছ্ ভী সাম্য নহী হৈ, ইস্ লিয়ে ইস্ প্রসঙ্গ মেঁ উস্‌কী চর্চ্চা চলানা অনাবশ্যক্ হৈ। গাথাসপ্তশতী ঔর্ আর্য্যাসপ্তশতী য়ে দোনোঁ হী অপ্‌নে অপ্‌নে রূপ্‌মেঁ নিরালী ঔর্ অদ্বিতীয় হৈ। সদাসে সহৃদয়োঁকে হৃদয়্‌কা হার্ রহী হৈ। ইন্‌মেঁ "গাথাসপ্তশতী" নে বিবেচক বিদ্বানোঁসে অত্যধিক্ আদর্ পায়া হৈ। উস্‌কী আধীসে অধিক্ গাথাএঁ সাহিত্যকা আকর্ গ্রন্থোঁমেঁ উদ্ধৃত হৈ। ধ্বনিপ্রস্থাপনপরমাচার্য্য শ্রীআনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য নে অপ্‌নে "ধ্বন্যালোক" মেঁ, বাগ্দেবতাবতার্ শ্রীমম্মটাচার্য্য নে "কাব্য-প্রকাশ" মেঁ, ঔর্ শ্রীভোজদেব নে "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" মেঁ, গাথাসপ্তশতীকী অনেক্ গাথাএঁ ধ্বনি ঔর্ ব্যঞ্জনাকে উৎকৃষ্ট উদাহরণোঁ মেঁ উদ্ধৃত করকে গাথাওঁকী সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত্ কর্ দী হৈ। য়ে প্রাকৃতগাথাএঁ বাস্তব মেঁ প্রাচীন্ সাহিত্য-সমুদ্রকে অনর্ঘ রত্ন হৈ। ইন্ প্রাচীন্ প্রাকৃত রত্নোঁকে মুকাবিলে মেঁ অনেক্ সংস্কৃত রত্নোঁকী রচনা সময়্ সময়্ পর্ হুঈ, পর্ ইন্‌কী চমক্ দমক্‌কে সাম্‌নে উন্‌কী জোতি নহীঁ জমী। 'প্রাকৃত' ভাবোঁকো প্রকট্ কর্‌নেকে লিয়ে প্রাকৃত ভাষা হী কুছ্ সমুচিত্ সাধন্ হৈ। "আর্য্যা-সপ্তশতীকে" কর্ত্তা গোবর্দ্ধনাচার্য্য নে ইস্ বাত্‌কো স্পষ্ট হী স্বীকার্ কিয়া হৈ—

* সোনজুহী—পীলী চমেলী। কুবলয়—নীল কমল। মার—কামদেব। জুন্হৈয়া—জ্যোৎস্না, চাঁদ্নী।

"বাণী প্রাকৃতসমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।
নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দকন্যের গগনতলম্॥"—(আ°স°৫২)।

অর্থাৎ বাণীকা কুছ্ স্বভাব হৈ কি বহ প্রাকৃত কাব্যমেঁ হী সরসতাকো প্রাপ্ত হোতী হৈ ঔর্ মৈঁ উসে বলাৎকার সে সংস্কৃত বনা রহা হূঁ—উলটি গঙ্গা বহা রহা হূঁ—ইস্ লিয়ে যদি বৈসী (প্রাকৃতকে সমান্) স্বাভাবিক্ সরসতা ইস্মেঁ ন আ সকে তো ক্ষন্তব্য হৈ। বলাৎকার্মেঁ রস্ কহাঁ?

ইস্ প্রকার্ খুলে শব্দোঁমেঁ প্রাকৃতকী প্রশংসা কর্নেবালে গোবর্দ্ধনাচার্য্য কোঈ সাধারণ্ কবি ন থে, জগৎপ্রসিদ্ধ গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" কে নির্মাতা জয়দেব নে উন্কে বিষয় মেঁ কহা হৈ—

"শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ॰"

অর্থাৎ শৃঙ্গাররসপ্রধান্ উৎকৃষ্ট * কবিতা কর্নে মেঁ আচার্য্য গোবর্দ্ধনকা কোঈ প্রতিদ্বন্দ্বী নহীঁ সুনা গয়া—উন্কে সমান্ শৃঙ্গাররস্কী রচনামেঁ নিপুণ্ কবি ঔর্ কোঈ নহীঁ হৈ। গোবর্দ্ধনাচার্য্য নে স্বয়ং ভী অপ্নী রচনাকী জো খোল্কর্ প্রশংসা কী হৈ, জো রচনা-সৌন্দর্য্যকো দেখে কুছ্ অনুচিত নহীঁ হৈ—

"মসৃণপদরীতিগতয়ঃ সজ্জনহৃদয়াভিসারিকাঃ সুরসাঃ।
মদনাদ্বয়োপনিষদো বিশদা গোবর্দ্ধনস্যার্য্যাঃ॥"—(আ°স°,৫১)।

"গাথাসপ্তশতী" কে অনুকরণ্ মেঁ গোবর্দ্ধনাচার্য্য সে পহলে (ঔর্ উন্কে পশ্চাৎ ভী) কুছ্ সংস্কৃত কবিয়োঁ নে আর্য্যা ছন্দমেঁ ইস্ ঢঙ্গ্কী কাব্যরচনা কী থী, জিস্কী ওর্ গোবর্দ্ধনাচার্য্য নে কঈ জগহ্ ইশারা কিয়া হৈ। পর "আর্য্যাসপ্তশতী"কে সাম্নে উন্মেঁ সে এক্ ন ঠহর্ সকী।

গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে সমান্ শৃঙ্গারী কবিয়োঁ মেঁ এক্ "অমরুক" কবি ঔর্ হৈ, জিন্কা "শতক্" হজারোঁমেঁ এক হৈ, জিস্কা অপূর্বতা পর্ মুগ্ধ হোকর্ সাহিত্যপরীক্ষকোঁনে "অমরুকবেরেকঃ শ্লোকঃ প্রবন্ধশতায়তে" কহ দিয়া হৈ, অর্থাৎ অমরুক কবিকা এক্ এক্ শ্লোক্ এক্ এক্ গ্রন্থকে সমান্ গম্ভীর্ ভাবোঁ সে ভরা হৈ।

জিস্ শৈলী পর্ প্রাকৃত "গাথাসপ্তশতী" "অমরুশতক" ঔর্ "আর্য্যাসপ্তশতী" কী রচনা

---

* মূলের 'শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়' ইত্যাদির অর্থ পূজারি গোস্বামী লিখিয়াছেন—'শৃঙ্গার এব উত্তরঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তস্য সৎপ্রমেয়স্য সামান্য-নায়ক-নায়িকা-প্রায়-বর্ণনস্য রচনৈঃ। সৎ=উৎকৃষ্ট; প্রমেয়=প্রমাণ-যোগ্য; প্রমাণ-সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'সৎপ্রমেয়' শব্দের ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ অর্থ প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ; সাধারণ নায়ক-নায়িকা ব্যতীত দিব্য নায়ক-নায়িকাগণের আদি-রসাত্মক অবস্থা কবির প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট হইতে পারে না,—এজন্যেই শৃঙ্গারোত্তরাদি পদের অর্থ—আদিরস-প্রধান সাধারণ নায়ক-নায়িকার বাস্তব (realistic) বর্ণন।—লেখক।

হুঈ হৈ, উসে সাহিত্যকে পরিভাষামেঁ "মুক্তক" কহতে হৈ। "ধ্বন্যালোক" কে তৃতীয় উদ্যোত্ মেঁ কাব্যকে ভেদ্ গিনাতে হুএ শ্রীআনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য নে "মুক্তকং সংস্কৃত-প্রাকৃতাপভ্রংশ-নিবদ্ধম্।" কহ কর্ মুক্তককে ভাষা-ভেদসে তীন্ ভেদ্ কিয়ে হৈ—অর্থাৎ সংস্কৃতনিবদ্ধ, প্রাকৃতনিবদ্ধ, ঔর্ অপভ্রংশনিবদ্ধ।

"মুক্তক" পদকী ব্যাখ্যা শ্রীঅভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য নে ইস্ প্রকার কী হৈ—

"মুক্তমন্যেন নালিঙ্গিতং, তস্য সংজ্ঞায়াং কন্।"

"পূর্ব্বাপরনিরপেক্ষেণাপি হি যেন রসচর্বনা ক্রিয়তে তদেব মুক্তকম্॥"

অর্থাৎ অগ্‌লে পিছ্‌লে পদোঁসে জিস্‌কা সম্বন্ধ ন হো, অপ্‌নে বিষয়কা প্রকট্ কর্‌নে মেঁ অকেলা হী সমর্থ হো, ঐসে পদ্যকো 'মুক্তক' কহতে হৈ। জিস্ অকেলেহী পদ্যমেঁ বিভাব, অনুভাব আদি সে পরিপুষ্ট ইত্‌না রস্‌ভরা হো কি উস্‌কে স্বাদসে পাঠক্ তৃপ্ত হো জায়ঁ, সহৃদয়তাকী তৃপ্তিকে লিএ উসে অগ্‌লী পিছ্‌লী কথাকা সহারা ন ঢুঁঢ়্‌না পড়ে, ঐসে অনুঠে পদ্যকা নাম্ "মুক্তক্" হৈ। ইসীকা নাম্ "উত্তট্" ভী হৈ, হিন্দী মেঁ ইসে ফুট্‌কর্ কবিতা কহতে হৈঁ। ইসী প্রকার্‌কে পদ্য জিস্‌মেঁ সংগৃহীত হোঁ উসে "কোষ" কহতে হৈঁ। "মুক্তক"কী রচনা কবিত্বশক্তি কী পরাকাষ্ঠা হৈ, মহাকাব্য খণ্ডকাব্য যা আখ্যায়িকা আদিমেঁ যদি কথানক্‌কা ক্রম্ অচ্ছী তরহ্ বৈঠ্ গয়া তো বাত্ নিভ্ জাতী হৈ, কথানক্‌কী মনোহরতা পাঠক্‌কা ধ্যান্ কবিতাকে গুণদোষ্ পর্ প্রায়ঃ নহীঁ পড়্‌নে দেতী। কথা-কাব্যমেঁ হজার মেঁ দশ বীস্ পদ্য ভী মার্কেকে নিকল্ আয়ে তো বহুত্ হৈ। কথানক্‌কী সুন্দর সংঘটনা, বর্ণনশৈলীকী মনোহরতা ঔর্ সরলতা আদিকে কারণ "কুল্ মিলাকর্" কাব্যকে অচ্ছেপন্‌কা প্রমাণ্‌পত্র মিল্ জাতা হৈ। পরন্তু "মুক্তক্" কী রচনামেঁ কবিকো "গাগর্‌মেঁ সাগর্" ভর্‌না পড়্‌তা হৈ। একৃহি পদ্যমেঁ অনেক্ ভাবোঁকা সমাবেশ ঔর্ রস্‌কা সন্নিবেশ কর্‌কে লোকোত্তর চমৎকার্ প্রকট্ কর্‌না পড়্‌তা হৈ। ঐসা কর্‌না সাধারণ কবিকা কাম্ নহীঁ হৈ। ইস্‌কে লিএ কবিকা সিদ্ধসরস্বতীক ঔর্ বশ্যবাক্ হোনা আবশ্যক্ হৈ। মুক্তক্‌কী রচনা মেঁ রস্‌কী অক্ষুণ্ণতা পর্ কবিকো পূরা ধ্যান্ রখ্‌না পড়্‌তা হৈ। ঔর্ য়হী কবিতাকা প্রাণ হৈ। জৈসা কি মুক্তক্‌কে সম্বন্ধমেঁ আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য লিখ্‌তে হৈ—

"মুক্তকেষু হি প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। যথা হ্যমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব।"

অর্থাৎ এক্ গ্রন্থমেঁ জিস্ রসস্থাপন্‌কা পূরা প্রবন্ধ কবিকো কর্‌না পড়্‌তা হৈ বহী বাত্ কবিকো এক্ মুক্তক্‌মেঁ লা কর্ রখ্‌নী পড়্‌তী হৈ। জিস্ প্রকার্ অমরুক্ কবিকে "মুক্তক" শৃঙ্গাররস্‌কা প্রবাহ বহানেকে কারণ প্রবন্ধকী (গ্রন্থকী) সমতা প্রাপ্ত কর্‌নেমেঁ প্রসিদ্ধ হৈঁ। "মুক্তক্" মেঁ অলৌকিকতা লানেকে লিএ কবিকো অভিধাসে বহুত্ কম্ ঔর্ ধ্বনি ব্যঞ্জনা সে অধিক্ কাম্ লেনা পড়্‌তা হৈ। য়হী উস্‌কে চমৎকার্‌কা মুখ্য হেতু হৈ। ইস

প্রকার্কে রসধ্বনিপূর্ণ কাব্যকে নির্মাতা হী বাস্তব মেঁ 'মহাকবি' পদ্কে সমুচিত্ অধিকারী হৈ। ফির্ উন্কী রচনা পরিমাণ্ মেঁ কিত্নী হী পরিমিত্ ক্যোঁ ন হো।

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব
বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং
বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু॥" (ধ্বন্যালোক—১।৪)

অর্থাৎ মহাকবিয়োঁকী বাণীমেঁ অভিধীয়মান—বাচ্য অর্থসে অতিরিক্ত "প্রতীয়মান" অর্থ ঐসী চমৎকারক্ বস্তু হৈ—জো কুছ্ ইস্ প্রকার্ চমকতী হৈ জিস্ প্রকার অঙ্গনাকে অঙ্গমেঁ হস্তপাদাদি প্রসিদ্ধ অবয়বোঁকে অতিরিক্ত লাবণ্য। ইস্ কারিকাকে "মহাকবীনাম্" পদ্কী ব্যাখ্যা কর্তে হুএ শ্রীঅভিনবগুপ্তপাদাচার্য্য লিখ্তে হৈঁ—

"প্রতীয়মানানুপ্রাণিত-কাব্যনির্ম্মাণনিপুণপ্রতিভা-
ভাজনত্বেনৈব মহাকবিব্যপদেশো ভবতীতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ প্রতীয়মান্ অর্থসে যুক্ত কাব্যনির্ম্মাণ্কী জিন্মেঁ শক্তি হৈ, বহী 'মহাকবি' কহলানেকে অধিকারী হৈ।

ইস্ নির্ণয়কে অনুসার্ 'মহাকবি' কহলানেকে লিএ য়হ্ আবশ্যক্ নহীঁ হৈ কি, সাহিত্য-দর্পণাদিমেঁ বর্ণিত লক্ষণোঁসে যুক্ত 'মহাকাব্য' কা কোই বড়া পোথা বনাবে তভী 'মহাকবি' কহলাবে। রাজশেখরনে তো ইস্ প্রকার্কে রসস্বতন্ত্র কবিকো মহাকবিসে ভী বড়ী 'কবিরাজ' কী পদবী দী হৈ। যথা—

"যস্তু তত্র তত্র ভাষাবিশেষে তেষু প্রবন্ধেষু তস্মিংস্তস্মিংশ্চ রসে স্বতন্ত্রঃ স কবিরাজঃ। তে যদি জগত্যপি কতিপয়ে।"

হমারে বিহারী জগত্কে উন্হীঁ কতিপয় কবিরাজোঁ মেঁ হৈঁ।

বিহারীকে সম্বন্ধ মেঁ লেখ লিখ্তে হুএ অব্ তক্ জো কুছ্ য়হ উপর্ লিখা গয়া সো সরসরী তৌর্সে অপ্রাসঙ্গিক সা প্রতীত্ হোগা, পর্ ঐসা নহীঁ হৈ; ইস্কী য়হাঁ আবশ্যকতা থী। হমেঁ অভী আগে চল্ কর্ 'গাথাসপ্তশতী' 'আর্য্যাসপ্তশতী' ঔর্ 'অমরুশতক' সে খাস্ তৌর্ পর্ বিহারী-সতসঈ কী তুলনা কর্নী হৈ, যদি ইস্ তুলনা মেঁ বিহারী পূরে উতর্ জায় অর্থাৎ বিহারীকী কবিতা ইন্কী বরাবরীকী য়া কহীঁ ইন্সে বঢ়ী চঢ়ী সিদ্ধ হো জায়, ইন্কে মুকাবিলে মেঁ উস্কা পল্ড়া কহীঁ ঝুক্ জায় তো জো বাত সিদ্ধ হোগী উসে ক্যা অভিধাবৃত্তিসে কহনেকী আবশ্যকতা হোগী!"

* * * *

পহলে সময় মেঁ সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বানোঁনে সতসঈ পর্ সংস্কৃতকে গদ্য ঔর পদ্য মেঁ তিলক্ ঔর

অনুবাদ্ কর্‌কে অপ্‌নী গুণগ্রাহিতা প্রকট্ কী হৈ সহী, পর্ ইস্‌সে সংস্কৃতজ্ঞোঁ মেঁ সতসঈ কা যথেষ্ট প্রচার্ নহীঁ হুআ, ঐসে অনুবাদোঁ দ্বারা কবিতাকা মূলতত্ত্ব অবগত কর্‌না অসম্ভব হৈ। বাস্তব মেঁ কবিতা অনুবাদ্ করনেকী চীজ হৈ হী নহীঁ।"

বস্তুতঃ পণ্ডিতজী তাঁহার অপূর্ব্ব তুলনায় সমালোচনা দ্বারা বিহারীলালের কবিতা যে কোন অংশে 'গাথা-সপ্তশতী', 'আর্য্যা-সপ্তশতী' বা 'অমরুশতকে'র কবিতা হইতে ন্যূন নহে—অধিকন্তু ব্রজভাষার অতুলনীয় মাধুর্য্য ও ভাব-ব্যঞ্জকতা হেতু বিহারীলালের কবিতায় এক অভিনব ও অপূর্ব্ব আস্বাদন অনুভূত হয়, ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই রসাস্বাদন অনুবাদ সাহায্যে সম্ভবপর নহে। তাই সাহিত্য-সেবক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা অবিলম্বে ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা (Lingua franca) হিন্দীর রীতিমত চর্চ্চা আরম্ভ করুন এবং পণ্ডিতজীর সঞ্জীবন-ভাষ্যের * সাহায্যে বিহারীলালের অতুলনীয় সতসঈ কাব্যখানির অনুশীলন ও উহা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়া মৈথিল-কবি বিদ্যাপতির তথাকথিত ব্রজবুলি পদাবলীর ন্যায় ব্রজ-ভাষার অদ্বিতীয় কবি বিহারীলালের দোঁহাবলীও বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গ-ভুক্ত করিয়া লইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের রত্ন-মুকুটে একখানা অমূল্য হীরক-খণ্ড সংযোজিত করুন।

আমরা নিম্নে বিহারীলালের 'সতসঈ' কাব্যের নানা স্থান হইতে নানা ভাবের কয়েকটী দোঁহা অন্বয় ও বাঙ্গালা অর্থ সহ উদ্ধৃত করিলাম :—

"মেরী ভববাধা হরৌ রাধা নাগরি সোয়।
জা তনকী ঝাঁঈ পরেঁ স্যাম হরিত-দুতি হোয়॥"

(মঙ্গলাচরণ)। সোয় (সেই) নাগরি (নায়িকা-রত্ন) রাধা (শ্রীরাধা) মেরী (আমার) ভববাধা (সংসার-যাতনা) হরৌ (হরণ করুন্), জা (যাঁহার) তনকী (শরীরের) ঝাঁঈ (কান্তি) পরেঁ (পতিত হইলে) স্যাম (শ্যাম-বর্ণ শ্রীকৃষ্ণ) হরিত-দুতি (এক-অর্থে—অপহৃত-কান্তি, অন্য অর্থে হরিদ্বর্ণ) হোয় (হয়েন)।

"ছুটী ন সিসুতা কী ঝলক ঝলক্যৌ জোবন অঙ্গ।
দীপতি দেহ দুহুন মিলি দিপতি তাফতা রঙ্গ॥"

(নায়িকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনা)। সিসুতাকী (শৈশবের) ঝলক (শোভা) ন ছুটী (ছোটে নাই), জোবন (যৌবন) অঙ্গ (অঙ্গে) ঝলক্যৌ (শোভা দিতে আরম্ভ করিয়াছে), দুহুন (শৈশব ও যৌবন—উভয়ের) মিলি (মিলনে) দীপতি দেহ (দেহের কান্তি) তাফতা রঙ্গ (ধূপছায়া-কাপড়ের ন্যায়) দিপতি (শোভা দিতেছে)।

---

* "বিহারী-সতসঈ"—সঞ্জীবন-ভাষ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মা প্রণীত। নায়কনগলা। চান্দপুর পোঃ (জিলা—বিজনৌর U. P.) ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট ৩।০ মূল্যে প্রাপ্তব্য।

"ইক ভীজে চহলে পরে বূড়ে বহে হজার।
কিতো ন ঔগুন জগ করত নৈ বৈ চঢ়তী বার॥"

(যৌবন-বর্ণনা)। ইক (এক-জন অর্থাৎ কেহ কেহ) ভীজে (ভিজিয়া যায়), (কেহ কেহ) চহলে পরে (দলদলে কর্দ্দমের ভিতর ঢুকিয়া যায়), (কেহ কেহ) বূড়ে (ডুবিয়া যায়), (আর) হাজার (হাজার হাজার লোক) বহে (ভাসিয়া যায়); চঢ়তী নৈ (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত নদী,) (এবং) চঢ়তী বৈ বার (বৃদ্ধি অর্থাৎ যৌবনের বয়স প্রাপ্ত বালা) কিতে (কত) ঔগুন (দোষ অর্থাৎ অনিষ্ট) ন করত (না জন্মায় ?)।

"কচ সমেটি কর ভুজ উলটি খএ সীস পট ডারি।
কাকো মন বাঁধৈ ন য়হ জূরো বাঁধনি হারি॥"

(সুন্দরীর কেশ-বন্ধন-বর্ণনা)। কচ (কেশ) কর (কর দ্বারা) সমেটি (সাপ্‌টাইয়া ধরিয়া), ভুজ (বাহু) উলটি (পাছের দিকে উল্‌টাইয়া), সীসপট (মাথার কাপড়টুকু) খএ ডারি (কাঁধের উপরে ফেলিয়া), য়হ (এই) জূরো বাঁধনি হারি (কেশ-বন্ধন-কারিণী) কাকো (কাহার) মন ন বাঁধৈ (মন না বন্ধন করে ?)।

"দৃগন লগত বেধত হিয়ো বিকল করত অঙ্গ আন।
য়ে তেরে সব তেঁ বিষম ঈছন তীছন বান॥"

(নায়িকার প্রতি নায়কের পরিহাস-উক্তি)। দৃগন (নয়ন-যুগলে) লগত (লগ্ন হয়), (কিন্তু) হিয়ো (হৃদয়) বেধত (বিদ্ধ করে) (এবং) আন (অন্য) অঙ্গ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) বিকল করত (বিকল করে); (সুতরাং) তেরে (তোমার) তীছন (তীক্ষ্ণ) ঈছন বান (দৃষ্টি-রূপ বাণ) সব তেঁ (সকল প্রকার অস্ত্র হইতে) বিষম (ভয়ানক)।

"ঝূটে জানি ন সংগ্রহে মন মুঁহ নিকসে বৈন।
য়াহী তে মানো কিয়ে বাতন কো বিধি নৈন॥"

(নয়নের ভাষার অপূর্ব্বতার বর্ণন)। মুঁহ নিকসে (মুখ হইতে নির্গত) বৈন (বচন) ঝূঠে (এক-অর্থে—উচ্ছিষ্ট, অন্য অর্থে—মিথ্যা) জানি (জানিয়া), (উহার) সংগ্রহে (গ্রহণে) মন ন (ইচ্ছা হয় না); মানো (মনে হয়) য়াহী তে (এই কারণ হইতেই) বিধি (বিধাতা) বাতন কো (বাক্য কহিবার নিমিত্ত) নৈন (নয়ন) কিয়ে (নির্ম্মাণ করিয়াছেন)।

"কহত নটত রীঝত খিঝত মিলত খিলত লজিয়াত।
ভরে ভৌন মেঁ করত হৈঁ নৈনন হী সোঁ বাত॥"

(নয়নের ভাষা-বর্ণন)। কহত (কথা বলে অর্থাৎ মনের কথা প্রকাশ করে), নটত (মানা করে), রীঝত (হর্ষ প্রকাশ করে), খিঝত (খেদ প্রকাশ করে), মিলত (মিলিত হয়);

খিলঁত (বিকসিত হয়) (এবং) লজিয়াত (লজ্জিত হয়) ; (এই প্রকারে) ভরে (জন-পূর্ণ) ভৌন মেঁ (ভবনে) নৈনন হীসোঁ (শুধু নেত্র-যুগল দ্বারাই) বাত করত (বাক্য কহে)।

"কঞ্জনয়নি মঞ্জন কিয়ে বৈঠী ব্যৌরতি বার।
কচ অঁগুরিন বিচ ডীঠি দৈ নিরখতি নন্দকুমার॥"

(শ্রীরাধার স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন)। কঞ্জনয়নি (কমল-নয়নী) (শ্রীরাধা) মঞ্জন (স্নান) কিয়ে (করিয়া) বৈঠী (বসিয়া) বার (কেশ) ব্যৌরতি (আঙ্গুল দিয়া আঁচড়াইতেছেন) (এবং) কচ অঁগুরিন বিচ (কেশ ও আঙ্গুলগুলির মধ্যে) ডীঠি (দৃষ্টি) দৈ (দিয়া) নন্দ-কুমার (নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে) নিরখতি (দেখিতেছেন)।

"বরন বাস সুকুমারতা সব বিধি রহী সমায়।
পঁখুরী লগী গুলাবকী গাল ন জানী জায়॥"

(সুন্দরীর কপোল-বর্ণন)। বরন (বর্ণ) বাস (সুগন্ধ) সুকুমারতা (কোমলতা)—সব বিধি (সকল প্রকারে) সমায় (সমান হইয়া) রহী (রহিয়াছে) ; (সুন্দরীর) গাল (গালে) (যে) গুলাবকী (গোলাপের) পঁখুরী (পাঁপড়ি) লগী (লাগিয়া রহিয়াছে) (উহা) ন জানী জায় (জানা যাইতেছে না)।

"রাতি দিবস হৌঁসৈ রহতি মান ন ঠিকু ঠহরায়।
জেতো ঔগুন ঢূঁঢ়িয়ে গুনৈ হাথ পরি জায়॥"

(প্রেম-গর্ব্বিতা নায়িকার সখীর প্রতি উক্তি)। রাতি দিবস (দিবা-রাত্র) হৌঁসৈ (প্রবল অভিলাষই) রহতি (থাকে), (কিন্তু) মান ঠিকু (মান করার ঠিকানা) ন ঠহরায় (থাকে না) ; (কেন না—প্রিয়তমের) জেতো (যত) ঔগুন (দোষ) ঢূঁঢ়িয়ে (তালাস করি) গুনৈ (গুণই শুধু) হাথ (হাতে) পরি জায় (পড়িয়া যায়)।

"কোরি জতন কোউ করো পরৈ ন প্রকৃতিহিঁ বীচ।
নল বল জল উচে চঢ়ৈ তউ নীচ কো নীচ॥"

(নীচ-স্বভাব-বর্ণন)। কোউ (কেহ) কোরি (কোটি) জতন (যত্ন) করো (করুক) (কিন্তু) প্রকৃতিহিঁ (স্বভাবের বিষয়ে) বীচ (পার্থক্য) ন পরৈ (ঘটে না) ; (ইহার দৃষ্টান্ত,—) নলবল (নলের জোরে) জল উচে (উর্দ্ধে) চঢ়ৈ (উঠে), তউ (তথাপি অর্থাৎ নল হইতে বহির্গত হইলে) নীচকো নীচ (নীচ হইতে নীচতর হইয়া প্রবাহিত হয়)।

"গিরি তে উঁচে রসিকমন বূড় জহাঁ হজার।
রহৈ সদা পশু নরন কহঁ প্রেম-পয়োধি পগার॥"

(রসজ্ঞ ও অরসজ্ঞের পার্থক্য)। জহাঁ (যাহাতে) গিরি তে (পর্ব্বত হইতে) উঁচে (উচ্চ) হজার (হাজার হাজার) রসিক মন (রসজ্ঞের মন) বূড় (ডুবিয়া যায়) বহৈ (সেই) প্রেম-পয়োধি (প্রেম-সমুদ্রকে) পশু নরন (অরসজ্ঞ লোকেরা) সদা (সর্ব্বদা) পগার (পগার অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও অগভীর জলাশয়) কহঁ (কহে)।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর

[পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

অব্যয় স্বর

(৫) কতকগুলি দুর্ব্বোধ দ্বিতীয়ান্ত অব্যয় শব্দ—তুষ্ণীম্ (নিঃশব্দে), সায়ম্ (সন্ধ্যায়), সাকম্ (সহ), অরম্-অলম (পূর্ণ), ঈষৎ (অল্প), অস্নঃ (অজ্ঞাতসারে), বহিঃ (বাহিরে), মিথু—মিথঃ, মুহু—মুহুঃ, জাতু। মদ্রিক্, নিণিক্, উশধক্, আনুষক্, আয়ুষক্, অনুষ্ঠু, সুষ্ঠু, যুগপৎ।

(৬) দ্রবৎ (=সত্বর, অব্যয়), দ্রবৎ (=ধাবমান, শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ) ; দ্রুগৎ (ঋ° এক বার—দৃঢ়ভাবে)।

(আ) তৃতীয়া—(১) সর্ব্বনাম—এনা, অয়া, কয়া, অনা, অমা, অমুয়া।

(২) বিশেষ্য—সহসা (হঠাৎ, সহঃ=বল), দিবা (দিনে)।

(৩) বিশেষণ—দক্ষিণেন, উত্তরেণ, অন্তরেণ, চিরেণ, শনৈঃ, শনকৈঃ, উচ্চৈঃ, পরাচৈঃ (দূরে), তবিষীভিঃ (জোরে)।

(৪) দুর্ব্বোধ—তিরশ্চতা, দেবতা, বাহুতা, সর্ব্বতা (সব ঋ°)। দ্বিতা, তাদীত্না, ঈর্ম্যা, মৃষা, বৃথা, সচা, অস্থা, অধুনা।

(৫) স্বরস্থিতির বিপর্য্যয়বিশিষ্ট তৃতীয়ান্ত পদ—গুহা, অপাকা, আসয়া, কুহয়া, নক্তয়া, স্বপ্নয়া, সমনা, অদত্রয়া, ঋতয়া, উভয়া, সুম্নয়া, দক্ষিণা, মধ্যা, নীচা, প্রাচা, উচ্চা, পশ্চা, তিরশ্চা, বসন্তা, আশুয়া, সাধুয়া, রঘুয়া, ধৃষ্ণুয়া, অনুষ্ঠুয়া, মিথুয়া, উর্বিয়া, ('উর্ব্যা' স্থানে), বিশ্ব্যা (বিশ্বয়া)।

(ই) চতুর্থী—এই বিভক্তিতে অব্যয় শব্দ অতি বিরল। অপরায় (ভবিষ্যতের জন্য, ঋ°), চিরায়।

(ঈ) পঞ্চমী—(১) সর্ব্বনাম—কস্মাৎ (কেন ?), অকস্মাৎ (হঠাৎ, বিনাকারণে), আৎ, তাৎ, যাৎ।

(২) বিশেষ্য—আসাৎ, (নিকটে), আরাৎ (দূরে)।

(৩) বিশেষণ—দূরাৎ, নীচাৎ, সাক্ষাৎ, পশ্চাৎ।

(৪) নানাবিধ—অপাকাৎ (দূরে, দূর হইতে), অমাৎ (নিকটে, নিকট হইতে), সনাৎ (বহুকাল হইতে, 'সনা' তৃতীয়ান্ত), উত্তরাৎ, অধরাৎ।

(উ) ষষ্ঠী—উদাহরণ বিরল—অক্তোঃ (রাত্রি-যোগে), বস্তোঃ (দিবাভাগে)।

(ঊ) সপ্তমী—বিশেষণ ও বিশেষ্য—আকে (নিকটে), আরে—দূরে (দূরে), অভিস্বরে, পশ্চাদ্‌ভাগে), অস্তমীকে (স্ব-গৃহে), ঋতে (বিনা), অগ্রে (সম্মুখে), অপরীষু। (সপদি, আদৌ, রহসি, স্থানে, অর্থে, কৃতে)।

(ঋ) প্রথমা—প্রথমান্ত পদও দু'একটী পাওয়া যায়। কিঃ (জিজ্ঞাসাবাচক), মাকিস্ (নিষেধবাচক)।

গ। উপসর্গ—বৈদিক যুগে উপসর্গসমূহের কতকটা স্বাধীন ব্যবহার ছিল। ক্রিয়াপদ হইতে বহু দূরে উপসর্গ প্রযুক্ত হইতে পারিত। ক্রিয়া ও উপসর্গের মধ্যে ব্যবধান ত থাকিতে পারিতই। তাহা ছাড়া ক্রিয়াপদের পরেও বহু দূরে উপসর্গের প্রয়োগ অবিরল। স দেবান্ এ হ বক্ষ্যতি (ঋ°—তিনি দেবগণকে এই দিকে আনিবেন ; আ—বক্ষ্যতি)। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ (অথ°—তিনি যেন আমাদের আয়ু বৰ্দ্ধিত করেন ; প্র—তারিষৎ)। তাবা যাতম্ উপ দ্রবৎ (ঋ°—তোমরা দুই জনে শীঘ্র এই দিকে এস ; আ—যাতম্—উপ)। গমদ্ বাজেভিরা স নঃ (ঋ°—যেন তিনি দান বা দেয় বস্তু সহ এখানে আমাদিগের নিকট আসেন ; গময়ৎ—আ)। লৌকিক সংস্কৃতে উপসর্গের এরূপ প্রয়োগ ছিল না। ক্রিয়ার পূর্ব্বে ক্রিয়ার সহিত জুড়িয়া উপসর্গের ব্যবহার ছিল। উপসর্গের কোনও স্বাধীনতাই ছিল না। বিনা ক্রিয়ায় উপসর্গের ব্যবহার অতি অল্পই ছিল। বেদের যুগে উপসর্গসমূহের সম্পর্ক কারক ও ক্রিয়ার সহিত সমান ভাবেই ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহারা কারক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

অনু, অতি (অতি দেবান্ কৃষ্ণঃ), আ, অন্তর্, উপ, প্রতি প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গ কারক-নির্দ্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়। অপ, অব, উদ্, নি, নিস্, পরা, প্র, বি, সম্ কেবল ক্রিয়ার সহিতই যুক্ত হয়, কারক-নির্দ্দেশকরূপে স্বাধীন ব্যবহার ইহাদের নাই। অপি এখন স্বাধীন; প্রশ্নার্থক অব্যয়। ইহার ক্রিয়ান্বয়িত্ব কাড়িয়া লইয়াছে—"পি'; যেমন পিধান। অব স্থানে "ব' ('বগাহ') থাকিলেও ইহার ভাগ্যে স্বাধীনতা লাভ ঘটে নাই। বৈদিক উপসর্গের আর একটী বৈশিষ্ট্য স্বর-বিষয়ক। স্বরবিষয়ক সাধারণ নিয়ম এই :—

(১) ক্রিয়াপদ বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশ স্থলেই স্বরবিহীন।* এই সকল স্বরবিহীন ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে যে উপসর্গ থাকে, তাহা স্বরবান্। কিন্তু একাধিক উপসর্গ থাকিলে ক্রিয়াপদের অতি সমীপস্থ উপসর্গই স্বরবান্ হয়। অন্যত্র স্বর থাকে না।

(২) যদি ক্রিয়াপদে স্বর থাকে, তবে উপসর্গ বা উপসর্গ-সমূহ স্বরবিহীন হইয়া পড়ে।

(৩) অর্থাৎ ক্রিয়া ও উপসর্গ উভয়ে মিলিয়া এক। তাই উভয়ের সম্পত্তি একটী মাত্র স্বর।

(৪) অধীন বাক্যে উপসর্গের স্বর থাকে না। কিন্তু এ সকল বিধি সর্ব্বত্র খাটে না। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই আছে—'আ-যাতম্-উপ', 'গমৎ—আ'। আরও অনেক উদাহরণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।†

উপসর্গের স্বরস্থিতি বিষয়ে আর একটী কথা এই যে, তাহারা সবগুলিই আদ্যুদাত্ত। কেবল 'অভি' অন্ত্যোদাত্ত।‡

উপসর্গসমূহ বিশেষণের ন্যায় তর,-তম,-র,-ম প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবিশেষণরূপে ও বিশেষণরূপে এবং সময়ে সময়ে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তর, উত্তম, অধর, অধম, অপর, অপম, অবর, অবম, উপর, উপম, অন্তর, অন্তম, নিতরম্, অভিতরম্, অবতরম্, পরাতরম্, পরস্তরম্, অতিতরাম্, অভিতরাম্, অনুতমাম্, প্রতিতরাম্, উত্তরাম্, প্রতরাম্, নিতরাম্, বিতরাম্, সন্তরাম্। এই শেষেরগুলি (তরাম্ যোগে) ব্রাহ্মণে ব্যবহৃত; সংহিতা-সাহিত্যে অতিবিরল।

উপসর্গের ন্যায় ক্রিয়ার সম্পর্কে বিকাশপ্রাপ্ত উপসর্গের ন্যায় ধর্ম্মবিশিষ্ট কতকগুলি অব্যয়

* সা, প, প, ১৩২৯। ১ম সংখ্যা, ১৮পৃঃ।

† সা, প, প, ১৩২৯। ১ম সংখ্যা, ১৮পৃঃ।

‡ উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্।

পদ— অবস্ (নীচে), অধস্ (অধস্তরাম্), পরস্ (দূরে) (পরস্তরাম্), পুরা, অন্তরা (মধ্যে—অন্তর্+আ ?), অন্তি (নিকটে),সহ, সচা (সহ), বিনা ('বি' উপসর্গের সগোত্র, তৃতীয়ান্ত)। পূর্ব্বের উদাহরণের কতকগুলি পদ এই শ্রেণীর।

নিষেধার্থক অ-, অন্- প্রভৃতি উপসর্গ-ধর্ম্মাক্রান্ত কতকগুলি চিরপরাধীন অব্যয় আছে। ইহাদের স্বাধীন ব্যবহার কোথাও নাই। কৃদন্ত, বিশেষ্য বা বিশেষণ সর্ব্ববিধ শব্দের সহিত ইহাদের যোগ হয়। অকুত্র, অপুনঃ, অনেব, অনধঃ। কচিৎ দীর্ঘ উচ্চারণ— আসৎ (অস্তিত্ব-বিহীন), আদেব (দেববিহীন), আরাতি (অরাতি), আতুর (অসুস্থ)।* সর্ব্বনামের সহিত নিষেধার্থক উপসর্গের ব্যবহার বিরল; অতৎ, অকিঞ্চিৎ, অকস্মাৎ। ব্রাহ্মণের ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার সহিতও ইহার ব্যবহার হইয়াছে—অলোকয়ন্তি (দেখে না), অস্পৃহয়ন্তি (চাহে না)। অসম্ভাবাচক 'ন' ও নিষেধবাচক 'মা' বোধ হয় এই শ্রেণীর নহে। তাহাদের স্বাধীন প্রয়োগই বেশী। সমাস-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

ঘ। বিবিধ অব্যয়।

(১) সম্মতি বা নিশ্চয়ার্থক—কিল, খলু, বৈ, বাব (ব্রাহ্মণে), হি (স্বরহীন), হিন, উ, হ, ঘ, সমহ, স্ম, ভল। ইদ্, জাতু, এব।

(২) জিজ্ঞাসাবাচক—কদ্, কুবিদ্, ননু, ক, কম্।

(৩) উ-যোগে—অথো, নো, মো, উতো, উপো, প্রো। ইহারা প্রগৃহ্য।

(৪) সম্বোধনে—অঙ্গ, হন্ত (খেদে), ভোঃ, ইত্যাদি।

(৫) উপমাবাচক—ন, (গৌরো ন তৃষিতঃ পিব—ঋ°—তৃষিত মহিষের ন্যায় পান কর), ইব, ব (স্বরহীন), যথা (স্বরহীন)।

(৬) স্থানকালবাচক—মু, নূ (নূনম্), ক, অত্র, সন্তস্, সদিবস্, হ্যম্, শ্বস্, জ্যোক্ (দ্যু হইতে), পুনর্।

(৭) নিষেধাদিবাচক—ন, মা, মু (নূ), নহি (ন+হি), নেদ্ (=নচেৎ), নহু, চন, হিন, নকিস্ মাকিস নকীম্ মাকীম্।

* বাঙ্গালা ভাষায় এই দীর্ঘ উচ্চারণের বাহুল্য আছে,—আগাছা, আমানব, আধানী, আসঁতা, আকামা, আ-দোঁআ (গরু—un-broken, untrained

(৮) বিবিধ—নানা, নানানম্, সস্বর্ (গোপনে)।

(৯) পাদপূরণে—এই সকল অব্যয়ের এক একটা অর্থ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কালক্রমে অর্থবিস্মৃতির সঙ্গে নানা অর্থে ইহাদের প্রয়োগ হইয়াছে। অবশেষে লৌকিক সংস্কৃতের শেষ যুগে তাহাদের পাদপূরণে ব্যবহার হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে পাদপূরণে অব্যয়ের ব্যবহার ছিল না।

ঙ। অনুবৃত্তিবাচক অব্যয় বা conjunctions—সমাসের প্রসাদে সংস্কৃত ভাষায় এই শ্রেণীর অব্যয়ের ব্যবহার বেশী নাই। অন্যান্য আর্য্যভাষার ন্যায় নানাবিধ অধীন বাক্যের ব্যবহার সংস্কৃতে নাই। তাহার স্থানে আছে বিবিধ সমাস। তাই এই শ্রেণীর অব্যয়ের সংখ্যা অতি অল্প।

(১) সংযোজক—চ, উত, অপি, ততঃ, তথা, কিংচ, অথ, ইতি, ইত্যাদি।

(২) বিয়োজক—তু, উ (স্বরহীন)।

(৩) সম্ভাবনাবাচক—যদি, চেদ্।

(৪) হেতুবাচক—হি (যেহেতু), যতঃ।

চ। ভাবাধিক্য-বাচক অব্যয় বা interjections—

(১) অঙ্গভঙ্গীর আনুষঙ্গিক—আ, হা, হাহা, অহহ, হে, হৈ, অয়ি, অয়ে, হয়ে, অহো বট্, বত, বত, হিরুক্, হুরুক্।

(২) অনুকরণজাত বা ধ্বন্যাত্মক—চিশ্চা, (বাণের শব্দ), কিকিরা (হৃৎ-স্পন্দন-শব্দ), বাল্, ফট্, ফষ্, ফস্ (=কোনও কিছু ভাঙ্গার শব্দ), ভুক্ (কুকুরের শব্দ), শল্ (পট্ শব্দ), আষ্, হীষ্, অস্, হস্।

(৩) বিশেষ্য-বিশেষণাদি-জাত—ভোঃ (ভবৎ শব্দ হইতে), রে (অরি শব্দ হইতে), ধিক্ (দিহ্ ধাতু হইতে ?). কষ্টম্, দিষ্ট্যা, স্বস্তি, সুষ্ঠু, সাধু। এইগুলির বৈদিক প্রয়োগ নাই।

এই সকল শব্দের আলোচনা কেহ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি বোধ হয় এইখানেই। সাহিত্যে ইহাদের কচিৎ ব্যবহার। অভিধানে ইহারা পরিত্যক্ত। অথচ ইহাদের অভাবে দৈনন্দিন কার্য্য বন্ধ হয়। এদিকে বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ছ। কারকনির্দ্দেশক অব্যয়ের (নিপাতাদির) * স্বরস্থিতির কথা স্থানান্তরে হইয়াছে।

---

* নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ।

তদ্ধিত স্বর

যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয়ে আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল স্থলে প্রায় আদ্যক্ষর বা অন্ত্যাক্ষরে স্বরস্থিতি হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই স্বরস্থিতির অগ্রসৃতি বা পশ্চাদ্‌গতি হয়। সাধারণতঃ প্রত্যয়েই স্বর থাকে, তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দসমূহ বিশেষণ বা বস্তুবাচক, ভাববাচক নহে। কিন্তু স্বরস্থিতির নানারূপ ব্যতিক্রমও দেখা যায়। প্রত্যেক প্রত্যয় ধরিয়া তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

অ—প্রত্যয়। এই প্রত্যয় দ্বারা নানা প্রকার শব্দের সৃষ্টি হয়। কৃদন্তেও অ প্রত্যয়ের ভূরি প্রয়োগ দেখা গিয়াছে।

আয়স (অয়স্), মানস (মনস্), সৌমনস (সুমনস্), ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্), হৈমবত (হিমবন্ত্), আঙ্গিরস (অঙ্গিরস্), হাস্তিন (হস্তিন্), মারুত (মরুৎ), শারদ, বৈরাজ, (বিরাজ্), পৌষ্ণ (পূষন্), মানুষ (অবিচলিত স্বরস্থিতি)। মাঘোন, বার্ত্রঘ্ন, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র (সবিতৃ), দানব (দানু), সৈন্ধব (সিন্ধু), পার্শ্ব (পর্শু, পঞ্জরাস্থি), পার্থিব (পৃথিবী), ঐন্দ্রাগ্ন (ইন্দ্রাগ্নী), পাঙ্‌ক্ত (পঙ্‌ক্তি), যামুন (যমুনা), কানীন (কনীন, বালিকা), বারুণ, বৈশ্বদেব (বিশ্বদেব), গার্দভ (গর্দভ), সৌভাগ্য (সুভগ), বাসন্ত (বসন্ত), দৈবোদাস (দিবোদাস)। বৃষণ, উচ্চ, নীচ, পরাচ, তমস, রজস, পয়স, ব্রহ্মবর্চস, সর্ব্ববেদস, পরমেষ্ঠিন প্রভৃতিতে গুণ বৃদ্ধি নাই। পান্ত (শুখো), বসন্ত, হেমন্ত, বেশন্ত, অনূক, অপাক, উপাক, প্রতীক, পরাক, হোত্র, নেত্র, নেষ্ট্র, পোত্র, ধাত্র, ভ্রাত্র, সবিত্রাত, আব্যুষ, ভূম্য, জাস্পত্য, ত্রয়, দ্বয়, নব, অন্তর (অন্তর্), ভেষজ (ভিষজ্), দেব (দিব্)।

য—প্রত্যয়।* দৈব্য (দেব), পালিত্য (পলিত), গ্রৈব্য (গ্রীবা), গার্হপত্য (গৃহপতী), আর্ত্বিজ্য

* In a great majority of instances in the oldest language, the *ya* when it follows a consonant is dissyllabic in metrical value, or is to be reduced to *ia*. Thus in R. V., 266 words have *ia* and only 75 have *ya* always : 46 are to be read now with *ia* and now with *ya* ***. As might be expected, the value *ia* is more frequent after a heavy syllable : Thus in R. V. there are 188 examples of *ia* and 27 of *ya* after such a syllable. ***. It must be left for further researches to decide whether in the *ya* are not included more than one suffix, without different accent and different quantity of the i-element : or with an *a* added to a final i of the primitive.—Whitney 1210. a.

(ঋত্বিজ্), সাংগ্রামজিত্য (সংগ্রামজিৎ), আতিথ্য (অতিথি), বৈমনস্য (বিমনস্), বৈশ্য (বিশ্), আধিপত্য (অধিপতি), নৈর্বাধ্য, বৈষ্ণব্যৌ।

য – প্রত্যয়। আদিস্বরের বৃদ্ধিবিহীন।

ক। মৌলিক স্বর। অশ্ব্য (অশ্ব), অঙ্গ্য (অঙ্গ), মুখ্য (মুখ), অব্য (অবি – মেষ), গব্য (গো), বিশ্য (বিশ্ = লোক), দুর্য (দুর্ = দ্বার), নর্য (নৃ), বৃষ্ণ্য (বীর্য্যবান্, বৃষন্) ; স্বরাজ্য (autocracy ; স্বরাজ্), সুবীর্য (বহু-সৈন্য-বান্, সুবীর), বিশ্বজন্য (= সকল লোকের), বিশ্বদেব্য (সকল দেবের), (বিশ্বদেব), ময়ূরশেপ্য (ময়ূর-লেজা)।

খ। প্রথমাক্ষরে পশ্চাদ্‌গত স্বর। কণ্ঠ্য (কণ্ঠ), স্কন্ধ্য (স্কন্ধ), ব্রত্য, (ব্রত), মেঘ্য (মেঘ), পিত্র্য (পিতৃ), প্রতিজন্য (প্রতিজন – বিপক্ষ)। [হিরণ্যয় (হিরণ্য), গব্যয়, অব্যয়, অব্যয়।]

গ। অন্ত্যোদাত্ত। দিব্য (দিব্), সত্য (সন্ত্), ব্যাঘ্য (ব্যাঘ্র), কব্য (কবি), গ্রাম্য (গ্রাম), সোম্য, অনেনস্য, (অনেনস্), অদক্ষিণ্য (দক্ষিণা)।

ঘ। অন্ত্য-স্বরিত। এই শ্রেণীর শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী। বিশ্য (বিশ্), হৃদ্য, বিদ্যুত্য (বিদ্যুৎ), রাজন্য (রাজন্), দোষণ্য (দোষন্ – বাহু), শীর্ষণ্য (শীর্ষন্), কর্মণ্য (কর্মন্), ধন্বন্য (ধন্বন্ = সমভূমি), নমস্য (নমস্) ত্বচস্য (ত্বচস্ = চর্ম্ম), বর্হিষ্য, আয়ুষ্য (আয়ুস্), ভসদ্য (ভসদ্ = পাছা), প্রাচ্য (প্রাঞ্চ্), অর্যম্য (অর্যমন্)॥ হনব্য (হনু), বায়ব্য (বায়ু), পশব্য (পশু), ইষব্য (ইষু), মধব্য (মধু), অপ্সব্য (অপ্সু = জলে, ৭মী), রজ্জব্য (রজ্জু), শরব্যা (শরু, বাণ), নাব্যা, নাব্য (নৌ = নৌকা), প্রাশব্য (প্র + অশ্ ধাতু), ঊর্জব্য (ঊর্জ্ – বৃদ্ধি, ভোজ্য)॥ জনিতব্য (জনিতু + য), কর্তব্য, হিংসিতব্য। বক্তু, ধাতু, গাতু, দাতু প্রভৃতির উত্তর য প্রত্যয়ে বক্তব্য, ধাতব্য, গাতব্য, দাতব্য প্রভৃতি শব্দ।

স্বর্গ্য (স্বর্গ), দেবত্য, (দেবতা), প্রপথ্য (প্রপথ – পথপ্রদর্শক), বুধ্ন্য (বুধ্ন্ – গৃহভিত্তি), জঘন্য (– পশ্চাদ্‌ভাগীয়,—জঘন্ত,) বরুণ্য (বরুণ), বীর্য (বীর), উদর্য (উদর), উৎস্য (উৎস), উর্বর্য (উর্বরা – কৃষ্টভূমি), স্বাহ্য (স্বাহা)।

৬। অপিকক্ষ্য (বগলের নিকট), উপপক্ষ্য (পার্শ্বদ্বয়ে), উদাপ্য (উজান), উপতৃণ্য (তৃণসমীপস্থ) ॥

চা অন্ত্রাস্ত্য (নাড়ি ভুঁড়ির মধ্যে), উপমাস্য (প্রতিমাসে), অভিনভ্য (আকাশাভিমুখী), অন্তঃপর্শব্য (পাঁজরার মধ্যে), অধিগর্ত্য (শকটাসনে)।

কৃদন্তের সহিত প্রভেদবিহীন য-প্রত্যয়ান্ত তদ্ধিত। চৈত্য (চিত্), ভব্য, হব্য, মর্জ্য, যোধ্য,-মাদ্য,-বাচ্য, ভাব্য, প্রশস্য, উপসদ্য, বিহব্য, অনাপ্য, অনপবৃজ্য। ইত্য, শ্রুত্য, স্তুত্য। চকৃত্য, নব্য, হব্য, অনুকৃত্য। কার্য, সমাপ্য, আদ্য (ভোজ্য), অতিতার্য (অতিতরণীয়), নীবিভার্য (নীবিতে বহনীয়), প্রথম-বাস্য (প্রথমে পরিধেয়), পরিবর্গ্য (পরিবর্জনীয়), অবিমোক্য (বিমোচনের অযোগ্য)। ব্রহ্মজ্যেয়, বসুদেয়, ভাগধেয়, পূর্ব্বপেয়, শতসেয়, অভিভূয়, দেবহূয়, মন্ত্রশ্রুত্য, কর্মকৃত্য, বৃত্রতূর্য, হোতৃবূর্য, অহিহত্য, সত্রসদ্য, শীর্ষভিদ্য, ব্রহ্মচর্য, নৃষহ্য। ঋতোদ্য, সহশেয্য, সধস্তুত্য। কৃত্যা, বিদ্যা. ইত্যা, অগ্নিচিত্যা, বাজজিত্যা, মুষ্টিহত্যা, দেবযজ্যা। সূর্য (স্ত্রী° সূর্যা), আজ্য, পুষ্য, নভ্য, যুজ্য, গৃধ্য, ইর্য, অর্য, আর্য, মর্য, মধ্য ॥

ইয় প্রত্যয়। ঈয় প্রত্যয়। অভ্রিয় (অভ্রিয়—মেঘজাত, অভ্র), ক্ষত্রিয় (শক্তিমান্, ক্ষত্র), যজ্ঞিয় (যজ্ঞ), হোত্রিয় (হোত্র), অমিত্রিয় (অমিত্র)। অগ্রিয় (অগ্রিয় অগ্র), ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রের, ইন্দ্র), ক্ষেত্রিয় (ক্ষেত্রবিষয়ক, ক্ষেত্র)। শ্রোত্রিয় (শ্রোত্র—বিদ্যা), ঋত্বিয়, (ঋত্বিয়, সাময়িক, ঋতু) ॥ আর্জিকীয়, গৃহমেধীয়, পর্বতীয় (পর্বত্য), অন্তরাষ্ট্রীয়, পঞ্চবাতীয়, মার্জালীয় ॥ দ্বিতীয়, তৃতীয়, তুরীয় ॥

এয় (এয্য) প্রত্যয়। আর্ষেয় (—ঋষিবংশধর, ঋষি), জানশ্রুতেয় (জনশ্রুতির পুত্র), সারমেয় (সরমার বংশ, সরমা), শাতবনেয় (শতবনির বংশধর), রাথজিতেয় (রথজিৎপুত্র)। আস্নেয় (রক্তবিষয়ক, অসন্), বাস্তেয় (বস্তিসম্বন্ধীয়, বস্তি—bladder), পৌরুষেয় (পুরুষ-যোগ্য)। সভেয় (সভা), দিদৃক্ষেয় (দর্শনীয়, দিদৃক্ষা) ॥ ভাগিনেয় ॥ শপথেয্য (শপথ-প্রাপ্ত), সহশেয্য ॥

এন্য প্রত্যয়। বরেণ্য॥ বীরেণ্য (পুরুষত্ববান্, বীর), কীর্তেন্য (কীর্তি ; যশস্বী)॥ অনভিশস্তেন্য (অভি শাস্তি), বিজেন্য॥ অধিকাংশেই স্বরস্থিতি 'এন্য'। অনেক স্থলে 'এনি অ'। ঈড়েনিঅ, চরেণিঅ, দৃশেনিঅ, ভূষেণ্য, যুধেনিঅ, যংসেন্য। মর্মৃজেন্য, বাবৃধেন্য, দিদৃক্ষেণ্য, শুশ্রূষেণ্য, পপৃক্ষেণ্য॥

আয্য প্রত্যয়। বহুপায্য (অনেকের পালনকারী), নৃপায্য (নররক্ষক), কুণ্ডপায্য (নাম), পুরুমায্য (নাম), পূর্ব্বপায্য (প্রথম পেয়), মহয়ায্য (উপভোগ). রসায্য (খিট-খিটে, neruons), উত্তমায্য (পর্ব্বতশিখর)। অলায্য, অকায্য, প্রহায্য (দূত), প্রবায্য॥

আয়ন প্রত্যয়। দাক্ষায়ণ, রামায়ণী, আমুষ্যায়ণ (অমুকের অপত্য), স্বস্বায়ন (-যন)। উক্ষণায়ন (ঋ°)। কাণ্বায়ন (সম্বোধন, কণ্ব-পুত্র)। অপত্যার্থ প্রত্যয়॥

আয়ী প্রত্যয়। শব্দসংখ্যা অল্প। অগ্নায়ী (অগ্নি-পত্নী), মনাবী (মনুপত্নী)।

ই প্রত্যয়। প্রথমাক্ষরে স্বর। আগ্নিবেশি, পৌরুকুৎসি, প্রাতরাদনি, সাংবরণি, প্রাহ্রাদি, সারথি॥ তপুষি, শুচন্তি, ভুবন্তি॥

ক প্রত্যয়। বহুল প্রয়োগ। মূলতঃ বিশেষণার্থক, পরে অল্পার্থক (diminutive), তারপর নানা অর্থে প্রয়োগ। উক, অক ও ইক প্রত্যয়ে বোধ হয়, এই 'ক' আছে। অন্তক (অন্ত), বল্হিক (বল্হি ; বাল্খ্-প্রদেশীয়), আণ্ডিক (অণ্ড, ডিম্ব যাহার আছে), সূচিক (সূচি, সূচি-যুক্ত, বিদ্ধকারী), উর্বারুক (উর্বারু ; লাউ বা শসা ফল), পর্য্যায়িক (পর্য্যায়, ক্রমিক)। একক, দ্বক, ত্রিক, অষ্টক, তৃতীয়ক (তৃতীয় দিবসের)। অস্মাক (আমাদের), যুষ্মাক (তোমাদের), * মমক (আমার), অন্তিক (নিকটবর্ত্তী), অনুক (পরবর্ত্তী), অবকা (উদ্ভিদ্‌বিশেষ), রূপক (রূপ ; মূর্ত্তিযুক্ত), বভ্রুক (বভ্রু—পীতবর্ণ)॥ অল্পার্থে। অশ্বক, কনীনক ও কুমারক (বালক), কনীনকা বা কনীনিকা (বালিকা), পাদক (পা), পুত্রক, রাজক (রাজপুত্র), শকুন্তক (ছোট পাখী)। অন্তক, অলকম্ (অলম্)॥

* সর্ব্বনাম স্বর অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ্য ও বিশেষণ সহ। অস্তক (গৃহ), নাসিকা, মক্ষিকা, অবিকা (মেষী), ইষুকা (বাণ), দূরক (দূরস্থ), সর্বক (সব, সমগ্র), ধেনুকা (ধেনু), নগ্নক (নগ্ন), বন্ধক (বদ্ধ ; বন্দী), অনস্তমিতকে (সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে), বম্রক (পিপীলিকা), অর্ভক (ছোট), শিশুক শিশু), এজৎক (সকম্প), অভিমাদ্যৎক (মত্ততাপ্রাপ্ত), পতয়িষ্ণুক (উড়ন্ত)।

সন্নক (ক্ষুদ্র, অল্প), বিমন্যুক (ক্রোধ-নাশক), বিক্ষিণৎক (নাশকারী), প্রবর্তমানক প্রবর্ত্তনকাম্নক, বিকাসক), বিক্ষীণক (হত, নষ্ট, 'ক্ষীণ')।

অনক্ষিক (চক্ষুহীন), অত্বক্ক (ত্বক্‌-হীন), অরেতস্ক (বীর্য্যহীন, বীজশূন্য), বহুহস্তিক (বহু হস্তী যার), ইয়ত্তক, ইয়ত্তিকা।

বাসন্তিক (বসন্তকালীন), বার্ষিক (বর্ষাকালীন), হৈমন্তিক, কৈরাতিকা (কিরাতদিগের) ॥

অনুনাসিক [ন্‌ বা ম্‌] যুক্ত প্রত্যয়।

আন—তকবান, ভৃগবান, বসবান। * ইন্দ্রাণী, বরুণানী ; উশীনরাণী, পুরুকুৎসানী, মুদ্‌গলানী, ঊর্জানী ॥ পতি-পত্নী ; দেবপত্নী, সিন্ধুপত্নী। পরুষ-পরুষ্ণী [কর্কশা, অমসৃণদেহা]। পূর্ব্বোদাহৃত 'ক্নী' প্রত্যয়। *

ঈন—অপাচীন, নীচীন, প্রাচীন, অর্বাচীন [অর্বাচীন], প্রতীচীন (প্রতীচীন), সমীচীন। সংবৎসরীণ, জ্ঞাতকুলীন (যাহার কুল জানা আছে), মাকীন [আমার]।

এন—সামিধেন [স্ত্রী° সামিধেনী]—'সমিধ' হইতে।

ইন—পরমেষ্ঠিন, মলিন। শাকিন, বর্হিন, ভজিন, শুষ্মিণ।

ন, অন—শূরণ [বীরতুল্য], ফল্গুন, শ্মশ্রুণ, দদ্রুণ ; স্ত্রৈণ, চ্যৌত্ন [উত্তেজক], দ্রোণ [দ্রু = কাঠ, গাছ]।

ইম, ত্রিম—খনিত্রিম [খনন দ্বারা কৃত], কৃত্রিম, পুত্রিম, অগ্রিম।

* সা, প, প, ১৩২৯।১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ম—অধম, অপম, অবম, উপম, পরম, মধ্যম, চরম, অন্তম। প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম॥

ম্ন—দ্যুম্ন (উজ্জ্বলতা), নৃম্ন (পুরুষত্ব), নিম্ন (গভীরতা), সুম্ন (মঙ্গল)।

ময় প্রত্যয়। মনস্ময়, নভস্ময়, অয়স্ময়, মৃণ্ময়, তেজোময়, অদোময়, আপোময়, যজুর্ময়, এতন্ময়, বাঙ্ময়, অশ্মন্ময়, হিরণ্ময়, সুময় [উৎকৃষ্ট আকারের], কিম্ময় [কিসের তৈরী]।

র প্রত্যয়। স্বরস্থিতি নানারূপ। পাংসুর [ধূলিময়], অশ্রীর [শ্রীহীন, অশ্লীল], ধূম্র [ধূম্রবর্ণ, ধূম]। আগ্নীধ্র (অগ্নিপ্রজ্বালনকারী, অগ্নীধ্], শাঙ্কুর [শঙ্কু, বধ-যূপ-সদৃশ, হাড়-কাঠের মত], মেধির [মেধাবী], রথির [রথস্থ], কর্মার [কামার], অচ্ছের [মৈংসং]। অপর, অধর, অবর উপর, অন্তর॥

ল প্রত্যয়। পূর্ব্ব প্রত্যয়ের সহিত অভিন্ন। বহুল, মধুল, (মধুর), জীবল (চঞ্চল, কর্ম্মঠ, lively), অশ্লীল (অশ্রীর ; অভব্য), মাতুল (মাতৃ হইতে ; মাতৃসম্পর্কীয়)। পরবর্ত্তী যুগের লু প্রত্যয় ইহারই আকার-ভেদ। দয়ালু।

ব প্রত্যয়। অর্ণব (ঊর্ম্মিযুক্ত), কেশব (কেশবান্), রাস্নাব (মেখলাবান্), (মসৃণ, পিচ্ছিল), শন্তিব (শান্তিকর), শ্রদ্ধিব (শ্রদ্ধা-যোগ্য, বিশ্বাস্য)।

কৃষীবল (কৃষি হইতে ; কৃষক), ঊর্ণাবল (লোমযুক্ত), রজস্বলা, দ্রুবয় (দারুপাত্র)

পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা), ভ্রাতৃব্য (ভাই-পো, শত্রু)।

শ প্রত্যয়। রোমশ, লোমশ, এতশ-এতশ, (নানাবর্ণের), অর্বশ-অর্বশ (সত্বর), বভ্রুশ—বভ্রুশ—কপিশ (পীতবর্ণ), যুবশ (যৌবনবান্), বারিশ, হরীমশ, কশ্মশ, [কলশ, গিরিশ, কর্কশ, বালিশ]॥

ইন্ প্রত্যয়। প্রত্যয় স্বর—'ইন্'। অশ্বিন্ (অশ্বী), ধনিন্, পক্ষিন্, ভগিন্ (ভাগ্যবান্), বজ্রিন্, শিখণ্ডিন্ (শিখাবান্), হস্তিন্ (হস্তদ্বয়বান্), ষোড়শিন্ (ষোড়শবর্ষীয়), গর্দভ-

নাদিন্, ব্রহ্মবর্চসিন্ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট আচারবান্), সাধুদেবিন্ (দক্ষ অক্ষক্রীড়াকারী, ভাগ্যবান্ খেলোআর), কুচিদর্থিন্ (যাহার কাজ সর্ব্বত্র)। মনীষিন্ (মেধাবী), শিখিন্ (শিখাবান্), ঋতায়িন্ (ঋতাবান্)॥ অভিমতিন্, অর্চিন্, খাদিন্, বর্মিন্, শ্বনিন্, রেতিন্ (বীর্য্যবান্), শবসিন্, মনসিন্, বয়সিন্, পরিস্রজিন্ (স্রগ্‌বান্), হিরণিন্॥ প্রশ্নিন্, গর্ভিন্, জূর্ণিন্, ধূম্রিন্, শ্বানিন্, হোমিন্, মৎসরিন্, পরিপন্থিন্, প্রবেপনিন্, অর্কিন্,-ভঙ্গিন্,-সঙ্গিন্,-রোকিন্॥ ধন্বায়িন্, সুকায়িন্, আততায়িন্, প্রতিহিতায়িন্, মরায়িন্, ঋতায়িন্, স্বধায়িন্॥ প্রব্রাজিন্, প্রস্যন্দিন্॥ শাকী, সরী, ইরী (ঋ° এক একবার)॥ বনিন্ (বৃক্ষ, বনস্পতি, সন্ন্যাসী), কপোতিন্ (কপোতবৎ)॥

মিন্ প্রত্যয়। ইষ্মিন্, ঋগ্মিন্, বাগ্মিন্। গ্=জ্=চ্॥

বিন্ প্রত্যয়। প্রত্যয় স্বর। ঋগ্বেদে ১০টী বিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ আছে। পরযুগে ইহার অধিক ব্যবহার হইয়াছে। অর্থের হিসাবে বিন্=মিন্=ইন্। নমস্বিন্ (ভক্তিমান্), তপস্বিন্ (তাপযুক্ত), তেজস্বিন্ (উজ্জ্বল), যশস্বিন্, রেতস্বিন্, এনস্বিন্, হরস্বিন্। শতস্বিন্, স্রোতস্বিন্, রূপস্বিন্, অনুপাত ভ্রমে সকারযুক্ত। স্রাবিন্, মেধাবিন্, মায়াবিন্, সভাবিন্, অষ্ট্রাবিন্ (ডাঙশের বশ, অঙ্কুশের অনুবর্ত্তী), দ্বয়াবিন্ (কুটিল), উভয়াবিন্ (উভয়ের মালিক), আময়াবিন্, আততাবিন্। বাগ্‌বিন্, ধৃষদ্‌বিন্, আত্মন্‌বিন্॥

বন্ত্ প্রত্যয়। মূল শব্দে সাধারণতঃ বিনা পরিবর্ত্তনে স্বরস্থিতি। কেশবন্ত্, পুত্রবন্ত্, সখিবন্ত্, প্রজননবন্ত্, পুণ্ডরীকবন্ত্, হিরণ্যবন্ত্, অপূপবন্ত্, রাজন্যবন্ত্ (ক্ষত্রিয়ের সহিত কৃতবন্ধুত্ব), প্রজাবন্ত্, উর্ণাবন্ত্, দক্ষিণাবন্ত্, সপ্তর্ষিবন্ত্, শচীবন্ত্, তবিষীবন্ত্, পত্নীবন্ত্, ধীবন্ত্ (ভক্তিমান্), দ্যাবাপৃথিবীবন্ত্, বিষ্ণুবন্ত্ (বিষ্ণুর সহিত), হরিবন্ত্ (স্বর্ণবর্ণ), আবৃবন্ত্ (যাহা এই দিকে ফিরিতেছে), আশীর্বন্ত্ (দুগ্ধমিশ্র), স্বর্বন্ত্ (ঐশ্বর্য্যবান্),

শরদ্বন্ত্ (বহু বৎসরের), পুংস্বন্ত্ (পুরুষবান্), পয়স্বন্ত্ (ধনী), তমস্বন্ত্ (অন্ধকার), ব্রহ্মণ্বন্ত্ (পূজার্চনার সহিত), রোমণ্বন্ত্ (কিন্তু রোমবন্ত্, লোমবন্ত্, বৃত্রহবন্ত্,), ককুভ্বন্ত্।

প্রত্যয় স্বর—অগ্নিবন্ত্, রয়িবন্ত্ (ধনী), নৃবন্ত্ (পুরুষত্ববান্), পদ্বন্ত্ (চরণবান্), নস্বন্ত্ (নাক-ওয়ালা), আসন্বন্ত্ (মুখযুক্ত), শীর্ষণ্বন্ত্ (মাথাওয়ালা)।

অশ্বাবন্ত্ (অশ্ববন্ত্), সুতাবন্ত্ (অভিষুত সোমযুক্ত), বৃষ্ণ্যাবন্ত্ (শক্তিমান্, বীর্য্যবান্), শক্তীবন্ত্, স্বধিতীবন্ত্ (পরশু বা কুঠার আছে যার), ঘৃণীবন্ত্ (উষ্ণ), বিষূবন্ত্ (বিভিন্ন প্রকার, বিষু=পৃথক্)।

অনিয়মিত। স-যুক্ত। ইন্দ্রস্বন্ত্, মহিস্বন্ত্। ন্-যুক্ত। বনস্বন্ত্, বুধন্বন্ত্, বধন্বন্ত্, গর্তন্বন্ত্, মাংসন্বন্ত্। হ্রস্বমূল। মায়বন্ত্, যাজ্যবন্ত্, পুরোনুবাক্যবন্ত্, আমিক্ষবন্ত্। অনিয়মিত স্বর। কৃশনাবন্ত্ (কৃশন=মুক্তা ?), অন্তর্বন্ত্ (গর্ভিত), বিষূবন্ত্।

মাবন্ত্ (আমার মত), ঈবন্ত্, কীবন্ত্, নীড়বন্ত্, নীলবন্ত্ (কৃষ্ণবর্ণ), নৃবন্ত্ (পুরুষের ন্যায়), পৃষদ্বন্ত্ (চিহ্নিত, বিন্দু-যুক্ত), কৈতবন্ত্ (রাজকুমারের ন্যায়)।

বিবস্বন্ত্ (বিবস্বন্ত্=উজ্জ্বল, প্রভাবান্), অনুপদস্বন্ত্, অর্বন্ত্, পিপিষ্বন্ত্, যহ্বন্ত্।

পৃষদ্বন্ত্ (পৃষদ্)। তপস্বন্ত্ (লৌকিক সংস্কৃতে তপোবন্ত্), বিদ্যুদ্বন্ত্।

বন্ প্রত্যয়। অল্প প্রয়োগ। স্বরস্থিতি অনিয়মিত—প্রায় মূল শব্দের অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব-স্বরে। ঋণাবন্—ঋণবন্, ঋতাবন্ (স্ত্রী° ঋতাবরী), ঋমাবন্, ধিতাবন্, সত্যাবন্, সুম্নাবরী, মঘবন্। সূনৃতাবরী, স্বধাবন্ (-বরী)। অমতীবন্, অরাতীবন্, শ্রুষ্টীবন্, মুষীবন্, (কার্ষীবণ)—কৃষীবন্। ধীবন্, অথর্বন্, সমদ্বন্, সহোবন্ (সহাবন্), হার্দ্বন্ (হার্দিবন্), ইন্ধন্বন্ (ইন্ধনবন্), সনিত্বন্ (সনিতিবন্)।

বেশী প্রচলিত—ঋতাবন্ (আবেস্তা সাহিত্যে সমধিক প্রচলন), মঘবন্, অথর্বন্।

মন্ত্ প্রত্যয়। প্রাচীন সাহিত্যে ইহারও প্রয়োগ অল্প। মূল শব্দের শেষ অক্ষরে সাধারণতঃ স্বরস্থিতি। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রেই স্বর প্রত্যয়ে অপসৃত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে মূল শব্দের স্বর অবিকৃত থাকে। কণ্বমন্ত্, যবমন্ত্ (যব-বহুল), অবিমন্ত্ (মেষবান্), অশনিমন্ত্, ওষধীমন্ত্, বাশীমন্ত্ (কুঠার সহিত ; বাশী = কুঠার), বসুমন্ত্ (অনেক ভাল জিনিস যার আছে), মধুমন্ত্ (মধুর), ত্বষ্টৃমন্ত্ (ত্বষ্টার সহিত), হোতৃমন্ত্ (হোতা আছে যে দেশে), আয়ুষ্মন্ত্, জ্যোতিষ্মন্ত্। উল্কুষীমন্ত্ (উল্কার সহিত), পীলুমন্ত্, প্রসূমন্ত্ (পল্লবযুক্ত), গোমন্ত্ (গো-বহুল), গরুত্মন্ত্ (পক্ষবান্), বিদ্যুত্মন্ত্ (দ্যুতি সহ), ককুদ্মন্ত্, বিদ্যুন্মন্ত্, ককুন্মন্ত্, বিরুক্মন্ত্, হবিষ্মন্ত্।

প্রত্যয় স্বর। অসিমন্ত্ (ছুরি অনেক আছে যার), অগ্নিমন্ত্, ইষুধিমন্ত্, (তূণযুক্ত), পশুমন্ত্, বায়ুমন্ত্, পিতৃমন্ত্ (পিতৃমন্ত্ = পিতৃগণ সহ), মাতৃমন্ত্ (যার মা আছে)। ত্বিষীমন্ত্, ধ্রজীমন্ত্, হিরীমন্ত্, জ্যোতিষীমন্ত্, তবিষীমন্ত্। আশুমৎ—ক্রিয়াবিশেষণ।

তা প্রত্যয়। প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বরে নিয়মিত স্বরস্থিতি। দেবতা, বীরতা, পুরুষতা, অগ্নিতা, অপশুতা (পশুহীনতা), বন্ধুতা, বসুতা, নগ্নতা, সুবীরতা, অনপত্যতা, অগোতা, (গো-হীনতা), অব্রহ্মতা, অপ্রজস্তা (অপত্যের অভাব), সূনৃতা (সুনর হইতে)। মমতা (স্বার্থবত্তা), ত্রেতা (triplicity—ত্রিগুণিততা)। জনতা = জনসমূহ ॥

তাতি, তাৎ প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের কেবল বেদেই প্রয়োগ। প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বরে স্বর। অরিষ্টতাতি (অবিমৃতা), অযক্ষ্মতাতি (নীরোগতা), গৃভীততাতি (গৃহীত বা বন্দী অবস্থা), জ্যেষ্ঠতাতি (প্রভুত্ব), দেবতাতি (দেবত্ব), বসুতাতি (ধনবত্তা), শংতাতি (শুভ, সৌভাগ্য), সর্বতাতি (সমগ্রতা)। স্বরস্থিতির ব্যতিক্রম সহ—অস্ততাতি (গৃহ), দক্ষতাতি (দক্ষতা)। উপরতাৎ, দেবতাৎ, বৃকতাৎ, সত্যতাৎ, সর্বতাৎ—এই কয়টী মাত্র 'তাৎ' প্রত্যয়ের উদাহরণ। সবগুলিই ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের পর তাৎ প্রত্যয় পাওয়া যায় নাই।

ত্ব প্রত্যয়। সর্ব্বত্র প্রত্যয় স্বর। অমৃতত্ব (অমরতা), দেবত্ব, সুভগত্ব (সৌভাগ্য), অহমুত্তরত্ব (আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধ), শুচিত্ব, পতিত্ব, তরণিত্ব (অধ্যবসায়, উৎসাহ, কর্ম্মশক্তি), দীর্ঘায়ুত্ব, শক্রত্ব, ভ্রাতৃত্ব, বৃষত্ব, (বীর্য্যবত্তা), সাত্মত্ব (সং+আত্মা+ত্ব), মঘবত্ব (দানশীলতা), রক্ষস্ত্ব (ইন্দ্রজালবিদ্যা)। অনাগাস্ত্ব, অপ্রজাস্ত্ব, সৌপ্রজাস্ত্ব, সৌভগত্ব, প্রত্যনস্ত্ব, সধনিত্ব, বসতীবরিত্ব (তৈ° সং), রোহিণিত্ব (তৈ° ব্রা°)।

একত্র ত্ব+তা প্রত্যয়—ইষিতত্বতা (ঋ°=উত্তেজিততা), পুরুষত্বতা (ঋ°—মনুষ্যত্ব)। প্রথমটী একবার, দ্বিতীয়টী দুইবার আছে।

ত্বন প্রত্যয়। প্রয়োগ ঋগ্বেদেই প্রায় সীমাবদ্ধ। অন্ত্যাক্ষরে স্বর। অর্থ='ত্ব'। কবিত্বন, জনিত্বন, পতিত্বন, মর্ত্যত্বন, মহিত্বন, বৃষত্বন, সখিত্বন।

তর ও তম প্রত্যয়। বৃত্রতর, পুরুতম (ঋ°; স্বরস্থিতি বিধিবিগর্হিত। মৃড়য়ত্তম। শশ্বত্তম, সংবৎসরতম, শততম, +সহস্রতম। কিন্তু রথীতম, রথীতর; শংতম; তবস্তম, তবস্তর; তপস্বিতর, যশস্বিতম; রত্নধাতম। মদিন্তম, বৃষন্তম। সুরভিন্তম, রয়িন্তম, মধুন্তম। অনিয়মিত রূপ। সুরভিষ্টম, তুবিষ্টম। বৎসতর (রী), অশ্বতর, ধেনুষ্টরী, রথন্তর।

থ প্রত্যয়। ততিথ, কতিথ।

তয় প্রত্যয়। একতয়, চতুষ্টয়, দশতয়, বহুতয়।

ত্য প্রত্যয়। নিত্য, অমাত্য। অপত্য, আবিষ্ট্য, সনুত্য, অপ্ত্য, আপ্ত্য।

ত প্রত্যয়। একত, দ্বিত, ত্রিত। মুহূর্ত্ত। অবত (কূপ)।

ন প্রত্যয়। পুরাণ, বিষুণ, সমান।

তন প্রত্যয়। নূতন, নূত্ন, প্রত্ন, সনাতন, সনত্ন, শ্বস্তন। প্রাতস্তন।

বৎ প্রত্যয়। অর্বাবৎ, আবৎ, উদ্বৎ, নিবৎ, পরাবৎ, প্রবৎ, সংবৎ।

কট প্রত্যয়। উৎকট, নিকট, বিকট, প্রকট, সংকট—ব্যাকরণে অন্তোদাত্ত। *

বন—নিবন, প্রবণ। আল—অন্তরাল॥

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

---

* চিতঃ।৬।১।১৬২॥ অন্তঃ উদাত্তঃ স্যাৎ। চিতঃ সপ্রকৃতের্বহ্বকজর্থম্॥ চিতি প্রত্যয়ে সতি প্রকৃতি-প্রত্যয়সমুদায়স্যান্ত উদাত্তো বাচ্য ইত্যর্থঃ। নভন্তামস্তকে সমে (ঋ ৮।৩৯।১)। যকে সরস্বতীমনু (ঋ ৮।২১।১৮)। তকৎসূতে (ঋ ১।১৩৩।৪।)॥

বেঃ শালচ্ শঙ্কটচৌ।৫।২।২৮॥ সংপ্রোদশ্চ কটচ্।৫।২।২৯॥

বৌদ্ধদর্শন

[প্রথমাংশ]

প্রাচীন আখ্যায়িকা বা পৌরাণিক তত্ত্বসমূহ মানব-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সকল অপুষ্ট চিন্তা-প্রবাহ হইতে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশেও মনীষিগণের মতে আর্য্যজ্ঞান বেদমূলক। বেদসমূহ আর্য্য-জ্ঞানের কোন্ স্তরের বস্তু, তাহা বলা যায় না। ঋক্‌বেদের স্তব, স্তুতি ও প্রার্থনার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রেরণা ও সাহিত্যিক ভাব আছে এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি উহার মধ্যে দর্শন ও ইতিহাসের সামগ্রীও দেখিতে পান। অথর্ববেদে রোগের স্তুতি ও যাদুবিদ্যার মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সজীব বস্তুর মত জ্ঞানের পুষ্টি ও বর্দ্ধন আছে; ইহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা আছে। এক একটি ভাব হইতে এক একটি যুগ এবং এক একটি যুগের ভাব হইতে বিভিন্ন আদর্শের উৎপত্তি। জাতীয়-জ্ঞান যুগের ভাবেই রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় ইতিহাস। কোন্ সময়ে উপনিষদের আদর্শগুলি ভারত-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক গণনায় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা, মানসিক ও প্রাণন-ক্রিয়ার বিশ্লেষণ, বহু দেবতা ছাড়িয়া এক মহান্ দেবতার অধিষ্ঠান, স্রষ্টা ও সৃষ্টে, আত্মায় ও পরমাত্মায় এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ঐ যুগের প্রধান লক্ষণ। ঐ যুগের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, জগৎ একটা নির্ম্মিত পদার্থ নহে, উহা ক্রমভাবী বা পরিণাম-সাপেক্ষ। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ছাড়া জড়, শরীর, মন ও নীতিবিষয়ক জিজ্ঞাসাও অনেক আছে। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ ঐ সময়ে বিদ্যার অঙ্গের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

উহার পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, শাকটায়ন, গার্গ্যাচার্য্য, যাস্ক, পাণিনি, জৈমিনি প্রভৃতি বড় বড় ভাষা-রহস্যবিৎ—কেহ ধাতুতত্ত্ব, কেহ ধ্বনিতত্ত্ব, কেহ শব্দ-শক্তি লইয়া ভারতের জ্ঞানসম্পৎ বাড়াইতেছেন এবং তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা এখনও জগতে আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। তবে উঁহারা বেদ-বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াই বেদের মর্য্যাদা রাখিয়া ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; স্বাধীন ও প্রমুক্ত ভাবে করেন নাই। তখনও অথর্ব্ব বেদের রূঢ় বিজ্ঞান দেশকে অধিকার করে নাই। জ্ঞান যতদিন প্রাচীন-ভাব লইয়া চলে, তত দিন উহার স্পষ্ট বিকাশ হইতে পারে না।

আধুনিক য়ুরোপীয় জ্ঞান-প্রচারের ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতদিন উহা খৃষ্টীয় বা হিব্রু বিশ্বাসের অনুগামী ছিল, তত দিন বিজ্ঞান মাথা তুলিতে পারে নাই। হিব্রু আখ্যায়িকা বা শাস্ত্রীয় মতের বিরুদ্ধে কাহারও ভাবিবার অধিকারই ছিল না। স্বাধীন মত

প্রচার করিয়া ডেকার্ট, টাইকো ব্রাহী, গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। নূতন মত সত্য হইলেও মানুষ বড় পছন্দ করে না। নূতন মত মনের সহিত সাজাইয়া লওয়া মানুষের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। সেই জন্য সাধারণ লোক প্রাচীন বিশ্বাস লইয়া থাকিতে ভালবাসে। সক্রেতিস দেববিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া গ্রীকেরা তাঁহাকে বিষপান করাইয়াছিল।

যাহা হউক, এ সকল অবান্তর বিষয়। নূতন মত লইয়া ভারতে কোন কালে বিশেষ বিপ্লব ঘটে নাই। প্রাচীন মতের সহিত নূতন মতের সামঞ্জস্য করার শক্তি ভারতে আছে বলিয়াই বোধ হয়, নূতন মতের জন্য বিশেষ কোনও অশান্তি হয় নাই। উপনিষৎ-যুগের ভাব হইতে একে একে নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বেদের গণ্ডী ছাড়াইয়া নূতন নূতন তত্ত্ব আসিতে লাগিল। ইহাতে জ্ঞানরাজ্যে এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বেদ, ব্রাহ্মণ-কর্ম্মকাণ্ড এবং এমন কি, উপনিষৎও নূতন বিশ্বাসের উপযোগী হইল না। নূতন জ্ঞানের আবাসের জন্য প্রকোষ্ঠ-সকল প্রশস্ত করিতে হইল, নূতন বাতায়ন ও রশ্মিপথ খুলিতে হইল।

ভক্তিবাদ ও অবতারবাদ কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বুদ্ধ-পূর্ব্ব-যুগের বটে, তবে উহার কঙ্কাল প্রথম কি আকারে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মহা-ভারতীয় যুগে একটা বেদ-বিরোধী ভাব ও যাজক-বিদ্বেষ অনুভব করা যায়। কপিলের প্রকৃতি-বাদ বুদ্ধ-পূর্ব্বযুগের বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতিবাদ এক প্রকার আস্তিক্য-নাস্তিক্য-মত এবং উহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাচীন ভাবের বিরোধী। বৃহস্পতির মতও খুব প্রাচীন। তাঁহার শিষ্যেরা বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডকে স্পষ্টভাবেই ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচরের ব্যবসা বলিয়াছেন। ইহার পরের স্তরটা ধরিতে গেলে বিজ্ঞানের যুগ।

বিজ্ঞানযুগে শারীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, জড়তত্ত্ব প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইতে লাগিল। অগ্নিবেশ, সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি মনীষিগণের শারীর তত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান-প্রণালী, উহার লজিক্ ও প্রেরণা সকলই যেন এই যুগের মত। কপিলের প্রকৃতিবাদ (ন্যাচারালিসম্), কণাদের পরমাণুবাদ (থিওরি অব্ ম্যাটার), গোতমের ন্যায় (লজিক্) ও মনস্তত্ত্ব (সাইকোলজি) সকলই ঐ যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। সকল বিষয়েই বিশ্লেষণ, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। ঐশী শক্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রাকৃতিক ব্যাপারের কার্য্য, কারণ, ব্যাপ্তি ও সম্বন্ধ অন্বেষণ করাই তখনকার ধরণ হইয়াছিল। প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখাই বিজ্ঞান-প্রবৃত্তি। "ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রমথবা কিং পূর্ব্বমিতি সংশয়ঃ" অর্থাৎ জ্ঞাতা আগে বা বস্তু আগে, এ বিষয়ে সংশয় আছে। চরকসংহিতার এই শ্লোকাংশ হইতে তখনকার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের ধরণটাও কতকটা ঐ রকমের। লাপ্লাস্ তাঁহার "মিক্যানিক সেলেস্ত" বা বিশ্বযন্ত্র নামক বিখ্যাত পুস্তকে সৃষ্টিকর্ত্তার উল্লেখ করেন নাই। উহা পূর্ব্বতন প্রথার বিরোধী হওয়াতে সম্রাট্ নেপোলিয়ন লাপ্লাস্‌কে ঐ ক্রটির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে লাপ্লাস্ উত্তর দেন যে, তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে "সৃষ্টিকর্ত্তা-বাদ" আরোপ করার কোনও আবশ্যক হয় নাই।

পূর্ব্ববর্ণিত চিন্তা-বিভ্রাটের প্রথম অবস্থায় বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তখনকার সম্প্রদায় প্রাচীন ধর্ম্মের একটি নূতন কেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কর্ম্ম-শব্দের নূতন অর্থ আবশ্যক হইয়াছিল। বুদ্ধদেব বেদ ও উপনিষৎকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা তিবেজ্জসুত্ত (সংস্কৃত ত্রৈবিদ্য-সূত্র) হইতে জানা যায়। বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ নামক দুই জন ব্রাহ্মণ-পুত্র প্রাচীন রীতি অনুসারে গুরুগৃহে উপনিষদ্-বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং ব্রাহ্মণদ্বয় বুদ্ধের খ্যাতি শুনিয়া, তাঁহার নিকট কোশল দেশে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। অনেক বাদানুবাদের পর বুদ্ধ বলিলেন, "দেখ, নানা ব্রাহ্মণ নানা প্রকার শিক্ষা দেন। অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ, ইহাঁদের উপদেশ-প্রণালী প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র। অন্ধেরা পরস্পর বেণীর মত সংযুক্ত হইলেও যেমন কিছুই দেখিতে পায় না, কোন্‌টা দক্ষিণ, কোন্‌টা উত্তর, কিছুই বুঝিতে পারে না, ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ভাষাও সেইরূপ অন্ধের ভাষা। তাঁহাদের উপদেশ হাস্যাস্পদ এবং উহা কেবল শব্দমাত্র, বৃথা আড়ম্বর ও নিরর্থক। বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সূর্য্য ও সোমের পূজা করেন এবং যে দিকে উহাঁদের উদয় অস্ত হয়, সেই দিক্ যুক্তকরে প্রদক্ষিণ করেন, ইহা তুমি জান।" বাশিষ্ঠ বলিলেন, "নিশ্চয়"। বুদ্ধ বলিলেন, "তাঁহারা কি সূর্য্য ও সোমের উপাসনা করিয়া তাঁহাদের সহিত একীভূত হন ?" বাশিষ্ঠ বলিলেন, "নিশ্চয়ই নয়।" বুদ্ধ বলিলেন, "দেখ, দৃশ্য বস্তুর উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহার সহিত মিলিত হইতে পারেন না। তাহা হইলে যে ব্রহ্মকে তাঁহাদের সাত পুরুষ কেহ কখনও দেখেন নাই, সেই ব্রহ্মের সহিত কি করিয়া মিলিত হইবেন ? অতএব ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহা অর্থশূন্য নহে কি ?"

"মনে কর বাশিষ্ঠ, যদি কোন লোক কোনও সুন্দরীকে না দেখিয়া বলে যে, এই স্থানের শ্রেষ্ঠা রূপসীকে আমি ভালবাসি। অথচ সে তাহার নাম জানে না ; সে লম্বা, কি বেঁটে, তাহার বর্ণ কাল, কি গৌর এবং সে কোন্ জনপদে বাস করে, তাহাও জানে না। এরূপ স্থলে সে লোকটির কথাবার্ত্তা মূর্খের মত নহে কি ? ত্রিবেদী ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান প্রভৃতি দেবগণকে না জানিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহাঁদেরই কি ব্রাহ্মণ বলে ? এই স্তব, স্তুতি, কামনা ও প্রশংসা দ্বারা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মের সহিত মিলিবেন ?"

বুদ্ধ আরও বলিলেন, "আমাদের এই পাঁচ ইন্দ্রিয় কুপথগামী ; কিন্তু ত্রিবেদজ্ঞেরা উহাই লইয়া আছেন। তার পর কামনা, দ্বেষ, অলসতা, অহংকার, সংশয়, এই কয়টি আবরণ ও প্রতিবন্ধক ত আছেই। এইগুলিও ত্রিবেদজ্ঞদের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। দেখ বাশিষ্ঠ ! ব্রহ্ম প্রাচীনগণের মতে দার-শূন্য, রাগ-দ্বেষশূন্য এবং শুদ্ধ ; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কি তাহার ঠিক বিপরীত নহেন ? এরূপ ব্রাহ্মণ কি করিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে। ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিনটি জ্ঞান বলিতে গেলে শুষ্ক মরুভূমি, জঙ্গল ও বিনাশ।"

এই ভাবের উক্তি ব্রাহ্মণবর্গ প্রভৃতি অপরাপর স্থানেও আছে এবং বুদ্ধদেব

প্রাচীন ধর্ম্মের চিত্র দেখাইয়া বাশিষ্ঠ ও ভারদ্বাজকে নিজমত সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে বুদ্ধের সময়ে ভারতের দৃষ্টিকেন্দ্র কিরূপ ছিল, তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। বৈদিক ধর্ম্ম তখন অনুষ্ঠান-প্রধান হইয়াছিল। কেবল্ বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপে প্রাণের পিপাসা মিটে না এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয় না। রস ও জ্ঞানের মিলনে ধর্ম্ম। অনুষ্ঠানে বা কর্ম্মে কতকটা রসের তৃপ্তি হয়, কিন্তু উহাতে জ্ঞানের তৃপ্তি হয় না। জ্ঞানের তৃপ্তির জন্য প্রাচীনকে আশ্রয় করিয়া সমাজে কতকগুলি নূতন আদর্শ ও নূতন অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়াছিল। জৈন ধর্ম্ম দেখা দিল বটে, কিন্তু উহা অত্যন্ত প্রাচীন-দ্বেষী বলিয়া, বোধ হয়, সার্ব্ব-জনীন হইতে পারিল না। বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষ ব্যতীত এই গুরুতর কার্য্য হওয়া সম্ভব ছিল না। বুদ্ধ এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি ভারতের অন্যতম অবতার।

বৌদ্ধ কল্‌চার বাহিরের বস্তু নহে,—ইহা ভারতীয় সভ্যতার একটা পর্য্যায়, একটা প্রকার বা একটা রূপ। খ্রীষ্টীয় সভ্যতার মত উহা বিদেশীয় আমদানি নহে। বৌদ্ধ-সভ্যতার মূল ভারতের ভিতরে, উহা বৈদিক তন্ত্রেরই একটা ধারা। বৈদিক নিদিধ্যাসন ও ধ্যান বৌদ্ধ সাধন-তন্ত্রের মূল মন্ত্র। বৌদ্ধের শূন্যবাদ বা অসদ্‌বাদও বহু-প্রাচীন, উহা বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বের জিনিস। উপনিষদের পারিভাষিক, উপনিষদের ধরণ বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। বৌদ্ধের জড়তত্ত্ব ও মানস তত্ত্ব উপনিষৎ হইতে লওয়া বলিলে দোষের হয় না। বৌদ্ধের সাধন অঙ্গেরও উৎপত্তি উপনিষৎ হইতে পাওয়া যায়। অপ্, অনল, বায়ু প্রভৃতি জড়তত্ত্ব বেদান্ত-যুগের কল্পনা। নাম-রূপ, চিত্ত, সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান প্রভৃতি বৈদান্তিকের পরিভাষা, * বৌদ্ধসূত্রে ও অভিধর্ম্মের মূল তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপনিষদের শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি অঙ্গ + বৌদ্ধদের শীল ও আচরণ গঠনের প্রধান অঙ্গ। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে প্রজ্ঞা উপনিষদে যেরূপ শ্রেষ্ঠ, বৌদ্ধ তন্ত্রেও উহার সেই স্থান। বৌদ্ধের "দৃষ্টি" উপনিষদেরই দৃষ্টি। উপনিষৎ মতে হৃদয় মনের স্থান, বৌদ্ধেরাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ আরও বৌদ্ধ-মার্গের অনেক বিষয় প্রাচীন হইতে টানা যাইতে পারে এবং যথাস্থানে তাহার উল্লেখ্ থাকিবে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ বহু বিস্তৃত। সাময়িক "কলচার" বুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার উপদেশ-প্রণালী য়িহুদী প্রফেট্ বা জরথুস্ত্রের মত নহে। যে সকল দুষ্ট সংস্কার তখন বর্ত্তমান ছিল, তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়া শিষ্যদের বুঝাইয়া দিতেন। ধর্ম্মের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ, ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু, সেই জন্য তিনি শিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি অর্থাৎ চিত্তের ব্যাপার সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সূত্র ও অভিধর্ম্ম মানসিক বিশ্লেষের উপর

* কৌষীতকি ও ঐতরেয়, ৩য় অধ্যায়।

+ তৈত্তিরীয়—১ম বল্লী।

প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিক ক্রিয়াসমূহ বৌদ্ধ গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় নিরাকরণ করা হইয়াছে। মনের স্বাভাবিক অবস্থা, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ, মনসিকার, একাগ্রতা, ধ্যান, কুশল, অকুশল, শীল প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের যথাযথ বর্ণনা আছে। দুঃখের বিষয়, এখনও অধিকাংশ বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদেই পাওয়া যায়, মূল গ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া দুর্লভ।

এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়েরই আলোচনা হইবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এখন যেমন ছয়খানি দর্শন নির্দ্দিষ্ট আছে, বৌদ্ধদের সেইরূপ বিশেষ কিছুই নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম্ম বা জনের ধর্ম্ম; সেই জন্য বোধ হয়, দর্শনের তত আবশ্যক হয় নাই। তবে উহা প্রাচীন ধর্ম্মেরই একটা নবীন ভাব। কাজেই ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগদর্শন উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ দর্শন হইয়াছে। ন্যায়, বৈশেষিক ও যোগ বিজ্ঞানমূলক, কাজেই উহাতে আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত উভয় সম্প্রদায়েরই সমান অধিকার। বৌদ্ধদের যেটুকু শুদ্ধ দর্শন আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ দ্বারাই রচিত। উহাঁদের মধ্যে বুদ্ধঘোষ, নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষই প্রধান। নাগার্জ্জুন ও অশ্বঘোষ সর্ব্বতোভাবে দার্শনিক এবং বুদ্ধঘোষের টীকাপ্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার বৌদ্ধ মত প্রচার করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সঙ্গে পরবর্ত্তী কালের অনুরুদ্ধের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ একখানি উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থ। ইহা ছাড়া বৌদ্ধেরা ন্যায়শাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দিঙ্‌নাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের পরিচয় তিব্বত প্রদেশ হইতে আমরা পাইয়াছি।

এই অবকাশে সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সাংখ্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন নূতন মত বাহির হইতেছে। সম্ভবতঃ উহা ব্রাহ্মণ-যুগের তত্ত্ব। অভিব্যক্তি-বাদ সাংখ্যের বিশেষত্ব। মনোবস্তু ও জড় বস্তু, এই উভয়ের প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা মিলনে দৃশ্য জগতের উৎপত্তি—এইগুলিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতি। বৌদ্ধেরা সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ কিছু কিছু লইয়াছেন, আবার সাংখ্যমত ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রেরও ভিত্তিস্বরূপ। তবে বৌদ্ধেরা স্বভাব-বাদ গ্রহণ করেন নাই।

মানবের জ্ঞান বস্তুতঃ এক ও অবিচ্ছিন্ন। মনের প্রেরণা অনুসারে আমরা বুদ্ধির দিক্ হইতে বিজ্ঞান ও দর্শন এবং রসের দিক্ হইতে সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প ও কলা প্রভৃতির আস্বাদ পাইয়া থাকি। জ্ঞানের হিসাবে দর্শনই মানব-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ। মানুষের অনুভব যতদূর উঠিতে পারে, দর্শন হইতে আমরা তাহাই পাইয়া থাকি। সেই জন্য আমাদের ইতিহাসের দর্শন, ধর্ম্মের দর্শন, আইনের দর্শন প্রভৃতি হইয়াছে। ইহাতে ঐ সকল বিষয়ের মূলতত্ত্ব-সকল আমরা জানিতে পারি। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নাই, "তাহার পর কি" ইহা জানিবার ইচ্ছা মানুষের সতত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রমা-জ্ঞান যেখানে শেষ হইয়াছে, দর্শন তাহার উপর দাঁড়াইয়া বাদানুবাদ সৃষ্টি করে। কাব্য যেমন বস্তুর রসের দিক্‌টা মানবের সম্মুখে আনিয়া দেয়, সেইরূপ দর্শন, বস্তুর বুদ্ধির দিক্‌টা আমাদের দেখাইয়া দেয়। কাজেই দর্শন এক প্রকার জ্ঞানাত্মক কাব্য। কাব্য-প্রকৃতি দেহের সৌন্দর্য্য লইয়া

থাকে, দর্শন-প্রকৃতি দেহের গঠন দেখাইয়া দেয়। দৃষ্টি-ভেদে কাব্যের যেমন স্বতন্ত্র আকার, দর্শনেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার আছে। জগতের মূলে কোনও দার্শনিক এক বস্তু দেখেন, কেহ বহু বস্তু দেখেন। কেহ পরমাণুকে নিত্য বলেন, কেহ উহাকে অস্থায়ী বলেন। কেহ দৃশ্য বস্তুসমূহের জাতি স্বীকার করেন, কেহ বা করেন না। কেহ দুইটি প্রমাণ মানিয়া থাকেন, কেহ বা চারিটি প্রমাণ মানেন। প্রকৃতিকে যে যেরূপ ভাবে বুঝিবে, তাহার দর্শনও সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত হইবে। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের পার্শ্বে বৌদ্ধ-দর্শন নিজের বর্ণ লইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দর্শন শব্দে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝিয়া থাকি,—মনস্তত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিতত্ত্ব, শুদ্ধদর্শন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব। আধ্যাত্মিক জগতের মূলে মনস্তত্ত্ব। প্রত্যক্ষের ব্যাপার মনস্তত্ত্ব হইতে বুঝা যায় এবং তর্কশাস্ত্র প্রত্যক্ষমূলক। নীতিতত্ত্ব—ইচ্ছা, নির্ব্বাচন ও সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। জ্ঞানবাদ, সত্তাবাদ, সম্বন্ধ, কার্য্যকারণবাদ প্রভৃতি বিষয় শুদ্ধদর্শনের অন্তর্গত। ঈশ্বর, আত্মা, পাপপুণ্য, পরলোক প্রভৃতি বিষয় লইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্ম ও দর্শনের মূলে মনস্তত্ত্ব। সেই জন্য বৌদ্ধেরা মন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন। মনের তত্ত্ব অন্বেষণ বৌদ্ধ-পূর্ব্ব-যুগের। সম্ভবতঃ বৌদ্ধেরা উহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্লেষ, কার্য্যকারণ-পরীক্ষা প্রভৃতি আন্বীক্ষিকী বৃত্তি বিজ্ঞান-যুগের লক্ষণ। কাজেই ঐ সময়ের লোকদের বুঝাইতে হইলে ধর্ম্মের মূল সংস্কারগুলি সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষ করা আবশ্যক। বুদ্ধদেব তাহা করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য বড় বড় পণ্ডিত বুদ্ধের উপদেশ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধ্যান, সমাধি ও শীল বা চরিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাণ। এ তিনই মানসিক ক্রিয়ার অধীন; কাজেই মনের বিষয় বুদ্ধদেব অতি গভীর ভাবে শিষ্যবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নব বৌদ্ধেরা বিচারপ্রিয় ছিলেন। প্রতিসম্ভিদা ছাড়া তাঁহারা কোন মত গ্রহণ করিতেন না। অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভাণ-প্রতি-সম্ভিদা, এই চারিটি প্রতিসম্ভিদা তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হইত। প্রতিসম্ভিদা শব্দ ইংরাজী "এনালিসিস্" শব্দের অনুরূপ। প্রত্যেক বিষয় বেশ ভাল করিয়া ভেদ করিয়া তাহা বুঝিতে হইবে। বস্তু, তাহার গুণ, তাহার নিরুক্তি, তাহার আভাস উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, তবে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইবে। ইহা হইতে বৌদ্ধ-মনের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব

হিন্দুজাতি দর্শন-প্রাণ জাতি। মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার একটি বৃহৎ তত্ত্বের মধ্যে লইয়া আসাই দর্শনের কার্য্য। কাজেই বৌদ্ধেরাও সে বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ধর্ম্মের মূলতত্ত্বসমূহ বৌদ্ধদের অভিধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। অভিধর্ম্ম না বুঝিলে বৌদ্ধদের মূলতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝা যায় না। সূত্র-পিটকের বিষয়সমূহ অভিধর্ম্মে পরিস্ফুট হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তত্ত্বের নানারূপ অর্থ হইতে পারে বলিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। শারীরকসূত্রের টীকায় আমরা তিনটি বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। আবার অভিধর্ম্ম গ্রন্থ কথাবস্তুতে সর্ব্বসমেত সাতাশ আটাশটি সম্প্রদায়ের কথা আছে। সর্ব্বাস্তি-বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশূন্যবাদ অবধি নানা সম্প্রদায়ের উল্লেখ কথাবস্তুতে আমরা দেখিতে পাই। উহাতে আত্মা, বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্ব, অর্হতের পতন, নির্ব্বাণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া বাদা-নুবাদ আছে। মাধবাচার্য্য যে সম্প্রদায় কয়টির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের জড়জগৎ-প্রত্যয় সম্বন্ধে মতামতই পাওয়া যায়। শূন্যবাদীর মতে বাহ্য ও অন্তর কোন অর্থই নাই। যোগাচার মতে বাহ্যার্থ শূন্যবাদ, সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তবে উহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, এবং বৈভাষিক মতে বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অপরাপর বাদীদের ঠিক দার্শনিক মত কি ছিল, তাহা তাঁহাদের লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকায় বুঝা যায় না। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন কোন বিশেষ বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং কথাবস্তু হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে পূর্ব্বোক্ত কথাবস্তুর সম্প্রদায়সমূহ মাধবাচার্য্যের চারিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। অপরা-পর অধিষ্ঠানের মত, ধর্ম্মও সময়ের সহিত চলিয়া থাকে এবং এই জন্য তাহাতে নূতন ভাব ও নূতন সমাবেশ আসিয়া পড়ে। বৌদ্ধদের মোটামুটি তিনটি যুগ ধরা যাইতে পারে। সূত্র ও অভিধর্ম্মের যুগ, মিলিন্দ-নাগসেন যুগ এবং অন্ত্যযুগ। প্রত্যেক যুগের সহিত আধ্যাত্মিক বা মানসিক তত্ত্বের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বুদ্ধ মন সম্বন্ধে এরূপ বিচার ও বিভাগ করিয়াছেন যে, আজকালকার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান, ব্যবহার-দিক্‌টা বাদে, তাহা অপেক্ষা বিশেষ কোনও নূতন সংবাদ দেয় না। দার্শনিক বিচার, মঝ্‌ঝিম-নিকায়, সংযুত্তনিকায়, দীঘনিকায় প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থে, অভিধর্ম্ম গ্রন্থে এবং প্রজ্ঞাপারমিতা ও ধম্মপদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে বিসুদ্ধিমগ্‌গ, লঙ্কাবতারসূত্র, মাধ্যমিক সূত্র ও অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে তত্ত্ববিচার আছে। বৈদান্তিকের আত্মার সম্বন্ধে বুদ্ধের কি মত, তাহা জানা যায় না। তবে তিনি আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার একটি অখণ্ড বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা চিত্ত। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান একার্থবোধক। "চিত্তম্ ইতি পি মনো ইতি পি বিজ্ঞানম্" ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। মানসিক ক্রিয়াসমূহ চিত্ত-ধর্ম্ম অথবা চেতসিক ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানসমূহ বা বিজ্ঞান চিত্তের* অন্তর্গত এবং ইহা ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা (স্মৃতি-জ্ঞান) এবং মনোধাতুও চিত্তের অন্তর্নিবিষ্ট। বেদনা, প্রজ্ঞা ও সংস্কার চেতসিক ব্যাপার। বৌদ্ধদের পঞ্চস্কন্ধ সুপরিচিত। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও সংস্কার, এই কয়টি লইয়া পঞ্চস্কন্ধ। স্কন্ধ অর্থে রাশি। এই পঞ্চস্কন্ধ বুদ্ধ কি ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন; তাহা বেশ বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ উহা প্রাচীন পঞ্চকোষের অনুপাতে কল্পিত হইয়াছে। পঞ্চস্কন্ধের পরিভাষা উপনিষৎ হইতে লওয়া হইয়াছে। চিত্ত-শব্দও উপনিষৎ হইতে গৃহীত। বাহ্য বস্তু কি করিয়া মনে অধিগত হয়, ইহার এখনও সুমীমাংসা হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে নব্য-পাশ্চাত্য দর্শনে কএকটি মত দেখা যায়।† অপরাপর মতের উল্লেখ না করিয়া দুইটি বিরোধী মতের কথা বলিব। এক দলের মতে (এসোসিয়েসনিস্ট) ইন্দ্রিয়জ প্রত্যয় বা সংবেদনসমূহ আপনা হইতে আপনার আকার মনে গড়িয়া লয়। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড় বস্তুর সন্নিবেশ করিয়া দেয়, সেইরূপ একটা নিয়মবশতঃ রূপ, শব্দ, স্পর্শ, দেশ, কাল প্রভৃতি অনুভবের পর আপনা হইতে সাজান হইয়া থাকে। ইঁহারা মনের কোনও ক্রিয়া স্বীকার করেন না এবং বস্তুর ক্রিয়ার দ্বারাই এইরূপ হইয়া থাকে মনে করেন। অপর সম্প্রদায়ের মতে (ক্যাণ্ট-তন্ত্রে) সংবেদনসমূহ একৈক ভাবে গৃহীত হইয়া উহার দিক্ ও কালের সন্নিবেশ মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সংবেদনসমূহ জড়-প্রেরণা মাত্র। উহার গড়ন ও সজ্জাটা মনই দিয়া থাকে। বৌদ্ধেরাও মনের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মে ও নীতিমার্গে সাধক যে নূতন নূতন দৃষ্টি ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, তাহা মনের শক্তিবশতঃই হইয়া থাকে, অন্য কোনরূপে হইতে পারে না। বৌদ্ধ নীতি-তত্ত্বের আলোচনায় এ বিষয় পরে দেখান হইবে।

নব্য পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে, বুদ্ধিমার্গে সেন্‌সেসন্, পার্‌সেপ্‌সন্, কন্‌সেপ্‌সন্ ও থট্, বেদনা-মার্গে প্লেসর্, পেন্, ইমোসন্ ও সেন্‌টিমেণ্ট, ইচ্ছামার্গে উইল্, ডেলিবারেসন্, রেসোলিউসন্, ডিটারমিনেসন্ প্রভৃতি বিভাগ দেখিতে পাই। বৌদ্ধেরাও বুদ্ধিমার্গে রূপ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, সংস্কার ও চিন্তা, বেদনামার্গে—সুখ দুঃখ, অদুঃখ অসুখ, ইচ্ছামার্গে—চেতনা, বিতর্ক, সংকল্প প্রভৃতি বিভাগ করিয়াছেন। ইংরাজী কন্‌সস্‌নেস ও এটেন্‌সন বৌদ্ধদের বিজ্ঞান ও মনসিকার। সতি বা স্মৃতি ও অনুস্মৃতির উল্লেখও দীঘনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ে আছে। মনের অলৌকিক শক্তির দিক্‌টা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি কোন কোন লেখক এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। যোগ ও একাগ্রতায় মন কতটা উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহার আলোচনা ইউরোপে এখনও আরম্ভ হয় নাই।

* Mind proper.

† Pre-established harmony, Common-sense School, Kantian doctrine, Associationist School.

হিন্দু ও বৌদ্ধেরা এ বিষয় যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা জগতের এক নূতন চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। চিত্ত নিরোধ করিলে মনের যে নূতন শক্তির উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে অজ্ঞাত তত্ত্ব-সমূহের যোগ-নেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা হিন্দু জাতির আবিষ্কার এবং পরে উহা অপর কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় শিক্ষা করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির "হায়ার সাইকোলজির" দৃষ্টি নূতন খুলিয়াছে। বোধ হয়, মাদাম ব্লাভাতস্কি এ বিষয়ে ইউরোপে প্রথম পথপ্রদর্শক। নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ কেবল বিজ্ঞান সাহায্যে বুঝা যায় না। বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা নূতন তত্ত্ব বাহির হয় না। "ইন্‌টুইসন্" বা যোগপ্রতিভা ব্যতীত উচ্চ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতেই সংবেদন বা সেন্‌সেসন্‌সমূহ মনের শক্তি দ্বারাই একত্রিত হইয়া বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে। "প্রজ্ঞা" একদিকে মনের একটা অবস্থাবিশেষ, ইংরাজী "কল্‌চার," আবার উহা মনের শক্তিও বটে। চিন্তা ও অনুধ্যান দ্বারা যে অভিনব অবস্থা মনে উদয় হয়, উহাও প্রজ্ঞা এবং যে শক্তির দ্বারা মানস সামগ্রীসমূহ একত্রিত হইয়া জ্ঞান আকারে পরিণত হয়, উহাও প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক উন্নতির অপরাপর নামও বৌদ্ধদের আছে—অভিজ্ঞা, সম্প্রজ্ঞান ইত্যাদি। মূল বৌদ্ধ মতে স্থায়ী নিত্য বস্তু কিছুই নাই, এইরূপ ভাবটাই পাওয়া যায় এবং সর্ব্বশূন্যবাদে ইহার চরম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কাজেই আত্মার স্থান বৌদ্ধতন্ত্রে নাই। বৌদ্ধেরা অহং স্বীকার করিয়াছেন, তবে সে অহং উপনিষদের আত্মা নহে, উহা দার্শনিক ব্যবহার মাত্র। উপনিষদের আত্মা স্থায়ী, নিত্য পদার্থ। এইরূপ ভাবের আত্মা পরবর্ত্তী পুগ্‌গল-বাদী বৌদ্ধেরা মানিয়াছেন এবং আত্মা স্থানে পুগ্‌গল বা পুদ্গল শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান, মনের বা জ্ঞানের একটা স্তর, আবার বিজ্ঞান চিৎও (ইংরাজী কন্‌সস্‌নেস্) বটে। বুদ্ধঘোষ, রূপ, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ কএক স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান সকলের পক্ষে একভাবের নহে। একই বিষয় বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে বুঝে। এক খণ্ড স্বর্ণ দেখিলে বালক, সাধারণ লোক ও বিশেষজ্ঞ উহা বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়া থাকে। ইহার অর্থ, বালক উহা একটা চক্‌চকে জিনিস মাত্র দেখে, বয়স্থ লোক উহা ধাতু বলিয়া বুঝে এবং বিশেষজ্ঞ উহার উৎপত্তি, ব্যবহার ও গুণ জানিতে পারে। একই বিষয়ে জ্ঞানের এইরূপ তারতম্য বুদ্ধঘোষ সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বও উহা মানিয়া থাকে। আবার ভাবের দিক্ হইতেও এইরূপ তারতম্য আছে—ইহাও বৌদ্ধেরা অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। সন্ধ্যার আগমনে চোর, অনূচান (বেদাধ্যায়ী) ও বিলাসিনীর বিভিন্ন ভাব-প্রেরণা হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তটি হিন্দুর, কি বৌদ্ধদের, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, হিন্দু গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মনের গভীরতত্ত্ব বৈদিক সম্প্রদায় অতি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধেরা সেই জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া মতস্তম্ভ আরও প্রশস্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়।

এই ছোট প্রবন্ধে বৌদ্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে যথারীতি আলোচনা করা সম্ভব নহে। ইহাতে কেবল এক একটি বিষয় ছুঁইয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের কথা অতি সংক্ষেপে

বলা হইল। মনস্তত্ত্বের সহিত তর্কশাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ। নাম-রূপ বা সংজ্ঞা তর্কশাস্ত্রের মূল। নাম ও সংজ্ঞা (কনসেপ্ট) ইহারা বস্তুর দুইটা দিক্ মাত্র। মনে যে বস্তুর সংস্কার থাকে, তাহার একটা নাম দেওয়া হয়। নাম হইতে অবয়ব প্রভৃতির উৎপত্তি। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রভৃতিও সংস্কারমূলক। বৌদ্ধ-ন্যায়গ্রন্থ ভারতবর্ষে বড় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ন্যায়বিষয়ক পুস্তক তিব্বতে রক্ষিত হইয়াছে। দিঙ্‌নাগাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহার ন্যায়ের ইতিহাসে অনেকগুলি নৈয়ায়িকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহ এখন তিব্বতে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছয়খানি বৌদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক প্রসঙ্গ—উহা ঠিক তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে। উহার এক খণ্ড অনুমানবিষয়ক এবং উহা তর্কশাস্ত্রের মধ্যে ফেলিতে পারা যায়। সমস্ত বৌদ্ধ-ন্যায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তর্ক, বিবাদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই হইত, সাধারণ ভিক্ষুদের উহাতে অনুরাগ ছিল না; কাজেই উহা সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছিল। মীমাংসক ও গোতমীয় শিষ্যদের উদ্দেশে অনেক বাদানুবাদ আছে। এই উভয় পক্ষের সংগ্রামের ফলে নব্য-ন্যায়ের উৎপত্তি। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অনেক আগে নব্য ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ব্যাপ্তিবাদ বা "ইন্‌ডক্‌সন"ই নব্য ন্যায়ের বিশেষত্ব। প্রাচীন বা গোতমীয় ন্যায়ের অনুমান-লক্ষণ নব্যেরা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাপ্য, ব্যাপক, হেতু, পক্ষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রাচীনেরা বড় ধরিয়া যান নাই। বোধ হয়, বৌদ্ধেরাই এ বিষয়ের প্রবর্ত্তক। ইহা ছাড়া সম্বন্ধ ও অভাব, এই দুইটি বিষয় তর্কশাস্ত্রে ও দর্শনে বিশেষ আবশ্যকীয় সামগ্রী। সম্বন্ধ না বুঝিলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান জিনিসটাই অপেক্ষামূলক। একটি ব্যাপার বা ঘটনার সহিত অপর একটি ব্যাপার বা ঘটনার কার্য্য-কারণ, আশ্রয়-আশ্রিত, অবয়ব-অবয়বী প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধ বুঝাই জ্ঞান। অভাবও একটা জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান কেবল ভাব লইয়াই নহে, অভাবেরও আমাদের একটা জ্ঞান হয়। নব্যন্যায়ে অভাব লইয়া অনেক আলোচনা আছে। তবে বৌদ্ধ ন্যায়ে "অভাব" স্থানে "অনুপলব্ধি" হইয়াছে।

বৌদ্ধ ন্যায়ের এবং দর্শনের সংবাদ আমরা হিন্দুগ্রন্থ হইতে পাইয়া থাকি। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেক মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। তবে বৌদ্ধ ন্যায় পূর্ণকলেবরে কেবল একখানি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের ন্যায়বিন্দু-টীকা। ন্যায়বিন্দু ধর্ম্ম-কীর্ত্তির গ্রন্থ। উহার টীকা ধর্ম্মোত্তর রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির মূল রচনা অতি সংক্ষিপ্ত, উহা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মূল রচনার মত অল্প ভাষাতেই লিখিত। তবে ন্যায়-বিন্দুর টীকায় নব্য ন্যায়ের টীকার মত বাহুল্য নাই। খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতকে তর্কশাস্ত্র স্থানে স্থানে ছন্দে লেখা হইত। কুমারিল, জয়ন্ত প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা অনেক বিষয় ছন্দে লিখিয়াছেন। ন্যায়বিন্দুতে তাহা নাই। টীকার ভাষা সুন্দর ও সরল। অল্পের মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টা

উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে প্রমাণ বা সত্য কাহাকে বলে, তাহার বিচার এবং তাহার পর প্রত্যক্ষলক্ষণ, অনুমান-(স্বার্থ ও পরার্থ) লক্ষণ এবং হেত্বাভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে যোগিপ্রত্যক্ষ ও ভ্রমের বিচারও আছে। বৌদ্ধেরা শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই। শব্দপ্রমাণ তাঁহাদের যোগিপ্রত্যক্ষের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান-লক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে কিছু কিছু ইতরবিশেষ আছে। সাংখ্য ও মীমাংসার প্রত্যক্ষ ও ন্যায়ের প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বিষয়ে ঠিক এক নহে। ইউরোপীয় লজিকেও সে তফাত-টুকু দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে একটু নূতনত্ব আছে, তাহা পরে বলা যাইবে। তবে অনুমান-লক্ষণে বৈশেষিক ও নব্য ন্যায়ের অনুমোদিত বিষয়সমূহ আছে। তর্কশাস্ত্র নীরস জিনিস; সুতরাং উহার কথা অধিক না বলিয়া মোটামুটি দুই চারিটি জ্ঞাতব্য বিষয় উপস্থিত করিব।

বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ, কল্পনাশূন্য অভ্রান্ত জ্ঞান। কল্পনা শব্দের অর্থ—বাচক বা শব্দ। নাম সংযোগ করিলেই বস্তুর শুদ্ধ জ্ঞানের সহিত অপরাপর জ্ঞান আসিয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় অভিঘাতে বস্তুর যে জ্ঞানটুকু হয়, তাহাই বৌদ্ধমতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। জ্ঞানের নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক অবস্থা হিন্দু দর্শনেও গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ ন্যায়মতে নির্বিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, গোতমীয় ন্যায়মতে সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ। গোতমীয় ন্যায়মতে ব্যক্তিজ্ঞান জাতিমান্ অর্থাৎ ব্যক্তিজ্ঞানে জাতিজ্ঞান আগে আসিয়া থাকে এবং ঐ সঙ্গে ব্যক্তির জ্ঞান হয়। বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক বস্তুজ্ঞান স্বলক্ষণ-যুক্ত, উহা জাতিজ্ঞানের অধীন নহে। গো-ব্যক্তি স্বলক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ব্যক্তি হইতে জাতির জ্ঞান হয়, জাতি হইতে ব্যক্তির জ্ঞান নহে। জাতি-জ্ঞান অনুমানের বিষয়, বস্তুর স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থক্রিয়াকারিত্ব বস্তুর আর একটা লক্ষণ। বস্তুজ্ঞানের সহিত উহাদ্বারা কি প্রয়োজন সাধন হয়, সে জ্ঞানটাও ঐ সঙ্গে হইয়া থাকে। নব্য পাশ্চাত্য দার্শনিক মতে উহা "প্র্যাগম্যাটিসম্"। আমাদের জ্ঞানের আবশ্যকতা কি? প্রাগম্যাটিষ্ট বলেন, উহা দ্বারা কি মানব-প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, এইটুকুই জ্ঞানের আবশ্যকতা। যাহা হউক, জ্ঞান কিছু পরিমাণে অর্থক্রিয়াসাপেক্ষ হইতে পারে। মানবের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য, জীবন রক্ষার জন্য বস্তুর গুণাগুণ জানার দরকার হয়; কিন্তু তাই বলিয়া জীবের জ্ঞানের উৎপত্তি যে ঐ জন্যই হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বৌদ্ধমতে অনুমান দুইপ্রকার,—স্বার্থ ও পরার্থ। প্রাচীনেরাও এই দুই ভাগ ধরিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য নব্য ন্যায়ে পাওয়া যায়। ন্যায়বিন্দুমতে স্বার্থ অনুমান জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ উহা নিজের জ্ঞানের জন্য এবং পরার্থ অনুমান শব্দজ্ঞানাত্মক, যেহেতু অপরকে বুঝাইতে হইলে শব্দের বা কথার আবশ্যকতা হয়। ইহাতে ঠিক ভাব বোধ হয় না। এইরূপ দুই ভাগ কেন হইয়াছে এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ন্যায়বিন্দুর প্রণালীটা দেখিলে মনে হয়, স্বার্থ অনুমান সরল এবং পরার্থ অনুমান জটিল বা মিশ্র (কম্‌প্লেক্‌স্)।

স্বার্থ অনুমানের তিনটি রূপ ও তিনটি লিঙ্গ। সত্ত্ব, সপক্ষ, অসপক্ষ—এই তিনটি রূপ। আর তিনটি লিঙ্গ—অনুপলব্ধি, স্বভাব ও কার্য্য। "ন প্রদেশবিশেষে কচিদ্ঘটঃ" অর্থাৎ স্থান-বিশেষে ঘট নাই, ইহা অনুপলব্ধির দৃষ্টান্ত। "বৃক্ষোঽয়ং শিংশপাত্বাৎ" অর্থাৎ ইহা শিংশপা-গুণ-বিশিষ্ট, সুতরাং উহা বৃক্ষ—ইহা স্বভাবের দৃষ্টান্ত। "অগ্নিরত্র ধূমাৎ", এখানে অগ্নি আছে, যেহেতু ধূম আছে, ইহা কার্য্যের দৃষ্টান্ত। অনুপলব্ধি আবার এগার প্রকারের। (১) স্বভাবানুপ-লব্ধি—এখানে ধূম নাই। (২) কার্য্যানুপলব্ধি—এখানে ধূম কারণ নাই, যেহেতু ধূমের অভাব আছে। (৩) ব্যাপকানুপলব্ধি—এখানে শিংশপা নাই, যেহেতু বৃক্ষ নাই। (৪) স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি—এখানে শীত নাই, যেহেতু অগ্নি রহিয়াছে। ইত্যাদি। এই সরল অনুমানগুলি স্বার্থ-অনুমানের অন্তর্গত।

ইহার পর পরার্থানুমান। ইহাতে সাধ্য[১], হেতু[২], পক্ষ[৩] আছে। পরার্থ অনুমানও ত্রিরূপ লিঙ্গবিশিষ্ট; অন্বয়, ব্যতিরেক ও পক্ষ-ধর্ম্মতা ত্রিরূপলিঙ্গ। পরার্থ অনুমান দ্বিবিধ—সাধর্ম্ম্যবৎ ও বৈধর্ম্ম্যবৎ। দৃষ্টান্তের সহিত সাধ্যের সাদৃশ্য থাকিলে উহা সাধর্ম্ম্যবৎ, সাদৃশ্য না থাকিলে বৈধর্ম্ম্যবৎ। যাহা কৃতক, তাহা অনিত্য, যেমন ঘট—সাধর্ম্ম্যের উদাহরণ। যাহা নিত্য, তাহা অকৃতক, যেমন আকাশ,—বৈধর্ম্ম্যের দৃষ্টান্ত। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য লইয়া অনেক বিচার আছে। তাহার পর হেতু, পক্ষ ও সাধ্য লইয়া বিচার ও কি কি কারণে অনুমানে দোষ আসিয়া পড়ে, তাহার আলোচনা। পরমত খণ্ডনও আছে। ন্যায়বার্ত্তিককারের দোষ ও দিঙ্‌নাগের শ্রেষ্ঠতা দেখান আছে। সাংখ্যের স্বভাববাদ বৌদ্ধমত-বিরোধী, যেহেতু বৌদ্ধেরা পূর্ণভাবে স্বভাব স্বীকার করেন না। তাহার পর হেত্বাভাসের[৪] কথা। অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক, এই তিন প্রকার হেত্বাভাস। "তিনি সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি সুবক্তা" অনৈকান্তিকের দৃষ্টান্ত,। যেখানে দুইটি রূপের অভাব, তাহাকে বিরুদ্ধ বলে। যাহা কৃতক, তাহা নিত্য, ইহা বিরুদ্ধের দৃষ্টান্ত। এস্থলে সপক্ষে অসত্ত্ব ও অসপক্ষে সত্ত্ব আকার বিরুদ্ধ হইল। "অনিত্য শব্দ, যেহেতু উহার চাক্ষুষ হয়"—ইহা অসিদ্ধের দৃষ্টান্ত। প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক, এই উভয়ের মধ্যে সন্দেহ বা অসিদ্ধি থাকিলে তাহাকে অসিদ্ধ বলে। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ কতকগুলি সংশয়কে বিরুদ্ধ অব্যভিচারী বলিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত অনেক বিষয় সাধারণ জ্ঞানগম্য নহে, যেহেতু সে সকল অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। সেই জন্য আগমসিদ্ধ বিষয় বাস্তব বিষয়ের অতীত হইলেও কোন না কোন তত্ত্বদর্শীর জ্ঞানে উহা যথাবস্থিত ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া উহা গ্রহণযোগ্য। হেত্বাভাস ছাড়া পক্ষাভাস, দৃষ্টান্তাভাস প্রভৃতি আরও আভাস আছে এবং তাহাদের উপবিভাগও অনেক আছে। তাহার উল্লেখ এখানে আবশ্যক নহে।

যে সময় বৌদ্ধাচার্য্যেরা বিশেষ ভাবে ন্যায়ের আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ের দুই একখানি ছাড়া কোনও বিশিষ্ট হিন্দু ন্যায়গ্রন্থ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হইতে

১। Major term. ২। Middle term.
৩। Minor term. ৪। Fallacy.

ত্রয়োদশ শতক অবধি বৌদ্ধেরা অনেকগুলি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সময়টি প্রাচীন ন্যায়ের অতিক্রম ও নব্য ন্যায়ের উপক্রমকাল। বৌদ্ধ-ন্যায়ের সহিত নব্য ন্যায়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। গোতমীয় ন্যায়ের অনেক বিষয়ই উভয় সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে নব্য ন্যায়ের জন্ম হইয়াছে। কি ভাবে প্রাচীন ছাড়িয়া ন্যায়-তত্ত্ব নূতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ইহা একটা বিশেষ "রিসার্চের" বিষয়।

বৌদ্ধেরা মানব-মন ও আধ্যাত্মিক বিষয় কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং তর্কশাস্ত্রে তাঁহাদের কৃতিত্ব কি পরিমাণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ে বৌদ্ধেরা যে, উপনিষদের নিকট ঋণী ও উপনিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন এবং এমন কি, উপনিষদেরই পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও দেখান হইয়াছে। আবার বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই সাধারণভাবে তর্কশাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং বৌদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ, পালিভাষা ছাড়িয়া, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহাও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বৌদ্ধেরা প্রাচীন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং উহাই তাঁহাদের স্বকীয় ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মূল ধারা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই এবং নূতন উপকরণ দিয়া প্রাচীন তত্ত্বসমূহ সজ্জিত ও দৃঢ় করিয়াছিলেন।

এখন আমরা বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধ নীতি প্রাচীন বৈদিক তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের একটা নূতন দিক্ দেখাইয়া দিয়াছে। মহাভারতের যুগে দেখা যায় যে, কর্ম্মের আর পূর্ব্ব অর্থ নাই। গীতাতে কর্ম্মের লক্ষণ মীমাংসকদের কর্ম্ম-লক্ষণ নহে অর্থাৎ উহা তখন আর কেবল যাগ যজ্ঞ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত না। কর্ম্মের ক্ষেত্র তখন বাড়িয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ নীতি বা কর্ম্মতত্ত্ব সূচনা করার পূর্ব্বে আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। আমরা পাশ্চাত্য ধরণে অভ্যস্ত হইয়াছি; সুতরাং মূল ব্যাপারটা পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া দেখাইলে বিষয়-বোধের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। পাশ্চাত্য লেখকদের মতে নীতি-তত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নহে, উহা সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বা তর্ক-শাস্ত্রের মত আদর্শ-মূলক[১] বিজ্ঞান। সৌন্দর্য্য সৃজন ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি কোনও নিয়মের বশীভূত নহে। সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণ স্পর্শ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাদের চিত্ত বিনোদন করে। দুইটি মূল অণু একত্র হইলে একটি যোজক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহা পূর্ব্বেও হইয়াছে এবং পরে একত্রিত হইলেও হইবে। সুতরাং ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী অথবা কার্য্য-কারণ-সাপেক্ষ, তাহাই প্রাকৃতিক বিধান। কিন্তু নীতি এবং সৌন্দর্য্য জড় নিয়মের বশীভূত নহে। উভয়েরই নূতন নূতন রূপ এবং দুইই প্রতিভা-সৃষ্ট। বাল্মীকি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, কাব্য

---

১ Normative Science.

রাজ্যে এক নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাহার পর কালিদাস ও ভবভূতি; তাঁহারাও রস-জগতে নূতন চিত্র, নূতন মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। এখনও অনেক রসস্রষ্টা আছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। সেইরূপ স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি সৌন্দর্য্যবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে আদর্শমূলক। সঙ্গীতবিদ্যায় ভরত, হনুমন্ত, কল্লিনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শস্রষ্টা। নীতিতত্ত্বেও ঐরূপ আদর্শসমূহ আছে। মনু, মোসেস, বুদ্ধ, কনফুসস্ ও খ্রীষ্ট নূতন নীতিমার্গ, নূতন পন্থা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। ঐ আদর্শ-সমূহ মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবলম্বন করে। অতএব নীতিতত্ত্ব কোনও প্রাকৃতিক বিধানের বাধ্য নহে এবং জড়-সঙ্ঘাতের আদর্শ নীতিতত্ত্বের আদর্শ হইতে পারে না।

গ্রীক "এথিক্স্" শব্দের অনুবাচক শব্দ হিন্দু দর্শনে নাই। গ্রীকদের ধর্ম্ম উপাসনা ও ধ্যান বড় একটা ছিল না, কাজেই তাহাদের "ষ্টোইক্" ও "এপিকিউরিয়ান" সম্প্রদায় ধর্ম্ম বাদ দিয়া মানুষের আচরণ ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। গ্রীক "এথিক্সে"র সহিত ধর্ম্মের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। কাজেই উহা বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার আমরা এখন ধর্ম্ম শব্দ যতটা বিষয় লইয়া ব্যবহার করি, বৈদিক যুগে তাহা ছিল না। আমাদের মনুপ্রভৃতি ধর্ম্ম-সংহিতা কতকটা "এথিক্সের" স্থান ও কতকটা "ল"য়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রীকদের এথিক্স্ ও বৌদ্ধদের ধর্ম্ম প্রায় একার্থবোধক। যাহা হউক, নীতি শব্দ আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় "এথিক্স্" ও "মর্যাল্স্" শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এ স্থলে প্রচলিত ভাবেই নীতি শব্দ ব্যবহৃত হইল।

নীতি শব্দে প্রবর্ত্তন বুঝায় এবং বিধিনিষেধ, ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতির অপেক্ষা করে। স্বাভাবিক প্রেরণা ছাড়াইয়া নীতিবশে কোনও নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হয়। মানুষ এরূপ করে কেন? পুরুষার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত বা প্রয়োজন সাধন জন্য নীতি অবলম্বন করে। এ স্থলে প্রশ্ন আসিতে পারে যে, মানুষের পুরুষার্থ কেবল ক্ষুৎ-পিপাসা লইয়া বা শারীরিক অভাব লইয়া অথবা যাহাতে সুখ হয়, সেই সকল বিষয় লইয়া সাধিত হয়। মানব-জীবনে নীতির আবশ্যকতা কি? পশুরা পশু-জীবনে, এমন কি, উদ্ভিদ-জীবনেও কেবল প্রকৃতির তাড়নায় ও প্রেরণায় চলিয়া থাকে। তাহা হইলে নীতি-ব্যাপারটা হয় কুসংস্কারমূলক অথবা রাজা, সমাজ ও যাজকের অভিপ্রায়বশতঃ লোকে মানিয়া থাকে। মিথ্যা কথায় যদি ইষ্ট-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতে লোকে বিরত হয় কেন? এ প্রশ্ন সমাধানের পূর্ব্বে আমরা মনস্তত্ত্বের আশ্রয় লইব।

পশুজগতে দেখা যায় যে, ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায় উহারা উহার তৃপ্তির জন্য কোনও নিয়ম রক্ষা করে না। ক্ষুধার তৃপ্তিই তখন উহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। দুর্ব্বলকে বধ করিতে অথবা দুর্ব্বলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে উহারা কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু মানুষে তাহা করে না। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান এবং পশুর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান ঠিক এক নহে। শরীরের আহ্বানে ইতর জীব প্রকৃতির বলেই চলে। মানুষ এ স্থলে

শরীরের অথবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়া অন্যভাবে কাজ করে। শরীরের অভাব নিম্ন-শ্রেণীর জীবের যে ভাবের হয়, মানুষেরও তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কার্য্য,—যুক্তি ও বিচারসাপেক্ষ ; পশুর তাহা নয়।

ক্ষুৎ-পিপাসা বা তৃষ্ণা জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। উহা মিটাইবার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ঐ উপায়ের মূলে আমাদের ইষ্ট-সাধনতা-বুদ্ধি থাকে। যদি উহা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তখন ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। সেই জন্য ইউরোপীয় নীতিতত্ত্বে, কার্য্যের পূর্ব্বে কএকটি মানসিক অবস্থা ধরিয়া থাকে। প্রথম অভাব (ওয়াণ্ট), দ্বিতীয় প্রবৃত্তি বা কামনা (ডিসায়ার), তৃতীয় ইষ্টতা-জ্ঞান (উইস্) এবং অবশেষে ইচ্ছা (উইল্)। যখন কএকটি কামনা সম্মুখীন হয়, তখন সকলগুলির প্রতি আমাদের আসক্তি হইতে পারে না। ঐ কামনাগুলির মধ্যে একটি বলবৎ হয় এবং তাহা যদি ভাল বলিয়া বুঝে, তাহা হইলে উহার প্রসাধনে মানুষ যত্নবান্ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের প্রথমে ক্ষুৎ-পিপাসা বা অভাব হয় এবং উহা সাধনের জন্য কতকগুলি কামনা এবং কামনা-সমূহের মধ্যে দুই একটি ঈপ্সিত, এবং ঈপ্সিতের মধ্যে যেটা কর্ত্তব্য, তাহার জন্য সংকল্প এবং পরে তাহার প্রতি আমাদের ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছা হইতে কার্য্য হয়।

এখন দেখিতে হইবে যে, যাহা আমাদের করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। এরূপ স্থলে উহার সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ। অর্থাৎ উহা আমরা চাহি কেন ? ইহার উত্তর—আমরা উহা ভাল বলিয়া চাহি ; উহাতে মঙ্গল হইবে বলিয়া, উহা শ্রেয়ঃ বলিয়া চাহি। কাজেই যাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়, তাহা আমাদের পক্ষে ভাল বলিয়া না বুঝিলে উহা কখনই আমাদের পাইবার চেষ্টা হইতে পারে না। এখন মানুষের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে কি ভাল, তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায় ? একটা মিথ্যা কথা বলিলে যদি কার্য্য-সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে মিথ্যা কথাটা আমাদের পক্ষে ভাল অথবা মন্দ ? এইখানেই পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কেহ যশ, কেহ ধন, কেহ বিদ্যা, কেহ দেশ বা জন-সেবা, কেহ দেশ পর্য্যটন এবং কেহ ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগী হইয়া থাকে। অতএব যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ বা প্রবৃত্তি, সে সেই ভাবেই কার্য্য করে। আবার এ দিকে পরস্বাপহরণ, নরহত্যা, নিষ্ঠুরতা, অসরলতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, দুর্ব্বল-দলন প্রভৃতি প্রবৃত্তিও লোকবিশেষের আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল, কোন্‌গুলি হেয় বা উপাদেয়, কোন্‌গুলি সাধু ও অসাধু অথবা শাস্ত্রীয় ভাষায় পাপ বা পুণ্য, ইহা কি উপায়ে স্থির হইতে পারে ? কেহ হয়ত বলিতে পারেন, এস্থলে বিধি নিষেধই আমাদের নিয়ামক। কোনও তত্ত্বদর্শী পুরুষ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পালনীয় এবং যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের বর্জ্জনীয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম-পন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন

প্রকারের বিধান আছে। একের সহিত অপরের মিল নাই। সে স্থলে মানুষ কি করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবে? এরূপ ক্ষেত্রে এমন একটা কিছু পরিমাপক আবশ্যক, যাহা দ্বারা আমরা কোনও তন্ত্রের বশীভূত না হইয়া স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিতে পারি।

কি উপায়ে আমরা কার্য্যের পরিমাণ করিতে পারি অথবা এমন কোনও ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে পারি, যাহা দ্বারা উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। ভাল, মন্দ, সাধু, অসাধু, এ সকল আপেক্ষিক শব্দ। যাহা মন্দ নহে—তাহাই ভাল এবং যাহা সাধু নহে, তাহাই অসাধু। কাজেই যেমন পণ্য দ্রব্যের গুণের তারতম্য অনুসারে মূল্য হইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের কার্য্যের এবং চরিত্রের একটা মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কি করিয়া উহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক।

মানুষের কামনা আছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই জন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন যে, কামনাই আমাদের কার্য্যের নিয়ামক অর্থাৎ বলবৎ কামনাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করে এবং ইচ্ছা সেই বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া থাকে। কামনা, সুখের সহিত সম্বদ্ধ এবং সুখই মানুষের পুরুষার্থ। আর এক দল বলেন যে, কাম্য বিষয় সুখপ্রদ বা উপাদেয় যাহাই হউক, ইচ্ছা কামনার বশীভূত নহে। কামনা যুক্তি ও প্রজ্ঞার দ্বারা অনুশাসিত; সুতরাং ইচ্ছাও যুক্তি দ্বারা পরিচালিত। অতএব প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই এবং প্রথমটী সুখকে এবং দ্বিতীয়টি যুক্তি প্রভৃতিকে নীতির পরিমাপক বলিয়া মনে করেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, হিব্রু, বাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন জাতিসমূহ কতকগুলি অনুশাসন অবলম্বন করিয়া চলিত। এই সকল অনুশাসনই তাহাদের মতে দেব-আদেশ এবং তাহাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি। আদর্শ ভিন্ন মনুষ্য-জীবন চলে না; ইহা করিতে হইবে, এই বিধিলিঙ্ ভাবই মানুষকে চালাইয়া লয়। পর্ব্বত বা বনবাসী আদিম মানবের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাহাদেরও এইরূপ নিয়মসমূহ আছে এবং তাহাদের "টাবু" বলে। এই "টাবু" বা নিয়মসমূহ তাহাদের পালন করাই জীবনের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তবে এই "টাবু"গুলি কতকটা দেব-আদেশ ও কতকটা জাতীয় আচার।

কোন কোনও প্রাচীন ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মতে নৈতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক নিয়মে কোনও প্রভেদ নাই। প্রকৃতির মধ্যেই কুশলের ও জ্ঞানের বীজ আছে এবং সেই জন্যই প্রকৃতি অনুসারে চলাই মানুষের কর্ত্তব্য। একটু ভাবিয়া দেখিলে এ কথাটার কোনও অর্থ নাই। আমাদের যে সকল কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি আছে, তাহাই আমাদের প্রকৃতিদত্ত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে আমাদের ত্যাগ করিতে হয়। মানুষের লোভ প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত; কিন্তু নীতির ইঙ্গিত অনুসারে উহা আমরা পোষণ না করিয়া বর্জ্জন করিয়া থাকি। প্রাচীন বৈদিক যুগে এই প্রাকৃতিক নিয়মকে ঋত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই ঋত (কস্মিক্ অর্ডার) স্রোতের মত একমুখী হইয়া চলিতেছে। কিন্তু মানবের নৈতিক

বুদ্ধি প্রতিস্রোতরূপে বিপরীতমুখী। প্রাকৃতিক অভিযান কতকগুলি নিয়মের বাধ্য হইয়া যে দিকে ছুটিতেছে, মানুষের ইতিকর্ত্তব্যতা সে অভিযানের বিরোধী হইয়া প্রকৃতিকে ছাটিয়া বাছিয়া কোন্ অজানা পথে যাইতেছে। অতএব যাহা হইতেছে এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং যাহা হওয়া উচিত, তাহাই নৈতিক বিধান বা নিয়ম।

নৈতিক বিধান সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক নিয়ম, উহার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ এবং উহার স্থিতি-কাল প্রভৃতি আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য আছে। অতএব নৈতিক আদর্শসমূহও আমাদের বুঝিবার অধিকার না থাকিলে উহার কোনও সার্থকতা হইতে পারে না। অতএব ধরিতে হইবে যে, এরূপ কিছু বৃত্তি বা আভ্যন্তরীণ শক্তি আছে, যাহা দ্বারা আমরা উহা বুঝিতে পারি। কেহ ঐ শক্তিকে নৈতিক বুদ্ধি বলেন, কেহ নীতি, বিবেক (কনসেন্স্), কেহ প্রজ্ঞা (রিসন্), কেহ স্বতঃ বোধ (ইনটুইসন্) ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দিয়াছেন।

যাঁহারা সুখকেই কার্য্যের নিয়ামক বলেন অর্থাৎ যাঁহারা নীতির মূল সুখকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাই আগে বলা হইবে। ইঁহাদের মধ্যে তিন চারিটী শ্রেণী আছে। তবে সকলের বিষয় উল্লেখ না করিয়া দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিব। এই দুইটি সুখবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ব্যক্তিগত সুখকেই পুরুষার্থ এবং অপর সম্প্রদায় সর্ব্বসাধারণের সুখই[১] পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। এখন সুখ কি, তাহাই দেখা যাউক। সুখ বাহিরের জিনিস নহে অর্থাৎ উহা বস্তুতে থাকে না ; কাজেই উহা অন্তরের ব্যাপার। যাহাতে ইষ্ট-সাধন হয় বলিয়া আমরা জানি, তাহাতেই সুখ জড়িত থাকে। যাহাতে ইষ্ট-সাধন হয়, তাহার একটা জ্ঞান বা সংস্কার (আইডিয়া) আমাদের আছে। সেই সংস্কারের একটা অঙ্গ বা উহার সহিত মিলিত আর একটি ভাবকে আমরা সুখ বলিয়া থাকি। কোমলতা অথবা মাধুরী সুখ নহে ; উহাদের জ্ঞানের বা অনুভূতির সঙ্গে যে মানসিক বিকার হয়, তাহাকেই আমরা সুখ বলি। হিন্দু দর্শন মতেও সুখ, মন বা আত্মা গ্রাহ্য অর্থাৎ উহা বাহিরের বস্তুতে থাকে না, উহা অন্তঃকরণসম্ভূত। ইউরোপীয় সুখবাদীরা বলেন যে, কাম্য বিষয় ও সুখ একই বস্তু ; এ মতটা আজকাল ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী বড় একটা গ্রহণ করেন না। সর্ব্বসাধারণের সুখকে যাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতও দুষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আর একটা সুখবাদ আছে, তাহা স্পেন্সার, আলেকসান্দার প্রভৃতির অভিব্যক্তিমূলক সুখবাদ। এই মতটা আজকাল খুব আলোচনার বিষয় হইয়াছে এবং উক্ত মতে যাহাতে জীব-সমূহের পরিপুষ্টি ও উন্নতি, তাহারই সহিত সুখ জড়িত থাকে। অভিব্যক্তি-বাদীর মূলমন্ত্র জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও জীব-সমূহের অবস্থানের উপযোগিতা। এই কয়টি উপায়ে জীবন-প্রবাহ উন্নতির দিকে, এমন কি, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অতএব

১। Utilitarianism.

যাহা ভাল, তাহাই জীবের উপযোগী অথবা যাহা জীবের পক্ষে উপযোগী, তাহাই ভাল। জীবের পক্ষে কি উপযোগী, তাহা কি করিয়া জানা যাইতে পারে, তাহার উত্তর অভিব্যক্তি-বাদীদের নিকট পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ, বিধি অবিধি, ইহা-দের অনুভূতি কোথা হইতে হয়, সে সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদীরা নিরুত্তর। আবার জীবের পক্ষে যাহা উপযোগী, তাহাই উহার পক্ষে সুখ এবং সুখই জীবের কল্যাণ। অভিব্যক্তি-বাদীর মত এতটা স্থান অধিকার করিয়াছে যে, দুই চারি কথায় তাহার শেষ হয় না। তবে মোটামুটি যেমন মানব-প্রকৃতির ও জীবনের অপরাপর বিষয়ের পরিপুষ্টি হইতেছে অথবা উহার ক্রমোন্নতি হইতেছে, সেইরূপ মানুষের নৈতিক জীবনেরও ক্রম-পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুখই জীবের পক্ষে কুশল; কাজেই সুখই জীবের নীতির পরিমাপক। অভিব্যক্তি-বাদীর চক্ষে নীতির অন্য কোনও মূল্য নাই। প্রকৃতি যাহাতে সুখের ইঙ্গিত করে, তাহাই জীবের পক্ষে কুশল ও কল্যাণপ্রদ।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা কেবল সুখবাদীদের মত। তাঁহারা সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। নীতি-বুদ্ধি অথবা নীতির স্বতঃপ্রামাণ্য তাঁহারা স্বীকার করেন না। যাঁহারা নীতি-বুদ্ধি অথবা যুক্তি-আশ্রিত-নীতি-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কএকটি সম্প্রদায় আছে। ক্যাণ্টের মত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ক্যাণ্ট সুখ-মূলক-নীতিবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানব-নীতি সুখের দ্বারা অনুশাসিত হইতে পারে না। মানবের নীতি বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আপনা হইতেই হইয়া থাকে এবং "কনসেন্‌স্" বা ইতি-কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধি অভ্রান্ত; ইহার কখনও ভুল হইতে পারে না। মানুষ সুখের অন্বেষণে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করে না; কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া থাকে। ভাল মন্দ আর কিছুই নহে—প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা ভাল হইলেই ভাল এবং মন্দ হইলেই মন্দ। ক্যাণ্টের মত অনেকটা গীতার সঙ্গে মিলে।

পাশ্চাত্য মতের বিষয় অনেক বলা হইল। মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপে দুইটি প্রবল সম্প্রদায় আছে; একটি সুখবাদী ও অপরটি যুক্তিবাদী। ইহা ছাড়া আর একটি তৃতীয় বাদ আছে এবং উহাকে আমরা আত্মবোধ[১] বলিব। ইহার উৎপত্তি হেগেল হইতে এবং গ্রীন্ উহা বিস্তৃতভাবে সমর্থন করিয়াছেন। এ মতটি নব্যতন্ত্রের দুই একটি লেখক মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

১। Self-realisation.

রাম বলেন ভাই লক্ষন তুমি এথা আইস।
সিংহাসন ছাড়িলাম য়ামি তুমি পাটে বৈষ্য॥
রাজত্ত করহ তুমি বৈষ্ম্যা রাজপাটে।
রাজটিক্যা দিব য়ামি তোমার লল্ল্যাটে॥
য়নেক দুখ পাইলে ভাই তুমি হয় রাজা।
তিন ভাই জানকি সহিত করি পুজা॥

(পৃঃ ১০।২)

দক্ষ বলে দেখিলে সভার জত লোক।
জামতা য়ামার হ্রিদে দিল বড় সোক॥
সম্মুরে দেখিয়া সিব না মুয়াইল মাথা।
এই সে ভাঙ্গড় সিব য়ামার জামতা॥
ধিক ধিক নারদে বলিব য়ার কি।
তার বার্কে য়পাত্রে দিলাম য়ামি ঝি॥
না জানিলাম মহেসের কিবা জাতি কুল।
ত্রিভুবনে জাহার নাই পাইলাম মুল॥
না জানিলাম উহার কেবা বটে মাতা পিত্ত্যা।
হেন জনে দান দিলাম আপন দুহিতা॥
দিলাম দুহিত্যা দান দিগাম্বর পাপে।
দিনে দিনে তনু সুখাইল এই তাপে॥
না বুঝিলাম হেন ছ্যার আমি মন্দমতি।
না জানিয়া য়নলে পেলিলাম কন্যা সতি॥
পাই সে পরম লর্জ্জা বলিতে জামতা।
সভা মাঝে সন্তাপে য়ামার হেট মাথা॥
বৃসব বাহন জার উত্তরি ভূসন।
দেববুদ্ধি ইহারে বলয়ে কোন জন॥
প্রেত পিচাস লয়্যা সদাই করে খেলা।
য়মঙ্গল ভূসন গলায় হাড়ের মালা॥
গুনহিন দোস জত য়মঙ্গলধাম।
মহাদেব বলিয়া রাখিল কেবা নাম॥
ভূত প্রেত লয়্যা জার সয়ন ভোজন।
দেবকুলে হৈল কেবল য়ামার গঞ্জন॥
সদা পিয়া ধুতুরা সির্দ্ধের বড়া সাত।
সভা মাঝে জে জনাকে না জুড়িল হাথ॥

(পৃঃ ১৮।১)

ইসত হাসিয়া সতি সিবেরে করএ স্তুতি
সুন প্রভু দেব ত্রিলোচন।
য়ঞ্জলি করিয়া ভূজে বল মুখসরসিজে
জাইবারে দক্ষর ভুবন॥
পিতা য়ারম্ভিল কির্ত্ত উৎসব দেখিবা হেতু
চলিলা ভুবনে জত লোক।
জতেক ভগিনিগনে সভে গেল নিমন্ত্রনে
য়ামার রিদয়ে বড় সোক॥
প্রাননাথ পসুপতি দেহ মোরে য়নুমতি
জাব য়ামি পিতার য়ালয়।
বহু দিবসের য়াসে জাইব জনক পাসে
কহিতে মনেতে বাসি ভয়॥ (পৃঃ ১৯।১-২)

য়াছেন সিবের জটায় গঙ্গা ঠাকুরানি।
দুগ্রা য়াগে কহেন নারদ মহামুনি॥
সুনিয়া য়াইল দেবি সঙ্করের পাসে।
হর পানে হেরি হৈমবতি ঘন হাসে॥
দেবি বলে দেখি হর বদন মোলিন।
দিন দুই দেখিয়ে য়ামারে ভাব ভিন॥
জটায় জার্ন্নবি ছিলা জয়ঙ্করি জান্যা।
জটে ধরি জগতজননি য়ানে টান্যা॥
দুর্গ্রাতে গঙ্গাতে বহু দন্দ বাজা জায়।
দেখিয়া নরদ রিসি দুই কক্ষ বাজায়॥
জানি লো জানি লো গঙ্গা তোর জেই কাজ।
পতির মস্তকে থাক নাই বাস লাজ॥
গঙ্গা বলে য়পনার ছিদ্র নাহি জান।
য়াগুছিদ্র না জানিয়া মোরে বল কেন॥
না জান য়াপন ছিদ্র গনেসের মা।
তুমি কেন পতির বুকে দিয়াছিলে পা॥

(পৃ০ ৩৩।২-৩৪।১)

সর্ব্বরি প্রভাত হৈল য়রূন উদয় ।
মৃগয়া করিতে জাব লঙ্কেশ্বর কয় ॥
সাজিল সকল রথ রথের সারথী ।
ঠাট কটক য়াদি সেনা সাজে সিঘ্রগতি ॥
সাজিল সকল সেনা রাবনের সাথে ।
বেসে সুবেসে রাবন উঠিলেন রথে ॥
বাদ্যকরগনে তবে বাজায় বাজনা ।
রাবন কাননে গেল সঙ্গে লয়া সেনা ॥
মৃগয়া করিতে হৈল দ্বিতিয় প্রহর ।
তেষ্টার কারনে গেলা ময়দানবের ঘর ॥
প্রবেস করিলা ময় দানবের পুরি ।
একাকিনি ঘরে য়াছে দানবঝিয়ারি ॥
রাবন বলে কিবা নাম কহ দেখি সুনি ।
কাহার নন্দীনি তুমি কাহার রমনি ॥
য়কুমারি মন্দদরি নাম ময় দানব পিতা ।
কি নাম তোমার বটে তুমি থাক কোথা ॥
বিস্বস্রবার পুত্র য়ামি পৌলস্তের নাতি ।
রাবন য়ামার নাম সংসারের পতি ॥
তোমারে দেখিয়া মোর জুড়াইল মন ।
তোমায় য়ামায় কর পানি গ্রহন ॥
জে য়াজ্ঞা করিয়া কন্যা রহিল জোড় করে ।
করিবে য়ামারে বিভা পিতা য়াসুন ঘরে ॥
বাসা করি রহিল রাবন রাক্ষস সব ।
সন্ধ্যা কালে ঘরকে য়াইল ময় দানব ॥
পিতার কাছেতে কন্যা করিল জোড় হাথ ।
তোমারে দেখিতে এস্যাছেন লঙ্কানাথ ॥
তারে বিভা দেহ মোরে লাজ খায়্যা বলি ।
সুনিয়া দানব তবে হৈল কুতুহলী ॥

(পৃ০ ৪৭।২-৪৮।১)

মলয় পর্ব্বত উপর রহে হনুমান ॥
মা বাপের কাছে য়াছে পর্ব্বত উপর ।
নানা বিদ্যা মল্ল জুর্দ্ধ সিখল বিস্তর ॥
তবে পড়িবারে গেলা ভার্গবের স্থানে ।
চারি সাস্ত্র বেদ পড়িলেন চারি দিনে ॥
গুরূ পড়াইতে নারে গুরূ ঢোল করে ।
কুপিয়া ভার্গব মুনি সাঁপ দিল তারে ॥
বানর হইয়া বেটা গুরূকে করিস ঘৃনা ।
বল বুদ্ধি বিক্রম পাসরিবে য়াপনা ॥
গুরূর সাঁপে হনুমান য়াপনা পাসরে ।
তেঞী পালাইল হনু বালী রাজার ডরে ॥
হনুমান বির জদি য়াপনাকে জানে ।
ত্রিভুবনের জিনিতে পারে এক দিনের রনে ॥

(পৃ০ ৮০।২)

ডাক দিয়া বলে লবের তরে কুস ॥
সর্ব্ব লোক বলে তোমায় ধার্ম্মিক শ্রীরাম ।
অনচিত জত তুমি করহ সংগ্রাম ॥
দুই জনের তরে জদি তিন জন রোসে ।
ধর্ম্মে নাহি সহে তারে মরে য়াপন দোসে ॥
হস্তি ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংক্ষা ।
সতির পুত্র য়ামা[রা] বটি তেঞী পাই রক্ষ্যা ॥
লব কুসের কথা সুনি শ্রীরাম লর্জ্জিত ।
জত কিছু বল তোমরা নহেত উচিত ॥
পৃথিবিমণ্ডলে য়ামি রাজচক্রবর্ত্তী ।
রাজা য়াসিতে ঠাট কটক য়াইসে সংহতি ॥
তে কারনে ঠাট কটক য়াইল মোর সনে ।
তোমার তরে নাঞী সাজি সুন দুই জনে ॥
আমারে জিনিতে বির নাঞী ত্রিভুবনে ।
আমার পুত্র বিনে য়ার কেহো নাঞী জিনে ॥
পুত্রের ঠাঞী বাপের য়াছে পরাজয় ।
বাপ জিনিতে পুত্রে সাস্তে হেন কয় ॥
য়াপন আকার দেখি তোমরা দুই জন ।
পরিচয় দেহ তোমরা কাহার নন্দন ॥
লব কুস বলি তোমরা দুই জন ।
আমার পুত্র জদি হয় না করহ রন ॥

(পৃ০ ১২১।১-২

শেষ,—

সংসার ছাড়িয়া রাম চলিলা স্বর্গবাসে।
পৃথিবির লোক যাইসে স্ত্রী যার পুরুসে॥
সুগ্রিব যঙ্গদ যাইল জত বানরগন।
তিন কুটী রাক্ষসে আইলা বিভিসন॥
প্রথিবির লোক যাইল যজধ্যানগরি।
ছোট বড় চলে জত কানা খোড়া যাদি করি॥
পৃথিবির লোক জত করে জোড় হাথ।
একে একে সভাকারে বলেন রঘুনাথ॥
রাম বলেন সুন রাক্ষস বিভিসন।
আমার সনে নাহি তোর স্বর্গের গমন॥
এই মত সকলে রাম বিদায় করিল।
ভরথ সক্রঘ্নন সহ স্বর্গ চলি গেল॥
[ই]তি উত্তরাকাণ্ড সমাপ্ত হইল জথা দিষ্টং···
০ (পঠনার্থে) শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দকুমারি ঠাকুরানি তস্য পিত্যা শ্রীজুত গোপালচন্দ বাবুজি মহাশয়ের বাটীতে লেখা জায় শ্রীমুক্তারাম ঘোসাল সাকিম্ সেনাই পরগনে জাহানাবাদ্।

১৩৮। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫¾×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮। এক এক পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শেখরে।
ভয় পায়ে বানরগণ পলাইল ডরে॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসিছে ধানুকী।
এ পর্ব্বত ছাড়ি অন্য পর্ব্বতেতে থাকি॥
হনুমান বলে এখন কি ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর॥
হইলে চঞ্চল অতি লোক উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুঃখ পায় শেষে॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বীর॥
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসি॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার॥
কৃর্ত্তিবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥ * ॥

মধ্য,—

এথা সীতা সীতা বলি রাম করেন ধ্যান।
বরিষা গোঙাইতে গেলেন পর্ব্বত মাল্যবান॥
দুই ক্রোশ পথ রাম করিলেন গমন।
সুগন্ধ সহিত বায়ু বহে ঘনে ঘন॥
বাস করি রৈলেন রাম পর্ব্বত উপর।
স্থানে স্থানে আছে তথা উত্তম সরবর॥
শয়ন ভোজন রামের কিছু নাহি মন।
ক্রন্দন করিয়ে করেন রাত্রি জাগরণ॥
আমার বচন লক্ষ্মণ কর অবগতি।
দুরন্ত বরিষা কাল স্থির নাহি মতি॥
আমি কোথা কোথা আছেন জনকনন্দিনী।
কিরূপে রাখেছে রাবন কিছুই না জানি॥
বরিষার মধ্যেতে সুগ্রীবে কি কব।
এ সময় বানর কটক কোথা পাব॥
নদীর জল সুখাইলে হবে উপকার।
তত দিন আমার হবে অস্তি চর্ম্ম সার॥
ক্রন্দন করিতে রামের গেল ভাদ্র মাস।
বিবরিয়ে কহেন তা পণ্ডিত কৃর্ত্তিবাষ॥ * ॥

(পৃঃ ৯।১)

শেষ,—

সম্পাতি আছয়ে এই কথোপকথনে।
হেন কালে ক্ষপারস আইল সে স্থানে ॥
পক্ষের পাখের সাঠে ঘোর বায়ু বহে।
ত্রাস পায়ে বানরগণ সম্পাতিরে চাহে ॥
দুই ওষ্ঠ মেলিয়ে আইসে গিলিবারে।
সম্পাতির আড়ে গিয়ে রহিলেক ডরে ॥
সম্পাতি বলেন শুন বচন আমার।
পৃষ্ঠে করি বানরে সাগর কর পার ॥
লঙ্ঘিতে না পারে সে পিতার বচন।
মম পৃষ্ঠে আইস তবে সকল বানরগণ॥
অঙ্গদ বলে পক্ষরাজ শুনহ বচন।
এক বানর নহে কেনে এত আকিঞ্চন ॥
দেব দানবের পুত্র দেব অবতার।
কোন কার্যে দিব তোমারে এত ভার ॥
সম্পাতি বলেন শুন জত বানরগণ।
এক চিত্তে রাম নাম কর উচ্চারণ॥
পক্ষ বলে বাহু তুলিয়ে নৃত্য করি।
রাম নাম বলিতে হইল পাখাসারি ॥
নুতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর ॥
দেখিয়ে সকল বানর আনন্দে অপার।
ভাবিল শ্রীরাম নামে সাগর হব পার ॥
বানর সম্ভাবি পক্ষ উড়িল আকাশে।
আনন্দিত হয়ে জায় আপনার দেশে ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়ে অঙ্গদ চলে দক্ষিন সাগর ॥
কৃত্তবাষ কহিলেন অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ॥ * ॥

———

১৩৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫৳ × ৫৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

চারি কাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণ ভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর ॥
তর্জ্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়ে বানর গণিল প্রমাদ ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল ॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবারাত্র হইল অবসান ॥

মধ্য,—

রাক্ষস সব বলে বানর সবে জাই ঘরে।
অমৃতান্ন আনি দিব তো তোমারে ॥
হনু বলে রক্ষক হৈলাম বনের ভিতরে।
এক গুটি ফল আমি না দিব কাহারে ॥
এত শুনি রাক্ষসের আনন্দিত মন।
হরষিতে ঘরে সবে করিল গমন ॥
বৃক্ষের অগ্রে উঠি হনু এক দৃষ্টে চায়।
অনেক দূর গেল আর দেখিতে না পায় ॥
পত্রের ঠোঙ্গা করিয়ে পাকা ফল পূরে।
ধ্যান করি দেয় বীর আপন ঠাকুরে ॥
হনুমান ফল দেয় লঙ্কা ভবনে।
ফলের স্বাদ পাইলেন এথা শ্রীরাম বদনে ॥
রাম বলেন শুনহ লক্ষণ গুনের ভাই।
এমন সুস্বাদু ফল কোথায় না খাই ॥
লক্ষণ বলেন ত্রৈলক্ষের কর্ত্তা আপনি।

কোন ভক্ত কোথায় দিয়াছে এমনি ॥
ধ্যান করি হনু ভাবে রামের চরণ।
বিস্তর ভোজন কৈলেন রাম নারায়ণ ॥
এক ফল লাগি দুঃখ দিলেন নারায়ণ।
উতসর্গ করিয়ে ছিলাম অমৃতের বন ॥
ভোজন অন্তেতে রাম কৈলেন আচমন।
কর্পূর তাম্বুল লৈলেন মুখের সোধন ॥
লক্ষণের উরে শির দিয়ে নারায়ণ।
নিদ্রেগত হৈলেন রাম কমললোচন ॥
প্রসাদ পাইতে আজ্ঞা হযুক হনুমানে।
এত বলি ফল দেয় আপন বদনে ॥
হেন কালে দৈববাণী হইল সম্মুখে।
খাও খাও হনুমান বলি ঘন ডাকে ॥
পাকা পাকা ফল বীর করিল ভক্ষণ।
মনের সাধে ফল খাইল পবননন্দন ॥
পাতা চুচিয়ে বীর করিল ভক্ষণ।
কচি কচি ডালগুলি খাইল তখন ॥
বড় বড় ডাল খায়ে গাছ কৈল মুড়া।
ভুমে জানু দিয়ে বীর চাদাইল গোড়া ॥
গোড়া সুদ্ধা খাইল বীর পবনকুমার।
গড়াগড়ি দিয়ে মাটি করিল শোসর ॥
আনন্দে বসিল বীর প্রাচীর উপর।
হস্ত পদ পসারিয়ে হরিষ অন্তর ॥
নিদ্রে হৈতে উঠি কয় জত নিশাচরে।
দেখি গিয়ে চল বানর কোন কর্ম্ম করে ॥
ধায়িয়া আইল তথা জত রাক্ষসগণ।
কেহ বলে এখানেতে ছিল মধুবন ॥
কেহ বলে দিশাভুল লাগিল তোমারে।
পাতা লতা চিহ্ন কিছু না পাই দেখিবারে ॥
কেহ বলে বানর আইল কোন রূপ ধরি।
মায়া করি বন ভাঙ্গি গেল নিজ পুরী ॥
কেহ বলে হেন কথা কহ বা কেমনে।
কোথায় মরিল বানর গাছের চাপনে ॥
ধুলায় পড়িয়ে কাঁদে জত নিশাচর।
কি বলিয়ে ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
পাশমোড়া দিয়ে উঠে পবনকুমারে।
পিতা মাতা মৈল কিবা তোমারদিগের ঘরে ॥
রাক্ষস সব বলে এই পাইলাম বানর।
কোন জন ভাঙ্গিল বন কহত সত্বর ॥
হনু বলে চাকর তুমি রাখিলা আমারে।
সকলগুলি খাইলাম আর দিব কারে ॥
রাক্ষস বলে বানর কিবা বলিস বচন।
সিকড় সহিত কেমতে খাইলি মধুবন ॥
হনু বলে সত্য কথা বলিব তোমারে।
চারি ভাগের এক ভাগ পেট নাহি ভরে ॥

(পৃ° ১২।২-১৩।১)

নল বলে প্রভু রাম কমললোচন।
পর্ব্বতিয়ে বাঁশ আমায় দেহ নারায়ণ ॥
রাম বলেন সে বাঁশ থাকে কোথাকারে।
নল বলে থাকে তিন সাগরের পারে ॥
দশ জোজন ব্যাপি তার মূল আয়াতন।
দীঘেতে হয় সে ত্রিশ জোজন ॥
ইহার কতকগুলিন বাঁশ দেনতো আমারে।
তবে সে সাগর আমি পারি বান্ধিবারে ॥
এত শুনি রঘুনাথ ভাবেন চমতকার।
বুঝিলেন জানকী মম নহিল উদ্ধার ॥
এমন বীর কেবা আছে পৃথিবী ভিতরে।
তিন সাগরের পার কেবা জাইতে পারে ॥
হনু বলে আজ্ঞা করেন কমললোচন।
সেই বাঁশ আনিতে আমি করিব গমণ ॥
রাম বলেন জাও বাপু পবনকুমার।
তোমার বিক্রমে হবে সীতার উদ্ধার ॥
রাম জয় শব্দ করি পবনকুমারে।
চক্ষুর নিমিষে গেল তিন সাগর পারে ॥

কতকগুলিন বাঁশের কারন বলিল বচন।
জড় সুদ্ধা উঠাইল পবননন্দন॥
রামজয় করি লৈল মাথার উপরে।
বাঁশ লয়ে থুইল বীর রামের গোচরে॥

(পৃ০ ৩০।১)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন রাম বলি যুক্তি সার।
নবমী পূজা তবে করেন দুর্গার॥
ব্রহ্মার বচনে নবমী পূজা কৈলেন।
তুষ্ট হয়ে ভগবতী হাতে হাতে লৈলেন॥
দুর্গা বলেন সবংশে বধহ রাবণ।
আর কোন চিন্তা নাহি শুনহ বচন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
নৃত্য গীতে মগ্ন হৈল সকল বানরে॥
নবমী পূজা করি মনের সন্তোষে।
দশমী দিবসে দুর্গা গেলেন কৈলাশে॥
হেন কালে নারদ মুনি করিয়ে গমন।
দেবীর কথা কহিলেন যথায় রাবণ॥
গিরিসুতা দুর্গা রাম পূজিলেন চরণ।
বর দিলেন দেবী বধ করিবে রাবণ॥
এত যদি কহিলেন নারদ মহামুনি।
মহামায়া স্তব রাবণ করয় আপনি॥
কোথা গেলে দুর্গা মা গো হরের ঘরণী।
তোমার বিহনে রাবণ মরিবে এখনি॥
আর বার রাবণ অকালে বোধন কৈল।
রাবন স্মরণে দেবীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল॥
হর বলেন গৌরী বড় দেখি উচাটন।
পুনর্ব্বার মনে বুঝি পড়িল রাবণ॥
এত পূজা তোমায় করিলেন নারায়ণ।
ইহাতে সন্তোষ তোমার না হইল মন॥
হরের বচনে গৌরী শান্তনা পাইল।
আপনার স্থানে মাতা আনন্দে রহিল॥
কৃত্তিবাষ পণ্ডিতের অমৃত বচন।
সুন্দরাকাণ্ডের শেষ হইল এখন॥

১৪০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{১}{৪}$×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৭১। এক এক পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

সাগর বন্ধ করি রাম হৈলেন যদি পার।
দেখিয়ে রাবণ রাজা সভয় অন্তর॥
হেরিয়ে রাবণ রাজা ভাবি মনে মনে।
সুক শারণ দুই রাক্ষস ডাক দিয়ে আনে॥
শুন বলি শুক শারণ সৈন্যের প্রধান।
রামের কটক যদি আইল বিদ্যমান॥
দুত হয়ে কিবে কায কর লঙ্কাপুরে।
নর বানর আইল আমা বধিবারে॥
বনপশু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ॥
যত বানর আসিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রত্যেকে হেরিবে তুমি আপন নয়নে॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবে নাম।
কটক চর্চ্চিয়ে তুমি আইস মম ধাম॥
রাম লক্ষ্মণ জানিবে সুগ্রীব বিভিষণে।
জত সৈন্যগণ জানিবে জনে জনে॥
কোন স্থানে বঞ্চে তবে নর আর বানর।
কিরূপে আসিতে চায় লঙ্কার ভিতর॥
রাজআজ্ঞা দুত তবে বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল ত্বরিতে॥

মধ্য,—

বলে রাজা লঙ্কেশ্বর তুমি কেবা বীরবর
হও তুমি কার অনুচর।
কি কারণ আইলে বীর • বচন অতি গভীর
বসিলে প্রায় পর্ব্বত শিখর॥
অঙ্গদ বলে বচন শুন রে দুষ্ট রাবণ
এবে তুমি পাসর আপনা।
জানিশ তো বালি রাজন আমি তাহার নন্দন
জে তোরে করিল বিড়ম্বনা॥
লাঙ্গুলে জড়ায়ে তোরে ডুবাইলেন সাগরে
লয়ে গেলেন কিস্কিন্ধা নগর।
দশ মুখ দেখি তোর অন্তর হরিষ মোর
শীঘ্রগতি গলে দিলাম ডোর॥
তবে লাফায়ে ২ চলো বানর বলে নাচো ভালো
এই মতে ক্ষণেক কাল জায়।
বানরেতে গালি দেয় না দেখি তার উপায়
শরণ ললে বালিরাজার পায়॥
মিত্র করি বালি সঙ্গে মুক্ত হয়ে আলে রঙ্গে
অঙ্গ বঙ্গে হতে জাও বিজয়।
তুমি তো সেই রাবণ আমি বালির নন্দন
এই কহিলাম পরিচয়॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ৪।২-৫।১)

বিশ্বামিত্র মহামুনি উপনিত হলেন তিনি
দশরথ রাজার গোচর।
ভাগ্য ভাগ্য বলি রাজা মুনিবরে কৈলেন পূজা
পাত্র মিত্রে হরিষ অন্তর॥
দশরথ মহাশয় যোগ হস্ত হয়ে কয়
আগমন কারণ কহেন মুনি।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই মুনি কন ইহাই চাই
নৃপ দিলেন মুনিবাক্য শুনি॥
মুনির সহিত আসি বধেন তারকা রাক্ষসী
মারিচের দর্প কৈলেন চুর।
আনন্দিত মুনিচয় সঙ্গে লইয়ে তোমায়
গেলেন তবে জনকরাজাপুর॥
(পৃঃ ১০।২)

শুন প্রভু দেব রাম অতিকা আমার নাম
হই আমি রাবণনন্দন।
যুদ্ধ করিতে মোরে পাঠাইলেন লঙ্কেশ্বরে
অদ্য আমায় করেন নিধন॥
কে বুঝে তোমার মায়া সিংহমুখ নরকায়া
সেই অতি অদ্ভুত রূপ।
করকমল ফুল্ল করনখ বজ্র তুল্য
বিনাশিলে হিরণ্য কশ্যপ॥
তব তত্ত কহেন প্রবিন বামন চরণে তিন
আৎসাদিয়ে ছিলেন তিন লোক।
হরিলে রাজ্য সম্পদ বাড়াইলে ইন্দ্রপদ
বলি তাহে না ভাবিল শোক॥
হয়ে ভৃগুপতি রূপ নাশিলা সকল ভূপ
ক্ষত্রি বধিলে ধরি চাপ।
হত জজ্ঞ হত তাপ পৃথিবীর সন্তাপ
খণ্ডাইলে বিষম বীরদাপ॥ ইত্যাদি
(পৃঃ ২৩।২)

রাব। বলে অদ্য আমি জানিলাম কারণ।
অবতার হয়েছেন সাক্ষাত নারায়ণ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাত্রি।
অন্ধ জনের চক্ষু তুমি নির্গুণের গতি॥
পাতালেতে কুর্ম্মরূপি স্বর্গে দেবগন।
তোমার মহিমা দেব না যায় কথন॥
দারুণ ব্রহ্মশাপে তোমার না জানিলাম মর্ম্ম।
এই মতে বৃথা আমার গেল দুই জন্ম॥
যুদ্ধ করি দুঃখ প্রভু পাইলাম অপার।
আর জন্মে এত যুদ্ধ না করিব আর

রাবণের স্তব শুনি হাসেন দেবগণ।
মরণকালে আপনারে জানিল রাবণ॥
স্তব শুনি সন্তোষ হইলেন রঘুনাথ।
হেন জনের এমন মন হৈল অকস্মাত॥
ভালো ভালো ভক্ত বটে বধ উচিত নয়।
তোমার লঙ্কা তোমায় দিয়ে যাই অযোধ্যায়॥
দেবগণ বলে ভালো বিপত্তি ঘটিল।
রাবণের স্তব শুনি রামের কৃপা হৈল॥
সরস্বতী কন্ধে যায়ে কৈলেন আরোহন।
পুনর্ব্বার রামে রাবণ কহে দুর্ব্বচন॥
কোথাকার মানুষ তুই জটীল তপস্বী।
সর্ব্বনাশ কৈলি আমার লঙ্কাপুরে আসি॥
এত বলি ঘন করে বাণ বরিষণ।
হেরিয়ে ক্রোধিত হৈলেন কমললোচন॥

(পৃঃ ৮১২)

এইরূপে হনুমানে বিদায় করিলেন।
পুষ্পক রথের প্রতি ডাকিয়ে কহিলেন॥
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্ব্বজন।
যুদ্ধে জিনিয়ে তোমায় আনিল রাবণ॥
কুবেরের হও যাও কুবের নিকট।
কুবেরে কহিবে আমি ছাড়াইলাম শঙ্কট॥
আজ্ঞা পায়ে রথ চলিল শূন্যভরে।
উপনিত হৈল রথ কুবেরের দ্বারে॥
রথ হেরিয়ে কুবের কহিলেন তখন।
কেনে তুমি এথা আইলে তেজি নারায়ণ॥
যাবত পৃথিবীতে থাকেন রঘুনাথ।
তাবত থাকিবে তুমি রামের সাক্ষাত॥
আজ্ঞা পায়ে রথ আইল অযোধ্যা নগর।
হেরি রঘুনাথ হৈলেন হরিষ অন্তর॥
ত্রিভুবণের মুনিগণ একত্র হইলেন।
রঘুনাথ দরশনে অযোধ্যা চলিলেন॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত কহেন করেন অবধান।
এত দূরে লঙ্কাকাণ্ড হৈল সমাধান॥

১৪১। রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৫$\frac{1}{4}$ × ৫$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা, ১—৭০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভ,—

ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
দুর্জ্জয় রাক্ষস মারি খণ্ডাইলেন ডর॥
মুনি সব বলেন রাম কৈলেন পরিত্রান।
অযোধ্যায় গিয়ে রামে করিব কল্যান॥
মুনি সব গেলেন যদি রাম বরাবরে।
দ্বারী সত্তরে গিয়ে রামের গোচরে॥

মধ্য,—

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রমায়ণের সহিত স্থানে স্থানে সুন্দর মিল আছে।

শেষ,—

বৃক্ষে পক্ষী নাহি রয় পশু না রয় বন।
এক দৃষ্টে চায়ে চলে রামের শ্রীচরণ॥
উর্দ্ধশ্বাসে চলি জায় নারী গর্ব্ভবতী।
লজ্জা ভয় তেজি ধায় কুলের যুবতী॥
সরজুর কূলে সবে করিলেন গমন।
চাহিয়ে রহিলেন রঘুনাথের শ্রীবদন॥
এইরূপে রঘুনাথ সরজুর কূলে।
কোটি কোটি রথ তবে আইল হেন কালে॥
লব কুশ দুই ভাই কান্দিয়ে বিকল।
ধারা শ্রাবন প্রায় চক্ষে পড়ে জল॥
অল্পকালে মাতৃহীন হৈলাম দুই জন।

জীবন ধারন করি হেরে ও চরণ ॥
আপনি তেজিয়ে গেলে সকলি উদাস।
জীয়ন্ত থাকিব আর কিসের অশ্বাস ॥
কাতর হইয়ে রাম পুত্র লৈলেন কোলে।
প্রবোধ বচন রাম কন সেই কালে ॥
শাত কাণ্ড রামায়ণ দুজনার অভ্যাস।
সকলি জানহ তাহা মুনির আভাস ॥
মুনিবাক্য রক্ষে করি জাই স্বর্গপুরে।
গৃহে বাস কর দোহে হরিষ অন্তরে ॥
মম আশীর্ব্বাদে সকল মঙ্গল হবে।
অন্তকালে দুই ভাই আমারে পাইবে ॥
প্রবোধিয়ে দুই পুত্র পাঠাইলেন ঘর।
স্বর্গ হৈতে আইল রথ দেখেন রঘুবর ॥
রথখানার তেজ জেন সূর্য্যের কিরণ।
সেই রথারোহন হৈলেন দেব নারায়ণ ॥
আর জত লোক ছিলেন সরজুর কূলে।
শরীর তেজিল তারা পড়ি সেই জলে ॥
গরুড় বাহনে হরি জান নারায়ণ।
ব্রহ্মা আদি দেব আসি করেন স্তবন ॥
চারি অংশ ছিলেন প্রভু হইলেন একজন।
বড় কর্ম্ম কৈলেন প্রভু বধিয়ে রাবন ॥
বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মা শুন আমার বচন।
আমার পশ্চাতে সব আসিছে এখন ॥
রাম নাম কহিছে আর তেজিছে জীবণ।
অক্ষয় স্বর্গভোগী হবে সেই জন ॥
সন্তাপন নামে স্বর্গ বৈকুণ্ঠ সমান।
পৃথিবীর লোকে আমি তাহা দিলাম দান ॥
রথ লয়ে গেলেন ব্রহ্মা প্রভুর বচনে।
স্বর্গবাসী হয় লোক শ্রীরাম স্বরণে ॥
দিব্য রথে জায় লোক স্বরিয়ে শ্রীহরি।
রামের প্রসাদে লোক গেল স্বর্গপুরী ॥
মরণকালে রাম নাম করে জেই জন।
আপনার মুর্ত্তি তারে দেন নারায়ণ ॥
ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার।
ভজিলে গোবিন্দপদ পায় তো নিস্তার ॥
স্বর্গে জায়ে সকল লোকের পুরিল আশ্বাস।
উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কীর্ত্তবাস ॥•॥
দীনহীন রাধামাধব দাসের নিবেদন।
শাতকাণ্ড রামায়ন ভাষায় রচন ॥
বর্ন্নিয়াছেন বহুকাল পণ্ডিত কীর্ত্তবাস।
পৃথিবীর লোক শুনে পুরায়েছেন আশ ॥
বিরুদ্ধ ছন্দ রশাভাষ পয়ার লিখন।
ভাবী হয়ে ভাব অর্থ করিলে গ্রহন ॥
ভক্তি ভাবে ব্যাঘাত হয় ভাবিলাম হৃদয়।
পণ্ডীতের ভাব জাহা ভাবিলাম নিশ্চয় ॥
সতন্তর পয়ার আর করিয়ে রচন।
গ্রন্থের আভাস লয়ে লিখিলাম এখন ॥
পণ্ডিতের যে পয়ার পাইলাম সারৎসার।
পণ্ডিতের মত লয়ে লিখন আমার ॥
সব শ্রোতাগণে আমি করি নিবেদন।
অন্য গ্রন্থের সহিত করিলে মিলন ॥
ভাবেতে বুঝিবেন ভাব কিরূপ হয়েছে।
অধিক লিখনে আর কি গুণ আছে ॥
ইতি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ২৬ মাঘ।

১৪২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,—১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। ২১।২ পত্রে প্রসাদদাসের ভণিতা আছে।

আরম্ভ,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরি।
ইন্দ্রের অমরাবতি তাহা তিরস্কারি ॥

রাজা প্রজা পুরজন সুখি নিরন্তর।
এক তিন সম জায় শতেক বৎসর ॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম জুবরাজ হৈয়া।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া ॥
পুরবাসি প্রজাগন ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় গুনের আ᠁য়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয় ॥
অদ্ভূত লক্ষণ রামের অদ্ভুত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র ॥
গুণের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রুপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে ॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম জৌবন।
সাস্ত্র বিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপন ॥
জোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দ হৃদয়।
রামে রাজা করিবেক ভাবিল নিশ্চয় ॥
বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালে আপনে।
সত্তরে লিখিলা পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে ॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
ভাবয়ে কেমন দান করিব কতেক ॥
সর্ব্বভুতকর্ত্তা প্রভু রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেক ভাবে সর্ব্বজন ॥

মধ্য,—

রাম বলেন শুন বলি প্রাণের লক্ষ্মণ।
বিপাকেতে হয় পাছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ॥
বিদায় হইতে জাব পিতার সাক্ষাতে।
পুত্রস্নেহে ছাড়িয়া না দিবে কদাচিতে ॥
তবে তাঁহার ভঙ্গ হবে প্রতিজ্ঞা পালন।
কোন প্রয়জন তবে আমার জীবন ॥
অতএব না জাইব পিতার সাক্ষাতে।
উদ্দেশে প্রণাম করি চলিল(ব) বনেতে ॥
করজোড়ে সসম্ভ্রমে কহিল লক্ষ্মণ।
জে কথা কহিলা গোঁসাই সত্য বিবরণ ॥
কিন্তু দুখসাগরে মজেছেন মহারাজ।
না কহিয়া গেলে পুন হইবে অকাজ ॥

(পৃঃ ১৪.১)

তবে গেলা তিন জন বশিষ্ঠ সদনে।
বিদায় হইতে তিনে পড়িলা চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি দুঃখিত হইলা।
সর্ব্বতত্ত জানে মুনি প্রকাশ না কৈলা ॥
বনবাস ব্রত শিক্ষা হৈলা মুনি স্থানে।
রাজবস্ত্র অলঙ্কার দিলাত ব্রাহ্মণে ॥
সীতার সহিত রাম চলিলা তখন।
পাছে ধনুর্ব্বান লইয়া চলিল লক্ষণ ॥
সীতা দেবীর দুঃখ দেখি মনে দুখ পাইয়া।
সুমন্তেরে কহে মুনি আক্ষেপ করিয়া ॥
স্ত্রীর বস রাজা তোর বৃদ্ধ বুদ্ধিহিন।
জোগ্য পাত্র তুমি সব হৃদয় কঠিন ॥
রাজার কুমারি সীতা দুঃখ নাহি জানে।
দশরথপুত্রবধু হৈয়া জায় বনে ॥
বনে গেল কর্ম্মফলে জে হউক পশ্চাতে।
নগর বাজার দিয়া হাঁটিবে কেমতে ॥
সত্তরে আনহ রথ না ভাব সঙ্কট।
তিন জন রাথ লৈয়া বনের নিকট ॥
শুনিয়া আনিল রথ সুমন্ত সারথি।
তিন জন রথে চড়ি চলে শীঘ্রগতি ॥

(পৃঃ ১৫।১-২)

নাচাড়ি ॥

শ্রীরাম পাঠাইয়া বনে ঘর মুহ হৈতে নারি।
জয় রঘুনন্দন অজোধ্যার প্রানধন
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
আমি জদি জানি বৈরি মোরে কৈকৈ রানি
তবে কেন জাইব বিশ্বাস।

প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রান সব নিল
তোমারে পাঠায়ে বনবাস ॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্য খণ্ড কোন॰ প্রয়োজন।
আহা মরি বাছা রাম উড়ু উড়ু করে প্রান
তোমা বিনা না রহে জীবন ॥
শ্রীরাম পাঠায়া বনে কান্দে রাজা রাত্রি দিনে
প্রবোধ না মানে কার বোলে।
কৌশল্যা সুমিত্রা দুই রাজারে তুলিয়া লই
মোছাইল নেত্রের আচলে ॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলা ধর্ম্ম কইলা অতি পাপ কর্ম্ম
এখন কান্দহ কি কারণে।
কীর্ত্তিবাস দ্বিজ কয় দৈবের নির্ব্বন্ধ হয়
বনে গেলা বধিতে রাবণে ॥ * ॥
(পৃঃ ১৭।১-২)

শেষ,—

লজ্জাযুক্ত হইলেন জনকঝিয়ারি।
আর সাক্ষি কে আছে বলেন শ্রীহরি ॥
সীতা বলেন আর সাক্ষি নাহি প্রয়োজন।
সকলে আসিয়া মিথ্যা বলেন বচন ॥
দুঃখ ভাবিয়া কন জনকঝিয়ারি।
বটবৃক্ষ আছে সাক্ষি শুনহ শ্রীহরি ॥
এ কথা শুনিয়া কহেন কমললোচন।
বটবৃক্ষে জিজ্ঞাসা করেন ততক্ষণ ॥
বটবৃক্ষ কহেন শুনহ রঘুবর।
তিনজন মিথ্যা কহিল সভার ভিতর ॥
মিথ্যা কথা ইহারা কহিল সর্ব্বজন।
আসিয়াছিলা মহারাজা দশরথ রাজন ॥
আসিয়াছিলা তোমার বাপ দশরথে।
পিণ্ডদান সীতার রাজা নিলা দক্ষিণ হাথে।
সত্যকথা কহিল বৃক্ষ রামের গোচরে।
এ কথা শুনিয়া সীতার জুড়ায় কলেবরে ॥
তুষ্ট হইলা সীতা বটবৃক্ষে দিলা বর।
আমার বরে হইও তুমি অক্ষয় অমর ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল অযোধ্যাকাণ্ড। * ॥

১৪৩। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা— কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{1}{2}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম সীতা দেবীর বিভা।
অজোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম ভরথে রাজ্য দিয়া ॥
ছত্র দণ্ড হারাইলা অজোধ্যাকাণ্ডে।
অরণ্যেতে সীতা হরে লৈল দশমুণ্ডে ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথ পাইলা অপচয়।
কিস্কিন্ধাকাণ্ডে মিত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥
অনাথ হইয়া দুই ভাই ভ্রমেণ দণ্ডকে।
সহায় করিতে জান বানরকটকে ॥
দুই ভাই উঠিলেন গিয়া পর্ব্বতশিখরে।
সম্ভ্রম পাইয়া পলায় কটক বানরে ॥
শুগ্রীব বলেন এথা আইসে দুইজন ধানুকী।
এই পর্ব্বত এড়িয়া চল আর পর্ব্বতে থাকি ॥
বুদ্ধির সাগর বানর নানা বুদ্ধি সঞ্চে।
আমারে মারিতে রাজা দুই বির পাচে ॥
শুগ্রীব বলেন কেহ বুক নাহি বান্দে।
লাফে লাফে পড়িয়া গেল বড় গাছের কান্দে ॥
কোন গাছে সহিতে নারে বানরের আস্ফাল।
ডালে মুলে ভাঙ্গিয়া পড়ে শাল পেয়াল ॥
বলবন্ত আছে জত পর্ব্বতশিখরে।•
মহিষ ব্যাঘ্র সকল পলায় উচ্চস্বরে ॥

মধ্য—,

সাগরপার রাবণ রাজার ঘর
শুনিতে বিষম কাহিনি।
একেশ্বর পরবাস জীবনের কিবা আস
চারি মাস বার্ত্তা নাহি জানি॥
অহে বানররাজ সাধ্যা দেহ রামের কাজ
বড় ধর্ম্ম পরউপগার।
ধর্ম্ম দেখি কর কাজ শুন হে বানররাজ
তোমার রহুক জসভার॥
রাত্রি দিবা ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কেমতে রহিবে জীবন।
চক্ষুর জল নাহি রহে প্রবোধে ভাই স্থির নহে
দেশে ভাই না করিলা গমন॥
শোকসাগরে কর পার তুমি কর প্রতিকার
সীতা দেবীর করহ উদ্ধার।
তিন জন দেশান্তরি তুমি মিত্র দ্রঢ় করি
সব দুঃখ নাস হে তাহার॥
(পৃঃ ১৭।১)

শেষ,—

সম্পাতি বলে বাহু তুলিয়া নৃত্য আমি করি।
রাম রাম বলিতে হইল পাখাসারি॥
নুতন দুই পাখা হইল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর॥
দেখিয়া সকল বানর আনন্দ অপার।
রাম রাম বলিয়া সাগরে হইব পার॥
বানর সম্ভাসিয়া পক্ষ উঠিল আকাশে।
দুই পাখ সারিয়া জায় আপনার দেশে॥
পিতা পুত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেলা অঙ্গদ দক্ষিণ সাগর॥
কীর্ত্তিবাস কবি করিলা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল কিস্কিন্ধাকাণ্ড॥ * ॥

১৪৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ।

চারি কাণ্ড পোতা গাইলাম রামায়ণ ভীতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া গেল অঙ্গদ দক্ষিনসাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরকটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ॥
দিগ বিদিগ নাহি দেখে আকাষমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সুর্য্যাস্ত জায় জখন বেলা অবসান।
লঙ্কা প্রবেসিল তখন বির হনুমান॥
আলো করি উঠে চন্দ্র গগনমণ্ডলে।
ভালোমতে হনুমান লঙ্কা নেহালে॥
রাজার দুয়ারে দেখে দুয়ারি প্রহরি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সব বিসম অস্ত্রধারি॥
সেল সুল শক্তি জাটি মুসল মুদ্গর।
খাণ্ডা ডাম্বুষ টাঙ্গি ছুরি ভয়ঙ্কর॥
পর্ব্বতপ্রমান হস্তি কনকে রচিত।
নানা বর্ন্নে ঘোড়া দেখে রত্নে বিভুষিত॥
লঙ্কাপুরের সোভা দেখে পবননন্দন।
ফল ফুল বৃক্ষ দেখে অতি সুসোভন॥
পরম সুন্দর ঘর দেখিতে রুপস।
ঘরের উপর সোভে রত্নের কলস॥
নানা বর্ন্নে ঘর সব হিঙ্গুল হরিতাল।

মনি মানিক বান্ধা মেঝ্যের সান কাচচাল ॥
ঘরের উপর সোভা করে সুবর্ন্নের বারা।
চারি ভীতে সোভে দেখ গজমুকুতার ঝারা ॥
ধ্বজ পতকা প্রতি ঘরের চালে উড়্যে।
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাহি নড়ে ॥
ঘরের ভিতর সোভা করে বিচিত্র সিংহাসন।
শেত নেত বহুতর বিচিত্র বসন ॥ (পৃ০৮।১)
সাগর লজ্ঘিলাম আমি বড় প্রতিআষে।
চাহিয়া না পাইল সিতা আওয়াসে আওয়াসে ॥
কার সনে যুক্তি করিব নাহিক দোসর।
চিত্তে গুনে হনুমান রাত্রি বিস্তর ॥
কান্দে বির হনুমান লঙ্কায় বসিয়া।
রামের কার্য্য না করিলাম লঙ্কায় আসিয়া ॥
কোন কোন স্ত্রির মুখ না কৈলাম নিরক্ষন।
অর্দ্ধ রাত্রি সিতা চাহি কৈলাম জাগরণ ॥
অর্দ্ধ রাত্রি গেল আমার আছে অর্দ্ধ রাতি।
তবু না পাইলাম আমি সীতা লক্ষ্মীসতি ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার প্রভুর ভকতি।
সকল নষ্ট কৈল পক্ষরা[জ] সম্পাতি ॥
তার বোলে ভর করিয়া লজ্ঘিলাম সাগর।
এতো দুঃখ পাইলাম আসি দেশ দেশান্তর ॥
সিতা জদি জিতেন অবস্য আমি দেখি।
রাক্ষশের ভয়ে প্রাণ ছাড়িলা জানুকি ॥
সিতা না দেখিয়া জাই রঘুনাথের পাস।
সিতার বার্ত্তা না পাইলে রামের বিনাস ॥
রামের মরনে মরিবেক রাজা সুগ্রিবে।
তার উমা প্রান দিবে সুগ্রিবের ভাবে ॥
অঙ্গদ যুবরাজ মরিবে বালির নন্দন।
কিচকিন্ধা নগরে মরিবে জতো বানরগন ॥
লক্ষ্মন বির প্রান দিবে রামের মরণে।
দেসে বার্ত্তা পাইয়া মরিবে ভরথ সত্রুঘনে ॥
ত্যাৎত মরিবে অগ্নি করিয়া প্রেবেস।
পাত্র মিত্র মরিবেক রঘুবংশের দেশ ॥
লঙ্কা হইতে আমি নাহি করিব গমন।
লঙ্কার ভীতর আমি তেজিব জিবণ ॥
হাতে দণ্ড করি আমি হইব সন্যাসি।
সাপ দিয়া রাবনে করিব ভস্মরাসি ॥
চন্দনকাষ্ঠের করিব সি(চি)তা সাগরের কুলে।
অগ্নি কার্য্য করিব আমি কি কাজ শরিরে ॥
রাম লক্ষ্মন সীতা আছেন বড় পৃত আসে।
সুন্দরাকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কির্ত্তিবাষে ॥*॥
(পৃ০ ১০।১-২)

শেষ,—

ব্রহ্মা বলেন সুন রাম জগত ঈশ্বর।
আজি হতে শেতু হইল রামেশ্বর ॥
জাঙ্গালেব উপর বসিবে জতো লোক।
পরম সুখে বসিবেক নাহি রোগ সোক ॥
উত্তর কুলে স্নান করিলা রাম নারায়ণ।
সেই জল স্পর্শ করিলা যত দেবগন ॥
অগ্রে স্পর্শ করিলেন দেব পঞ্চানন।
তৎপরে ব্রহ্মা করিলা পরষন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বাইউ বরুণ যত দেবগন।
সভে পরষিলা জলা হয়্যা ভক্তিমন ॥
জেই স্থানে স্নান করিলেন প্রভু নারায়ণ।
সেই হতে পুন্য[]ক্ষত্র হইল ততক্ষণ ॥
শেতবন্ধ রামেস্বর যেই জন সুনে।
শরীরের পাপ ভষ্য হয় ততক্ষনে ॥
ব্রহ্মা শিব বিদায় হইলা দুই জন।
সবংশেতে মার গীয়া লঙ্কার রাবণ ॥
এত বলি বিদায় হইলা দেবগন।
লঙ্কা প্রেবেসি তবে চলেন নারায়ণ ॥
অগ্রে পার হইল জতেক বানরগন।
তার পশ্চাতে শুগ্রিব বিভিষন ॥
তার পশ্চাতে পার হইলা শ্রীরাম লক্ষ্মন।

তবে পার হৈলা সব সেনাপতিগন ॥
রাম লক্ষন পার হৈলা জগত অধিপতি।
পশ্চাতে হইলা পার সব সেনাপতি ॥
জেই কুলে সীতা আছেন সেই কুলে রাম।
দুরে ছিলা দুই জন হইলা এক গ্রাম ॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডীত জীবের করিতে হিত।
জগত তারণ হেতু রামায়ন গীত ॥
রামায়ন গীত ইহা অতি সুধাখণ্ড।
এত দুরে সমাধান সুন্দরাকাণ্ড ।*॥

১৪৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৫⅞ × ৫⅛ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

বন্দ গেল সিন্দু রামচন্দ্র হইলা পার।
দেখিয়া রাবণ রাজার সভয় অন্তর ॥
চিন্তয়ে রাবণ রাজা গুণে মনে মনে।
শুখ শারণ দুই চরকে ডাক দিয়া আনে ॥
তোরে বলি সুথ শারণ সেনার প্রধান।
রামের কটক আইল কতো দেখ বিদ্যমান ॥
দুত হয়্যা কি কর্ম্ম করহ লঙ্কাপুরে।
নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে ॥
বনপষু বনজন্তু না চিনে রাবণ।
তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ ॥
কতো বানর মিলিয়াছে সুগ্রীবের সনে।
প্রেতক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে ॥
রাউছত্রি হই আমি না জানে কোন জনা।
লঙ্কা আসিয়া কেবা অগ্রে দিবে হানা ॥
কোন কোন সেনাপতি কার কিবা নাম।
সকল কটক চিনিবে হয়্যা সাবধান ॥
রাম লক্ষন জানিহ সুগ্রিব বিভিষনে।
প্রেতক্ষ্য জানিহ তুমি প্রতি জনে জনে ॥
কোনখানে বঞ্চে তারা কিরূপ ছাউনি।
কোন পথে বানরগুলা করিবে উঠানি ॥
রাজা[র] আজ্ঞা দুত বন্দিলেক মাতে।
রাজাকে প্রণাম করি চলিল তুরিতে ॥

মধ্য,—

রাম তোর জত অন্তর সুন রে রাবণ।
যত দুর গনি রাবণ পঙ্ক চন্দন ॥
শ্রগাল ব্যাঘ্রতে রাবণ যত দুর গনি।
যত দুর গনি রাবণ তৃণ আর আগুনি ॥
সিংহ ব্যাঘ্রতে যদি উপমা দিতে পারি।
রামকে তোকে রাবণ তবে প্রতিজোগি করি ॥
মক্ষিকা হয়্যা সহিতে চাহ পর্ব্বতের ভার।
খুদ্র হইয়া নিন্দা করিস পূর্ন্ন সশোধর ॥

(পৃঃ ১০।২)

ধন্য মাল্যানি বলে করিতে জাবে রণ।
মাএর এক সত্য তুমি করহ পালন ॥
বৈকুণ্ঠের নাথ সেই প্রভু গদাধরে।
নানাঘাত কর পাছে রামের শরিরে ॥
অতিকা বলেন মাতা করি নিবেদন।
ন্যায় জুর্দ্ধ করিব কেবল লইয়া লক্ষ্মণ ॥
অধমে কৃতার্থ যদি করেন গদাধরে।
প্রাণ সমর্পণ করিব রাম বরাবরে ॥
অতঃপর বিদায় মাতা তোমার চরণে।
এ জনমের মত আর নাহি দরসনে ॥
মায়েরে প্রণাম করি রাবণকোঙর।
রামজয় শব্দ করি ডাকে উচ্চস্বর ॥
আনন্দিত হইয়া তখন চারি দিগ সাজে।
রুশিয়া প্রেবেস কৈল সংগ্রামের মাঝে ॥

ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষহিনী।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদুনী॥
ধুলায় অন্দকার করি জায় রাক্ষস বির।
ঠেলাঠেলি হইল গীয়া গড়ের বাহির॥

(পৃঃ ৩৬।১)

তিন ভাই পড়িল দুই খুড়া জোদ্ধাপতি।
অনুমান করিছে অতিকা মহামতি॥
বানরের সনে জুর্দ্ধ কোন প্রেয়োজন।
নয়ান ভরি দেখি গীয়া রাজীবলোচন॥
আনন্দে অতিকা জায় রাম দরশন।
মার মার করি আইসে জত বানরগণ॥
দেখিয়া বানরের রঙ্গ অতিকার হাষ।
বিনা ভয় পৃত নাহি বুঝিলামাভাষ॥
হাসিয়া অতিকা দিলা ধনুকে টঙ্কার।
সর্গ মত্ত পাতালে লাগিল চমৎকার॥
ভয় পায়্যা বানর সব পড়িল শঙ্কটে।
পলায় বানরগন না রহে নিকটে॥
ডর পাইয়া জত বানর করে পলায়ন।
বলিতে লাগীল তবে রাবণনন্দন॥
আমার রোশের জোগ্য নহ বানরগন।
কেন পলাইয়া জাহ লইয়া জিবন॥
পাইয়া কথার পৃত বানর সকল।
আপনা আপনি বলে পথ ছাড়ি চল॥
রিপু সম নাহি দেখে বলে বলাধিন।
কপি পথ ছাড়ে রামের আরতি বিহিন॥
জেখানে বশীয়া আছেন কমললোচন।
সেইখানে অতিকা বির দিল দরশন॥
সভা করি বসিয়াছেন কমললোচন।
বামেতে শুগ্রিব রাজা দক্ষিনে লক্ষন॥
পদতলে বসিয়াছে ধার্ম্মিক বিভিষন।
জাম্বুবান আদি সভে করিছে স্তবণ॥
একদৃষ্টে দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন।
রূপ দেখি মোহ পাইল রাবননন্দন॥
রথে হৈতে অতিকা নামিল ভূমিতলে।
সজল নয়নে প্রনাম রামপদতলে॥
কিত্তিবাষ পণ্ডীতের কবিতা বিচক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল অপূর্ব্ব রামায়ণ॥ * ॥

(পৃঃ ৩৭।২)

সুন হে গোসাঞি তুমি কিছু যে বলিয়ে আমি
আমারে রাখিলে কি কারন।
আমি রঘুনাথের দাস মোরে করিলে নৈরাস
আজি হইল লক্ষ্মনের মরন॥
ভরথ আমার নাম সুন বাপু হনুমান
আমি হই রঘুনাথের ভাই।
চৌর্দ্দ বৎসরের সুখ রাম বিনে পাইল দুখ
আজি রামনাম সুনিল তোমার ঠাঞি॥
এতো কহি ভরথ রাজা তবে কহে বানর তেজা
সুন রাম লক্ষনের কল্যান।
তোমার কঠিন হিয়া তিলেকে নাহিক দয়া
বনবাসে দিয়া প্রভু রাম॥
বিষ্ণু অংশে তোমার জন্ম করিলে দারুন কর্ম্ম
রামচন্দ্রে বনবাস করি।
রার্য্যখণ্ড পাইয়া মোনে বসি রাজসিংহাসনে
রামচন্দ্র হইলেন ভিকারি॥
বনবা[ে]স শ্রীহরি খর দুষন মারি
সিতা চুরি করিল রাবন।
সুগ্রীবেরে করি মিত খণ্ডিল রামের ভিত
সেতবন্ধ করিলা বন্ধন॥
গিয়া রাম লঙ্কাপুরি কুম্ভকর্ণ আদি করি
জত বির করিল নিধন।
রনে আইলা রাবন করিলা বিস্তর রন
সক্তিসেলে পড়িল লক্ষ্মন॥
রামের ক্রন্দন সুনি সুসেন বেজ্ঞ বলে বানি
জাহ হনু গন্ধমাদন।

ঔসধি আনিবে জবে লক্ষ্মন জিবেন তবে
প্রাত[ঃ]কালে লক্ষ্মনের মরন ॥
অপরাধ নাহি করি আমারে বাঁটুল মারি
কেনে রামের না চিন্ত কুসল।
তুমি লইলে রার্য্য ধন রামচন্দ্র গেলা বন
সোকে রাম হইয়াছেন দুর্ব্বল ॥
সুনি হনুমানের কথা ভরথে লাগিল বেথা
শ্রীরাম বলিয়া ভরথ কান্দে।
কোথা গেলে পাব রাম ত্রিভুবনে অনুপাম
কির্ত্তিবাসের নাচাড়ি প্রবন্ধে॥* ॥
(পৃঃ৮৯।১-২)

শেষ,—

রত্ন সিংহাষনে বসিলা রাম নারায়ন।
পুত্র হেন পালেন জতেক প্রজাগন॥
দুরন্ত রাক্ষষ মারি রাম গেলেন ঘরে।
ত্রিভুবনের মুনি মিলে একোত্র জুক্তি করে ॥
সর্গবাসি পাতালবাসি আর মর্ত্তবাসি।
একোত্রেতে হইলা জত ত্রিভুবনের রিসি ॥
মুনি সব বলে রাম রাখিলে ত্রিভুবন।
অজোধ্যায় জাইয়া চল দেখি নারায়ন ॥
ইন্দ্রজিতে মারিলেন জেই বির লক্ষ্মন।
তাঁর তরে পুষ্প লহ জত মুনিগন ॥
ত্রিভুবনজই বির ইন্দ্রজিতে মারে।
পুষ্পমাল্য দিব গলে লক্ষ্মনের তরে ॥
দেবরিসি ব্রহ্মরিসি রাজরিসিগন।
ত্রিভুবনের মুনি হইলা একোত্রে মিলন ॥
ত্রিভুবনের মুনিগন হইলা একত্তরে।
রামধ্বনি করি জায় অজোধ্যানগরে ॥
সর্ব্ব মুনি মনে মনে করেন তখন।
আমাদিগের এমন দসা করিবেন নারায়ন ॥
এই জুক্তি মনে কার চলিল মুনিগন।
অন্তর্জ্জামি ভগবান জানিলা কারন ॥
সকল মুনি উপস্থিত অজোধ্যা নগরে।
রামনাম মন্ত্র জপেন ধিরে ধিরে ॥
কিত্তিবায পণ্ডিত লোকের কৈলা হিত।
জগতে করিলা তিহোঁ রামায়ন গিত ॥
রামায়ন গিত করিলা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥ * ॥

১৪৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৯—৪২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। ৪১ সংখ্যক পাতাখানি অপর পুথির।

আরম্ভ,—

পাত্র মিত্র অজধ্যায় দাস দাসি জেবা।
সভারে বলিয় জেন করে মহারাজার শেবা।
মুনিয়া সুমন্ত হল জিয়ন্তেতে মরা।
বদন বাহিয়া পড়ে নয়ানের ধারা।।
লক্ষন বলেন সুমন্ত না করয় বিশাদ।
কেকৈ মাএরে কয়ো আমার সংবাদ।।
তার বাড়া ত্রিভুবনে নাহি কঠিন হিয়া।
বনচারি করিলেন জটা বাকল দিয়া।।
অজধ্যার কন্টক তার ঘুচিলাম জঞ্জাল।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরাল ॥
আজি হৈতে রামনামে দেন জলাঞ্জলি।
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরালি ॥
ভরথে লইয়া করুন অজধ্যার সুখ।
অজধ্যার সুখে আমাদিগো বিধাতা বৈমুখ ॥
মুনিঞা সুমন্ত কান্দে সিরে মারি ঘা।
জল ছাড়া মিন জেন আছাড়য়ে গা ॥
সুমন্তকে দেখ্যা রাম তুলে নিল কোলে।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

১৫ই ভাদ্র ১৩৩১, ৩১এ আগষ্ট ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৭॥০ টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত কয়েকটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়-লিখিত "নাথধর্ম্মে সৃষ্টিতত্ত্ব।" ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) দাশরথি হালদার (কালীঘাট) এবং (খ) কৃষ্ণলাল সাধু এম্ এ, বি টি (রাঁচী) মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত ১ম হইতে ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে উল্লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত বাঙ্গালা এবং ইংরেজি পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ডা: বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়-লিখিত "নাথধর্ম্মে সৃষ্টি-তত্ত্ব" প্রবন্ধের সার মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলেন এবং প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া, প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। (এই সকল আলোচনা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

৬। শোক-প্রকাশ—সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিম্নোক্ত দুই জন সদস্য পরলোক গমন করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(ক) দাশরথি হালদার (কালীঘাট)।

(খ) কৃষ্ণলাল সাধু এম্ এ, বি টি (রাঁচী)।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "বসুমতী"র স্বত্বাধিকারী, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, ৮৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মল্লিক, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, আলিপুর, ২৪পঃ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ ঘোষ, সাকরাইল, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩এ, সেন লেন, নাথের বাগান। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিশ্বাস, ৮ গৌরীবাড়ী লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামচরণ মৈত্র এম্ এ, ৬৮।এ বীডন ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ৪ লাটুবাবু লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার নায়েক, ৫ নিমতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৯ বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা। প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল, মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, শোভাবাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার মিত্র, ৫৯ মকবুলগঞ্জ রোড, লক্ষ্ণৌ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ আঢ্য, ৮ বাবুরাম শীল লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত, ১০ প্যারীমোহন সুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন রায়, ১৬ সাগর ধর লেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ, কিউরেটার—ঢাকা মিউজিয়াম, রমণা, ঢাকা। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল, ডি লিট, অধ্যাপক—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্‌. এ, ঠিকানা ঐ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ--শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৯ শ্যামানন্দ রোড, ভবানীপুর। প্রঃ - শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু, শিক্ষক, ৭ গোপাল বিশ্বাস লেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল চৌথরিয়া বি এ, ৪২ আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট্‌, শ্রীযুক্ত জহরলাল উদয়চাঁদের বাড়ী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, উপহৃত পুস্তক—১। বাঙ্গালীর বল। ২। চন্দ্রালোকে যাত্রা। শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর—৩। খাদ্য (৪র্থ সংস্করণ)। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত—৪। উপদেশরত্নমালা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাজপেয়ী—৫। রামেন্দ্র-সুন্দর-জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত এককড়ি দে—৬। স্বদেশী-শিল্প। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৭। সুপ্রভাত, ৮। লিপিকা, ৯। নারীর প্রাণ, ১০। গরীব, ১১। দাবীদাওয়া। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মণ্ডল—১২। ঝড়ের আলো। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার—১৩। আসলে মেকি। শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী—১৪। প্রাচীনা স্ত্রী-কবি। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ)। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—১৬। দিল্লী-অধিকার। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—১৭। মাণিক-জোড়। শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী—১৮। ম্যাটসিনি ও মানবের কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার মুস্তফী—১৯। অরসিকের রসোদ্ভব, ২০। পথের ডাক, ২১। স্বপ্নভঙ্গ, ২২। পরিত্যক্ত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২৩। জোড়-বিজোড়।

Le Editeur, *Librairie Ancienne Honorè* Champion. 1. Bulletin de la Societè de Linguistique de Paris, Nos. 74 & 75. The Officer-in-charge Bengal sectt. Book Depot. 2. Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal for the year 1922-23. 3. Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the year 1923. 4. Report on Public Instruction in Bengal for 1922-23. 5. Supplement to the Progress of Education in Bengal, 1917-18 to 1921-22. 6. Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, 7th July, 1924. 7. Index to the Proceedings, Vol. I, Nos. 2. 3. 4. 5. 6. The Secretary, Vivekananda Society. 8. Report of the Vivekananda Society for the year 1923. শ্রীযুক্তা বীণাপাণি বসু—9. The Law of Mortgage and other Securities upon property, Vol. I. 10. Do Vol. II. 11. A Digest of Law Cases containing C. P. and Nagpur Law

Reports (1862—1910). Vol. II. 12. The Law of Crimes. 13. Phatak's Digest (1862—1912). 14. A Treatise on the Law of Fraud and Mistake. 15. Estoppel by Representation and Res Judicata in British India. 16. Desai's Point Noted Index of cases (1811—1912). 17. A Treatise on International Law. 18. The Institutes of Justinian. 19. A Treatise on the Law and Practice relating to infants. 20. The Trial of Muluk Chand for the murder of his own child or A Romance of Criminal Administration in Bengal. 21. The Indian Limitation Act being Act IX of 1908. 22. A Selection of Legal Maxims. 23. A Treatise on the Principles of the Law of Evidence. 24. The Great Barada Trial. 25. The Civil Procedure Code being Act V of 1908. 26. A Selection of the leading Cases in Equity, Vol. I. 27. Do. Vol. II. 27. The Central Provinces Revenue Manual. 29. The Code of Criminal Procedure (Act V of 1898). 30. Table of Cases cited. 31. Lectures on Jurisprudence. 32. The New Civil Court Manual. Vol I. 33. Do. Vol II. 34. Do. Vol III. 35. Full Reports of Decisions of Indian cases, Vol XIII, 1912. 36. Do. Vol. XV. 1912. 37. Do. Vol XVI 1912. 38. Do. Vol XVII 1912. 39. Do. Vol. XVIII 1913. 40. Do. Vol. XIX 1913. 41. Do. Vol. XX 1913. 42. Do. Vol. XXI, 1914. 43. Do. Vol. XXII, 1914. 44. Do. Vol. XXIII, 1914. 45. Do. Vol. XXIV, 1914. 46. Do. Vol. XXV, 1914. 47. The Central Provinces Land Revenue Act, 1917. 48. The Co-operative Societies Act. (Act. II of 1912) 49. The Land Acquisition Act (Act I of 1894). 50. The Code of Criminal Procedure being Act V of 1898. The Secretary, Shiromani Gurdwara Parbandhak Commitee. 51. The struggle for Freedom of religious worship in Jaito. 52. Do. Do. The Director, Geological Survey of India. 53. Records of the Geological Survey of India, Vol LV. Part 4. 1924. 54. Geological Map of Behar and Orissa.

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩৩১, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ মহাশয়-লিখিত "জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ [হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন

পাঁচটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে—অধ্যাপন (ব্রহ্মযজ্ঞ), তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), হোম (দেবযজ্ঞ), বলি (ভূতযজ্ঞ) এবং অতিথি-পূজন (নৃযজ্ঞ)। জৈনগণ, হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ, প্রতিদিন ষট্‌কর্ম্মের—দেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায়, সংযম, তপস্যা ও দান অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে জৈনদের উক্ত ষট্‌কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে]। ৫। শোকপ্রকাশ—(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (খ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (গ) চারুচন্দ্র মিত্র এবং (ঘ) রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় গত ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। এই কার্য্য বিবরণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, কার্য্যবিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, "শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার (ত্রিংশ বার্ষিক) অধিবেশন স্থগিত থাকুক; এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার (ত্রিংশ বার্ষিক) অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া কোনই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না; বরং ইহা দ্বারা পরিষদের ক্ষতি হইবে; কাজেই এই অধিবেশন স্থগিত রাখা কোন মতেই সমীচীন নহে। এই অধিবেশনেই পরিষদের অবস্থা আলোচিত হইবার উপযুক্ত সময় ও স্থান। পরে সভাপতি মহাশয় এই উভয় প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যগণের ভোটে দিলেন ইত্যাদি।" কিন্তু এই দিন অধিবেশনের কার্য্যাদি (Proceedings) ঐরূপ হয় নাই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কোন নূতন প্রস্তাব করেন নাই, তিনি মাত্র আমার (জ্যোতিষ বাবুর) প্রস্তাবই সংশোধন (amendment) করিতে চাহিয়াছিলেন। আর একই সময় দুইটি প্রস্তাব কি করিয়া ভোটে দেওয়া যাইতে পারে? কোন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় তখন, যখন ঠিক একই প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই মত হয়—একটি স্বপক্ষে, অপরটি বিপক্ষে। এখানেও তদ্রূপ—"অধিবেশন স্থগিত থাকুক" এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে এক মত, আবার ইহারই বিরুদ্ধে এক মত। কাজেই শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু কোন নূতন প্রস্তাব করেন নাই; এ বিষয়ে আমার আপত্তি রহিল;—কার্য্যবিবরণের অন্যান্য অংশ গৃহীত হইতে পারে।

এই আপত্তির উত্তরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু দাঁড়াইয়া যে এই নূতন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; এ বিষয়ে তাঁহার (সম্পাদক মহাশয়ের) স্মৃতির কোনরূপ অপলাপ হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, এই কার্য্য-বিবরণ যে খসড়া হইতে লিখিত হইয়াছে, সেই খসড়া সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত। কাজেই

এ বিষয়ে কি করিয়া সন্দেহ থাকিতে পারে, বুঝিলাম না। তৎপরে সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত সেই খসড়া সভাস্থলে আনাইয়া অদ্যকার সভাপতি মহাশয়কে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়কে দেখাইলেন। শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, বিষয় ত একই; তবে ভাষার (technicalities) তফাৎ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু amendment করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু ঐ খসড়া নিজে হাতে নিয়া দেখিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার সেই আপত্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, "শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে..............." এইরূপ ভাবে কার্য্যবিবরণ লিখিত হইলে উহা গ্রহণে আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি?

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, এইরূপ "সংশোধক প্রস্তাব" লিখিত হইলে উক্ত কার্য্যবিবরণ গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নাই।

পরে কার্য্যবিবরণে "সংশোধক প্রস্তাব" লিখিত হইলে পর উক্ত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল। তৎপরে বিশেষ ও মাসিক কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। "ক"—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত "খ"—পরিশিষ্টে উল্লিখিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি এ মহাশয় তাঁহার "জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, "প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আজ অনেক নূতন বিষয় আমাদিগকে শুনাইলেন। জৈন-ধর্ম্মের আলোচনা আমাদের দেশে অল্প দিন যাবৎ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। জৈনদিগের দৈনিক কর্ত্তব্য বিষয় প্রবন্ধে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক হয়, অবশ্য এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নাই, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও প্রশংসার বিষয়। প্রবন্ধকার মহাশয় অন্যধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যেরূপ পরিশ্রম করিয়া জৈন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া গবেষণার সহিত এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত মহাত্মগণ পরলোক গমন করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—তিনি সুকবি ছিলেন।

(খ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

(গ) চারুচন্দ্র মিত্র।

(ঘ) রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের শোক প্রকাশ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরলোকগতা সুকবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়া সম্বন্ধে বলিলেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; তাহার প্রমাণ এই যে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর দিন যখন তাঁহার মৃত দেহ কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে গঙ্গাজলে ধৌত করা হইতেছিল, তখন তিনি দূর হইতে তাঁহাকে (সুকবিকে) একখানি গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট গেলেন। তিনি তাঁহাকে স্যর আশুতোষের মৃত দেহ দেখাইবার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষবাবু বলিলেন যে, অত্যন্ত লোকের ভিড়, এত জনতার ভিতর দিয়া আপনাকে তাঁহার মৃত দেহ দেখান অত্যন্ত কঠিন। আর আপনি এরূপ প্রবীণা হইয়াও তাঁহার মৃত দেহ দেখিতে এত উদ্বিগ্না কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, "আমি তাঁহার মৃত দেহ দেখিতে কেন যে এত উদ্বিগ্ন, তাহা আর কি বলিব! তিনি ভগবত্তুল্য লোক ছিলেন, আর বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য, বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় এম্ এ উপাধির সৃষ্টি করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ যে কি ভাবে খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, এই সভার অধিবেশনের নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইবার পর ভূপেন্দ্র বাবু পরলোক গমন করেন। সে জন্য অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের ভিতর উহার নাম দেওয়া হয় নাই। ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার বিষয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হইবে এবং সমিতির নির্দ্দেশ মত কার্য্য করা হইবে।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয়কে আমরা পরিষদের মধ্যে পাইবার জন্য অনেক দিন যাবৎই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। অদ্য আমরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পরিষদে পঠিত হইবার জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ও বক্তৃতা দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সভাপতি।

ক-পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্য ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, সহকারী সম্পাদক—বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ সমিতি, ১২৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২১ রতন বাবুর ঘাট রোড, কাশীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬এ রতন নিয়োগী লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাগচি, ৬৮।২ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ২৩ মোহনবাগান রো। মহম্মদ হিদায়েদ হোসেন, ৭।১ রামশঙ্কর রায়ের লেন। শ্রীযুক্ত যতীশগোবিন্দ সেন পি এইচ্ ডি (লণ্ডন), প্যালেস হোটেল, ১৩৪বি, বৈঠকখানা রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, পি এচ্ ডি, অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭৫।১ হ্যারিসন রোড। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্লট নং ৪, কালীঘাট। শ্রীযুক্ত মোহিত-মোহন ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, সঃ—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রনাথ বসু জমিদার, সৈদপুর, টাকী, ২৪ পরগণা। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, ৩ করিস চার্চ্চ লেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, Goods charitable Dispens·ry. রুদ্রপুর, ২৪ পঃ। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বসু, ৩ প্রিয় মল্লিক রোড। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ঘোষ, ১৩ জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড। শ্রীযুক্ত হরিহর দাস চৌধুরী, রাসবাটী, ৯১ চিংরীহাটা রোড্। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস চৌধুরী, ঠিকানা ঐ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ৪৩ পদ্মপুকুর রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সিংহ, হেড্ ক্লার্ক, সেক্রেটারীর আফিস, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ৩।৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০২ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস, চিত্রকর, ঠিকানা—ঐ। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিকানা—ঐ। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা—ঐ। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সিংহ, ঠিকানা ঐ। শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু সরস্বতী, Vice Principal India School of Accountancy, Associate Editor, Success-Post Box-2020, Calcutta. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার এবং কণ্ট্রাক্টর, ১০২ আহিরী-টোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০১ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬ নিবেদিতা লেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঘোষ, ৪ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় গলি, গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ, ৩ বীরচাঁদ গোস্বামীর গলি। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বসু এম এস সি

৩ নীলমণি সরকার লেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, Rali's section, E. B. Ry. কয়লাঘাট। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বসু, মোক্তার, হাওড়া কোর্ট, ৩ নীলমণি সরকারের লেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ৮৫ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ৬৭ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, ৭০।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি টি, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, শিলং। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আই এস ও, রায় সাহেব, ২এ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর।

খ-পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্য (টিলক), ২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্য), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, ৪। নিবেদিতা, ৫। গীতি-কুসুমাঞ্জলি, ৬। ইঙ্গিতকুসুমাঞ্জলি, ৭। উক্তি-কুসুমাঞ্জলি, ৮। আকাশ-বাণী, ৯। গার্হস্থ্য চিকিৎসা, ১০। কারাকাহিনী, ১১। সেতুবন্ধ যাত্রা, ১২। সিদ্ধজীবনী। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়—১৩। পাখী। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার,—১৪। নসিরুদ্দিন, ১৫। জ্যোতিষপ্রসঙ্গ বা আকাশরহস্য। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা,—১৬। বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি,—১৭। বোলশেভিকবাদ। শ্রীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, ১৮। বৈষ্ণবদর্শনে জীবতত্ত্ব, ১৯। ঐ।

The Chief Inspector of Explosives in India. 1. Twenty fifth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1924. The Supdt. Govt. Printing, India,—2. Memoirs of the Archæological Survey of India. No. 18. (Hindu Astronomy) শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার—3. The Lure of the Cross. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—4. Talk of the Town 5. Outlines of the Hindu Metaphysics. 6. Sri Krishna : The Saviour of Humanity. 7. Haridasi. 8. My Confession. 9. Siva and Buddha. 10. Sadhu and other lives. 11. English Seamen. The officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-depot.—12. Resolution Reviewing the Reports on the working of Municipalities in Bengal during the year 1922-23. শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সান্যাল—13. Vegetable Drugs of India.

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের "অর্থশাস্ত্রে সমাজ-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ (ইহা শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবুর লিখিত মৌর্য্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের পঞ্চমাংশ।) ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) ষোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ও (খ) চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেন মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলি উপস্থিত করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, ৯০৩ খানি ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক এবং ২০ খানি প্রাচীন পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে ৭২০ খানি (ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্র), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি মহাশয়ের নিকট ৪৫ খানি, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহাশয়ের নিকট ৫১ খানি, আর্য্য পাবলিশিং হাউস হইতে ২১ খানি এবং অবশিষ্ট অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল দানের জন্য প্রদাতৃগণ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে।

৪। প্রস্তুত না থাকায় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "অর্থ-শাস্ত্রে সমাজ-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, লেখক মহাশয় ঐ কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এ দেশের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার চিত্র দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ববিশারদ মহাশয় বলিলেন, এক শ্রেণীর লোকে প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে বিশ্বাস করেন না, এই জন্য তাহার আলোচনাও হয় না। তাহা ঠিক নহে। অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যে ঐ যুগের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের বিষয়। পুরাকালেও ইতিহাসের আলোচনা হইত। কেবল যে রাজা ও রাজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইত, তাহা নহে— নানা শাস্ত্রের, দর্শন বিজ্ঞানেরও আলোচনা হইত। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার দ্বারা যাহাতে আর্য্যগণের গৌরব প্রকাশ পায়, তাহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রের প্রতি পক্ষের হ্রাস বৃদ্ধির মূলে যে পৌরাণিক ইতিহাস রহিয়াছে, বক্তা মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে তাহা বিবৃত করিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার বিশেষ স্নেহ-ভাজন—তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ও সহকর্ম্মী ছিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইবে)।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই বিষয়ে লেখক মহাশয়ের চারিটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরও হইবে। পরিষৎ তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ পাইবার আশা করেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, [ক] চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন ও [খ] ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতা যোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৺গৌরহরি বাবুর চেষ্টাতেই চৈতন্য লাইব্রেরী কলিকাতায় অন্যতম প্রধান লাইব্রেরীরূপে আজ বিরাজ করিতেছে। সরকারী লাইব্রেরী ছাড়া এই লাইব্রেরীকে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী বলা যাইতে পারে। ৺যোড়শী বাবু মোটর গাড়ীতে আঘাত লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি পরিষদের একজন অতি পুরাতন সদস্য ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

অতঃপর এই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় Mc, L gan Engineering College, লাহোর ? প্রঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিন্ধুকুমার সরকার, ৭৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হেলথ অফিস, Dis No. 1. প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সেন আই সি এস্, সাবডিবিশনাল অফিসার, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত, ১৪১বি কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, সিনেট হাউস, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি, ৪১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী, "সেরপুর হাউস", টাঁকাটুলী, পোঃ উয়ারী, ঢাকা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন, সঃ--ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কর এম্ এ, সিটি কলেজ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, ১৫ কলেজ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ চৌধুরী এম্ এ, ৪২ নীলখেত রোড, রমণা, ঢাকা; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী বি এ, বি এস্ সি, জমিদার, সহর সেরপুর, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরী, ঠিকানা ঐ।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উপহৃত পুস্তক—১। ভারতোচ্ছ্বাস (পঞ্চম জর্জ্জের সাম্রাজ্যাভিষেক), ২। ঐ (সপ্তম এডওয়াডের স্বর্গারোহণ), ৩। ঐ, ঐ। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু,—৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (হিন্দী), ৫। শ্রীকৃষ্ণলীলা, ৬। দোঁহাবলী, ৭। বাঙ্গালার প্রতাপ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত— ৮। ভারতেশ্বরী ও ভারত-সম্রাট, ৯। সচিত্র প্রেমপত্রাবলী, ১০। সনাতন ধর্ম্ম-সঙ্গীত, ১১। আনন্দোচ্ছ্বাস-সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়,—১২। ইলেকট্রিক পাখা, ১৩। ইলেক্‌ট্রিক্ মেসিন প্রভৃতির দোষ ও প্রতিকার। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪। ব্যতিক্রম। ১৫। অসীম। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত—১৬। ভারত-ললনা। শ্রীযুক্ত রায় নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত বাহাদুর—১৭। ভারত-রাষ্ট্রনীতি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,—

১৮। ভাস্করানন্দ-চরিত। শ্রীযুক্ত ইন্দীবরকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ—১৯। শ্রীরাধা-পরিদেবনম্। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২০। গো-জীবন। শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়—২১। অন্তিমে "মা"। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী—২২। মহাভারত-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু—২৩। ভাদুরে, ২৪। মালসা-ভোগ, ২৫। সখের সয়তানী। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ—২৬। যোগশাস্ত্র। শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ—২৭। ছন্নছাড়া, ২৮। সুহাস, ২৯। মণ্টুর মা। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম ভাগবতভূষণ—৩০। উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, ৩১। ঐ ১১শ বর্ষ, ৩২। ঐ ১২শ বর্ষ, ৩৩। ঐ ১৩শ বর্ষ, ৩৪। ঐ ১৪শ বর্ষ, ৩৫। ঐ ১৫শ বর্ষ, ৩৬। ঐ ১৬শ বর্ষ, ৩৭। ঐ ১৭শ বর্ষ, ৩৮-৩৯। পন্থা (১২শ ও ১৩শ বর্ষ), ৪০। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং। ৪১। ললিতমাধবনাটকং। ৪২। বিদগ্ধমাধবনাটকং। ৪৩। অলঙ্কার-কৌস্তুভঃ। ৪৪। প্রেমবিলাস, ৪৫। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী। ৪৬। সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতং, ৪৭। দানকেলিকৌমুদী, ৪৮। মানবের আদি জন্মভূমি (৩য় ভাগ)। ৪৯। শ্রীমদ্ভাগবত (অনুবাদ), ৫০-৫১। ঐ (১ম ও ২য় খণ্ড) (মূল), ৫২। সচিত্র রাজস্থান, ৫৩। রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী, ৫৪। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, ৫৫। শ্রীকৃষ্ণমাধুরী, ৫৬। মধুর মিলন, ৫৭। সাধন-সংগ্রহ, ৫৮। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, ৫৯। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (পূর্ব্বভাগ), ৬০। ঐ (উত্তরভাগ), ৬১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থ, ৬২। ললিত মাধব, ৬৩। বিদগ্ধ মাধব, ৬৪। দৃঢ় রসিক অনন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম, ৬৫। বরদার প্রার্থনা, ৬৬। সহজ ব্রহ্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-লহরী, ৬৭। গীতি-পুষ্পহার, ৬৮। শ্রীগৌরার্চ্চন প্রয়োগঃ, ৬৯। মহাযজ্ঞ, ৭০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং, ৭১। পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন, ৭২। অন্ধের চক্ষুঃদান। ৭৩। স্রক্, ৭৪। বীণা, ৭৫। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, ৭৬। প্রেমের ডালি, ৭৭। ভক্তজীবন, ৭৮। শ্রীনামরত্ন-চিন্তামণি, ৭৯। সদুক্তি-সংগ্রহ, ৮০। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র, ৮১। হারা'ণ গীতাবলী, ৮২। গুরুদক্ষিণা। সম্পাদক, বঙ্গ-বিহার অহিংসা-ধর্ম্ম-পরিষৎ—৮৩। জৈন ত্রিরত্ন (২ খানি), ৮৪। জৈন পদ্মপুরাণ। সম্পাদক, গুজরাট পুরাতত্ত্ব মন্দির ৮৫। সম্মতিতর্কপ্রকরণং। রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী—৮৬। রচনা-সংগ্রহ (Intermediate Bengali Selection)। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর রায়—৮৭। শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দতত্ত্বামৃত। সম্পাদক, কাশীধাম ব্রাহ্মণ-সভা—৮৮। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ। আর্য্য পাব্লিশিং হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ—৮৯। ইরাণী উপকথা, ৯০। দ্বীপান্তরের কথা, ৯১। উড়ো চিঠি, ৯২। কারা-জীবনী, ৯৩। নিগৃহীতা, ৯৪। গল্পের আরম্ভ, ৯৫। সাহিত্যিকা, ৯৬। ধর্ম্ম, ৯৭। বাঙালীর ব্যবসাদারী। ৯৮। মায়ের কথা, ৯৯। পণ্ডিচারীর পত্র। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ১০০। খাদ্য-কথা, ১০১। ষড় অবতার। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়, ১০২। নানা কথা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানমণ্ডলের সম্পাদক, কাশী ১০৩। অন্তারাষ্ট্রীয় বিধান, (হিন্দী)। বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট—১০৪। কৃপণের কর্ণমর্দ্দন, ১০৫। মৃতের পুনর্জীবন, ১০৬। তস্কর-তনয়া, ১০৭। বিলাতী বণিকের কীর্ত্তি, ১০৮। ফিরিঙ্গীর

প্রতিহিংসা, ১০৯। অপূর্ব্ব সহযোগ, ১১০। রাজকীয় গুপ্তকথা, ১১১। লেডী ডাক্তারের লেড়কা। ১১২। প্রসাদ, ১১৩। অঞ্জলি, ১১৪। মনীষা, ১১৫। মলয়া, ১১৬। তারা ও রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, ১১৭। অবসর-সঙ্গিনী, ১১৮। উপেক্ষিতা, ১১৯। কারবার, ১২০। সরল কৃষিবিজ্ঞান, ১২১। শ্রীভগবৎকথা, ১২২। শ্রীব্রহ্মানন্দ বচন, ১২৩। বেঙ্গল পুলিশ কার্য্যবিধি, ১২৪। আইন ও আদালত, ১২৫। প্রস্তাবিত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের সরল মর্ম্মানুবাদ, ১২৬। শৈতানী লীলা (হিন্দী), ১২৭। নমাজ শিক্ষা, ১২৮। ফকবাষ পুথি, ১২৯। অসমীয়া ধন্বন্তরী নিদান বা বৃহৎ বৈদ্যসার, ১৩০। পৌরাণিক কথা, ১৩১। উড়ো জাহাজ, ১৩২। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ, ১৩৩। গীতা, ১৩৪। সর্ব্বসৎকর্ম্মপদ্ধতি, ১৩৫। যখের আমল, ১৩৬। বিশ্বাসঘাতক, ১৩৭। তস্কর ও ডাকাত, ১৩৮। ঘরের ঢেঁকি, ১৩৯। বিভীষিকা, ১৪০। শয়তান, ১৪১। পাপনিধি, ১৪২। ঠাকুরদাদার গল্পের ঝুলি, ১৪৩। প্রাথমিক শিক্ষা সহচর (হিন্দী), ১৪৪। শ্লোক-মালা, ১৪৫। মহাবিদ্যা স্তোত্রম্, ১৪৬। পাবলিক ভ্যাক্সিনেটার্স গাইড, ১৪৭। ভিষক্‌সহচর, ১৪৮। ভৈষজ্যসার, ১৪৯। শ্রীমদ্ভাগবত (পদ্য), ১৫০। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ১৫১। গোলে হররোজ, ১৫২। সুন্দরী বেলওয়া মানিকের কেচ্ছা, ১৫৩। ছহি আহকাম-চ্ছালাত, ১৫৪। চাহার দরবেশ, ১৫৫। লায়লি মজনু, ১৫৬। নুরেনেহার সাহাজাদি, ১৫৭। তুতিনামার পুথি, ১৫৮। ধর্ম্ম মিহির, ১৫৯। ছেরাজোল হক (২য় খণ্ড), ১৬০। গাজিকালু ও চম্পাবতি, ১৬১। চোরহানোল বা মজাহার মীমাংসা, ১৬২। আদি পুস্তক, (Holy Bible), ১৬৩। পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম (ঐ), ১৬৪। বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, ১৬৫। চৈতন্যলীলা নাটক, ১৬৬। যুগল মিলন, ১৬৭। নিমাই সন্ন্যাস, ১৬৮। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ১৬৯। যোগিনীতন্ত্রম্, ১৭০। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, ১৭১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১মাংশ, ১৭২। কার্পাস আবাদ, ১৭৩। গানওয়ালী, ১৭৪। বালচিকিৎসা, ১৭৫। জ্বরচিকিৎসা, ১৭৬। শিক্ষাপ্রচার, ১৭৭। songs of Service (তিব্বতীয়), ১৭৮। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্রিকা, ২য় ভাগ, ৫—১২ সংখ্যা, ৩য় ভাগ, ১।২ সংখ্যা, ১৭৯। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০। স্বাস্থ্য-সমাচার, ১ম বর্ষ, ১—৮, ১১—১২ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১, ২, ৩, ৯, ১০ম সংখ্যা, ১৮১। সাহিত্য-সংবাদ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮২। শাশ্বতী, ১ম খণ্ড, ১ম, ২য় সংখ্যা, ১৮৩। গল্পলহরী, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ, ৫-৬, ৭-৮, ৯-১০, ১১-১২ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ৬ষ্ঠ সম্পূর্ণ, ৭ম বর্ষ, ১—৮ম সংখ্যা, ১৮৪। গৃহস্থ, ৪র্থ বর্ষ, ৮, ৯, ১০ম সংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ১—১০ম সংখ্যা, ১৮৫। সম্মিলনী, ১১শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১২শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৩শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৪শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৮৬। সম্মিলন, ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৮৭। শিক্ষা-সমবায়, ২য় বর্ষ, ১-৩ সংখ্যা, ১৮৮। সৌরভ, ১ম বর্ষ, ৫—১০ সংখ্যা, ১৮৯। সমাজ-চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯০। সন্দেশ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য়, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯১। সুপ্রভাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৯২। হিন্দুপত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ১, ২, ৩ সংখ্যা, ১৯৩। স্বাস্থ্য, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,

১৯৪। সরণী, ১ম বর্ষ, ১—১১ সংখ্যা, ১৯৫। সোপান, ৪র্থ ভাগ, ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, ১১ ও ১২ সংখ্যা, ১৯৬। পল্লীবাণী, ২য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ৩য় বর্ষ, ১ম-৪র্থ, ৬ষ্ঠ-১১শ সংখ্যা, ৪র্থ সম্পূর্ণ, ৫ম বর্ষ, ১—৪ সংখ্যা, ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৯৭। যোগবল, ২য় বর্ষ, ৩য়-৪র্থ, ৫-৬ষ্ঠ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৯৮। যুবক, ১৭শ ভাগ, ১ম, ২য়, ১৯৯। যমুনা, ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ২০০॥ যোগীসখা, ১৬শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৭শ বর্ষ, ৬—১২ সংখ্যা, ১৮শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০১। তিলিসমাচার, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০২। দীপালি, ১ম বর্ষ, ১, ২, ৩, ৪, ৭ সং, ২০৩। ধ্রুবতারা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০৪। বাহী, ৪র্থ বছর, ৭, ৮, ৯ সংখ্যা, ৮ম বছর, ১—৯ সংখ্যা, ২০৫। বঙ্গদর্শন, ১৩শ বর্ষ, ২য় ৩য় সংখ্যা, ২০৬। বিজুলী, ২য় ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ২০৭। তিলিবান্ধব, ২য় বর্ষ, ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ২০৮। তোষিণী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ২০৯। তারা, ৫ম বর্ষ, ২য় ৩য় সংখ্যা, ৪—১২শ সংখ্যা, ২১০। বৈশ্যপত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ২১১। ব্যবসায়ী, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২১২। বিকাশ, ১ম বর্ষ, ৩য়—৫ম সংখ্যা, ২১৩। বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ২১৪। বৈষ্ণবসমাজ, ৩য় ভাগ, ১ম ২য়, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ, ২য় ৩য়, ২১৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯ সংখ্যা, ২১৬। বাণী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২১৭। ভারতমহিলা, ৮ম ভাগ, ১০ম, ১১শ সংখ্যা, ৯ম ভাগ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ২১৮। আয়ুর্ব্বেদবিকাশ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ২১৯। আয়ুর্ব্বেদপত্রিকা, ১ম ভাগ, ৯ম ১০ম সংখ্যা, ২২০। আয়ুর্ব্বেদহিতৈষী, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২১। অঞ্জলি, ১ম বর্ষ, ১—৬, ১০ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা, ২২২। অবসর, ৯ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা, ২২৩। আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম ২য় ৩য় সংখ্যা, ২২৪। কায়স্থসমাজ ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ১-৬ সংখ্যা, ২য় ভাগ, ১—৬ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১-৭ সংখ্যা, ১১শ, ১২, ৩য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৫। কুশদহ, ৫ম বর্ষ, ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, নবপর্য্যায়, ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৬। চিকিৎসাদর্পণ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা, ২২৭। কৃষিসম্পদ্, ৩য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৮। কাজের লোক, ১১শ সম্পূর্ণ, ১২শ সম্পূর্ণ, ১৩শ সম্পূর্ণ, ১৪শ ১ম—৮ম, ১১শ—১২শ সংখ্যা, ১৫শ সম্পূর্ণ, ১৬শ সম্পূর্ণ, ১৭শ ১ম—৫ম সংখ্যা, ২২৯। হাকিম, ১ম বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩০। রৌদ্রপালপ্রবোধিনী, ১ম সংখ্যা, ২৩১। উপাসনা, ৯ম বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, ২৩২। নববাণী, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ২৩৩। নাট্য পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২৩৪। প্রতিভা, ২য় বর্ষ, ১১ ১২শ সংখ্যা. ২৩৫। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৩৬। প্রভাত, ১ম ভাগ, ১ম ২য় সংখ্যা, ২৩৭। শ্রীজৈনসিদ্ধান্তভাস্কর, ১ম ভাগ, ১ম কিরণ, ২৩৮। প্রবাসী, ১৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ২৩৮। ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ১ম. ২য় সংখ্যা, ২৩৯। ভারতী, ৩৭শ বর্ষ, ৩য় ৪র্থ সংখ্যা, ২৪০। ইস্‌লাম আভা, ১ম বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ২৪১। মহাজনবন্ধু, ১৩শ বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা।

The Secretary, Smithsonian Institution—1. Exploration and Field-work of the Smithsonian Institution in 1923. 2. Additional Designs on Prehistoric Mimbers Pottery. 3. The Brightness of Lunar Eclipses 1860-1922. 4. Opinions rendered by the International commission on Zoological Nomenclature. 5, Cambrian and Ozarkian and Brachiopoda, Ozarkian Copholopodia and Notostraca. 6. Geological Formations of Beaverfoot-Brisco-standford Range, British Columbia, Canada. Sj. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বসু 7. Left her home; 8. The Intellectual Life; 9. A Book of Remarkable criminals; 10. Sacrifice and other plays. 11. Bengal Fairy Tales; 12 Hungry Stones. 13. The Wreck, 14. Life and Work of Romesh Chandra Dutt. C. I. E, 15. Studies in Early Indian thought. 16. The Soul of Germany. 17. William of Germany 18. Indian Nation Builders, part I. 19. Do, part II. 20. Do, part III. 21. The Masterpiece Library of short stories, Vol. XIV (American) 22. The Life of Swami Vivekananda, Vol. I. 23. Do, Vol. II. 25. Do. Vol. III, 25. Do, Vol. IV. 26. Inspired Talks. 27. The Treasure of the Humble. 28. Bulls: Ancient and Modern, 29. Mashi and other Stories. 30. The Conduct of Life and Society and solitude 31. Macaulay's History of England (Chapter I.) 32 Macaulay's Essays on Addison 33. The Heroes. 34. De Quincey's Revolt of the Tortars and the English Mail-coach. 35 A short History of the great war. 36. Visions and Judgments.37. The warden. 38. Letters of William Cowper. The Life of William Ewart Gladstone 39. A Book of Golden Deeds. 40. The Speeches and Table-talk of the Prophet Mahammad. 41. The Golden Sayings of Epictetus. 42. Thoughts are Things. 43. Jack's Reference Book for Home & Office. 44. Institutes of Musalman Law. 45. The Code of Criminal Procedure being Act, 1882. 45. Digest of cases; 47. The Unrepealed Acts of the Governor General in Council from 1883 to 1898 48. Indian Penal Code (Act. XLV of 1860). 49. The Indian Evidence Act. 1872 and Indian oaths Acts, 1873. 50. Calcutta University Calender. 1910. 51. Full notes on Dicken's Tale of two cities. 52. Code Civil Procedure, 1908. The officer-in-charge, Bengal Sectt., Book Depot. 53. Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1923. 54 Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the

year, 1923. 55. Council Proceedings of the Bengal Legislative Council sixteenth session, 1924, Vol. XV1. The Supdt. Naval Observatory. Washington D. C. 56. The American Ephemeries and Nautical Almanac for the year 1926, The Manager, Central Publication Branch, Govt. of India, 57. Indian Education in 1922-23 58, Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year, 1922-23. শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—59. The Economy of Human Life. The Supdt. Govt. Printing, Rangoon, Burma 60. Report of the Superintendent Archæological Survey, Burma for the year ending 31st. March 1924. The Director of Industries, Bengal. 61. Improvement on the Manufacture of shellac (গালা প্রস্তুত পদ্ধতির উন্নতি সাধন) The Manager, Arya Publishing House. 52. Twelve years of Prison Life ; 63. The Coming Race. 64. Baji Probhu. 65. A system of National Education 66. Evolution. 67. The Superman ; 68. Thoughts and Glipmses. 69. Yogic Sadhan. 69, Songs to Myrtilla 79. Speeches of Sri Aurobindo :Ghosh. কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—71 Pet Birds of Bengal Vol, I. The Manager, Oxford University Press 72 Catalogue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India Office. 73. Catalogue of the Oriya Manuscripts in the library of the India office The Supdt. Govt Printing, India. 74. Memors of the Archæological Survey of India, No 16. (The Temple of Siva at Bhumara) 76. Memoirs of the Archæological Survey of India. No. 17 (Pallava Architecture) The Supdt Govt. Press, Madras. 76. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts, in the Govt. Oriental Mess Library Madras, Vol. XXV. Suplemental. The Hony. Secretary, Watson Museum of Antiquities, Rajkot. 77. Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, 1923-24. The Asst. Secy. to the Govt of India, Deptt. of Education and Health (Books Distribution)—78. Proceedings of meetings of the Indian Historical Records Commission, Vol. Vl, Madras, 1924. The Director, Geological Survey of India—79. Records of the Geological Survey of India, Vol LVI. Part 2, 1924. The Librarian, Bengal Library Govt. of Bengal.—80. Records of the Indian Museum. 39 Copies. 81. Memoirs of the Indian Museum, Vol. VII. No. 4. 82. Memoirs of the Indian

Meteorological Deptt. Vol XXIV. Part III. 83. Transactions of the Mining and Geological Institute of India, 6 copies 84. Journal of the Photography Society of India, 26 Copies. 84. The Presidency College Magazine, 17 Copies. 36. The Hindu School Magazine, 20 Copies. 87. The Hare School Magazine, 19 Copies. 88. The Hooghly College Magazine, 9 Copies. 89. The Modern Review, 2 Copies 90 East and West; July, Augt., Sept., Oct. 1920; 4 Copies. 91. The Calcutta Review, No 291 Jan. 1918, 92 Indo-Portuguese Review, Vol. V 1922-23 93. The Dawn Vol. XVI. No. 4 & 5 94. The Dacca Review, 5 copies. 95. The Dacca Collegiate School Magazine, 3 Copies. 99. Patna College Magazine, 7Copies 97 Edward College Magazine, 2 Copies. 98. Rajshahi College Magazine, 4 Copies. 99. Pirojpur Govt. H. E. School Magazine, 10 Copies 100, Ripon College Magazine, 13 Copies. 101. Krishnagore College Magazine, 14 Copies. 102. Krishnagore Collegiate School Magazine, 17 Copies. 103 Bangabasi College Magazine, 13 Copies. 104. Welfare, Vol I Nos. 1,2 105. Bethune College Magazine, Vol. I. No. 7. 106. Bengal Agricultural Journal, Vol. II. No. 3. 107. The College Magazine (Chittagong) 3 Copies. 108. Cooch Behar College Magazine, 2 Copies 109. Carmichæl College Magazine, 5 Copies. 110. Scottish Churches College Magazine, 11 Copies. 111. St. Paul's College Magazine, 10 Copies. 112. Midnapur College Magazine, 10 Copies. 113. Metropolitan Institute Magazine, 3 Copies 114 Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol VII, Part III & IV. No. 115 Echoes. 116. Denizens of the Jungles

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।

২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৫॥• টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

সভাপতি মহাশয় এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে পরলোকগত পণ্ডিতরাজের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ মহাশয়কে 'ভারতবর্ষ' কার্য্যালয়ে প্রথম দর্শন করি। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে আমার সামান্য পরিচয় দেওয়ামাত্র তিনি একেবারে প্রসন্ন-হাস্যে আমাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। তাঁহার বিপুল সহৃদয়তা, অপূর্ব্ব সরলতা ও মহান্ উদার হৃদয়ের সেই জীবন্ত চিত্রটি আজিও ভুলিতে পারি নাই। এক হিসাবে পণ্ডিতরাজ সে কালের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেও বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ অনুকূলতা প্রকাশ করিতেন। মাইকেল মধুসূদনের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং মধুসূদনের আদর্শে তিনি "দ্রৌপদী" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। মধুসূদনের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, তিনি মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন, "মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্মের আবরণে একজন পূর্ণ হিন্দু ছিলেন।" ইহাতে মধুসূদনের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ পায়। বর্ত্তমান সাহিত্যে সঞ্জীবন-রসের অভাব, প্রাণহীনতা ও নির্জ্জীবতার বিষয় তিনি ১৩২০ সালে কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐ অভিভাষণে তিনি মধুসূদনের ভাষা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"একদিন উত্তর-গোগৃহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিলেন; প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধজয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল; একদিন মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপূরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চ-জন্য শঙ্খ প্রলয়-পয়োনিধির ঘোরগর্জ্জনে দিগ্বিজয়ী মহারথদিগকে পর্য্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদখিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সে গম্ভীর গর্জ্জন কি আর কবির মুখে শুনিব না? চিরদিনই কি বীণার নিক্বণ, বেণুধ্বনি ও নূপুর-শিঞ্জিত শুনিব? বাঙ্গালীর শক্তি নাই, বলিতে পারি না। সে দিনও মেঘনাদবধে বাঙ্গালীর মেঘমন্দ্র গভীর ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন এই জন্য দুঃখ হয়।" তিনি কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। সকল সাহিত্যিককেই উৎসাহিত করিতেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় "পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিম্নে প্রবন্ধের সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল,—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের তিরোভাবে উত্তরবঙ্গের ও সমগ্র দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের একটী উজ্জ্বল রত্নের লোপ হইয়াছে। তিনি রঙ্গপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামে পূর্ব্বে বহু পণ্ডিতের আবাস ছিল এবং অসংখ্য টোল ছিল। বঙ্গবিশ্রুত পণ্ডিত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। কৈশোরে তিনি বারাণসীধামে শিক্ষার জন্য

গমন করেন। তথায় ৺কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদান্ত ও যোগদর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া কুইন্স কলেজের প্রধানাধ্যাপক গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব তাঁহাকে উক্ত কলেজে আহ্বান করেন। সে সময়ে উক্ত কলেজে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাঃ ভিনিস্‌ও পাঠ করিতেন। বারাণসী হইতে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি রঙ্গপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও পরে ঐ বিদ্যালয় রঙ্গপুর কলেজে পরিণত হইলে তথায় অধ্যাপনা করেন। নানা কারণে, বিশেষতঃ স্থানটী অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় কলেজটী উঠিয়া যায়। তখন নানা স্থান হইতে অধ্যাপকতা করিবার জন্য আহূত হইলেও তিনি দেশে থাকিয়া রঙ্গপুরকে নানা শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র করিবার জন্যই রঙ্গপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। দেশীয় জমিদারগণ ও কর্ত্তৃপক্ষগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর চতুষ্পাঠীতে (পাকা টোলে) দেশবিদেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী সমবেত হইত। তাঁহার একটী বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যে কোন শাস্ত্র অধ্যাপনায় তুল্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনাপূর্ব্বক সমালোচনা করিতে, স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে ও ভাগবত ব্যাখ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাকিনাধিপতি রাজা শম্ভুচন্দ্র এক সময় বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে তাঁহার রাজধানীতে নবরত্নের সমাবেশ করেন। পণ্ডিতরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, 'হেমোদ্বাহকাব্য' ও 'বিজয়িনী কাব্য'-প্রণেতা শ্রীশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উক্ত নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। স্যর জর্জ্জ গ্রিয়াস্‌র্ন উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর, গ্রিয়াস্‌র্ন সাহেবের Linquistic Survey of India রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। উক্ত নবরত্নের অন্যতম রত্ন তারাশঙ্করের বংশধর হরশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ" পত্রিকা রাজা শম্ভুচন্দ্রের পরিচালনে কাকিনা হইতে যখন "রঙ্গপুর-দিক্‌-প্রকাশ" নামে প্রকাশিত হয়, তখন পণ্ডিতরাজ এই পত্রিকায় এবং রাজসাহী হইতে প্রকাশিত "হিন্দু-রঞ্জিকা"য় বহু সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। কাশীতে শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁহার অধ্যাপক ৺কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট তিনি "তর্করত্ন", নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজের নিকট "পণ্ডিতরাজ", বারাণসীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট "কবিসম্রাট্‌" এবং ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের নিকট "পণ্ডিতকেশরী" উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে 'শ্রীকণ্ঠ,' শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'বিদ্যারত্ন,' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে 'পঞ্চানন', মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়কে 'তত্ত্বসরস্বতী,' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে 'বিদ্যাভূষণ' এবং স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 'সরস্বতী' উপাধি দান করিয়া বিশেষ প্রীতি বোধ করিয়াছিলেন।

তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পণ্ডিতা রমা-

বাঙ্গী ইঁহার সহিত কবিতায় কথোপকথন ও সমস্যাপূরণ করিয়া ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। "মিত্রগোষ্ঠী," "বিদ্যোদয়" প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি সংস্কৃত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "বাণবিজয়" নামক একখানি সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুভদ্রা-হরণ, চন্দ্রদূত, প্রশান্তকুসুম, অশ্রুবিন্দু, রাজ্যাভিষেক-কাব্য, রত্নকোষকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অন্নপূর্ণাস্তোত্রং, শিবস্তোত্রং, গঙ্গাদর্শনকাব্যং, ভারতগাথা প্রভৃতি বহু কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উপাধি পরীক্ষার প্রবর্ত্তনের পর হইতে তিনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং সংস্কৃত বোর্ডের মাননীয় সদস্যরূপে গৃহীত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৺শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র অধ্যাপক কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি।

বাঙ্গালা ভাষা এবং তাহার আলোচনা ও প্রসারের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একজন প্রতিপত্তিবান্ সাহিত্যিক ছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এক সময়ে তিনি ঐ শাখার সভাপতি ছিলেন। উত্তরবঙ্গবাসী সাহিত্যিকগণ ঐ শাখা-পরিষদে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়ার অধিবেশনে তিনি সভাপতি-পদে বৃত হন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি 'মেঘনাদ বধে'র অনুকরণে "দ্রৌপদী" কাব্য রচনা করেন। ভাষা-সাহিত্যে তিনি অধিক গ্রন্থ না লিখিলেও তাঁহার "সংসার-নিরসন", "অশোক" (উপন্যাস), "একাদশীতত্ত্ব", "ত্রিসন্ধ্যাতত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আশা কাব্যের সমালোচনা, মৃণালিনীর সমালোচনা, বিলাতি বিচার, আমি একটি অবতার প্রভৃতি কতকগুলি সমালোচনা ও সামাজিক নক্সার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিম-যুগের লোক হইয়া অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সাহিত্যিক বন্ধুর প্রণালীতেই মাতৃভাষার সেবা করিতেন। কবি স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তিনি বিদ্যাপতির ছন্দে পত্র ব্যবহার করিতেন। তাঁহার বৈদেশিক সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে মিঃ এফ এচ স্ক্রাইন, মিঃ বেভারিজ রিজলি, স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সন, স্যর উইলিয়ম গেইট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি বারাণসীধামে বাস করিতেন। সেখানেও তিনি তাঁহার বাড়ীতে সাহিত্যিকের বৈঠক জমাইয়া তুলিতেন।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়া, বঙ্গভঙ্গের ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক Special Constable নিযুক্ত হন। তিনি ইহাতে বিশেষ অপমানিত হন এবং

তাঁহার উপাধি ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তৎপরে রাজসরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করেন।

তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের প্রতিকূলে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদিগের ব্রাত্যত্ব ইনি প্রমাণ করেন, কিন্তু ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দূর হওয়া তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল। কলিতে বাল্যবিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ চলিতে পারে, ইহাই তাঁহার মত ছিল। তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও রাজনৈতিক মতের উল্লেখ করিয়া রাজপুরুষগণ তাঁহাকে political পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতরাজের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ দীন হইয়াছে ও উত্তরবঙ্গ তমসাবৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"উত্তর-বঙ্গের বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ পণ্ডিতরাজের তিরোধানে দেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অদ্য বক্তৃদ্বয়ের বক্তৃতায় সকলেই বুঝিতে পারিলেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় প্রথম তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। পরে রাজসাহি ও দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ এবং কবিত্ব-শক্তি বরণীয় ছিল। সর্ব্ববিধ জাতীয় কার্য্যে তিনি অকপট যোগদান করিতেন। এরূপ পণ্ডিত ও কবিকে হারাইয়া বঙ্গভাষা দীনা হইয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় তিনি জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতেছিলেন।" অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"উত্তরবঙ্গের প্রাণস্বরূপ, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক, সর্ব্ববিধ জাতীয় কার্য্যের সহায়ক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা দীনা হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই. আই এস ও, এম বি, এফ সি এস—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত-রত্ন, এম এ মহাশয়ের "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশন দুইটির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। কোন প্রস্তাব উপস্থিত না থাকায় কোন সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন হইল না।

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত ১৫ খানি প্রাচীন পুথি, ২৫ খানি বাঙ্গালা ও ৮ খানি ইংরেজী পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলেন এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচীন পুথি-গুলির মধ্যে জীবগোস্বামীর ভাগবতসন্দর্ভ (ষট্‌সন্দর্ভ) পুথিখানি দুষ্প্রাপ্য—এ পুথি অন্য কোন লাইব্রেরীতে নাই। এই পুথি পাইয়া পরিষদের পুথিশালার বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি হইল। "ক" পরিশিষ্টে পুথি ও পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৪। "নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী" নামক প্রবন্ধলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধের সার মর্ম্ম পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথির তালিকা

উপহারদাতা—বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীর সম্পাদক, উপহৃত পুস্তক,—

[১] The Indo-Aryan Races, Vol. I, [২] A Catalogue of the Archaeological Relics in the Museum of the Varendra Research Society.

ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা—[৩] Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, Vol. I, [৪] The Life and Work of Buddhaghosa. [৫] The Buddhist Conception of Spirits. [৬] Historical Gleanings. [৭] The Law of Gift in British India. [৮] Rent Acts, মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক—(৯) Report of the Maju Public Library for 11 years from 1913—24. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১০) বিদ্যাসাগর, (১১) শ্রীরামানুজ-চরিত, (১২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১ম ষট্‌ক, (১৩) ঐ, ২য় ষট্‌ক, (১৪) আত্ম-চরিত, [শিবনাথ শাস্ত্রী] (১৫) ভারতের সাধনা, [১৬] ঋদ্ধি, [১৭] বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত, [৮] মানসী, ৪র্থ বর্ষ, ১৩১৮—১৯, [১৯] ঐ, পঞ্চম বর্ষ, ১৩২০ [৮ম—১২শ সংখ্যা], [২০] ঐ, ৬ষ্ঠ ভাগ, [২য়—৭ম সংখ্যা], [২১] ঐ, ঐ, ১৩২১ [বৈশাখ—আশ্বিন], [২২] ঐ, ঐ, ২য় খণ্ড, ঐ, [কার্ত্তিক—চৈত্র], [২৩] মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১১শ বর্ষ, ১৩২৫—২৬, [২৪] ঐ, ১২শ বর্ষ, ১৩২৬—২৭, [২৫] ঐ, ১৩শ বর্ষ ১৩২৭—২৮, [২৬] শ্রীব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক—[রাজসাহী],—[২৭] কাশিকা-বিবরণ পঞ্জিকা, ১ম ভাগ, [২৮] ঐ, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, [২৯] ঐ, ঐ, ২য় খণ্ড, [৩০] ভাষাবৃত্তিঃ, [৩১] ধাতুপ্রদীপঃ, [৩২] তারা-তন্ত্রম্, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা—[৩৩—৩৪] সৌন্দরনন্দ কাব্য, [২ খানি]।

উপহারপ্রাপ্ত পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন, এম্ এ, উপহৃত পুস্তক—১। লঘুভাগবতামৃত, ২। স্তবমালা, ৩। ভাগবতসন্দর্ভ ৪। পদামৃতসমুদ্র, [খণ্ডিত], ৫। স্তবাবলী, ৬। বিদগ্ধমাধব নাটক, ৭। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (খণ্ডিত), ৮। হংসদূত, ৯। মুক্তাচরিত, ১০। বেদান্তসার, ১১। ভাবার্থদীপিকাদীপন, ১২। গোবিন্দলীলামৃত (খণ্ডিত), ১৩। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ১৪। দুর্ল্লভসার খণ্ডিত), ১৫। গীতচিন্তামণি [পূর্ব্বভাগ, খণ্ডিত]।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের উপহৃত পুথি

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ, ১। কূর্ম্মপুরাণ, ২। পদ্মপুরাণ, ৩। বরাহ-পুরাণ, ৪। লিঙ্গপুরাণ (খণ্ডিত), ৫। অগ্নিপুরাণ (খণ্ডিত), ৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (খণ্ডিত), ৭। মৎস্যপুরাণ, ৮। দেবীপুরাণ (খণ্ডিত), ৯। নৃসিংহপুরাণ, ১০। রামায়ণ-আদি ও অযোধ্যা, ১১। ঐ-অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরাকাণ্ড, ১২। ঐ—লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ড, ১৩। শ্রীমদ্ভাগবত—১—৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ১৪। মহাভারত—কর্ণপর্ব্ব, ১৫। ভগবদ্ভক্তিবিলাস, ১৬। চৈতন্য চরিতামৃত—আদিখণ্ড, ১৭। ঐ—মধ্যখণ্ড, ১৮। ঐ—অন্ত্যখণ্ড, ১৯। মহাভারত—আদিপর্ব্ব (খণ্ডিত), ২০। ঐ—সভাপর্ব্ব (খণ্ডিত)।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ন ৫॥০টা।

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি এ—সভানেত্রী

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, "বাঙ্গালার বরেণ্য মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে শোকপ্রকাশের জন্য আজ আমরা এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়াছি। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতাই আমরা পাঠ করিয়াছি। তাঁহার কবিতা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্। আজ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, সেই মহিলা কবির শোক-সভায় মাননীয়া বিদুষী শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহোদয়া আজ সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবেন। আমি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহোদয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন,—"নলিনী লিখিত এই সুন্দর হীরামণিমুক্তা-খচিত প্রবন্ধটি শুনিয়া আজ খুব পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। তার প্রবন্ধ অতি শ্রুতিমধুর হয়েছে ও তাহাতে ঘটনার সমাবেশ বেশ আছে। নলিনী আমার চেয়ে অল্প বয়সের, এই জন্য তার স্মৃতিশক্তি এখনও প্রখর আছে। বহু কালের কথা, স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর বিষয়ে সব কথা আমার স্মরণ নাই—যা কিছু বল্‌ব—তা ঐ নলিনীর প্রবন্ধ হতেই বল্‌ব। আমার স্মৃতিশক্তির অনেক হ্রাস হয়েছে। স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে একটা অপ্রা-সঙ্গিক কথা এখানে বলে নি। বিলাতে কোন এক পল্লী-গির্জ্জায় প্রত্যহ উপাসনান্তে পুরোহিত মহাশয় গির্জ্জার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় কি ফল হইতেছে, তাহা কোন কোন শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। এক দিন এক আশী বছরের বৃদ্ধ কৃষককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"হ্যাঁ হে বাপু, এই যে রোজ রোজ গির্জ্জায় এসে বক্তৃতা শুনছ, উপাসনা করছ,

এখন বল ত "Who created you—কে তোমায় সৃষ্টি করেছে?" বৃদ্ধ কোন উত্তরই করতে পারল না। পাশেই একটি ৫ বছরের বালক ছিল—তাকেও ঐ প্রশ্ন করতেই সে উত্তর দিল, কেন? God (ঈশ্বর)। বৃদ্ধ তখন বল্‌লে, দেখুন মশায়, এ ছেলেটি অতি অল্প দিন জন্মেছে, ওর স্মরণশক্তি ত থাক্‌বেই; আমি ওর চেয়ে ৭৫ বছর আগে জন্মেছি—কি করে সব পুরাণ কথা মনে থাকবে বলুন ত? আমারও সেই দশা—তাই নলিনীর কথা হতেই ২।৪ কথা মনে করে কিছু বল্‌ব। ব্যোমকেশের পর নলিনী সাহিত্য-পরিষদে শতদল কমলের স্থায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার সৌরভে সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সেবীরা মশ্‌গুল হয়ে আছেন। হেম, নবীন, মাইকেলের পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর এক শ্রেণীর কবি ছিলেন।—তাঁদের পূর্ব্বে বৈষ্ণব-কবিরা ছিলেন। হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি কবি ছিলেন। সে সময়েও দেশে নারী কবি ছিলেন। মধুকানের মা ভাল কবিতা লিখ্‌তে পারতেন। অনেক স্ত্রী-লোকের পাদপূরণের ক্ষমতাও ছিল। এ যুগের পর গিরীন্দ্রমোহিনী, স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী প্রভৃতি শক্তিশালিনী কবির আবির্ভাব হয়। ইঁহারা সকলেই বিদুষী। তখনকার কালেও বাঙ্গালার অন্তঃপুরে রীতিমত শিক্ষার প্রচলন ছিল—পুথিগত বিদ্যা অনেকেই শিখিয়াছিলেন। নারী শক্তিস্বরূপিণী বলা হ'ত। আজকাল অবশ্য অনেকেরই গ্রন্থগত বিদ্যা বেশী হয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর সময়ে এত স্ত্রীশিক্ষা ছিল না। স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি ২।৪ জন স্ত্রীকবির খুব প্রশংসা তখন হয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী হিন্দু ঘরের কুলবধূ ছিলেন। বৌবাজারের অক্রুর দত্তের বাড়ীর বধূ। তখনকার কালে অক্রূর দত্তের বাড়ী বল্‌লে অনেক কথা বলা হ'ত। বিদ্যা বুদ্ধি, ধনে মানে এ বাড়ী কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ বাড়ী ছিল। স্রোতের মত অর্থ ব্যয় হত—কত লোক জন! যেন একটা হাট। এই দত্ত-বাড়ী হ'তে অনেক বীরের উদ্ভব হয়েছিল। রাজেন্দ্র দত্ত আগে এলোপ্যাথি, পরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারীর আলোচনা করেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিদেশীয় চিকিৎসার ফল প্রচার করবার জন্য বাড়ী বাড়ী বক্তৃতা ও ওষুধ বিতরণ করে বেড়াতেন। যোগেশ দত্ত একজন লেখক ছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী নরেশ দত্ত "রইস ও রায়ত" নামক ইংরাজী কাগজের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁদের বাড়ীর "সাবিত্রী লাইব্রেরী"তে বহু দুষ্প্রাপ্য বই ছিল এবং বিদ্যা ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা হ'ত। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি সেখানে বক্তৃতা করতেন। এই সময় এই ঘরের একজন কুলবধূ অন্তঃপুরে থাকিয়া তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার ফলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জে তাঁহার কবিতা ও কাব্য উপহার দিলেন। এ বড় কম সাহসের কথা নয়। স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী, গিরীন্দ্র-মোহিনী—এঁরা সব যুগপরিবর্ত্তনকারী সাহিত্যিক। আমার সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর কুটুম্বিতা ছিল—সম্পর্কে তাঁহার দেবর ছিলাম। তদ্ব্যতীত তাঁদের বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাই বেশী ছিল। একবার তাঁদের বাড়ী গেলে ৩।৪ দিন আসতে পারতাম না। আমাদের এই সম্পর্কের একটা সুবিধা এই ছিল যে, আমাদের তখন বেশ goose guill fight চলত—উভয়েই রস-রচনা করতাম—কত রকম ঠাট্টা ব্যঙ্গ চল্‌ত। তখন ঠাট্টা করলে গাল দেওয়া হল মনে

কর্‌তাম না। ঠাট্টা করা একটা বিদ্যা—সব জিনিষেরই এক একটা ridiculous side আছে—তাই নিয়ে রস রচনা—ঠাট্টা বিদ্রূপ বেশ চলে—এখন সে সব উঠে গেল। Scottএর সময় Bible নিয়েও ঠাট্টা চল্‌ত। গোবিন্দ অধিকারী বৈষ্ণব ছিলেন, অথচ তিনি অপর পক্ষকে গাল দেবার সময় বৈষ্ণবের নানা কুৎসা রচনা করে গান বাঁধতেন। সেটা একটা ক্ষমতার কাজ। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে এইরূপ সাহিত্যালোচনা আমরা সে কালে করেছি। তিনি একটা কবিতায় স্বামীদের নির্দ্দয় বলে অনেক লিখেছেন. এ নির্দ্দয় কথাটায় প্রকৃত পক্ষে স্বামীকে complimentary দেওয়া হয়েছে—গাল দেওয়া বা নিন্দা করা হয় নি। সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রাণস্বরূপ গোবিন্দ তখন ক্রীড়াশীল বালক ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী আদর্শ হিন্দু মহিলা ছিলেন। হিন্দুগৃহের অন্তঃপুর হতে তাঁর প্রতিভাকে প্রকাশ কর্‌তে পেরে ছিলেন বলে আজ বঙ্গসাহিত্য তাঁর দানে সমুজ্জ্বল। নলিনীর প্রবন্ধের রচনা, উপকরণ-সংগ্রহ সুন্দর। কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর এই প্রবন্ধ-পাঠ। সুন্দর ও সুলিখিত প্রবন্ধ এমন সুন্দর করে পড়তে না পার্‌লে হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ হয় না। আমি তাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি, আর প্রার্থনা করি, তার সৌরভে বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষৎ ভরপুর হয়ে উঠুক।"

তৎপরে কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শিবানীবালা ঘোষজায়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়া যে পরিবারের কুলবধূ ছিলেন, সেই পরিবারকে তখনকার কালে সাহেবরা Wellington Dutt Family বল্‌ত—এই সংসার বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অনেক সাহিত্যিক, সুলেখক বিদ্বান্ এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীতে অনেক বড় বড় লোক বক্তৃতাদি করিতেন। বিখ্যাত বাগ্মী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও এখানে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মন্তব্য দুইটী গৃহীত হইল।

প্রথম মন্তব্য—

"বঙ্গসাহিত্যের বরেণ্যা মহিলা কবি ও "জাহ্নবী"-সম্পাদিকা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোক-প্রাপ্তিতে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া পরলোকগতা মহিলা কবির জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

অতঃপর সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী মহোদয়া বলিলেন,—"পরলোকগতা গিরীন্দ্র-মোহিনীর সহিত যখন আমি পরিচিতা হই, তখন আমি বালিকা। বেথুন কলেজে একটা শিল্প-মেলায় তাঁকে দেখি। তখন হইতেই আমি তাঁর স্নেহ লাভ করি। তিনি যদিও কোন স্কুলে পড়েন নি, তথাপি তিনি বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর কবিতায় যে একটা করুণ সুর পাওয়া যায়, তাহা আন্তরিকতায় পূর্ণ এবং মনের অকৃত্রিম ভাব প্রকাশ করে। তিনি যা অনুভব করতেন, তাই তাঁর কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন—সেই জন্যই তাঁর কবিতা বিশ্বহৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি জীবনে অনেক বেদনা পেয়েছিলেন—এ বেদনা মর্ম্মান্তিক হলেও তাঁর হৃদয়কে শুষ্ক করেনি—স্নিগ্ধতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর কবিতা করুণামাখা ও আন্তরিকতায় পূর্ণ ছিল বলে বিশ্বের শোকার্ত্তকে তিনি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতা আমার হৃদয়কে ব্যথিত করত বলেই আমি তাঁর প্রতি চিরদিনই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলাম। আজ তাঁর শোকসভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করবার অবকাশ পেয়েছি বলে আমি আজ ধন্য।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে সভানেত্রী মহোদয়াকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "গিরীন্দ্রমোহিনী-রচিত 'অশ্রুকণা'র কথা সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের সভানেত্রী মহোদয়া রচিত 'রেণুর' কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। অশ্রু-কণার ভিতরে যে ব্যথা ও বেদনার ধারা ওতঃপ্রোত ভাবে প্রবাহিত, পূজনীয়া প্রিয়ম্বদা দেবীর রেণুর ভিতরে সেই ধারা সমভাবে বহমান। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ স্বামী পুত্র হারিয়ে অন্তরে অন্তরে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করেছিলেন বলে অশ্রুকণার কবির মর্ম্মবেদনা যত-খানি বুঝতে পেরেছিলেন, অত আর কেউ পারে নি বোধ হয়। এই জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই শোক সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর হৃদয়ের গভীর রুদ্ধ শোক আজ জাগরিত হয়েছে। তিনি সে শোকের বেগ সহ্য করতে পারেন নাই—তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। পুনরায় আমরা তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

তৎপরে স্বর্গগতা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্যক্তিগত ভাবে সভানেত্রী মহোদয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্না, তাহা তাঁহারা কৃতজ্ঞতার সহিত অবগত আছেন।

অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৬ই পৌষ ১৩৩১, ২১এ ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্,— সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ পাঠ—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি মহাশয়ের "বঙ্গীয় মৎস্যের তালিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৬। নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব—(ক) ৩য় নিয়মের নির্ব্বাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে—"কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকারী স্থির করিয়া দিবেন, এবং সভাপতি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হইবে।" (খ) ৩য় নিয়মে যোগ হইবে—"শাখার সভ্যগণের কাজ করিবার জন্য লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং উপর্য্যুপরি চারিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে নাম বাদ যাইবার ব্যবস্থা হইবে।" ৭। Oriental Conferenceএ প্রবন্ধ ও আর্থিক সাহায্য প্রেরণ সম্বন্ধে মন্তব্য। ৮। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ না হওয়ায় পঠিত হইল না।

২। কোন নূতন নাম সদস্যের জন্য কেহ প্রস্তাব না করায় কেহ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন না।

৩। 'ক' পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ সময়াভাবে পঠিত হইল না।

৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম এস্ সি মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় মৎস্যের তালিকা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত একেন্দ্র বাবু এই তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিজ্ঞানের কল্যাণ সাধন

করিয়াছেন। যিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ইহাতে প্রভূত উপকার পাইবেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

৬। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতির আহ্বানকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের কতিপয় সদস্য পরিষদের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্দ্ধনের ও পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই সকল প্রস্তাব বিশেষ ভাবে আলোচনার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠন করেন। এই শাখা-সমিতি উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহা গ্রহণ করিয়া, এই অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নোক্ত প্রস্তাব পাঠ করিলেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মাবলী পাঠ করিলেন।

(ক) ৩য় নিয়মের নির্ব্বাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে

'কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকারী স্থির করিয়া দিবেন এবং শাখার সভাপতি শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হইবে।"

(খ) ৩য় নিয়মে যোগ হইবে—

"শাখার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত সভ্যের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং কোন সভ্য উপর্য্যুপরি চারিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে তাঁহার নাম বাদ যাইতে পারিবে।"

সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদস্যগণের মতামত চাহিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই নিয়ম পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৭। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। উক্ত কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদের নিকট প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তিনি পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশ মত প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সমবেত সভ্যগণকে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি

ক পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, উপহৃত পুস্তক—১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (পদ্যানুবাদ)। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী—২। লিওনিদাস্। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—। ৩। সন্ধ্যারহস্য। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—৪। নবাবী আমল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—৫। গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী।

বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর

[পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

বৈদিক স্বরলিপি

বৈদিক স্বরলিপি নানাবিধ। পৃথক্ পৃথক্ শাখায় পৃথক্ পৃথক্ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

ক। ঋগ্বেদের রীতি অথর্ব্ববেদসংহিতা, তৈত্তিরীয়সংহিতা ও বাজসনেয়িসংহিতায় অনুসৃত হইয়াছে বলা যায়। তবে বাজসনেয়িসংহিতায় স্বরিত লিপি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের। এই স্বরলিপিই (ঋগ্বেদীয় লিপি) সর্ব্বত্র সমাদৃত। কিন্তু ঋগ্বেদের লিপিতে উদাত্ত স্বরের কোনও লিপি নাই। অনুদাত্ত ও স্বরিতের মধ্যবর্ত্তী অচিহ্নিত অক্ষরে উদাত্তস্থিতি বলিয়া বুঝিতে হয়। অনুদাত্তের নিম্নে সরল অধোরেখা '—' থাকে, এবং স্বরিতের উপরে লম্ব-রেখা '।' থাকে। এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বর উদাত্ত। কাশ্মীরে সংগৃহীত ঋগ্বেদের পুথি-সমূহে উদাত্ত ও স্বাধীন স্বরিতেরই চিহ্ন আছে। উদাত্তের চিহ্ন উপরে লম্বরেখা '।' ও স্বাধীন স্বরিতের চিহ্ন শঙ্খাকার বক্ররেখা '৲'। কিন্তু এ (কাশ্মীরী) লিপি সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে ও ইহার সমাদরও নাই। ঋগ্বেদের প্রচলিত স্বরলিপির উদাহরণ—অ গ্নি না ঃ অর্থাৎ অগ্নি না। এখানে প্রথমাক্ষর অধোরেখা-চিহ্নিত অনুদাত্ত, দ্বিতীয়াক্ষর চিহ্নবিহীন উদাত্ত ও তৃতীয়াক্ষরে অধীন স্বরিত। অবশ্য স্বাধীন ও অধীন স্বরিতের ভেদ ঋগ্বেদীয় স্বরলিপিতে নাই। বাক্যাদি বা পাদাদিতে একাধিক অক্ষরে কোনও চিহ্ন না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, পরবর্ত্তী অনুদাত্ত বা স্বরিত চিহ্নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল অক্ষরই উদাত্ত। তাবা যাতম্=তা বা যাতম্। তবেৎ তৎ সত্যম্=ত বেৎ তৎ সত্যম্। বৈশ্বানরম্=বৈশ্বানরম্। প্রথম স্বরিতচিহ্নের পর পুনরায় উদাত্তের পূর্ব্বাক্ষরের পূর্ব্বাক্ষর পর্য্যন্ত যাবতীয় অক্ষর চিহ্নবিহীন থাকে! কেবল উদাত্ত লক্ষিত করিবার জন্য তাহার পূর্ব্বের অনুদাত্ত ও পরের স্বরিত স্বর চিহ্নিত হয়। মূল উদাত্ত স্বরে কখনও কোনও চিহ্ন থাকে না। ই মং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি=ই মং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি।

স্বরলিপির জন্য মন্ত্রের এক একটী পাদকে একক স্থানীয় করিয়া ধরা হয়। স্বরস্থিতির জন্য যে এই পাদ বাক্যস্থানীয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই জন্য পাদাদিতে না থাকিলে সমাপিকা ক্রিয়া বা সম্বোধন পদে স্বর থাকে না (বাক্য স্বরের বিধি অনুসারে[১])। সুতরাং

১। সা, প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা।

অনুদাত্ত ও স্বরিতাক্ষরের চিহ্ন পদসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে ; এক পদের প্রভাবে অন্য পদের অক্ষরে চিহ্ন পড়ে। 'রশ্মিম্' পদটী অন্ত্যোদাত্ত, এবং 'অশ্রবৎ' পদটী স্বরবিহীন হইলেও তাহারা যখন পাশাপাশি বসিবে, তখন দ্বিতীয় পদের প্রথমাক্ষরে স্বরিত চিহ্ন পড়িবে ; কারণ, সেটী উদাত্তের পর স্থিত হওয়ায় অধীন স্বরিত প্রাপ্ত হইবে। এই কারণে মূল পাঠ ও পদ-পাঠে স্বরলিপির বিভিন্নতা ঘটে। পদ-পাঠে প্রত্যেক পদের স্বরলিপি থাকে, এক পদের প্রভাব অন্য পদে যায় না। রশ্মিম শ্রবৎ। এই জন্য পরপদের প্রথমাক্ষর উদাত্ত হইলে পূর্ব্বপদের অন্ত্যাক্ষরে অনুদাত্ত চিহ্ন চাই। এবং পূর্ব্বপদের অন্ত্যাক্ষরের পূর্ব্বাক্ষর স্বরিত হইলে অন্ত্যাক্ষরে অনুদাত্ত চিহ্নও থাকিবে না। পূর্বেভি ঋষিভিঃ =পূর্বেভি ঋষিভিঃ। যজ্ঞম ধ্বরম্=যজ্ঞমধ্বরম্। কিন্তু অন্ত্য উদাত্তের পরবর্ত্তী প্রথম অনুদাত্তের চিহ্ন থাকিবে, যদি তৎপরবর্ত্তী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকে। দেবমৃত্বিজম্= দেবমৃত্বিজম্। এখানে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি না হইবার কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[১]

স্বরলিপির এই জটিলতার উপর আবার জটিলতা এই যে, স্বাধীন স্বরিতের পূর্ব্বে [ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট বা অভিনিহিত[২]] উদাত্ত স্বর থাকিলে স্বরিতের পর স্বরিতাক্ষরের মাত্রা (লঘু বা গুরু) অনুযায়ী '১' বা '৩' সংখ্যা দেওয়া হইবে এবং সেই সংখ্যা স্বরিত চিহ্ন বহন করিবে ; প্রকৃত স্বরিত অক্ষর যেটী, দীর্ঘস্বর হইলে সেটীতে অনুদাত্ত অধোরেখা পড়িবে। আবার এই স্বরিতের পরবর্ত্তী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে এই সংখ্যাটী এককালে স্বরিত চিহ্ন ও অনুদাত্ত চিহ্ন, উভয় বোঝাই বহন করিবে। অপ্স্ব১ন্তর্=অপ্স্বন্তর্। রায়ো ৩ বনিঃ=রায়ো বনিঃ। ইহাকে কম্প, প্রকম্পিত বা বিকম্পিত স্বর বলে।

খ। মৈত্রায়ণী সংহিতা ও কাঠক সংহিতায় উপরে লম্বরেখা দ্বারা উদাত্ত স্বর চিহ্নিত হয়। অনুদাত্ত ঋগ্বেদের অনুরূপ। অগ্নিনা। কিন্তু স্বরিত-লিপি লইয়া এই উভয় সংহিতাতেও বিষম গোলযোগ। মৈত্রায়ণী সংহিতায় অধোবক্র-রেখা দ্বারা স্বাধীন স্বরিত চিহ্নিত হয়। বীর্য্যম্=বীর্য্যম্। কিন্তু অধীন স্বরিতের চিহ্ন একটী হাইফেন্ '—' অথবা তিনটী ঊর্দ্ধ-লম্ব রেখা '।।।'। কাঠক সংহিতায় স্বাধীন স্বরিতের চিহ্ন একটু বিভিন্ন প্রকারের

১। সা, প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা।
২। সা, প, প, ১৩২৯, ১ম সংখ্যা।

অধো-বক্র-রেখা, কিন্তু অধীন স্বরিতের জন্য ব্যবস্থা একটী অধোবিন্দু ।। উভয় সংহিতাতেই অধোলম্ব রেখা দ্বারা অনুদাত্ততর স্বর চিহ্নিত হয়।

গ। সামবেদে উদাত্ত, স্বরিত ও অনুদাত্তের চিহ্ন যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ সংখ্যা অক্ষর-মস্তকে স্থাপিত। ব হিঁ ষি = বর্হিষি। কিন্তু উদাত্তের পরবর্ত্তী অক্ষর স্বরিত না হইলে '২' সংখ্যা দ্বারাই উদাত্ত চিহ্নিত হয়। গিরা = গিরা। যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং = যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং। উপর্য্যুপরি দুইটী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে দ্বিতীয়টীতে চিহ্ন না দিয়া পরবর্ত্তী স্বরিতের মাথায় '২র' লেখা হয়। অথবা প্রথম উদাত্তটীর মাথায় '২উ' লিখিলে স্বরিতের মাথায় 'র' লিখিবার আবশ্যক থাকে না। স্বাধীন স্বরিতের মাথায় '২র' ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনুদাত্তে '৩ক' থাকে। দ্বিষো মর্ত্ত্যস্য = দ্বিষো মর্ত্যস্য। এষস্য পীতয়ে = এষস্য পীতয়ে। তন্বা = তন্বা।

(ঘ) শতপথ ব্রাহ্মণে উদাত্ত স্বর অধোরেখা দ্বারা চিহ্নিত হয়; পূর্ব্বের অনুদাত্ত বা পরের স্বরিতে চিহ্ন আবশ্যক হয় না। আবার একাধিক উদাত্ত পাশাপাশি থাকিলে কেবলমাত্র অন্তিমটীতে চিহ্ন দেওয়া হয়। সকলগুলিতে চিহ্ন দরকার হয় না।

= পুরুষঃ। অগ্নির্হি বৈধূরথ = অগ্নি র্হি বৈ ধূরথ। যখন সন্ধিতে উদাত্ত স্বর পশ্চাদ্‌গামী হয়, তখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তেরও চিহ্ন থাকে। সোঽগ্নিমেবাভীক্ষমাণঃ = সোঽগ্নিমেবাভীক্ষমাণঃ (এবাভী = এব + অভী)। সমাসজন্য উদাত্ত স্বর লক্ষিত করিতেও কখনও কখনও উপর্য্যুপরি দুই স্বরে উদাত্তচিহ্ন থাকে। স্পৃহয়দ্‌বর্ণঃ = স্পৃহয়দ্‌বর্ণঃ।

(আ) স্বাধীন স্বরিত কখনও কখনও উদাত্তরূপে পশ্চাদ্‌গামী হয়; মনুষ্যেষু = মনুষ্যেষু = মনুষ্যেষু। সন্ধিজাত ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট ও অভিনিহিত স্বরিতেরও এইরূপ পরিণতি হয়। কথং নিমম্ = কথং নিমম্ = কথং নিমম্; এবৈতৎ = এবৈতৎ = এবৈতৎ = এব + এতৎ। তেঽর্চন্তঃ = তের্চন্তঃ = তে + অর্চন্তঃ।

(ই) আ, প্র, এই দুইটী উপসর্গ এবং পদান্ত অ সমাসে অন্য পদের স্বরবিহীন আদি স্বরের সহিত মিলিত হইলে সন্ধিতে উদাত্ত স্বরের স্থিতি অক্ষুণ্ণ থাকে।

আ+ইহি = এহি ; প্র+আহ = প্রাহ ; চিত্র+উতি=চিত্রোতি (বিস্ময়কর বস্তু দানকারী)।

(ঈ) বিরামের পর উদাত্ত বা স্বাধীন স্বরিত থাকিলে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের লোপ বা হ্রাস হয় এবং তাহার নীচে তিনটী বিন্দু দিয়া (...) সেই স্বরের প্রকৃতি লক্ষিত হয়। স ভা গঃ ; সং স্থি তে=সভাগঃ। সংস্থিতে ; এইরূপ কারণে পাদের অন্ত্যাক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষরেরও হ্রাস হইতে পারে। জুহোতি॥ অথ = জুহোতি॥ অথ ; পরপাদের প্রথম অক্ষর স্বরবিহীন হইলেও ইহা হইতে পারে। নাপ্সু॥ অপ=নাপ্সু॥ অপ।

(উ) দ্বিরুদিত (আম্রেড়িত) পদ বা দীর্ঘ সমাসের আদ্যক্ষরে বা আদিভাগে স্বর (উদাত্ত) থাকিলে সমগ্র পদের শেষের দিকে আর একটি নূতন স্বরের অভ্যুদয় স্থানে স্থানে দেখা যায়। বল্‌বলীতি (বল্‌বলীতি), একচত্বারিংশৎ (একচত্বারিংশৎ)। কথনও কখনও এরূপ স্থলে মৌলিক স্বরটীরই লোপ হয়। একসপ্ততিঃ, (এবং একসপ্ততিঃ) ; এইরূপ সমস্ত পদের ন্যায় অনিয়ম কথনও কখনও ক্রিয়াপদেও দেখা যায়। উপসর্গ ও ক্রিয়া উভয় স্থানেই যুগপৎ স্বরস্থিতি হয়। অভি গোপয়েৎ। ইহা ছাড়া স্বরস্থিতির বিপর্য্যয় বহু পদেই পাওয়া যায়। এই সকল অনিয়ম শতপথ ব্রাহ্মণের ১০ম হইতে ২৩শ কাণ্ডে অধিক পাওয়া যায়। প্রাচীন অংশসমূহে এত বিশৃঙ্খলা নাই। চতুর্দ্দশ কাণ্ডে অনিয়মের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

উপসংহার

ঋগ্বেদের পাঠের (মূল ও পদ-পাঠের) পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক পদে একটী এবং কেবল মাত্র একটী প্রধান স্বর থাকাই সাধারণ নিয়ম। পাণিনির ব্যাকরণেও সেই কথা—"অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্ ৬।১।১৫৮" * সেই একটী মাত্র উদাত্ত (বা স্বাধীন স্বরিত) স্বর পদমধ্যে সাধারণতঃ যে স্থানে দেখা যায়, আদিম আর্য্য (Indo-European) ভাষায় ঠিক সেই স্থানেই স্বরস্থিতি ছিল, এই কথা ব্রুগম্যান্ (Brugmann) প্রভৃতি আর্য্য-ভাষাতত্ত্ব-ধুরন্ধর পণ্ডিতগণ সকল আর্য্যভাষার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা

* পদমাত্রের একটি অক্ষর ছাড়িয়া সবগুলিই অনুদাত্ত।

নির্ণয় করিয়াছেন। ইউরোপের সকল সভ্যতার কেন্দ্রীভূত গ্রীক ভাষাও ইউরোপীয়গণের নিকট এত উচ্চ সমাদর পায় নাই। ইহা একদিকে যেমন আমাদের গৌরব ও স্পর্দ্ধার বিষয়, অন্য দিকে সেইরূপ লজ্জা ও অধঃপতনের পরিচায়ক। বৈদিক সাহিত্যের নাম শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প হয়, আর তাঁহারা আমাদের সেই সকল লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিতেছেন। আধুনিক লিথুআনীয় ভাষায় আদিম আর্য্যভাষার সুর এ যাবৎ উচ্চারণে সংরক্ষিত আছে। আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে বৈদিক সুরের বিলোপ ঘটিয়াছে; তাহা বৈদিক সাহিত্যের উদাহরণেই পরিস্ফুট। ঋগ্বেদের স্বরস্থিতি ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের স্বরস্থিতিতে অনেক প্রভেদ। তাহার কতকটা পরিচয় শতপথব্রাহ্মণের স্বরলিপি প্রসঙ্গে বলিয়াছি। যতই এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়, ততই এই পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি হয়। দুই চারিটী উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ঋগ্বেদের সপ্ত শব্দ ব্রাহ্মণে সপ্ত হইয়াছে। অষ্টৌ হইয়াছে অষ্টৌ। তিল হইয়াছে তিল। সীদন্তি স্থানে সীদন্তি, গহ্বর স্থানে গহ্বর। স্থানে স্থানে স্বাধীন স্বরিতের পরিবর্ত্তে উদাত্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঋগ্বেদেই অন্ত্য স্বরিতের স্থানে উদাত্তের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। দ্যৌঃ স্থানে দ্যৌ (৮।৮৯।১২)। অর্ঘ্য শব্দ একবার মাত্র (১।১২৩।১) ঠিক আছে; অন্য বহু স্থানে অর্ঘ্য হইয়াছে। কখনও কখনও অন্ত্য স্বরিত পশ্চাদ্‌গামী ও উদাত্ত হইয়াছে। মিত্র্যা (এবং মিত্র্যা), বীর্য্য (এবং বীর্য্য = বীর),—ভব্য (—ভব্য) ;

বেশী আলোচনায় পুথি বাড়িয়া যায়। সুতরাং লেখনী সংবরণ করি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত বই কয়খানি পড়িয়াছি :—

(১) Sanskrit Grammar by W. D. Whitney.

(২) Vedic Grammar by A. A. Macdonell.

(৩) সিদ্ধান্তকৌমুদী, বৈদিক প্রকরণ (শ্রীশচন্দ্র বসু)।

(৪) An Introduction to Natural History of Language (T. G. Tucker)

(৫) Language and Its Study (W. D. Whitney).

(৬) বৈদিক শব্দসূচি (বোম্বাই)।

(৭) Speijer's Sanskrit Syntax.

(৮) Brugmann's Comparative Grammar.

বৌদ্ধদর্শন

[দ্বিতীয়াংশ]

এখন আমাদের দেশে বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগে নীতিতত্ত্ব বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বুদ্ধি কিরূপ ছিল, দেখা যাউক। ঋক্‌বেদসংহিতার স্থানে স্থানে আমরা দুইটি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। সে শব্দ দুইটি "ঋত" ও "সত্য"। "ঋত" শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন উহার অর্থ যজ্ঞ, কখন জল, কখন প্রাচীন বাসস্থান ইত্যাদি। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, পরে উহার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়ম, নিয়তি, শৃঙ্খলা, একভাবিত্ব প্রভৃতি দাঁড়াইয়াছে। ম্যাক্‌স্‌মূলর তাঁহার হিবার্ট লেক্‌চারে একটি শ্লোক[১] উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—"দ্যুলোক সূর্য্যের দ্বারা ধৃত হইয়া আছে এবং ভূলোক সত্যের দ্বারা ধৃত হইয়া আছে।" কিন্তু সায়ণ, এখানে ঋতের অর্থ করিয়াছেন যজ্ঞ ও সত্যের অর্থ করিয়াছেন, "ব্রহ্মণানন্তাত্মনা।" "উত্তম্ভিতা" শব্দের অর্থ স্তম্ভিত বা উদ্ধৃত, এইরূপ করিয়াছেন। যাহা হউক, বিভিন্ন ঋতুর যেমন একের পর অপরটির নিয়ত আবির্ভাব হয়, ঋত শব্দে তাহাই বুঝায়। সম্ভবতঃ ঋতু শব্দ ও ঋত শব্দ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "ঋ"ধাতুর অর্থ নির্দ্দিষ্ট বা নিয়ত বা গমন ইত্যাদি। আর একজন বেদজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত ঋত শব্দ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই "ঋত" হইতে আমরা প্রাচীন বৈদিক যুগের সংবাদ পাই, ইহা পূর্ণতার উপদেশ। ঋত, পৃথিবী ও প্রকৃতিকে অনুশাসন করিতেছে। জাগতিক ব্যাপার এবং প্রাকৃতিক ঘটনা ঋতের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। উষা, ঋতের বলে প্রাতরাকাশে কিরণ বিস্তার করিতেছে, সূর্য্য আকাশে স্থিত হইয়া রহিয়াছে, সূর্য্যই ঋতের চক্রস্বরূপ। দেবতারা ঋত হইতে উৎপন্ন; সেই জন্য তাঁহাদের নাম ঋত-জাত এবং তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ঋতজ্ঞ, ঋতায়ু, ঋতসপ নাম দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ঋত জানেন বলিয়া ঋতজ্ঞ, ঋত পালন করেন বলিয়া ঋতায়ু, ঋত অনুরাগী বলিয়া ঋতসপ নামধারী হইয়াছেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে ঋত ও সত্য, এই দুইটি শব্দ কোনও মহান্ তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুইটি শব্দ হইতে বৃহৎ দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বউদ্ধৃত ঋক্ হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃতি ঋতের বশেই চলিয়া থাকে এবং মানুষও প্রকৃতির জীব বলিয়া উহাকেও প্রকৃতির অধীন হইয়া চলিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মানুষ প্রকৃতির বশীভূত বটে, কিন্তু তাহার নীতিবুদ্ধি তাহাকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করাইয়া থাকে। রাগ ও দ্বেষ এবং সুখের অন্বেষণ প্রকৃতিপ্রদত্ত; কিন্তু কর্ত্তব্য-

১। সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্য্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমে অধিশ্রিতঃ॥

বুদ্ধিবশতঃ আবশ্যক হইলে মানুষ তাহা দমন করিয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, সত্য, ভূমিকে স্তম্ভিত বা রক্ষা করিয়া থাকে। ভূমি যদি পৃথিবী হয়, তাহা হইলে সত্য পৃথিবীকে অধিকার করিয়া আছে এবং এই সত্য হইতে ধর্ম্ম, নীতি ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উৎপত্তি হয়।

বৈদিক যুগেতে পাপ পুণ্যের বিচার যথেষ্ট ছিল। অঘ, দুরিত প্রভৃতি পাপবাচক শব্দের বহু উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্রে বিধি-নিষেধের অনেক কথা আছে। তবে এখন কালবশে অনেক বিষয় অপ্রচলিত। বৈদিক-সংহিতা-যুগের আর দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। তপঃ হিন্দুদের বহু পুরাতন অনুষ্ঠান। তপঃ শব্দে এখন আমরা কেবল ক্লেশমাত্র বুঝি। কিন্তু প্রাচীন কালে উহা ঠিক কি ছিল, তাহা বলা যায় না। জগৎসৃষ্টি তপের দ্বারা হইল—ঋত, সত্য, তপ হইতে উৎপন্ন হইল। কাজেই এ তপ কেবল ক্লেশ নহে; ইহার মূলে নিশ্চয় আরও কিছু আছে। ইহা মানুষের বা ঋষিগণের একটা অলৌকিক শক্তি, যাহার প্রভাবে আপাত অসাধ্যের সাধন হইতে পারে। আর একটি প্রক্রিয়াও বহু প্রাচীন এবং উহা ধ্যান। ধ্যান শব্দটি সংহিতায় অধিক পরিলক্ষিত হয় না। তবে তপঃ শব্দের অনেক স্থানেই উল্লেখ আছে। ব্লুমফীল্ড তপের ইংরাজী অর্থ করিয়াছেন "creative force" অর্থাৎ সিসৃক্ষা। এ অর্থ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; তপঃ উদ্ভাবনী শক্তি—অভাব হইতে ভাবের উৎপাদন, যাহা নাই—তাহাই করা।

সংহিতাসমূহের মধ্যে নীতিতত্ত্বের অন্বেষণ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। উপাসনাসমূহ ভক্তির প্রেরণা, প্রীতির ব্যঞ্জনা; ইহার মধ্যে নৈতিক আলোচনার সম্ভাবনা নাই। দুই এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়ম ও নৈতিক নিয়ম পরস্পর ব্যবচ্ছেদক ও বিরোধী। ঋত ও সত্য, এই দুইটী তত্ত্বের মূলে আমরা নৈতিক নিয়ম বা নৈতিক জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। তপঃ ও ধ্যান দ্বারা আমরা আধ্যাত্মিক জগতের নূতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই।

এই অবধি সংহিতার কথা বলিয়া শেষ করিতেছি। ইহার মধ্যে আরও অনেক সামগ্রী আছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে নীতিমূলক হইতে পারে। ইহার পর উপনিষৎ যুগে নীতির মূল সূত্রগুলি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যায়। উপনিষৎসমূহ আর্য্য-জ্ঞানের এক অদ্ভুত বিকাশ। অল্প কথার মধ্যে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্ব এত গভীর ভাবে আলোচিত আর কোথাও হইয়াছে কি না, সন্দেহ। উপনিষদে আমরা নীতিমূলক অনেক বিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাই। নীতির মূলে আত্মত্যাগ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ স্বার্থ দূরে রাখিয়া কোন একটি বড় আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া চলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়জ সুখ ক্ষুদ্র, উহার তৃপ্তিকাল অবধিই সুখ। প্রকৃত সুখ বড় জিনিসে (ভূমায়)—উচ্চ-তত্ত্বই সুখ ও শান্তি। উচ্চ-তত্ত্ব কেবল আত্মজ্ঞানে জানা যায়। প্রকৃতি আমাদের পদে পদে বাধা দেয়, জড়-পিপাসার আকর্ষণ করে, সেই জন্য স্বভাবের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যাচিদ্ধনম্।" এ দুইটিই বড় আদর্শ। আত্ম-

জ্ঞান ও তত্ত্ব-সুখ, এই দুইটি ছাড়া মানুষের উন্নতি হয় না। ঋষি, জ্ঞানী, বোধিসত্ত্ব, সুপারম্যান, পূর্ণ মানব হইতে হইলে এই পথ দিয়া চলিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান একই বস্তুর দুইটি দিক্ মাত্র। উহা পাওয়া যায় কি করিয়া? সে উপদেশেরও উপনিষদে অভাব নাই। আত্মজ্ঞানই উপনিষদের ধর্ম্ম। এই আত্মজ্ঞানে চিত্তকে গড়িতে হইবে, মানুষকে প্রথমে "মর‍্যাল ম্যান" বা ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। ইহার উপায় শম, দম বা বাহ্যান্তর নিগ্রহ। প্রকৃতিকে লয় করিতে হইবে। চিত্ত প্রকৃতির উপর উঠিতে পারে এবং চিত্তই জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যবর্ত্তী। শম, দম ও তপঃ, এই তিনটি প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইয়া তত্ত্বজগতের সাক্ষাৎ হয়। উপনিষদের চরম তত্ত্ব সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। বোধ হয়, কোন জাতির জ্ঞানে এরূপ গভীর মন্ত্র উদ্ভাসিত হয় নাই। গ্রীকদের গুড্, ট্রুথ ও বিউটিফুল আছে। কিন্তু জ্ঞানের একদিকে সত্য ও অপর দিকে আনন্দ অথবা সত্যের একদিকে জ্ঞান ও অপরদিকে আনন্দ, ইহা উপনিষদের ঋষিরাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আনন্দ হয় জ্ঞানে, আনন্দ হয় সত্যে। জ্ঞানই শ্রেয়ঃ, সত্যই শ্রেয়ঃ। ইহার মধ্যে যে দিকে লক্ষ্য করা যায়, তাহাতেই অপর দুইটি রূপ থাকিবে। যাহা জ্ঞান, তাহাই সত্য, এবং আনন্দ ইহাদেরই মূর্ত্তি। সেই জন্য বৈদান্তিকের জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ এবং মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয় সেই পূর্ণ-বস্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ।

উপনিষদের তত্ত্ব আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রাচীন বৈদিক ও উপনিষদের যুগে মানব-জীবনের উদেশ্য সম্বন্ধে কিরূপ সমাধান হইয়াছিল, তাহাই দেখা আবশ্যক। সৎ-অসৎ বিচার, আত্মত্যাগ, শম দম তপঃ প্রভৃতি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য কি? পাপ পুণ্যের চিন্তাই বা কেন? এই সকল আচরণের উদ্দেশ্য অমৃতত্ব প্রাপ্তি। মৃত্যুতে জীবনের শেষ হয় না, তাহার পরও আবার জীবন আছে। ঋষি দ্রষ্টা; তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে যে দেবতত্ত্ব মধুর ছন্দে বাহির করিয়াছেন, তাহাই অভ্যাস করিতে হইবে এবং তাঁহার বিধি-নিষেধের বাণী পালন করিতে হইবে। উপনিষদের সময়েও বোধ হয়, অমৃতত্ব প্রাপ্তিই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। দেবলোক, পিতৃলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি মানুষের পরম রমণীয় বাসস্থান—সেখানে পরম আনন্দ। ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা মানুষ এই সকল লোক পাইয়া থাকে। এই ইষ্টাপূর্ত্তের কল্পনা বহু প্রাচীন।[১] ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান ফললাভের জন্য অথবা উহা কামনামূলক। এখানে কামনা —আনন্দ বা সুখ—পিতৃলোকে ভোগ ও চন্দ্রলোকে ভোগ। এই ধারাটি পরবর্ত্তী শাস্ত্রে ও বিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। দর্শন শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিতে ঐ একই ভাবের প্রভাব দেখা যায়। অপবর্গ, নির্ব্বাণ প্রভৃতি মানবের চরম লক্ষ্য। হয় নিরতিশয় সুখ, না হয়

১। ঋক্‌বেদ, ১০, ১৪, ৮; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫,৭,৭,১।

দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি। মাত্র ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্ম অনুষ্ঠানে কামনার লেশ থাকিবে না, কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিতে হইবে। আবার মনটাকে এরূপ ভাবে গড়িয়া লইতে হইবে যে, সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, এমন কি, শারীরিক ক্লেশ শীত উষ্ণ প্রভৃতিও একই ভাবের বোধ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ঋতের জগৎ ও সত্যের জগৎ পরস্পর একপথগামী নহে। বৈদান্তিক যুগে সত্য আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বেও উহার ঐ ব্যবহারই ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখন ঋতের জগৎ অথবা প্রকৃতির অধিকৃত জগৎ নিয়মের অধীন। আমরা শত চেষ্টা করিলেও মাধ্যাকর্ষণের বাধা অতিক্রম করিয়া, লাফ দিয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারিব না অথবা বিনা আলোকে দেখিতে পাইব না। কিন্তু নীতি-জগতে বা সত্যের জগতে আমরা প্রকৃতিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকি। এই নীতিজগৎ বা পারমার্থিক জগৎ প্রকৃতির অধীনে অথবা প্রকৃতির অতীত? নব্য ইউরোপীয়েরা এই প্রকৃতির স্থান ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়াইয়া নীতি-তত্ত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। মানুষ যাহা জানে, যাহা ভাবে, যাহা বুঝে ও যাহা দেখে, সে সকলই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পশ্চাতে আর কিছুই নাই। প্রকৃতিই জড়, প্রকৃতিই মন এবং প্রকৃতিই চৈতন্য। এ কথাটার কোন সার্থকতা নাই; কারণ, জড় ও জড়শক্তি লইয়া প্রকৃতি। বহু পূর্ব্বে প্রকৃতিবাদী সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে এই ভাবেই দেখিয়াছিলেন এবং এখনকার প্রকৃতিবাদীও প্রকৃতিকে ঐ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তবে সাংখ্যকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল জড় ও জড়শক্তি দ্বারা মানব-রহস্য বুঝান যায় না। সেই জন্য তাঁহাদের পুরুষ বা চৈতন্য। সাংখ্যেরাও মানবের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রকৃতির অতীত ব্যাপারই বুঝিয়াছিলেন। মানুষ যদি আগাগোড়া জড়-শক্তিরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে সে জড়কে বুঝে কি করিয়া এবং তাহার অনন্তের জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসে? কাজেই জড়ে ও আত্মায় বা চৈতন্যে একটা প্রভেদ না থাকিলে চলে না। আবার এ দিকে প্রকৃতি কি অর্থাৎ জড় ও জড়শক্তি কি, তাহারই বা এত দিনে আমরা কতটা বুঝিয়াছি? এক একটা সৌরমণ্ডল কেবল তন্মাত্রের বা পরমাণুর সমষ্টি। তাহারা একটা কেন্দ্র গ্রহণ করিয়া চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতেছে। কেন ঘুরিতেছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি, মাধ্যাকর্ষণবশতঃ। প্রকৃতির জ্ঞান ত আমাদের এইটুকু মাত্র হইয়াছে।

যাহা হউক, মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করার শক্তিটা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পূর্ব্বে ইচ্ছা সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। ইচ্ছা ও কার্য্যে একটা সম্বন্ধ আছে। আমরা যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। তবে ইচ্ছা কাহার দ্বারা অনুশাসিত হয়? একদল বলেন,—ইচ্ছা স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র; আর একদল বলেন, ইচ্ছা পরভাবী বা পরতন্ত্র। এ কলহের মূলে যাইবার আবশ্যক নাই। তবে হিন্দু গ্রন্থে ও শাস্ত্রে

ইচ্ছার স্ব-তন্ত্রতা বা স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। কর্ম্ম-বাদী হিন্দুরা বুঝিয়াছেন সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় ইচ্ছাশক্তি জন্যই হইয়া থাকে। যোগ বা ধ্যান হিন্দুর চক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রধান পন্থা। ইচ্ছা শব্দটি ন্যায়গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্য বা যোগগ্রন্থে ঠিক ইচ্ছা শব্দটি নাই। তবে ইচ্ছামূলক অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমার বোধ হয়, নব্য-যুগের ইচ্ছা শব্দে প্রাচীন হিন্দুরা যাবতীয় মানসিক শক্তি বুঝিতেন। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধই যোগ। কিন্তু চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ কাহা দ্বারা হয়? যোগশাস্ত্র মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহার নিরোধ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যও মানসিক শক্তিরই ফল। কাজেই ধরিয়া লইতে হয় যে, চিত্তেরই এমন একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা অভ্যাস সাধিত হয়। কোন কোন হিন্দুগ্রন্থে যোগ-শক্তি অস্বীকৃত হইয়াছে। বোধ হয়, গোতমীয় ও কাণাদ এবং বিশেষতঃ মীমাংসা-মতে যোগ-শক্তির ফলস্বরূপ সর্বজ্ঞত্ব ও বুদ্ধত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা যোগফলে অবিশ্বাসী, তাঁহাদের মতে অভ্যাসবলে মানুষ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন, অভ্যাস করিলে আমরা পৃথিবী বা ভুবনত্রয় লাফ দিয়া পার হইতে পারি না। তাহার উত্তরে ন্যায়-কন্দলীকার শ্রীধর একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। শ্রীধর ইহার উত্তরে বলেন যে, বাস্তবিক অভ্যাসবশতঃ শরীরের শক্তি অসীম হয় না। কিন্তু মন সম্বন্ধে তাহা বলিতে পার না। কারণ, মনের শক্তির আমাদের কোনও জ্ঞান নাই। মনের অধিকার কতদূর বিস্তৃত, তাহা বলা যায় না। কাজেই মনের দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদের বিষয়ের উপক্রমণিকাস্বরূপ। নীতিতত্ত্বের মূল মন্ত্রগুলি আয়ত্ত হইলে বৌদ্ধনীতি সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক হইবে না। বৌদ্ধনীতির মূল সূত্রসমূহ যে বুদ্ধ-পূর্ব্ব-যুগে অপরিচিত ছিল না, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ও বৈদান্তিক যুগে আমরা দুইটি মহৎ নিয়মের উল্লেখ পাইয়াছি। ঋত ও সত্যের অনুভূতি বৈদিক ও বৈদান্তিক যুগে সমভাবেই ছিল। তাহার পর আত্মসংযম, শম, দম প্রভৃতি, আত্মত্যাগ, সৎ-অসৎ, শ্রেয়ঃ প্রেয় ও অমৃতত্ব নামক চরম পুরুষার্থ—এই সকল সংস্কার ও আদর্শ বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগেও ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। অমৃতত্ব যে মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়, ইহা কেবল হিন্দু জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, অপরাপর প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যেও ইহা ছিল। মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স্, অপবর্গ, নির্ব্বাণ প্রভৃতি শব্দের মূলে পুনর্জ্জন্ম ও দুঃখনিবৃত্তি রহিয়াছে। কাজেই মোক্ষ, নির্ব্বাণ ও অমৃতত্বে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। আর একটি বৈদান্তিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আবশ্যক। সে প্রক্রিয়াটি নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন, ধ্যান ও যোগ, একই বিষয়ের নামভেদ মাত্র। ধ্যান ও সমাধিই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতির মূল ভিত্তি, ইহাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির প্রধান অনুষ্ঠান, তাহা পরে আমরা দেখিতে পাইব।

বিষয় অনুপ্রবেশের পূর্ব্বে বিপক্ষ-পক্ষের দুই একটি আপত্তির সমালোচনা আবশ্যক। ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় ধর্ম্ম ও নীতিবাদ দুঃখমূলক। তাঁহাদের

মতে প্রাচীন বৈদিক যুগে দুঃখ-বাদটা মোটেই ছিল না। কারণ, তাঁহাদের জীবনের প্রতি অনুরাগ ছিল। তখন পুনর্জ্জন্ম-বাদটা ছিল না; দেবলোকে অথবা পিতৃলোকে গিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া, তাঁহাদের আবার জীবন ভোগের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এ উক্তিটা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে একটা ধুয়া গোছ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপের বড় বড় দার্শনিক, তাঁহারাও দুঃখবাদী। সপেনহর ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, এ জগৎ-সৃষ্টিটা সম্পূর্ণই ভুল এবং মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোনও সার্থকতা নাই। উইলিয়ম্ জেম্স্—তিনি আজ-কালকার একজন খ্যাতনামা দার্শনিক। তিনিও স্পষ্টভাবে মানব-জীবনে দুঃখ-বহুলতার কথা বলিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ছাড়া গেটে, ম্যাথ্ আরনল্ড প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্যিক—তাঁহারাও জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন। অপরের উক্তি বাদ দিয়া প্রত্যেকেরই নিজের অভিজ্ঞতাই দুঃখবাদের একটি প্রমাণ। জীবনে মানুষের যাহা আশা ও কল্পনা, তাহার কয়টা সফল হয়, আবার তাহার কত আশা পোষণ করিতে সাহসই হয় না। এইটুকু ত গেল ব্যক্তির দিক্ হইতে। আবার সমাজেরও ঐ অবস্থা অর্থাৎ দুঃখবহুলতা। কতক লোক অলসভাবে বিলাসভোগ করিতেছে, আবার কত লোক খাটিয়া খাটিয়া দুই বেলায় আহার সংস্থান করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর রোগ, শোক, প্রাকৃতিক নিগ্রহ, এ সকল ত আছেই। এই দার্শনিক সমস্যার সমাধানে ইউরোপ-বাসী কখনও চেষ্টা করে নাই এবং সে শক্তি পূর্ব্বেও ছিল না এবং এখনও আছে বলিয়া বোধ হয় না। জন্মান্তর-বাদ ভারতীয় প্রতিভার ফল এবং ইহা সম্প্রতি ইউরোপীয় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক সমাজে স্থান ও আদর পাইতেছে।

আর একটি ইউরোপীয় আপত্তি যে, ভারতীয় নীতি বা কর্ম্মানুষ্ঠানে মানব-সমাজের কোন স্থান নাই। উহাতে কেবল মাত্র ব্যক্তিরই মঙ্গল বা কুশলের দিকে লক্ষ্য আছে। এ কথাটার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। কারণ, ব্যক্তি লইয়াই সমাজ এবং ব্যক্তির মঙ্গলেই সমাজের মঙ্গল। ইহা ছাড়া ইউরোপীয় প্রধান দার্শনিকেরা ব্যক্তিগত নীতিরই পোষণ করিয়াছেন। কারণ, স্বতোগ্রাহ্যবাদ ও আত্মোপলব্ধিবাদ ব্যক্তির জন্যই আবশ্যক।

ইউরোপীয় তৃতীয় আপত্তি যে, ভারতীয় নীতিবাদে তপঃ, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মানুষের কোমল প্রবৃত্তি ও ভাবগুলি শুকাইয়া যায় এবং মানুষে ও লোষ্ট্রে বিশেষ কোনও প্রভেদ থাকে না। আশা ও কামনাশূন্য হইয়া কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। বাহ্য ও অন্তর নিগ্রহ করিয়া পরমহংস অথবা অবধূতের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মানুষের লাভ কি? উহা জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সংসার ছাড়ায় মনুষ্যত্ব নাই, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত, ইষ্ট অনিষ্ট, দুঃখ বিপদের মধ্যে থাকিয়া কাজ করাই মনুষ্যত্ব। এ আপত্তিটি বড় গুরুতর। অল্প ভাষায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। ভোগবাদী ইউরোপের দৃষ্টিকেন্দ্রে দেখিলে ইহার সুমীমাংসা হয় না। ইউরোপীয় মধ্যযুগ খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসের যুগ। মধ্যযুগ ইউরোপীয় দৃষ্টিতে বড়ই হেয়। ভোগের চক্ষে সন্ন্যাস চিরকালই অশ্রদ্ধার বিষয়। তবে এখন আবার দেখা

যায় যে, ইউরোপে একটা প্রতিস্রোতঃ আসিয়াছে। মধ্যযুগের আদর্শ ও জ্ঞানের আদর অল্প অল্প করিয়া বাড়িতেছে। যাহা হউক, এই আপত্তির উত্তরে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অভিব্যক্তিবাদ বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অভিব্যক্তিবাদের মূল মন্ত্র, অবস্থানের উপযোগিতা। যে জীব বা উদ্ভিদ এই অবস্থানের উপযোগী হইতে পারে, সে একটা জীবনের নূতন "বীজ" পায় এবং সেই সঙ্গে তাহার কতকগুলা শারীর সংস্থানেরও পরিবর্ত্তন হয়। প্রাণিজগতে এক একটি জাতি আসিতেছে, আবার তাহার ধ্বংস হইতেছে। যাহারা টিকিয়া যায়, তাহাদেরই অভিব্যক্তিবাদীরা উপযোগী বলিয়া থাকেন। কাজেই উপযোগিতার কোনও বিশেষ লক্ষণ নাই। এক এক শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাবে বা অভিব্যক্তির মূলে কোনও দেব-অভিপ্রায় আছে কি না? এক জন নবীন আস্তিক দার্শনিক বলেন, অভিব্যক্তি নিয়মে কোনও অভিপ্রায় দেখা যায় না। মানুষ যেমন নূতন কিছু করিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে, এই ধারাবাহিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার পশ্চাতে সেইরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা রহিয়াছে। জড় ও জীব-সৃষ্টির নূতন নূতন প্রকরণে যেখানে পরীক্ষা সফল হইতেছে না, আবার একটা নূতন প্রকরণ ও পরীক্ষা আরম্ভ, আবার নূতন চেষ্টা, নূতন উদ্যম। অতএব স্রষ্টাও মানুষের মত অপূর্ণ ও সসীম।

যাহা হউক, অভিব্যক্তি নিয়মের পিছনে কোনও অভিপ্রায় থাক বা নাই থাক, উহার মূল লক্ষণ পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির অভিযানের উপরে উঠিতে না পারিলে জীবের ত্রাণ নাই। যদি মনে করা যায় যে, এই প্রকৃতি অভিযানে উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ-যোনি অতিক্রম করিয়া উন্নত মানুষ—জীব হইয়াছে, তাহা হইলে ধরিতে পারা যায় যে, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক উন্নত জীব ভবিষ্যতে আসিবে। তাহাকে অতিমানব (সুপারম্যান)ই বল, আর দেবতাই বল। তাহাদের বিশেষ লক্ষণ কি হইবে? যদি তাহার ধরণ ও ভাব আমাদেরই মত হয়, তাহা হইলে তাহারা উন্নত হইল কিসে? স্রষ্টার চক্ষে কীট ও মনুষ্যে কোনও প্রভেদ আছে কি না, বলা যায় না। মানুষের অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট কোনও জীব আসিলে তাহারা কি হইবে, তাহা কে বলিবে? এই জীব-জগতে আসা যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া, সৃষ্টি-প্রলয় কি চিরকালই চলিবে? দেবযোনি অথবা পূর্ণ-মানব আসিলে জগতে কি অভাব দূর হইবে? অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মানুষের ক্লেশ ত থাকিয়াই গেল। সুপারম্যান আসিবে বলিয়া এত পূর্ব্ব-সৃষ্টি আবশ্যক কেন? তাহাদের ত একবারে আসিলেই চলে; জীবের পর জীব, রকমের পর রকম না আসিলে কি সুপারম্যানের আসা হয় না? স্রষ্টার যদি সুপারম্যান আনাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অপরাপর জীবকে লইয়া এত কসা-মাজা কেন? এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আছে বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানের তৃপ্তি, আদর্শ ও কল্পনাতেও হয়। কিন্তু জগতের অভিব্যক্তিবাদীর আদর্শে কোন তৃপ্তি নাই।

অতএব বৈদান্তিকের সহিত বিশ্বাস করিতে হয় যে, এই ভাঙ্গা-গড়া চক্রাকারে চলিতেছে। যাহা হইতেছে, তাহা মায়া। এক মহা সত্য ও নিত্য পদার্থের মানুষ-ভুলান রূপ। আমরাও

মায়ার অধীনে; কাজেই ভাঙ্গা-গড়া বা অনিত্যটাই দেখিতেছি। ইহা আমাদের অবিদ্যা বা ভুল বুঝা। স্রষ্টার ইহা লীলা বা বালকের খেলা। মানুষকে বুঝাইবার জন্য সময়ে সময়ে ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে পথ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধরাও জগৎকে স্বপ্ন ও মায়া বলিয়া থাকেন। মানবও তাঁহাদের মতে অবিদ্যাচ্ছন্ন। তবে তাঁহাদের জগৎকর্ত্তা নাই, কাজেই অবতারও নাই। বুদ্ধ হিন্দুর অবতার হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বৌদ্ধদের অবতার নহেন, তিনি তাঁহাদের মহাপুরুষ, পরমযোগী। তিনি কর্ম্মবলে তত্ত্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ, অবতার ভাবে নহেন। হীনযান মতে তিনি উপাস্যও নহেন, যেহেতু কর্ম্ম ও নীতিবলে অপরেও বুদ্ধ হইতে পারে। হিন্দু এবং বিশেষভাবে বৌদ্ধেরা মানুষকে খুব বড় করিয়াছেন। প্রকৃতিচর্য্যা করিলে মানুষ বড় হয় অথবা প্রকৃতি-দত্ত চিত্তকে নিরোধ করিলে বড় হয়, সে প্রশ্ন মীমাংসা করিবার সময় এখনও আসে নাই। সুপারম্যানের মন যদি প্রকৃতির বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হইল, তাহার সাম্য নষ্ট হইল, তাহা হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? যাঁহার প্রতিভা আছে, তাঁহার বিশেষত্ব মনে। যদি তাঁহার শরীর ক্লেশ না সহিতে পারে ও মন অল্পেই বিচলিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ মনুষ্যের সহিত তাঁহার কোনও প্রভেদ থাকে না। কাজেই হিন্দু ও বৌদ্ধ আদর্শ সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা যে আপত্তি তুলিয়া থাকেন, তাহার কোনও সারবত্তা নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই অভিব্যক্তিবাদী। হিন্দুর বিকার, বিবর্ত্ত, পরিণাম প্রভৃতি বহু প্রাচীন কল্পনা। বৌদ্ধের উৎপাদ-নিরোধ ও অন্যথাভাব, অভিব্যক্তিব্যঞ্জক। বৌদ্ধের প্রকৃতির সন্নিবেশ প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—এই আছে, আর অমনি নাই। নবীন ইউরোপীয় ও ভারতীয়, উভয় মতেই সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি অনন্ত, ইহার শেষ নাই, মহাপ্রলয়ের পরও আবার সৃষ্টি। তবে ইউরোপীয় অভিব্যক্তি যেন একটা সরল রেখা ধরিয়া যাইতেছে, আর ভারতীয় অভিব্যক্তি বৃত্ত বা চক্ররেখা অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপীয় অভিব্যক্তিতে ব্যঞ্জনার শেষ নাই, ভারতীয় মতে সৃষ্টিচক্র ষড়্ঋতুর মত একই ভাবে আবর্ত্তন করিতেছে। ইউরোপীয়ের সুপারম্যান একটি শব্দ মাত্র, একটি উগ্র কল্পনা, তাহার সার্থকতা বুঝা যায় না। ভারতীয়েরা সৃষ্টিচক্রে মহাপুরুষের আবির্ভাব, কালে কালে, কল্পে কল্পে, যুগে যুগে প্রতীক্ষা করেন। জগৎকে নূতন তত্ত্ব, তত্ত্বদর্শী পূর্ব্বেও দেখাইয়াছেন এবং পরেও দেখাইবেন, ইহাই ইতিহাসের বাণী। সুপারম্যান জগতের শেষ অবস্থায় আসিয়া জগতের কি হিতসাধন করিবেন?

নীতিতত্ত্ব, নব্য ইউরোপে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ঐ আদর্শে বৈদিক ও উপনিষৎ-যুগের নীতি বিষয়ে যৎসামান্য বলা হইয়াছে। যুগভেদে আচার-ভেদ হয়, ইহা প্রাচীনেরা উত্তমরূপেই জানিতেন। আমরাও দেখিতে পাই, সংহিতা-যুগের আদর্শ উপনিষৎযুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং উপনিষৎ-যুগের সংস্কার বৌদ্ধযুগে অন্যপ্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে। তবে বৌদ্ধযুগের পরিবর্ত্তন বাহ্য লক্ষণেরই হইয়াছিল; মূল ধাতুর কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই। সেইটুকুই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কোন সম্প্রদায়ের মতামত বুঝিতে হইলে তাহাদের দৃষ্টিকেন্দ্র বুঝা আবশ্যক অর্থাৎ তাহারা বিশ্ব-ব্যাপার কি ভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। সম্প্রদায়-বিশেষের মূল মতটি বুঝিতে পারিলে নীতিতত্ত্ব ও ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ভারত, দর্শন-প্রাণ দেশ; কাজেই নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দর্শনও ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। পরিদৃশ্যমান জগতের সত্তা কোন সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেন নাই। তবে উহার উৎপত্তি, ব্যবস্থাপন, সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষ তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টি-কেন্দ্র অনুসারে বুঝিয়া থাকেন। দৃশ্যমান জগৎ, তন্মাত্র, পরমাণু, ধাতু প্রভৃতি জড়-রচিত, তাহাও কেহ অস্বীকার করেন না। তবে জড় ও জড়-শক্তি হইলেই যদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার আর অপর কর্ত্তা কেহ আছেন কি না এবং জীবের চৈতন্য জড়-প্রসূত কি না, এই দুইটি গুরুতর প্রশ্ন থাকিয়া যায়। যাঁহারা সশক্তি জড়কেই জগতের প্রসবিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের জড়বাদী বলা যায়। আবার যাঁহারা সন্নিবেশ ও ব্যবস্থা দেখিয়া জড়ের পশ্চাতে জ্ঞান ও চৈতন্য দেখেন, তাঁহাদের চৈতন্যবাদী বলা যাইতে পারে। এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপসম্প্রদায়ও আছে। জড়বাদীর মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ অথবা তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান মানব-জ্ঞানে স্রষ্টার সম্বন্ধে কোনও বিচার করা যায় না। তাঁহাদের সন্দিগ্ধ এবং দুর্জ্ঞেয়-বাদী বলা যাইতে পারে। তাঁহারাও জড় ও জড়শক্তি বা সাংখ্যের ভাষায় তমঃ ও রজঃ লইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করেন।

আবার এদিকে চৈতন্যবাদীদের ভিতরেও উপসম্প্রদায় আছে। এক দল মনে করেন যে, মানুষ কলের পুতুলের মত। জগৎকর্ত্তা তাহাদের যে ভাবে চালাইতেছেন, তাহারা সেই ভাবে চলিতেছে। জগৎকর্ত্তা পরমমঙ্গলময়; মানুষের দুঃখ কষ্ট বলিয়া কোনও জিনিষ নাই। জগৎ কর্ম্মের বা পরীক্ষার স্থল। জগতের মূলে যিনি আছেন, তাঁহার বালকবৎ ক্রীড়া করাই উদ্দেশ্য। জগৎ যেমন তাঁহার খেলার সামগ্রী, মানুষও তাহাই। আত্মা সৃষ্ট ও স্রষ্টা অজ্ঞেয়। অপর সম্প্রদায় বলেন, জগৎটা কর্ম্মক্ষেত্র বটে এবং উহার মূলাধার আছেন। মূলাধার সত্তারূপে বিদ্যমান এবং তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা, পরমাত্মারই কণা বা অংশ এবং জীব-হৃদয়ে আত্মার উপলব্ধি হয়। মানব-জীবন আত্মার বদ্ধাবস্থা এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা জীবের মুক্তি হয়। এই শেষোক্ত মতটি বৈদান্তিক মত ধরা যাইতে পারে। বৌদ্ধ মতও প্রায় এইরূপ। তবে বৌদ্ধের জগতের মূল সত্তা, মানব-বুদ্ধির অতীত এক কল্পনাবিশেষ। সে সত্তাটি অসৎ, অভাব বা শূন্য। আত্মা বলিয়া স্থায়ী কোনও নিত্য পদার্থ নাই। সমস্তই ক্ষণিক, কাজেই জ্ঞান বা সম্বিৎও ক্ষণিক। স্থায়ী নিত্য জ্ঞান মানুষের নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান, পরবর্ত্তী জ্ঞানকে আপনার সঞ্চিত বুদ্ধি দিয়া অভাবে মিশাইয়া যায়। কুশল কর্ম্ম করিলে মানুষের কল্যাণপ্রদ সংস্কার হয় এবং সংস্কারসমূহ একবারে নির্ম্মল হইলে মানুষ সম্বুদ্ধ ও মুক্ত হয়। এইরূপ মানুষই তত্ত্বদর্শী। সংস্কারের ভাল মন্দ অনুসারে পুনর্জ্জন্ম বা

সংসার। এইখানে বেদান্তের সঙ্গে একটু প্রভেদ। বৈদান্তিক মতে পুনর্জন্ম হয় আত্মার; বৌদ্ধ মতে সংস্কার-সমূহ পারমার্থিক নিয়ম-বশে আপনি আসিয়া জন্মাইতে বাধ্য হয়। বৈদান্তিকেরাও কর্ম্ম-ফল মানেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে কর্ম্ম-ফল আত্মাকে অভিভূত করে বা আত্মার আচ্ছাদন সূক্ষ্ম-শরীরকে অভিভূত করে। বৌদ্ধেরা উহা সংক্ষেপ করিয়া সংস্কারের উপরেই সমস্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধমত মীমাংসক মতের সহিত মিলে। মীমাংসকেরাও কর্ম্মেরই শক্তি মানিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মতে কর্ম্ম হইতে "অপূর্ব্ব" (কনসারভেসন্) এবং উহা হইতে স্বর্গে যাওয়া বা মর্ত্ত্যে আসা।

মানব-জ্ঞানের প্রথম বিকাশ হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এখনও যে সকল জাতি বনে অথবা পাহাড়ে বাস করে, তাহাদের মধ্যেও সৃষ্টির একটা না একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। পৌরাণিক যুগে ও বৈদিক যুগে নানা প্রকার সৃষ্টি-প্রকরণের উল্লেখ আছে। পর্ব্বতগুলি কি করিয়া হইল, নদীসমূহ কোথা হইতে নামিল, সমুদ্র কিরূপে উৎপন্ন হইল, অগ্নি, স্বর্গ হইতে কি করিয়া আসিল, ইহার মন-বুঝান ব্যাখ্যা একটা যে প্রকারের হউক, পাওয়া যায়। আমাদের এই গর্ব্বিত সভ্যতার যুগেও যে কল্পনার প্রভাব কমিয়াছে, তাহা বলা যায় না। পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব এবং গ্রহসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে কত রকমের বাদ প্রতিবাদ আছে। কাল্পনিক চিন্তা হিসাবে সেইগুলিকে প্রাচীন সৃষ্টি-বর্ণনার পাশে বসাইলে বিশেষ দোষের হয় না। জ্ঞান যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে মানুষকে স্তিমিত-দৃষ্টিতেও চলিতে হইবে। জিজ্ঞাসা, ছাড়িবার পাত্র নহে। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ত আছেই। এইরূপ প্রত্যেক দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞাত বিষয় জানার চেষ্টা আপনা হইতে অগ্রসর হইবে এবং সাময়িক দৃষ্টি ও বুদ্ধি অনুসারে তাহার মীমাংসাও হইবে। চিন্তার ইতিহাস অধ্যয়নে এইটুকুই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতার যুগে দেখা যায় যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টে বড় একটা প্রভেদ নাই। প্রকৃতি বা স্বভাবের ধারণা প্রাচীনকালে হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃতির মূলে পরমাণু বা তন্মাত্রা দেখিতে মানবজ্ঞানকে বহু দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক অধিষ্ঠানের মূলে যত দিন দেবতা বাস করিতেন বা বিভিন্ন বিশ্ব-শক্তি যতদিন দেব-নিয়ন্ত্রিত ছিল, তত দিন বহু দেবতা ও বহুরূপী প্রকৃতি ছিল। ক্রমশঃ প্রতিভার বলে বায়ু, বরুণ, অগ্নি, উষা একই প্রকৃতির রূপ, ইহা অনুভূত হইল। বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির একই ভাবের ক্রিয়া দেখিয়া দেখিয়া উহাতে আর দেবভাব থাকিল না এবং পরবর্ত্তী যুগে উহা ভূতে পরিণত হইল। বহুমূর্ত্তি-বিশিষ্ট প্রকৃতির পশ্চাতে বহু সত্তা আছে অথবা উহা একই সত্তার বিভিন্ন আকার, উপনিষৎ-যুগের পূর্ব্বে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বিশ্বক্রিয়ায় তাঁহারা অব্যভিচারী নিয়ম দেখিলেন; উহা হইল ঋত এবং উহার পশ্চাতে এক মূল অধিষ্ঠান দেখিলেন। যাহাকে আমরা সংহিতা-যুগ বলি, উহার শেষ অবস্থায় দেবতারা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হইলেন এবং এক মহান্-বিশ্ব-দেবতা তাঁহাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি সময়ে সময়ে প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা, পরমেষ্ঠী

হইতেন। তিনি স্বয়ম্ভু, ধাতা, ও বিধাতৃরূপে ঋষি-জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইতেন। পরে তিনি সহস্র-শীর্ষ পুরুষরূপে সর্ব্বময়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবে বিকশিত হইলেন। আবার এদিকে কালও ক্রমশঃ একটা তত্ত্বে পরিণত হইল, তাহার পরিচয়ও আমরা অথর্ব্ববেদে[১] পাই।

বিশ্ব, জগৎ, তস্থুশস্ প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতিবোধক। কিন্তু ঠিক প্রকৃতির সংস্কারটা আমরা ঋত শব্দেই পাই। সংহিতা-যুগের পরে আরণ্যক, উপনিষৎ-যুগেও ঋত শব্দের বহু স্থলে প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু যেখানে উহার বিশেষভাবে উল্লেখ থাকার দরকার অর্থাৎ দর্শন-যুগে, সেখানে উহার ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, ঋত তখন মূর্ত্তি বদলাইয়া প্রকৃতিতে দাঁড়াইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে[২] আমরা একটি প্রশ্ন দেখিতে পাই যে, কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ—ইহারাই কি জগতের মূল অথবা জগতের মূলে অপর কিছু আছে? এই মন্ত্র যে সময়েরই লেখা হউক, ইহা গভীর দার্শনিক চিন্তার ফল। যাহা হউক, ইহা বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগের রচনা না হওয়ার কোনও কারণ দেখা যায় না। এ জগৎটা আপনা হইতে অথবা নিয়মবশতঃ অথবা আকস্মিক সৃষ্টি, এই যে প্রাচীন কালের প্রশ্ন, এখনও ইহার নিবৃত্তি হয় নাই; প্রায় সমভাবেই চলিতেছে।

প্রকৃতির মূল রূপটাকে আমরা দুই ভাবে দেখিতে পারি। জ্যোতিষ্কমণ্ডল বা অচেতন জগৎ সেই একই ভাবে চলিতেছে। সেই ঋতু, সেই সমুদ্রোচ্ছ্বাস, সেই অগ্নি-দাহ, সেই বায়ুতরঙ্গ। প্রাচীনের চারি ভূত, এখনও তাহাই আছে। পৃথিবীর আকার গঠনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হয় ত গ্রহসমূহের যৌবন বার্দ্ধক্য আছে। তবে পরিবর্ত্তন হয় জীব-জগতের। জগদভিযানে জীব এবং উদ্ভিদেরই ধর্ম্ম ও লক্ষণের পরিবর্ত্তন। যদি প্রকৃতির এইটাই রূপ হয়, তাহা হইলে ইহা কি স্বভাব, অর্থাৎ আগুনের যেমন উষ্ণতা অথবা তুষারের যেমন শীতলতা আছে, সেইরূপ জগতে যাহা হইতেছে, তাহা কি জগতের স্বভাব? অথবা গ্রহ-নক্ষত্র যেমন আপনার কক্ষে চলিতেছে, প্রকৃতিও কি সেইরূপ কোন বাঁধা নিয়মে আপনাকে আপনি চালাইতেছে অথবা ইহার মূলে কোন নিয়ম বা কার্য্য-কারণ-ভাব নাই; যেমন ইচ্ছা, তেমনিভাবে চলিতেছে। প্রকৃতির এই দিক্‌টা জড়ের দিক্; ইহার বিষয় বেশ অনুসন্ধান আছে। তবে চেতনের দিক্‌টা লইয়া প্রাচীনেরা বড় বেশী নাড়াচাড়া করেন নাই। যাহা হউক, এত পূর্ব্বে প্রকৃতিকে এরূপভাবে অপর কোনও জাতি অধ্যয়ন করে নাই।

আমাদের মূল কথাটা স্বভাব লইয়া। শূন্যবাদী ও যোগাচারী বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা প্রকৃতিকে স্বভাবের মূর্ত্তিতে দেখেন নাই এবং ইহার সম্বন্ধে অনেক প্রতিবাদ আছে, তাহা পরে বলা হইবে। ষড়্‌দর্শনে স্বভাব-বাদ সম্বন্ধে সমর্থন অথবা নিরাকরণ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বভাব-বাদটা তবে কোন্ সম্প্রদায়ের ছিল? জয়ন্তের ন্যায়-মঞ্জরী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিতে শিশুর পূর্ব্ব-জন্মের

১। ১৯, ৫৩-৫৪।   ২। ১, ২।

সংস্কারবশতঃ রোদন ও স্তনপান—জয়ন্ত, নৈয়ায়িকদের সাধারণ মত অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়মতে শিশুর রোদন ও স্তনপান স্বতোবুদ্ধিবশতঃ হয় এবং পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কারের উহাই উত্তম প্রমাণ। চার্ব্বাকদের উদ্দেশে গ্রন্থকার বলিতেছেন, শিশুর রোদন ও স্তন্যপান, তোমরা পদ্মফুল ফোটা অথবা চুম্বকের আকর্ষণের মত স্বভাব-বশতঃ হইয়া থাকে, এরূপ বলিতে পার না। তোমরা যাহাকে স্বভাব বল, সেটা কি? সে স্বভাব কি তোমাদের মতে কারণশূন্য, অজ্ঞাত কারণ-জন্য, অথবা নিয়মবিহীন কারণ-জন্য[১]? আবার মাধবাচার্য্যের সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক-দর্শনে দেখিতে পাই,—"এই অদৃষ্ট, অনিষ্ট ও জগদ্-বৈচিত্র্য কি আকস্মিক?" তাহার উত্তরে চার্ব্বাকসম্প্রদায় বলেন, "না, ইহা আকস্মিক নহে; ইহা স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" তাহার পর একটি শ্লোক,—"অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পার্শস্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥" ইহা দ্বারা এইটুকু বুঝা যায় যে, চার্ব্বাকসম্প্রদায়ই স্বভাববাদী ছিলেন। তবে স্বভাববাদীরা সম্ভবতঃ পরিণামবাদী ছিলেন না।

তাহার পর সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ বা প্রকৃতিবাদ। এ মতও বৌদ্ধেরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ প্রসিদ্ধ। এই সৎকার্য্যবাদটি কি? যে সম্প্রদায় প্রকৃতিকে যেরূপভাবে বুঝিয়াছেন, এই কার্য্য-কারণ-বাদও তাঁহাদের সেইরূপ আকার ধরিয়াছে। সাংখ্যকারিকার টীকায় বাচস্পতি মিশ্র চারিটি কারণবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলেন, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়। অপর এক সম্প্রদায় বলেন, পরমার্থ-সৎ বস্তুর বিবর্ত্তই কার্য্য। আর এক মতে সৎ হইতেই অসতের উৎপত্তি। আবার সাংখ্যমতে কারণ ও কার্য্য, উভয়েই সৎ। এই বিশ্বব্যাপারের মূল কারণটি কি হইতে পারে? মানুষের মন এইখানে বিবশ হইয়া পড়ে। বিশ্ব-যন্ত্রের পিছনে একটি কিছু আছে। সে লক্ষণ-শূন্য নিত্য বস্তুর কেবল লেশমাত্র আমরা পাইয়া থাকি। যেমন অনন্তের আমাদের একটা অনির্দ্দিষ্ট জ্ঞান হয়, জগতের মূল বস্তু সম্বন্ধেও বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেই ভাবের একটা জ্ঞান হয়। জ্ঞানের মূলে আমরা কয়টি পদার্থের পরিচয় পাই—জড়, প্রাণ, মন ও চৈতন্য। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে জগতের মূল পদার্থ পরমাণু নামে অভিহিত হইয়াছে। কাজেই তাঁহাদের মতে বিশ্বের উপাদান এক অখণ্ড নিত্য বস্তু নহে; তাঁহাদের বহু সত্তা ধরিতে হইয়াছে। মন, চৈতন্য, পরমাণু—এ সমস্তই নিত্য; ইহাদের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান আছে; কেহ কাহারও অধীনস্থ নহে। তাহাদের একত্র সমাবেশে জগৎ রচিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক বলেন, এই সমাবেশ বা সন্নিবেশ ঈশ্বর কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। অতএব উপাদান ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে। আবার বৈশেষিক মতে পরমাণু-সন্নিবেশ ও পরিস্পন্দ কোনও কর্ত্তা দ্বারা হয় না। উহা কোনও অজ্ঞেয় কারণবশতঃ হইয়া থাকে। কাজে কাজেই ন্যায় ও বৈশেষিক মতে বহু সত্তা এবং উহাদের একত্র সংযোগে জগৎ রচিত হইয়াছে। যাহা হউক, বহুসত্তাবাদীর বহু

১। স্বাভাবিকং নাম কিমুচ্যতে, কিমহেতুকং অবিজ্ঞাতহেতুকং, অনিয়তহেতুকং বা।—ন্যায়মঞ্জরী, ৪৭০।

উপাদান-ঘটিত জগৎ রচনা বুঝা কঠিন। সাংখ্যেরও প্রকৃতি সর্ব্বময়ী। এক দিকে মনোবস্তু ও অপর দিকে জড়, এই উভয়ের বিক্ষোভ ক্রিয়াশীল রজের দ্বারা হইয়া থাকে বা রজই ক্রিয়া বা কর্ম্ম। ইঁহাদের জড় ও জড়শক্তি এবং চিত্ত, এই তিন লইয়াই প্রকৃতি। তবে জ্ঞানের জন্য চৈতন্য আবশ্যক, সেই জন্য পুরুষের অবতারণা। এখানে প্রকৃতিই আপন শক্তিতে আপনি বিকশিত বা পরিণত হইতেছে, ইহাই সৃষ্টি। কাজেই সাংখ্যের সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যক হয় নাই। আত্মা কেবল দ্রষ্টা ও চেতন। এখানেও দেখা যাইতেছে, দুইটি সত্তা। বৈদান্তিক মতে প্রকৃতি জগৎকর্ত্তার বিবর্ত্ত মাত্র। অর্থাৎ জগৎকর্ত্তাই স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া বিশ্ব-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে জগৎকর্ত্তা ও প্রকৃতি দুইটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নহেন, একই বস্তুর দুইটি রূপ। এই জন্য বৈদান্তিক একসত্তাবাদী এবং এই মতটিই মানব-বুদ্ধির পক্ষে যুক্তিপূর্ণ।

বিশ্ব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ঠিক কি ছিল, তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধদের প্রাচীন কোনও দর্শন নাই। অভিধর্ম্ম গ্রন্থসমূহে যে সকল বিচার বিতর্ক আছে, তাহা অবশ্য সুসঙ্গত ও সুযুক্তিসম্পন্ন এবং উহাতেও অনেক দার্শনিক তত্ত্ব আছে। তবে উহার বিষয় অবতারণা ঠিক দার্শনিক ধারায় নহে। বুদ্ধ-মহানির্ব্বাণের পরেও থেরবাদীরা দার্শনিক গ্রন্থ-রচনায় উদাসীন ছিলেন। উহাঁদের ধর্ম্ম, নীতিশিক্ষা ও উপদেশই লক্ষ্য ছিল। মহাযানসম্প্রদায়ের ভিতরে বিশুদ্ধ দর্শন আছে এবং উহা বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ-প্রভাবে রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থের পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি এবং উহারও অধিকাংশই বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ লেখক দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, মহাযানসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-সংঘর্ষেই গঠিত হইয়াছিল। উহাঁদের ধর্ম্ম ও দর্শন দুইই, সূত্র ও অভিধর্ম্মমূলক নহে। মহাযান-সম্প্রদায়ের শূন্যবাদ, তথতাবাদ ও বিজ্ঞানবাদ প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ্য দর্শনে শূন্য ও বিজ্ঞান, এই দুইটি বাদেরই প্রতিবাদ দেখা যায়। বুদ্ধদেব জগতের মূল সত্তা সম্বন্ধে কি ভাব পোষণ করিতেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। শূন্যশব্দ তিনি দুই এক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি অগ্নি-শিখা ও উহার অন্তর্ধান প্রভৃতি দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্ব্বাণ ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। অগ্নি-শিখা পূর্ব্বে কোথায় ছিল ও কোথায় চলিয়া গেল, ইহা বাস্তবিকই ভাবুকের মনে চাঞ্চল্য আনিয়া দেয়।

শূন্যবাদীদের কথা প্রথমে বলিব। নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, কুমারজীব ও চন্দ্রকীর্ত্তি, ইঁহারাই শূন্যবাদী। নাগার্জ্জুনের মত বহু প্রতিভাশালী লেখক ভারতবর্ষেই সম্ভবে। শূন্য-পদার্থ কি, তাহা নাগার্জ্জুনের ভাষায় বলিব এবং যোগ্য টীকাকার চন্দ্রকীর্ত্তি তাহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিব। প্রজ্ঞাপারমিতায় আমরা দেখিতে পাই, "শূন্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মা নিঃস্বভাবযোগেন" অর্থাৎ বস্তুসমূহের স্বকীয় ভাব নাই; কাজেই উহার বিভিন্ন রূপ বা ধর্ম্ম—শূন্য। নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিকসূত্রে মূল কারণের লক্ষণ একস্থলে এইরূপ করিয়াছেন,—"শূন্যমিতি ন বক্তব্যম্ অশূন্যমিতি বা ভবেৎ। উভয়ং নোভয়ং চেতি

প্রজ্ঞপ্ত্যর্থং 'তু কথ্যতে।" এই মূলাধারকে শূন্য বলা যায় না, উহা অশূন্যও হইতে পারে অথবা দুইই হইতে পারে, কি তাহা নাও হইতে পারে, কেবল বুঝিবার জন্য শূন্য নাম দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধেরা শূন্যের আবার প্রকার-ভেদ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের মহাশূন্য আছে, আবার মহাশূন্য হইতে শূন্য অবধি ক্রমভেদ আছে।

অশ্বঘোষও একজন বড় দার্শনিক। তাঁহার লঙ্কাবতারসূত্রে "তথতা"বাদ অবতারণা করিয়াছেন। তথতা শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ভাবাভাবসমানতা" এবং কোন কোন স্থলে "তথতা" শূন্য নামেও বলা হইয়াছে। শূন্যবাদী নাগার্জ্জুন, তিনি সমস্তই নাই দেখাইয়াছেন অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ নাই, গমন (মোসন) নাই, কর্ম্ম নাই, সংস্কার এবং এমন কি, বুদ্ধও নাই। এইরূপে যাহা কিছু লইয়া বৌদ্ধ মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কিছুই নাই। তথতা মতে জগৎ বলিয়া কোনও অধিষ্ঠান নাই অথবা সমস্তই শূন্য—ধর্ম্ম বা গুণসমূহ ক্ষণিক। আমরা জগৎ রচনা করি বা আমাদের চিত্ত উহা রচনা করে; যেহেতু উহা "নির্ম্মিতপ্রতিমোহী" অর্থাৎ উহা মন দ্বারা গঠিত হইয়া আমাদের মুগ্ধ করিয়া রাখে। সমস্তই "মায়োপম"। বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রথম, যাহা জ্ঞানসমূহ ধরিয়া রাখে, তাহা খ্যাতিবিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়, যাহা কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে সজ্জিত করে, তাহা প্রতিবিকল্প বিজ্ঞান। তাহার পর চিত্তের কথা। সমুদ্র একটা জলরাশি, চিত্তও অনেকটা তাহাই। চিত্তের বৃত্তিসমূহ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। চিত্ত ও মনে প্রভেদ এই যে, চিত্ত ভাব-সমূহ সংগ্রহ করে ও মন উহার বিধান বা সন্নিবেশ করে এবং বিজ্ঞানরূপে পঞ্চস্কন্ধ রচনা করে। বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের শেষে কিছু বলা হইবে। রত্নকীর্ত্তির দুইটি প্রবন্ধে উহার আলোচনা আছে। তবে উহা "তথতা"বাদেরই পরিণাম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি অনুসন্ধানে দৃষ্টিকেন্দ্র অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কল্পনা। বৈদিক যুগে প্রকৃতির নাম ঋত ছিল। উপনিষৎ, ব্রাহ্মণযুগেও ঋত শব্দ প্রকৃতিবাচক ছিল। মনুসংহিতাতে ঋত শব্দের উল্লেখ আছে; তবে উহা সত্য অর্থে। দর্শন-যুগে প্রকৃতিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। বোধ হয়, ঐ সময় হইতেই বিশ্ব-ব্যাপার, প্রকৃতি নাম ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধেরা স্বভাব-বাদী নহেন, আবার প্রকৃতি-বাদীও নহেন; তাঁহারা এই দুইটি নামই ত্যাগ করিয়া উহার নূতন নামকরণ করিলেন। তাঁহারা এই বিশ্ব-ক্রিয়ার প্রতীত্যসমুৎপাদ[১] নাম দিলেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহাতে বহু উপসর্গ সংযোজিত হইয়া থাকে; দেশে নূতন ভাব আসিলে নূতন কথা না হইলে প্রাণের আশা মিটে না। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধের দৃষ্টিতে এক বিশাল ব্যাপার, উহা একদিকে ধর্ম্ম, আবার উহা শূন্য। কাজেই যাহার উপর এত বড় সংস্কার আরোপিত আছে, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য লইয়া যে মতভেদ হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এক সম্প্রদায় "ইতি" ধাতুর অর্থ করিলেন—গতি, গমন অর্থাৎ বিনাশ; অতএব প্রত্যেক বিনাশী

১। সংযুত্তনিকায়, ১২,১০ দ্রষ্টব্য।

ভাবের সমুৎপাদ, প্রতীত্যসমুৎপাদ। আর এক মতে "প্রতি" উপসর্গ বীপ্সার্থে, "ইত্য" শব্দ প্রাপ্তি অর্থে, সমুৎপাদ শব্দ সম্ভবার্থে; অতএব রূপ প্রভৃতি প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া উহা প্রতীত্যসমুৎপাদ। তারপর ধর্ম্মসঙ্গিনী নামক অভিধর্ম্ম গ্রন্থে "তস্স পচ্চয়ধম্মস্স ভাবেন ভবনশিলস্স ভাব" অর্থাৎ প্রত্যয় ধর্ম্মের ভাব হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহারই ভাব। আর এক মতে "ইমস্সিন্ সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপপাদ ইদং উপপজ্জতে" ইত্যাদি। তাহার পর সিংহলী টীকা আছে—"পচ্চয়সামগ্গিম্ পতিচ্চ সমং গন্ত্বা ফলানাম্ উপ্পাদ এতস্মাতি পতিচ্চসমুপ্পাদ"। তাহার পর ব্রহ্মদেশের টীকা আছে—"তদ্ভাবভাবী ভাব"। যাহা হউক, আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির মতে সমুৎপাদ শব্দ প্রাদুর্ভাব অর্থে ব্যবহৃত; অতএব হেতু-প্রত্যয়-অপেক্ষিত অভাবসমূহের উৎপাদই প্রতীত্যসমুৎপাদ।

যাহা হউক, প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের যত অর্থই থাক, সকল অর্থেরই একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা কার্য্য-কারণ-বোধক। তবে উহা নিমিত্ত বা উপাদান কারণ নহে; কতকগুলি ব্যাপারের একত্র সমবায়ে যে ভাবের উৎপত্তি হয়, সেই ভাবটাই প্রতীত্যসমুৎপাদ-জনিত। সে ব্যাপারগুলির নাম প্রত্যয় অথবা সম্বন্ধ। (১) হেতু, (২) আলম্বন, (৩) অনন্তর ও (৪) আধিপত্যেয়, এইগুলির নাম প্রত্যয়। (১) যে যাহার নিবর্ত্তক অর্থাৎ বীজ-ভাবে স্থিত, সে তাহার হেতু। (২) যাহা অবলম্বন করিয়া কোনও ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই আলম্বন। (৩) কারণের নিরোধে কার্য্যের উৎপত্তি, যেমন বীজের নিরোধে অঙ্কুরের উৎপত্তি, ইহাকেই অনন্তর বলে। (৪) আধিপত্যেয় "যস্মিন্ সতি যৎ ভবতি" অর্থাৎ যাহা হইলে যাহা হয়, সেই তাহার আধিপত্যেয়। মাধ্যমিক সূত্রমতে এই প্রতীত্যসমুৎপাদই শূন্যতা, "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষতে"। অতএব প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধ তন্ত্রের চূড়াস্বরূপ এবং ইহা সাংখ্যের প্রকৃতি নহে ও নাস্তিকের স্বভাবও নহে; ইহা একটা নূতন কল্পনা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সময়ে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, তখন ভারতে বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধ, মন সম্বন্ধে এত বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে সে সকল বিষয় আলোচনা না থাকিলে তদানীন্তন সুধীমণ্ডলীর উহা বোধ-গম্য হইত না। তাহার নিদর্শন উপনিষৎসমূহে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দর্শনগুলি কতকটা ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র কেবল দর্শন নহে, উহা ধর্ম্মও বটে; এমন কি, ন্যায় বৈশেষিক তত্ত্ব যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরও মুক্তি হয়। বৌদ্ধ তত্ত্বও ঐরূপ একটা দার্শনিক ধর্ম্ম। বোধ হয়, আত্মা ও বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে মহাভারত ও যোগবাশিষ্ঠের পার্শ্বে পিটকের স্থান হইত।

তবে শূন্যবাদ বৌদ্ধ-তন্ত্রেরই ব্যাপার, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। উপনিষৎ আলোচনায় বুঝা যায় যে, অসৎবাদ কোনও একটি সম্প্রদায়বিশেষ অধিকার করিয়াছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দুই[১] স্থানে আমরা স্পষ্টভাবে অসতের উল্লেখ দেখিতে পাই।

১। দ্বিতীয় বল্লী, ৬,৭।

প্রথম স্থলে, ব্রহ্মকে যদি অসৎ বল, তাহা হইলে তুমিই অসৎ। অপর স্থলে, জগৎ প্রথমে অস্তিত্বশূন্য ছিল, তাহার পর অসৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম অস্তিত্বে বা ভাবে পরিণত হইলেন। কাজেই শূন্যবাদ যে বুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল না, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

বৌদ্ধেরা জগৎকে কেবল কার্য্য-কারণ ও নিয়মাশ্রিত বলিয়া মনে করিতেন। বাহ্য জগতেও যেমন কারণ ও কার্য্য, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ। জগতের মূল শূন্য। ভাবের উদয় হইতেছে সত্য, তাহার পর আবার অভাব। যে ক্ষণটুকু উহা বিজ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত থাকে, সেইটুকুই আমরা জানিতে পারি। সকল ভাবেরই উৎপাদ ও নিরোধ হয়, তাহা ছাড়া অপর কিছুই নাই। ইহার মূলে অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অঙ্গ[১]। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, উহা হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি এবং জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য প্রভৃতি। এই কঠোর নিয়মবশে মানুষের জীবন চলিতেছে। আবার এদিকে আভ্যন্তরীণ জীবনেও ঐ কঠোর নিয়ম। সংস্কার বা বৃত্তি লইয়া মানসিক গঠন এবং রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধের মধ্য দিয়া পুনরায় সংস্কার।

এখন কথা এই যে, মানুষ কি কেবল যন্ত্রের মত এই জীবনচক্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে? মানুষের কিছু কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নাই? ইহার উত্তর, মানুষের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য আছে এবং যিনি সম্বুদ্ধ বা তত্ত্বদর্শী হইয়াছেন, তিনিই জীবনের পন্থা স্থির করিতে পারেন। কি ভাবে তত্ত্বদর্শী হয়, তাহা পরে বলা হইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশাঙ্গ একটি উচ্চ তত্ত্ব। তাহা ছাড়া চারিটি আর্য্য-সত্য আছে—দুঃখ, দুঃখসমুদয় বা উৎপত্তি, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপৎ বা পন্থা। দুঃখ নিরোধের উপায় কি? দুঃখ নিরোধের উপায় অষ্টমার্গ[২]। কর্ম্মজনিত সংসার বা প্রেত্যভাব অর্থাৎ মানুষের যাওয়া আসা উপনিষদেরই শিক্ষা। চারিটি আর্য্যসত্যের উল্লেখ যোগদর্শনেও আছে। তবে ইহা বৌদ্ধেরা যোগদর্শন হইতে পাইয়াছেন অথবা যোগদর্শন এ বিষয়ে বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ধ্যান ব্যাপারটি বৌদ্ধ-পূর্ব্বযুগের এবং উহার প্রকরণ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

এখন বৌদ্ধনীতি কি, তাহাই দেখা যাউক। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য-[৩] বাদী। যদিও জন্মসূত্রে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মনিয়ম অনুসারে মানব-চরিত্র গঠিত হয়, তাহার বৃত্তিসমূহ আকারিত হয় এবং এই হিসাবে তাহারা নিয়তিবাদী, কিন্তু বীজরূপী পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কারসমূহ ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতির দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়। সংস্কার শব্দ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয় শাস্ত্রেই নানারূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে বেগাখ্য, স্থিতি-

১। কোন মতে ৯ ও ৫ [মিলিন্দ প্রশ্ন, দিঘনিকায় ১৫, মহানিদানসুত্ত]। ২। সম্যক্‌দৃষ্টি, সংকল্প, বাক্‌, কর্ম্মান্তঃ, আজীব, ব্যায়াম, সমৃতি, সমাধি। কর্ম্মান্তঃ = conduct, ব্যায়াম = endeavour।
৩। Free Will.

স্থাপক ও ভাবনাখ্য, এই ত্রিবিধ সংস্কার। এখানে সংস্কার শব্দ ইংরাজী "আইডিয়া" ও "পোটেন্‌সি" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহা জড় ও মন, উভয় বিষয়েই ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বৃত্তি (predisposition) অর্থাৎ যাহা সঞ্চিত হয় এবং পরজন্মে প্রকাশিত হয়, এরূপ অর্থেও সংস্কার শব্দ ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধেরাও দুই অর্থে সংস্কার শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, একটি সংস্কারস্কন্ধ ও অপরটি সঞ্চিতবৃত্তি বা অভ্যাস। বৌদ্ধমতে বহু সংস্কার,—কেহ বাহান্নটি, কেহ বা ততোধিক সংস্কার ধরিয়াছেন। সংস্কার চেতসিকের অন্তর্গত অর্থাৎ উহা চিত্তের এক একটি ভাব। আবার এদিকে বিজ্ঞানও উননব্বইটি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মন লইয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই বিশেষভাবে সাধনা করিয়াছেন। চেতসিকসমূহ, রস, ভাব ও বৃত্তি।

নীতিসাধনে কতকগুলি চেতসিক বিশেষ আবশ্যক। বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য্য, প্রীতি ও চণ্ড। বিষয়ে অগ্রসর হওয়াকে বিতর্ক বলে। বিষয়ে মনোরক্ষা—বিচার; অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টিতে মনঃ সংযোগ করি, কি না করি, ইহাই অধিমোক্ষ; বীর্য্য অর্থে উৎসাহ; প্রীতি অর্থে আনন্দ বা অনুরাগ; কামনা বা কামকে চণ্ড বলে। কোন বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চার করিতে হইলে ইচ্ছার আবশ্যক। বৌদ্ধ ভাষায় ইচ্ছার নাম চেতনা। চেতনা দ্বারা বিষয়ে একাগ্রতা হয়। আবার কতকগুলি হেয় চেতসিক আছে। সেগুলি মোহ (ভুল-বুঝা), আহিরিক (লজ্জাহীনতা), অনোত্তপ্প (ফলাফল-চিন্তাবিহীনতা), উদ্ধচ্চ (মনঃসংযোগে বাধা)। লোভ ও দিট্‌ঠি, এই দুই বিশেষ চেতসিক।

নীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অনুরুদ্ধের অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। উহা একখানি সংগ্রহ-পুস্তক এবং অভিধর্ম্মের সার মর্ম্ম উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। খ্যাতনামা বুদ্ধঘোষ বোধ হয়, সকল লেখক অপেক্ষা টীকা টিপ্পনীর দ্বারা এবং তাঁহার বিশুদ্ধিমার্গ-নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বিশুদ্ধি-মার্গে এ সকল বিষয় যথেষ্ট আলোচনা আছে।

কর্ম্মের মূলতঃ দুইটি ভাগ, কুশল ও অকুশল। ইহা ছাড়া অপরাপর ভাগও আছে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই তিন প্রকার কর্ম্ম। আবার কারণ-রূপী কর্ম্ম—যাহা মানুষকে সংসারে আনে; বিপাক কর্ম্ম অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ হইতেছে এবং ক্রিয়া অর্থাৎ কারণ-শূন্য কর্ম্ম, ইহা "বুদ্ধ" অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। কর্ম্ম-মার্গে উত্থানের পূর্ব্বে কতকগুলি শীল ও ষট্ পারমিতা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শীলসমূহ বুদ্ধের দশশীল বা নিষেধ-বাণী; আর পারমিতাগুলি[১] বিধি, তৃষ্ণা ও কাম মানুষকে বিপথগামী করে। কুশল কর্ম্মে মন নিবিষ্ট হইলে ক্রমশঃ বীথিমুক্ত হয় অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। তাহার ফলে "জবন" অর্থাৎ বিষয়ের সম্যক্ প্রতীতি।

বিজ্ঞান যে কেবল বাহিরের বস্তুরই হইয়া থাকে, তাহা নহে; পারমার্থিক জগতেরও বিজ্ঞান

১। দান, শীল, ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা), বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা এবং অপর চারিটি উপায়, প্রণিধান, বল ও ধ্যান।

হয়। পারমার্থিক জগতের বিজ্ঞানের আবার ক্রমভেদ আছে। প্রথমতঃ আদিকর্ম্মিকা বীথি অর্থাৎ শীলবিশুদ্ধি। ইহা সুকৃতি ভিন্ন হয় না। আগে সংসার-চিন্তা দূর করিয়া অভীষ্ট চিন্তার প্রতি মন অগ্রসর করিতে হইবে। প্রথম আরম্ভে পরমার্থ বিষয়ের যে আভাস হয়, উহা পরিকর্ম্মনিমিত্ত[১]। তাহার পর বিষয়ের পরিস্ফুট[২] মূর্ত্তি সম্মুখীন হয়, তাহার নাম উগ্রহনিমিত্ত। তাহার পর পাঁচটী বাধা আসে—তাহাদের নাম পঞ্চনিবারণ। সে বাধা অতিক্রম করিলে উপচার-সমাধি। ইহাই যোগ-জীবনের বোধ হয় আরম্ভ। এই অবস্থায় কাম-বিজ্ঞান বা ক্ষুৎ-পিপাসার জগৎ চলিয়া যায়। তাহার পর রূপবিজ্ঞান আসে ও এই অবস্থার ইহা প্রথমাধ্যায়, ইহার আবার অঙ্গবিভাগ আছে। তাহার পর বিচার অর্থাৎ আবার ঐ অবস্থার বিষয়ে মনোরক্ষা, বিচারের পর প্রীতি-ক্ষুদ্র ও ঐকান্তিক। সুখ, বৌদ্ধের মরু-মরীচিকা বা জলভ্রম, আর প্রীতি বাস্তবিক জলপ্রাপ্তি। তাহার পর ধ্যানানন্দ। অর্হতদের স্থান বেশ উচ্চ নহে। তাঁহারা ধ্যানী নহেন; তাঁহারা শুষ্ক বিপশাক। ধ্যানানন্দকে 'অপ্‌পনা' বলে এবং ঐ অবস্থায় যে বিতর্ক হয়, তাহাতে চিত্ত বিষয়ের মূলে প্রবিষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক যায়, তৃতীয় ধ্যানে বিতর্ক-বিচার যায়, চতুর্থে প্রীতি যায় এবং পঞ্চমে সুখস্থানে উপেক্ষা আসে। যোগদর্শনেও এ সকল তত্ত্বের কথা আছে। সুতরাং ইহা কোনও নূতন ব্যাপার নহে। ধ্যানের ফল ইদ্ধি বা ঋদ্ধি—"চত্তারো ইদ্ধিপাদো"। এবং দশ প্রকার ঋদ্ধি। অধিষ্ঠান-বীথি ও অভিজ্ঞা-বীথিও ধ্যানের ফল। আবার দিব্য চক্ষু, দিব্য শ্রোত্র, পরচিত্ত বিজ্ঞান (থট রিডিং) ও পূর্ব্ব-নিবাসের অনুস্মৃতি, ইহাও যোগীর হইয়া থাকে।

কামলোক ও রূপলোক অতিক্রান্ত হইলে যোগীর দৃষ্টি অরূপ লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় অনন্ত-দেশ-জ্ঞান হয়। তাহার পর দশধা অবস্থা। তাহার পর আরও অভিজ্ঞান আসে; উহার পর অনিমিত্ত জ্ঞান অর্থাৎ ধর্ম্ম বা গুণশূন্য জ্ঞান এবং পরিশেষে শূন্যতা উপলব্ধি।

এ সকল বিষয় আমাদের নিকট কেবল শব্দঝঙ্কার মাত্র। কিন্তু ইহাও সংক্ষেপে বলা হইল। যাঁহারা ইহার বিশেষ বিবরণ চাহেন, তাঁহারা বুদ্ধঘোষের ধর্ম্ম-সঙ্গিনীর টীকা ও বিশুদ্ধি-মার্গ দেখিতে পারেন। ইহার বিষয় সাংখ্যদর্শন, বিশেষতঃ যোগদর্শনে পাওয়া যাইবে। ইহার ফল অর্হত্ত্ব অথবা বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি। বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি হইলে নির্বাণ। নির্ব্বাণ অসংযত ধাতু অর্থাৎ সংস্কারশূন্য-ধাতু—উহা অস্তিত্ব-লোপ নহে বা "এনাইহিলেসন্" নহে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই দুঃখবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্য-জীবন অসার, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই মত নহে। হিন্দু ও বৌদ্ধ "পেসিমিষ্ট" নহেন। মানব-জীবন অমূল্য, ইহা উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন।

অতএব বৌদ্ধদের মূল নৈতিক মত সংক্ষেপে বলিতে গেলে কুশলকর্ম্মের অনুষ্ঠান। কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে পূর্ব্বজন্মের সুসংস্কার থাকা চাই এবং থাকিলে মনোবৃত্তি সেই অভিমুখেই থাকে। কাম বা তৃষ্ণা কার্য্যের প্রেরক। চেতনা সাহায্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

১। Transcendental percept. ২। Transcendental visualisation.

সাধন হয়। পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করিতে হইলে শীল ও পারমিতা আচরণ, করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি বৃত্তিসমূহের অনুসরণ এবং বিচার বিতর্ক দ্বারা তাহার উপকারিতা উপলব্ধি, এই ভাবে সংস্কারসমূহ গঠিত হয়। যাঁহারা উচ্চ পন্থায় প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধ্যান আবশ্যক, উচ্চ তত্ত্ব কেবল ধ্যানের দ্বারাই জানা যায়। মূল তত্ত্ব সংবৃত বা আচ্ছাদিত ; এক একটা আচ্ছাদন খুলিয়া গেলে ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। প্রথমে কামলোক, তাহার পর রূপলোক, তাহার পর অরূপলোক। লোক অর্থে এক একটি অন্তর্জগৎ বা সত্যের জগৎ। এক একটি ধ্যানে এক একটি নূতন আধ্যাত্মিক জগৎ পাওয়া যায়। এইরূপে চতুঃ বা পঞ্চ ধ্যান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের জ্ঞান হয়। এবং একবারে সংস্কারশূন্য, কামনাশূন্য হইলে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি হয়।

বুদ্ধপূর্ব্বযুগে নৈতিক তত্ত্ব কি ভাবের ছিল, দেখা যাউক। কাম শব্দটি বহু প্রাচীন। অথর্ববেদে উহার বিশেষ উল্লেখ আছে। কর্ম্ম শব্দটীও বহু প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে ধর্ম্ম-শব্দ ঠিক বৌদ্ধভাবে ব্যবহৃত হইত কি না, বলা যায় না। তখন উহা আচার বা রীতি অর্থে ব্যবহৃত হইত। তবে তৈত্তিরীয় শিক্ষা-বল্লীতে "সত্যং বদ ধর্ম্মঞ্চর", "ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্", এ স্থলে ধর্ম্মশব্দ বৌদ্ধভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ শিক্ষাবল্লীতেই আবার আচার্য্য "যানি অনবদ্যানি[১] কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি", "কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্"[২], "যানি অস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি", তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে শিষ্যের প্রতি গুরুর এই উপদেশে, বৌদ্ধ দশ শীল ও ষট্ পারমিতার মূল ভাবসমূহ পাওয়া যায়। তাহার পর কর্ম্ম ও ভব বা সংসার-বিষয়ক আলোচনা বৃহদারণ্যকে[৩] পরিষ্কার ভাবেই পাওয়া যায়। "যে বিষয় পুরুষের আসক্তি, সেই বিষয় লিঙ্গ-প্রধান মন কর্ম্মের সহিত প্রাপ্ত হয়।...............সেই লোক হইতে আবার মনুষ্যলোকে কর্ম্ম-করণের জন্য আসে। সে কামনা সহ অথবা কামনাশূন্য হইয়া আসিয়া থাকে। সে যদি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম অথবা আত্মকামসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না—সে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।" উহার পূর্ব্বের শ্লোকটিও এ স্থানে উল্লেখযোগ্য। "এই পুরুষকে কামময় বলিয়া থাকে ; তাহার কামনা যে ভাবের হয়, তাহার চেষ্টাও সেই ভাবের হইয়া থাকে এবং কর্ম্মও সেই ভাবের হইয়া থাকে। আবার যেরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়।" এই ভাবের আলোচনা বিভিন্ন উপনিষদে পাওয়া যায়। কাজেই উহা বৌদ্ধপ্রণীত নহে, উহা বৈদিক যুগেরই সম্পত্তি।

তাহার পর ধ্যানের কথা। ধ্যানযোগের কথা শ্বেতাশ্বতরে (১অ, ৩ শ্লো) আমরা দেখিতে পাই। ঐতরেয় উপনিষদে (১অ, ১১ শ্লো) "মনসা ধ্যাতম্" শব্দ পাওয়া যায়। সংহিতা-যুগেও ধ্যানের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতে ধ্যান, যোগ, সমাধি প্রভৃতি কবে আসিল, কোন্ ঋষি ইহার প্রণেতা, তাহা বলা যায় না। অপর কোনও প্রাচীন ধর্ম্মে ইহার চিহ্ন দেখা যায় না। ভারত যে ধর্ম্ম-প্রাণ, এক যোগ ও সমাধিই তাহার প্রমাণ। অপর দেশে ঐহিক আবিষ্কার

১। অনিন্দ্যনীয়ানি।　　২। বিচলিতব্যম্।　　৩। ৪ অ, ৪ ব্রা, ৬ শ্লো।

অনেক হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক মিশরেই শিল্প ও বিলাস-সামগ্রী কত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের উপায় ভারত ছাড়া অপর কোনও দেশে হয় নাই। কিন্তু একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই যোগবিশ্বাসী, অথচ পন্থাভেদ কেন হইল? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পন্থাভেদ বিশেষ নাই। উভয় সম্প্রদায়ই সৃষ্টির মূলে সত্তা দেখিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ই সৃষ্টিক্রমে বিবর্ত্ত, বিকার, পরিণাম বা অন্যথাভাব স্বীকার করেন। মূল সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ই অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তবে মানবাত্মার সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত নহেন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু মতে মানবাত্মা, পরমাত্মারই অংশ এবং উহা নিত্য ও অব্যয়। কর্ম্ম-ফল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বৌদ্ধেরা সেরূপ আত্মা স্বীকার করেন না। মৃত্যুর পর কর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কর্ম্মের আধার কি, সংস্কার কোথায় থাকে, পুনর্জ্জন্ম কাহার হয়, তাহা বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে ভাল বুঝা যায় না। বৌদ্ধমতে কর্ম্ম যেন একটা ঐশী শক্তি এবং "কন্‌সারভেসন্" ও "পোটেনসির" মত একটা জাগতিক নিয়ম, উহার ক্ষয় ব্যয় নাই, উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উহা আপনার নিয়মে চলিয়া থাকে। বোধ হয়, মীমাংসকেরাও এই মত পোষণ করেন। তাঁহাদেরও কর্ম্ম হইতে অপূর্ব্ব এবং এই অপূর্ব্বও জড় নিয়মের মত মানবাত্মাকে বশীভূত করিয়া রাখে। উহাই আপন বলে স্বর্গে লইয়া যায়, আবার উহাই মর্ত্তে আনিয়া ফেলে।

বৌদ্ধ-তত্ত্ব কতকগুলি বিশ্বাস, আদেশ ও উপদেশ-সমষ্টি নহে। উহা যুক্তি, তর্ক ও সঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মে উপাসনা নাই। ঈশ্বর নাই, কাজেই উপাসনাও নাই। এমন কি, বুদ্ধেরও উপাসনা আবশ্যক নাই। কাজেই কর্ম্ম, অনুষ্ঠান, শীল, চরিত্র বা মনুষ্যত্বের দিকেই তাঁহাদের অধিক লক্ষ্য ছিল। শীল, চরিত্র, মুদিতা, করুণা প্রভৃতির সাধন এত অনুষ্ঠান-বহুল হইয়াছিল যে, ক্রমশঃ তাহা মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর আবার পঞ্চধ্যান, ইহারও আবার শত শত প্রকরণ। কাজেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সেই কারণে বৈদান্তিক ধর্ম্মও সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ও অনুষ্ঠানের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণে উহাকে পিরামীড মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার বলিয়া বুঝিত; উহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিত না। অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু সে অনুষ্ঠানের ভিত্তি নিজের মনের ভিতর নহে; উহা কেবল শুষ্ক সাধনেই পরিণত হইয়াছিল। কাজেই উহাদের স্থূল পৌরাণিকেরা তাঁহাদের সরস ভাব ও সরল সাধন দ্বারা অধিকার করিলেন। ঔপনিষদেরা রসের দিক্‌টা আবশ্যকীয় বুঝিয়াছিলেন। কাজেই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রহ্মকে রসময় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগৃহে রসের উল্লেখ বা রসসৃষ্টি দেখা যায় না। অন্ততঃ থেরবাদী বৌদ্ধেরা নহেন। জাতকে ঐ চেষ্টাটা হইয়াছিল; আখ্যায়িকার আচ্ছাদনে রস উদ্ভাবনের উহা চেষ্টা বটে, কিন্তু উহাতে ভাবলালিত্য, সাহিত্য-কলা, সৃষ্টি-নৈপুণ্য নাই। ব্রাহ্মণেরা আখ্যায়িকার দিক্‌টা সাজাইয়া গোছাইয়া এক বিপুল ধর্ম্ম-সাহিত্য রচনা করিয়া জন-সাধারণের ধর্ম্মপিপাসা মিটাইয়া দিলেন।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধদের বাঁধা দর্শনশাস্ত্র নাই, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বুদ্ধের

উপদেশ ও বিচার-প্রণালী দর্শনমূলক। দার্শনিকের পিপাসা, বুদ্ধের উক্তি ও তত্ত্ববিচার পাঠ করিলে তৃপ্তি হয়। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি ও কৌতূহলই বিজ্ঞান ও দর্শনের সৃজন করিয়া থাকে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের (১২৯) সৃষ্টিসূক্তে "সৎ বা অসৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না,—বায়ু, আকাশ ছিল না; কি সামগ্রীর দ্বারা সমস্ত আবৃত ছিল এবং কাহার দ্বারা রক্ষিত হইত এবং পূর্ব্বে কি সমস্তই জলময় ছিল?" ইত্যাদি। এখানে একটা প্রবল দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আমরা দেখিতে পাই। বৌদ্ধদেরও অষ্ট-দৃষ্টির উল্লেখ আছে। হয় ত এই দৃষ্টিই পূর্ব্বে দর্শন-কঙ্কাল ছিল। "অহং অভুবং অতীতাধ্বানম্, নাভুবমতীতাধ্বানং, কিং স্বিদং, কথং স্বিদং" অর্থাৎ "আমি পূর্ব্বে ছিলাম বা পূর্ব্বে ছিলাম না; ইহা কি? ও ইহা কেন," এই সকল প্রশ্ন হইতেই দর্শনের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাহার পর দুঃখ। দুঃখের উৎপত্তি প্রভৃতি চারিটি আর্য্যসত্য, ইহাও দার্শনিক অনুসন্ধান। যোগদর্শনেও ইহার উল্লেখ আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে যেমন রোগ, রোগের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে এবং উহা যেমন চিকিৎসা-দর্শন বা উহার মূল, এই আর্য্যসত্য কয়টিও বৌদ্ধতত্ত্বের মূল এবং ইহা বৌদ্ধগৃহে বিশেষ ভাবে আদরের সামগ্রী। বৌদ্ধজ্ঞান যুক্তি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; উপনিষৎযুগের তত্ত্বসমূহ বুদ্ধের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল এবং তিনি উপনিষদের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উপনিষৎ হইতেই দর্শনযুগের আরম্ভ এবং বুদ্ধ, দার্শনিক বিচার হইতে কখন বিচলিত হন নাই।

বৌদ্ধ জ্ঞানবাদ

বুদ্ধ পূর্ণমাত্রায় শূন্যবাদী ছিলেন কিনা অথবা তিনি ক্ষণিক-বাদী ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ একটা জটিল দার্শনিক বাদে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং উহাও বৌদ্ধ দর্শনেরই অঙ্গ ধরিতে হইবে। বুদ্ধ, প্রকৃতির পশ্চাতে এক মহাসত্তা দেখিলেন। প্রকৃতির কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন যে, বায়স্কোপের দৃশ্যাবলীর মত উহার অতীত ক্রিয়াসমূহ কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে, আর ভবিষ্যৎটাও কোন একটা অজ্ঞাত বস্তুতে লীন হইতেছে; কেবল বর্ত্তমানটাই আমরা বুঝিতেছি, এইটুকুই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। বর্ত্তমান সতত অতীতে মিলাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাকারে সম্মুখীন হইতেছে। এরূপ স্থলে বৌদ্ধসাধনা "তত্ত্বমসি"তে না পৌঁছাইয়া প্রতীত্যসমুৎপাদে উপস্থিত হইল। শূন্যের উপাসনা নাই, শূন্যের হস্তামলকবৎ উপলব্ধি নাই, শূন্যের সহিত মানুষের কোন সম্বন্ধ নাই, উহার বিবর্ত্ত নাই, ধ্যান দ্বারা কেবল ঐ ভাবাভাবরূপী বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। দর্শন বা যুক্তিতে কথাটা বেশ ভাল, জগতের একটা নূতন চিন্তা বটে, কিন্তু জিনিসটা পূর্ণ অবয়বের নহে। ইহাতে সব সমাধান হয় না। ইহার কতক অজ্ঞেয়ের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত, আবার কতক মানুষের জানিবার আবশ্যক নাই; যেহেতু তাহার অনুসন্ধান নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষ তাহা ছাড়িবে কেন? মানুষ প্রশ্ন-পটু, এক একটা বিষয় প্রশ্নাকারে মানব-সমাজে সমাধানের জন্য আসে। ইহাও জগৎ-রহস্যের একটা রহস্য।

মানবজ্ঞান সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা অনেক অনুশীলন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে জ্ঞানই নহে, তাহা বৌদ্ধেরা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান কেবল শিশু ও পশুরই হইয়া থাকে। বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রায় একই ভাবের বোধ হইয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মানুষ চিরকালই একভাবে দেখিতেছে; তাহাতে কেবল চক্ষু-লব্ধ জ্ঞানই হয়। কিন্তু সৌর জগতের জ্ঞান, উহার নিয়ম ও শৃঙ্খলার অনুভূতি মানসিক সন্নিবেশ। ইন্দ্রিয়সমূহ সামগ্রী সংগ্রহ করে, মন তাহাদের সাজাইয়া জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান রচনা করে। মন—আধার, জ্ঞান—আধেয়। মনের আকার অনুসারেই জ্ঞানের আকার হয়। কার্য্যকারণ, সম্বন্ধ, দেশ, কাল, রাশি, এ সমস্ত বাহির হইতে বা ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। মানুষ যাহা পর পর দেখে বা শোনে, মনের ভিতর উহা সেরূপ ভাবে সজ্জিত হয় না, কাজেই মন একটা আধার। সন্নিবেশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না, উহা অপর কোন শক্তিদ্বারা সজ্জিত হয়। উহা মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণ, সম্বন্ধ, কাল প্রভৃতি মনেরই সামগ্রী, উহারই ছাপে ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত জ্ঞানসমূহ মুদ্রিত হইয়া থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই এ তত্ত্বটা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। আবার জ্ঞানের দুইটা দিক্ আছে। বস্তু-প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান হয়, উহা উপস্থিত না থাকিলেও কেবল নামের দ্বারা উহা অনুভূত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমুদয়ের জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রকৃতি, সৌরজগৎ, জীব প্রভৃতি বহু খণ্ড-জ্ঞানের সমষ্টি, উহা একটি তত্ত্ব। বৌদ্ধদের সমুদয়-গ্রহণ, অর্থ-গ্রহণ, নামগ্রহণ, সংকেত-সম্বন্ধ প্রভৃতি জ্ঞানের অনেক পর্য্যায় আছে। সকল জ্ঞানের আধার হইলে বুদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান সকলের সমান নহে। একই বিষয়ের জ্ঞান বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ভিন্ন হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয়, বৌদ্ধমতে তাহার বিভিন্ন নাম আছে—প্রজ্ঞা, সম্প্রজ্ঞান ইত্যাদি। ইংরাজী "এক্স্পিরিয়ান্স্" এই প্রজ্ঞা বা সম্প্রজ্ঞান।

জ্ঞান ও সত্য পরস্পর সম্বদ্ধ। সত্য অবধারণই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। তবে মানুষ কতটুকু সত্য জানে? আমরা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলি, তাহার অধিকাংশই অপরের জ্ঞান এবং উহাই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। তাহার উপর অনেক বিষয় মতামত মাত্র; তাহা সত্য, কি অসত্য, বুঝিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য মতে সাধারণতঃ সত্য দুই প্রকার—ধ্রুব বা নিশ্চিত[১] ও কাদাচিৎক[২]। সত্যের অনেক ভাগ হইতে পারে—নিশ্চিত, অনিশ্চিত, সংশিত বা উপেক্ষিত। গুরুত্বের জন্য পতন, মেঘ ও বৃষ্টি, মঙ্গলগ্রহে জীব প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধমতে (শূন্যবাদী) সত্য দুই প্রকার। সংবৃত্তি ও পারমার্থিক। অবিদ্যা জীব-মাত্রেই সাধারণ এবং উহা জগতের প্রকৃত তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া জীবের সাধারণ জ্ঞান সংবৃত্তি-জ্ঞান অথবা বেদান্ত-মতে ব্যবহারিক জ্ঞান। প্রজ্ঞা, সম্প্রজ্ঞান প্রভৃতি প্রসারিত হইলে পারমার্থিক জ্ঞান হইয়া

১। Necessary. ২। Contingent.

থাকে। তবে উহা ধ্যান-সাপেক্ষ। শূন্যতা, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও সংসারের জ্ঞান পারমার্থিক। উহা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। তবে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রভৃতি কাহার? ইহা কাহার আশ্রিত? বৌদ্ধমতে উহা চিত্ত বা উহার ধর্ম্ম; উহা অহম্-আশ্রিত নহে। বৌদ্ধমতে জ্ঞান-প্রকরণে ইন্দ্রিয়-সংবেদন মূল ব্যাপার, অথবা প্রজ্ঞা মূল ব্যাপার, তাহা বড় বুঝা যায় না। উভয়ই ক্ষণিক, ভাবাভাব সম্পন্ন ও ক্রম-অক্রম-সমর্থ। সকলই চঞ্চল, অস্থির, উৎপাদ-নিরোধশীল।

বৌদ্ধ সত্তাবাদ

জ্ঞান ও সত্তা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। জ্ঞান সত্তারই হইয়া থাকে। এখন যদি সত্তা একই হয়, তাহা হইলে বহু সমাবেশ কি করিয়া হয়? তাহার উত্তর, সত্তার ক্ষয় ব্যয় নাই; ধর্ম্ম ও গুণেরই উৎপাদ বিনাশ হয়। হিন্দুদর্শনে দ্রব্য বা সত্তা বা পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। গুণসমূহ দ্রব্যের আশ্রিত। তথতা বা ক্ষণিকতাবাদী বৌদ্ধ একসত্তাবাদী। রত্নকীর্ত্তির ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তৎপ্রণীত ছয়খানি ন্যায়গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত করিয়াছেন। উহাতে সত্তা সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা প্রথমে উল্লেখ করি। রত্নকীর্ত্তি, ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-তন্ত্র-প্রচলিত সত্তার সাতটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থক্রিয়া-কারিত্ব, সত্তা-সমবায়, স্বরূপ-সত্তা, উৎপাদব্যয়-ধ্রৌব্য-যোগিত্ব, প্রমাণ-বিষয়ত্ব, সদুপলম্ভ-প্রমাণ-গোচরতা, ব্যপদেশ-বিষয়ত্ব। এইগুলির মধ্যে অর্থক্রিয়াকারিত্বই, বৌদ্ধমতে সত্তার প্রধান লক্ষণ। "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ঘটঃ" এই বিবাদটি তুলিয়াই রত্নকীর্ত্তি বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। বৌদ্ধদের সৎ ও বৈদান্তিক সৎ পরস্পর বিরোধী। যাহা হইতেছে, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই সৎ। বৈদান্তিক বলেন, যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই অসৎ—কেবল মূলাধারই সৎ। ক্ষণভঙ্গ-বাদীদের মতে কার্য্য-কারণ-সন্তান অনবরত চলিতেছে—বীজ হইতে অঙ্কুর এবং তাহার পৃষ্ঠভাবী অপরাপর ব্যাপার। ইহার উৎপত্তি নিবৃত্তি জানিবার উপায় নাই, অন্ততঃ লৌকিক জ্ঞানে উহা হয় না। বৌদ্ধেরা জগৎকে কেবল ধারাবাহিক কার্য্য-কারণরূপে দেখিয়া-ছিলেন। প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে এ নিয়মটা খাটে। আর উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ-শক্তি দ্বারা জগতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, ইহাও আধুনিক মতে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কার্য্য-কারণের একটা বৃত্তি বা নিয়ম আছে; তাহা না হইলে সাংখ্যকারের (সর্ব্বস্য সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ) ইহার কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। অপরদিকে কৃতক বস্তু অর্থাৎ ঘট প্রভৃতি ক্ষণিক বলিতে পারা যায় না। যে বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, যাহার ক্রিয়া চলিতেছে, তাহাতে ভাব অভাবের সমষ্টি ধরিতে পারা যায়। বীজ ও অঙ্কুরে অনেক ভাব অভাব আছে, অনেক উপচয় অপচয় আছে। অথবা সৌগত দৃষ্টান্তে প্রদীপে তৈল ও বর্ত্তিকা-ক্ষয়ে কতকগুলি ক্রিয়াসন্তান ধরা যায়। কিন্তু ঘটের বেলায় কি ক্রিয়া হয়?

ইহার উত্তরে সৌগতেরা বলেন, উহা তখন কারণরূপী হইয়া থাকে, ক্রমশঃ উহাতে কার্য্য হইবে বা ক্ষয় হইবে। আবার ঘটে অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বা শক্তি আছে। এই অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব ঠিক কি, তাহা বুঝা যায় না। ইহার মূল অর্থ, বস্তুতে কার্য্য করিবার শক্তি আছে। মধ্যযুগের সৌগতেরা শক্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা শক্তি মানেন না। ঘট, পাক দ্বারা বা অপর উপায়ে ধ্বংস হইলে, উহা ত্রাসরেণু, দ্ব্যণুক এবং অবশেষে মূল অবয়বী পরমাণুতে পরিণত হয়। বৌদ্ধেরা সম্ভবতঃ এই অর্থক্রিয়া দ্বারা ঐরূপ কোনও ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। ঘটে সম্প্রতি যে অর্থক্রিয়া-কার্য্য উৎপাদন করিবার শক্তি রহিয়াছে, পরমুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন হয় এবং এই পরিবর্ত্তন রাসায়নিক। তবে বৌদ্ধেরা বস্তুর উপাদান-কারণ কি ভাবে দেখিতেন, তাহা অনুমানের বিষয়। তাঁহাদের পঞ্চ ধাতু আছে অর্থাৎ ভূত আছে; কিন্তু পরমাণুর স্থান নাই। ক্রমাগত কার্য্যধারা চলিতে থাকিলে মানুষের অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা নাই। তবে বস্তুসমূহের এক একটা অবস্থায় এক একটা অর্থসিদ্ধি বা বস্তু হইতে কার্য্যসিদ্ধি আছে, এই জন্য অভিজ্ঞতা।

বৌদ্ধদের জ্ঞানমূলে অপোহভাব আছে। অর্থাৎ গো-জ্ঞানে "অগো" বা গরু ব্যতীত অপর বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে গো-জ্ঞান হয় না। বৌদ্ধভাষায় গো-শব্দ "অগবাপোঢ়" অর্থাৎ যাহাতে গরুর রূপের অভাব আছে, সেই জ্ঞানটি থাকা চাই। ইহা ছাড়া তাঁহারা জাতি স্বীকার করেন না। বস্তুসমূহ স্বলক্ষণ অর্থাৎ তাহারা যাহা, সেই লক্ষণ দ্বারাই বুঝা যায়। জাতিটা অনুমানের বিষয়। "দণ্ডী পুরুষ" ইহা একটি বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং এই বিশিষ্ট বুদ্ধিই সামান্য জ্ঞান বা জাতিজ্ঞান। সামান্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি উপাধি চক্রমাত্র। ব্যক্তি-গ্রহণই পটু-প্রত্যক্ষ। আবার অবয়বী বলিয়া কোনও জিনিষ নাই অর্থাৎ নৈয়ায়িক মতে বস্তুর যাহা মূল অর্থাৎ পরমাণু, তাহাই অবয়বী এবং অপর সমস্ত বস্তু অবয়ব। বৌদ্ধেরা তাহা স্বীকার করেন না। উঁহারা বলেন, অবয়বের সমষ্টিই অবয়বী।

বৌদ্ধেরা বস্তুর স্বভাব স্বীকার করেন না। অগ্নির উত্তাপ অগ্নির স্বভাব বলিতে পারা যায় না। যেহেতু কাষ্ঠ, ইন্ধন ও বহ্নি সংযোগ না হইলে অগ্নি হয় না, উহাতেও কার্য্য-কারণ-ভাব রহিয়াছে। যদি বস্তুর স্বভাব কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার অন্যথাভাব কি করিয়া হয়? দুগ্ধের স্বভাব দধি অবস্থায় থাকে না অথবা ঘৃতও দুগ্ধ নহে। কাজেই বস্তুর স্বভাব কিছুই নাই। যদি সকল জিনিসই ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাহার ভাবান্তর ছাড়া উপায় নাই।

বৌদ্ধেরা সম্বন্ধ বা প্রত্যয় স্বীকার করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন কেবল বীজ সাহায্যে হয় না, উহাতে মৃত্তিকা, জল ও উপযুক্ত ক্ষেত্র আবশ্যক হয়। সুতরাং কারণের সহকারী অপরাপর ব্যাপার না থাকিলে কার্য্য হয় না।

বৌদ্ধেরা জগৎকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় ঔপনিষদিক ভাব নহে। তবে উহার মধ্যে ঐ সাময়িক অনেক মত প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। শূন্যবাদী

বৌদ্ধ এক শূন্য ছাড়া অপর কোনও পদার্থ স্বীকার করেন না। কিন্তু এরূপ হইলে ধর্ম্মের স্থান কোথায় ? নাগার্জ্জুনের মতে ধর্ম্ম নাই, এ কথা বলা যায় না। অমোঘ-ধর্ম্ম আছে এবং সে অমোঘ-ধর্ম্ম শূন্যতা বা প্রতীত্যসমুৎপাদ উপলব্ধি করিলেই হইয়া থাকে, ইহাই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। যাহা সংস্কারপ্রধান, তাহা মৃষামোষধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম দার্শনিক ধর্ম্ম। উপনিষৎ-যুগের পর ভারতে দার্শনিক যুগের আবির্ভাব হয়। দর্শনগুলি যেমন একদিকে তত্ত্ববিচার, অপর দিকে উহাতে একটা ধর্ম্মের কঙ্কালও আছে। বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনও বটে, আবার উহা একপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ। যে মহাত্মাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার স্থান ধর্ম্ম-জগতে অতি উচ্চ। উহা প্রায় সমস্ত এসিয়া ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছে এবং একটা নূতন আচার, অনুসন্ধান ও মানবাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া মানব-সমাজে এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

দুই খণ্ড সমিৎকাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ইহাতে অগ্নি-উপাসকেরা মনে করিতেন যে, সমিৎকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে। তাই সমিধ্ বড় পবিত্র। সমিধ্কে স্বস্তিক বলা হইত। সমিৎকাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে একখণ্ড হইতে দিব্যাগ্নি ও অপর খণ্ড হইতে পার্থিবাগ্নি উৎপন্ন হইত। যজ্ঞে আর তিনখানি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। এই কাষ্ঠত্রয়কে পরিধি বলা হইত। পরিধিও অগ্নির জনক। অগ্নি পূর্ব্বে ইন্দ্রের বজ্রমধ্যে নিহিত ছিলেন। ইন্দ্র বজ্রমধ্য হইতে তিনপ্রকার অগ্নিকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেন। তখন হইতে এক অগ্নি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, এক অগ্নি বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, আর এক অগ্নি জীবান্তর্গত হইয়া জীবগণের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন। অগ্নি, মাতা পৃথ্বীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অগ্নিই পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির জনক এবং অগ্নিই জীব-হৃদয়ে প্রাণ। পরিধি-কাষ্ঠত্রয়ের একটী মাতা পৃথ্বীর প্রতিনিধি, একটী তাঁহার উৎপাদিকা শক্তির জনক বলিয়া অগ্নি পিতৃরূপী, আর একটী কাষ্ঠ জীবের প্রাণের স্বরূপ। যজ্ঞে পরিধিকাষ্ঠত্রয় ত্রিকোণাকারে সজ্জিত হয় এবং প্রথম সমিদুৎপন্ন অগ্নিদ্বারা তাহার নিম্নে কাষ্ঠ প্রজ্বালিত করা হয়। পরিধির তলকাষ্ঠ জীবনী শক্তিরূপে পৃথ্বীদেবী ও বিশ্বপিতাকে সমুত্তেজিত ও একত্র সম্বদ্ধ করে। ত্রিকোণাকারে সজ্জিত পরিধিকাষ্ঠত্রয়ের মধ্যে যে সকল উপকরণ থাকে, পুরোহিত তারপর তাহাও প্রজ্বালিত করেন। প্রথম সমিধ্ দিব্যাগ্নি—দ্বিতীয় সমিধ্ পার্থিবাগ্নি। পুরোহিত এই দ্বিতীয় সমিদগ্নি দ্বারা বসন্ত ঋতুকে প্রজ্বালিত করেন এবং ইহা দ্বারা উৎপাদনক্ষম সমগ্র বর্ষকে প্রজ্বালিত করেন।

বৈদিক আখ্যানে পাওয়া যায়, অগ্নি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতরিশ্বার নিকট প্রথম প্রকট হইলেন। মনোবল ও মাহাত্ম্য দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্বর্গ ও পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত করিল। মাতরিশ্বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। তিনি অগ্নিকে অথর্বা ভৃগুর নিকট আনয়ন করিলেন। ভৃগু ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য মনুকে প্রদান করিলেন।

নানা ঋষিবংশদ্বারা অগ্নি প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বেদে উল্লেখ আছে। ঋষি অঙ্গিরা অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন বলিয়া শতপথ উপদেশ করিয়াছে। অঙ্গিরার জন্য অগ্নি হূত ও তাঁহা দ্বারা স্তুত হইয়াছিল বলিয়াই বেদে উল্লেখ আছে। বেদ বলে, অপ্নবান অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন। ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ সলিলাবাসে অগ্নির পূজা করিয়া আয়ুপরিবারে তাঁহাকে স্থাপন করেন। আয়ু-পরিবারে প্রথম অতিথি হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগের দ্বারাই গৃহে গৃহে নীত হন। বস্তুতঃ ভৃগুগণই মনুষ্যমধ্যে অগ্নিকে প্রথম প্রচার করেন।

ভরদ্বাজদিগের মধ্যেও অগ্নিকে প্রথম স্থাপিত দেখা যায়। মনুগণও প্রথম অগ্নিস্থাপন করেন। ইঁহারা ইদের গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। অগ্নি মনুদিগের পুরোহিত হইয়া পড়িলেন। শতপথে আছে যে, দেবগণ, মনু ও ঋষিগণ তাঁহাকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন।

অগ্নি নহুষদিগের গোষ্ঠীপতি হন। পুরুনীথ শাতবনেয়ের গৃহে অগ্নি প্রথম স্থাপিত। পুরুগণ তাঁহাকে প্রথম পূজা করেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতি অগ্নিপূজায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। নানা রূপে ও নানা নামে অগ্নি নানা স্থানে পরিচিত। প্রাচীন স্লাভেরা অগ্নিকে বলিত Ogni, পরবর্ত্তী স্লাভেরা তাহার নাম দিয়াছিল Ogün। লাটিন ভাষায় ইহা Ignis, লিথুয়ানিয়ানে ugnis। শব্দতত্ত্বালোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নি, ignis, ugnis, Ogni প্রভৃতি এক সুপ্রাচীন সাধারণ শব্দের রূপান্তর। কিন্তু অগ্নির ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সংস্কৃত 'অগ্নি'-শব্দে যত স্পষ্ট, অন্য কোন দেশের ভাষায় তাহা তত স্পষ্ট নয়। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশেষ সমস্যার বিষয়। ইহার বুৎপত্ত্যর্থ লইয়া ভারতের বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার কিছু পরিচয় আমরা দিব।

নিরুক্তি

অমরটীকায় ক্ষীরস্বামী 'অগ্নি'র ব্যুৎপত্ত্যর্থ দিয়াছেন—"অঙ্গতি ঊর্দ্ধং যাতি ইতি অগ্নিঃ" (১ম কাণ্ড, ৫৩ শ্লোক)। সাধারণতঃ অগ্নির নিরুক্তিতে এই অর্থই দেওয়া হইয়া থাকে। এই ব্যুৎপত্তির সার্থকতার পক্ষে সাধারণ যুক্তি এই যে, পদার্থবিশেষের এক একটী ধর্ম্ম আছে। জলের যেমন ধর্ম্ম নিম্নে গমন করা, অগ্নির তেমনই ধর্ম্ম ঊর্দ্ধে গমন করা। অগ্নির এই ধর্ম্ম দেখিয়া ক্ষীরস্বামীর এই ব্যুৎপত্তি।

ঋগ্‌ভাষ্যকার শাকপুণি অগ্নি শব্দের এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অগ্নিতে এই কয়টী বর্ণ আছে—'অ'—'গ্‌'—'নি'। এই তিনটীর আখ্যাত তিনি অতি কৌশলে বাহির করিয়া অগ্নি শব্দকে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। 'অঞ্জু'র 'অ', দহ্‌ ধাতু হইতে যে দগ্ধ পদ হয়, তাহার 'গ' এবং 'নী' ধাতুর 'নী'কে ছান্দস প্রণালীতে হ্রস্ব করিয়া তিনি 'অগ্নি' শব্দ খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ—

"ত্রিভ্য এব আখ্যাতেভ্যঃ জায়তে। অঞ্জু ব্যক্তিম্রক্ষগতিষু, অক্তেঃ অকারমাদত্তে, দহতে-র্দগ্ধশব্দাদ্‌গকারমাদত্তে, ততঃ নীপরাৎ তস্যৈষা ভবতি। নী ছান্দসত্বাৎ হ্রস্বো ভূত্বা নির্দিশ্যতে।" অগ্নির এই এক নিরুক্তি।

ঋগ্বেদের অন্যতম ভাষ্যকার যাস্ক তাঁহার প্রণীত নিরুক্তে বলিয়াছেন,—"অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, প্রথমং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, [ততঃ] অগ্রণীর্ভবতি"—যজ্ঞের অগ্রে— প্রথমে অগ্নিস্থাপনা না করিয়া কোন কাজেরই অনুষ্ঠান হয় না, এই জন্য ইঁহার নাম 'অগ্নি'।

স্থলাষ্ঠীবানের পুত্র বলেন,—"অক্লোপনো ভবতীতি অগ্নিঃ", ইনি দ্রবীভূত করেন না, রূক্ষতা সম্পাদন করেন, এই জন্যই ইঁহার নাম "অগ্নি"।

অগ্নি সকলকে "অঙ্গং নয়তি" আত্মসাৎ করেন, অতএব ইঁহার নাম 'অগ্নি'।

'সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ'—(১।২।২৮) এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্বঞ্চ পরমাত্মনোঽপি সর্ব্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে।"—অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিষ্পন্ন অর্থ 'অগ্রণী' অর্থাৎ যাহা অগ্রে নয়ন করে, এইরূপ করিলে অগ্নিশব্দকেও পরমেশ্বর-অর্থে ধরা যায়; যেমন,—"অগ্রয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলম্ ইত্যগ্নিঃ।" যিনি উচ্চাবচ কর্ম্মফলের প্রাপক, তিনি অগ্নি। অগ্নি ও পরমেশ্বর সমান। গার্হপত্যাদিকল্পনাও পরমেশ্বরে সঙ্গত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য এখানে এই একই সিদ্ধান্ত "অগ্রে নয়তি"দ্বারা করিয়াছেন।

বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। বেদের প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণই করিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের মধ্যে অগ্নির নিরুক্তি পাওয়া যায়। শতপথের ষষ্ঠ কাণ্ডের (১ম প্র ১ম ব্রা, ১১) নির্দ্দেশ এইরূপ, যে গর্ভ অভ্যন্তরে ছিল, তাহা 'অগ্রি'রূপে সৃষ্ট হইল। যেহেতু, ইহা সর্ব্বাগ্রে 'অগ্রম্' সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম 'অগ্রি'। বস্তুতঃ, 'অগ্রি' তিনি, যাঁহাকে লোকে 'পরোঽক্ষ'ভাবে (mystically) বলে 'অগ্নি'; কারণ, দেবতারা 'পরোঽক্ষ-কামা' অর্থাৎ mysticদিগকেই ভালবাসে। শতপথের উক্তি যথা,—'অথ যো গর্ভোঽন্তরাসীৎ। সোঽগ্রিরসৃজ্যত স যদস্য সর্ব্বস্যাগ্রমসৃজ্যত তস্মাদগ্রিরগ্রির্হ বৈ তমগ্নিরিত্যাচক্ষতে পরোঽক্ষং পরোঽক্ষকামা হি দেবাঃ।'—[৬—১।১।১১]

জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে অগ্নিশব্দের এক ব্যাখ্যা আছে। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ব্রাহ্মণ ইহাদের বাচ্য-বাচকভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে এই ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, 'অ' বর্ণে অমৃতের দৃষ্টি এবং 'গ্নি' বর্ণে মর্ত্ত্যের দৃষ্টি করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায় যে, অগ্নি শব্দের দুইটী অংশ আছে—একটী অমৃত, অপরটী মর্ত্ত্য। দেবতাদের মধ্যে দুইটী অংশ আছে। একটী অনৃত বা মর্ত্ত্য, আর একটী সত্য বা অমৃত। নামরূপাদির অংশটুকু মিথ্যা, আর সেই নামরূপাদির আশ্রয় যে অংশ, তাহা সত্য বা অমৃত। বাচ্য অংশের দ্বিত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহার যে বাচক শব্দ, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক একটী অংশের প্রতিপাদকরূপে শিষ্যের বোধসৌকর্য্যার্থ এক একটী অর্থ করা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"এতদগ্নেরমৃতমপহতপাপ্মশুদ্ধমক্ষরম্। গ্নিরিত্যস্য মর্ত্ত্যমনপহতপাপ্মাক্ষরম্।" ৮—অনুবাক্। ৩য় খণ্ড। ৪। বৃহদ্দেবতা (২।২৪) অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপে স্থির করিয়াছেন,—

"জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যৎ।
নাম্না সন্নয়তে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ॥"

ঋষিগণ যে ইঁহাকে অগ্নি নামে স্তুতি করিয়া থাকেন, তাহার কারণ—(১) তিনি সমস্ত ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বে জাত হইয়াছিলেন ; (২) যজ্ঞে তিনি অগ্রণী, এবং (৩) তিনি অঙ্গকে সংযুক্ত করেন।

অগ্নির নাম

বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী সংহিতাদি গ্রন্থে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তৈত্তিরীয়সংহিতা বলেন (২. ২. ৪২)—পার্থিব অগ্নির নাম বিপ্রগণ দিয়াছেন 'পবমান', অন্তরীক্ষের অগ্নির নাম 'পাবক' এবং দ্যুলোকস্থ অগ্নিকে বলা হয় 'শুচি'। অথর্ববেদ (৫. ২৪. ২) পাবককে 'বনস্পতি' নামে অভিহিত করিয়াছে। পুরাণগুলি একটু প্রকারভেদ করিয়া সাধারণতঃ সংহিতারই অনুসরণ করিয়াছে। পুরাণকারগণ বলেন, অগ্নির পত্নী স্বাহার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র হয়। পবমান—ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি ; পাবক—বিদ্যুদগ্নি, শুচি—সৌরাগ্নি। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছে—ইহলোকে ঋষিগণ অগ্নিনামেই অগ্নির স্তুতি করেন, অন্তরীক্ষে ইনি জাতবেদ বলিয়া পূজিত হন এবং দ্যুলোকে বৈশ্বানর নামে স্তুত হইয়া থাকেন। বৃহদ্দেবতায় এই তিনটী নামের উল্লেখ আছে।[১] নিঘণ্টুকার দৈবতকাণ্ডের প্রথমেই এই তিনটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যাস্ক (৭. ২৩) বলেন, প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা অগ্নি বৈশ্বানর বলিতে সূর্য্য বুঝিতেন। শাকপুণির মতে কিন্তু বৈশ্বানর পার্থিব অগ্নি। পরে যাস্ক (৭. ৩১) শাকপুণির মতই মানিয়া লইয়াছেন।

বৃহদ্দেবতা বলে, অগ্নির একটী নাম 'ইন্দ্র'। নিজের রশ্মিজাল দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া বায়ুর সাহায্যে তাহা পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন বলিয়া অগ্নির এই নামের সার্থকতা।

নিরুক্ত (৭. ৫) ও সর্ব্বানুক্রমণী (২. ৮) পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র ও বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য্যকে 'ত্রিদেব' নামে পরিচিত করিয়াছে।

অগ্নিত্রয়

অগ্নিত্রয় বলিলে অগ্নি, জাতবেদ ও বৈশ্বানর, এই তিন অগ্নিকে বোঝায়। এই তিন স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পার্থক্য দেখান হইয়া থাকে। ইঁহাদের প্রস্তুতি, বিভূতিস্থান বা জন্ম নির্ব্বাচন করা অসম্ভব বলিয়া বৃহদ্দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছে—এইরূপ করিবার কারণ, সমস্ত জগৎ তাঁহাদের দ্বারা ব্যাপ্ত।

আবার অগ্নি বৈশ্বানরে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্নিতে এবং জাতবেদ উভয়ে আশ্রিত ; এইরূপে অগ্নি ও বৈশ্বানর জাতবেদের দুই রূপ হইয়াছে।[২]

সালোক্য, একজাতত্ব ও ব্যাপ্তিমত্তায় তাহারা এক হইলেও তাহাদের পৃথক্ দেবত্ব

১। ইহাগ্নিভূতস্ত্বৃষিভির্লোকে স্তুতিভিরীড়িতঃ। জাতবেদাঃ স্তুতো মধ্যে স্তুতো বৈশ্বানরো দিবি ॥—১।৬৭

২। 'এতে উত্তরে জ্যোতিষী জাতবেদসী উচ্যেতে।'—নিরুক্ত ৭।২৩

স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন কোন সূক্তে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইবে, তখন সেই সূক্তভাক্ হইবেন "পার্থিব" অগ্নি। জাতবেদকে উদ্দেশ করিয়া কোন সূক্তের কথা বলিলে সেই সূক্তভাক্ হইবেন মধ্যমাগ্নি। বৈশ্বানর-সম্বোধিত কোন সূক্তের কথা বলিলে, সেই সূক্তভাক্ হইবেন সূর্য্য[১]।

এই পৃথিবীস্থান অগ্নি মানুষদিগের দ্বারা নীত হয় এবং সেই দ্যুস্থান তাঁহাকে নয়ন করেন। এই জন্য এই উভয় একনামযুক্ত হইয়াও প্রত্যেকে পৃথগ্‌ভাবে আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে।

জাতবেদ নামের কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে—যাঁহারা জাত, তাঁহারা তাঁহাকে জানেন বলিয়া তাঁহার এই নাম, অথবা তিনি যখনই জাত হন, জন্মগ্রহণ করেন, তখন জাত—বিদিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'জাতবেদ'।

পৃথিবীস্থান অগ্নি অর্চ্চিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া, অন্তরীক্ষস্থান অগ্নি বিদ্যুদ্‌রূপ কেশযুক্ত বলিয়া এবং দ্যুস্থান অগ্নি রশ্মিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া কবিরা তাঁহার নাম দিয়াছেন 'কেশী'[২]। তবে প্রক্রিয়ায় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি[৩]।

শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে যে, পার্থিব ও মধ্যমাগ্নি সূর্য্য হইতে প্রসূত। প্রত্যেক যজ্ঞে অগ্নি ও মরুৎকে চিকীর্ষা করিবার সময় বৈশ্বানরীয় সূক্ত দিয়া কার্য্য করিতে হয়।[৪] এই বৈশ্বানর হইল দ্যুলোকস্থান সূর্য্য। এই কার্য্য ত্রিলোকের অবরোহপ্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে এই দ্যুলোক-দেবতার স্তুতি করিয়া মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষ-দেবতা রুদ্র ও মরুতের স্তুতি করিতে হয়; তারপর পুনরায় স্তোত্রিয়[৫] দেবতা অগ্নির স্তুতি করিতে হয়।

অগ্নির পঞ্চনাম

বৃহদ্দেবতা (২।২২) বলেন, বৈদিক সূক্তে অগ্নির পাঁচটী নাম, ইন্দ্রের ছাব্বিশটী এবং সূর্য্যের সাতটী।

অগ্নির পাঁচটী নাম বলিলে বুঝাইবে—দ্রবিণোদা, তনূনপাৎ, নরাশংস, পবমান ও জাতবেদা।

১। বৈদিক ঋষি কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাকেন। দ্রবিণ বলিলে ধন ও বল বোঝায়; সুতরাং তিনি অগ্নিকে 'দ্রবিণোদাঃ' নামে প্রচার করিলেন।[৬]

১। বৃহদ্দেবতা, ১—৯৮-১০০। ২। নিরুক্ত ১২।২৫-২৭। ৩। বৃহদ্দেবতা—১।৯৫

৪। বৃহদ্দেবতা—১।১০১; নিরুক্ত ৭।২৩

৫। অগ্নিদেবতা সম্পর্কেই স্তোত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য। যাস্ক ৭।২৩ দ্রষ্টব্য।

৬। বৃহদ্দেবতা—২।২৫; ঋগ্বেদ—১।৯৬।৮

২। পার্থিব অগ্নির নাম 'তনূনপাৎ'। দিব্যাগ্নিকে তনু বলে। তনন (প্রসরণ) হইতে তনু নিষ্পন্ন। তনু হইতে মধ্যমাগ্নির জন্ম। মধ্যমাগ্নি হইতে 'তনূনপাৎ' জাত হইয়াছে।

পৌত্রকে কবিরা 'নপাৎ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাস্কও বলিয়াছেন—"নপাদিতি অনন্তরায়াঃ প্রজায়াঃ নামধেয়ম্' (৮।৫)। পুত্রের ঠিক পরবর্ত্তী যিনি, 'অনন্তর' বলিলে তাঁহাকেই বোঝায়। তাই বৃহদ্দেবতা (২।২৭) বলিয়াছেন,—

অনন্তরং প্রজামাহুর্নপাদিতি কপন্যবঃ।
নপাদমুষ্য চৈবায়মগ্নিস্তেন তনূনপাৎ ॥

পার্থিবাগ্নি দিব্যাগ্নির পৌত্র; সুতরাং ইনি তনূনপাৎ।

৩। সমবেত নরগণের দ্বারা যজ্ঞে অগ্নি পৃথগ্‌ভাবে পূজিত (শংসিত) হন বলিয়া আপ্রী-সূক্তে অগ্নির নাম হইয়াছে—'নরাশংস'। যাস্কের উক্তিতে কাথক্যের মত এইরূপ— "নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাথক্যো নরা অস্মিন্নাসীনাঃ শংসন্তি"। শাকপূণির মত— 'অগ্নিরিতি শাকপুনির্নরৈঃ প্রশস্যো ভবতি।' কাথক্যের ন্যায় বৃহদ্দেবতাও বলেন— যজ্ঞে আসীন হইয়া অগ্নি স্তুত হয় বলিয়া 'নরাশংস' যজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪। পার্থিবাগ্নি এই বিশ্বকে পবিত্র করেন বলিয়া বৈখানস ঋষিগণ তাঁহাকে 'পবমান' নামে স্তব করিয়াছেন।

৫। অগ্নির একটী নাম 'জাতবেদাঃ'। জাত হইয়াই অর্থাৎ জন্মিয়াই —

(ক) ইনি ভূতগণকে জানেন বলিয়াই ইঁহার নাম 'জাতবেদাঃ'।

(খ) বিদ্যা হইতে জাত বলিয়া ইঁহাকে 'জাতবেদাঃ' বলে।

(গ) অথবা জাত হইয়াই বিত্ত (ধন) অবগত হইয়াছেন বলিয়া ইঁহার এই নাম।

(ঘ) বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ভূতগণ দ্বারা বিদিত হন, তাই বিশ্বের 'মধ্যভাগেন্দ্রে'র ন্যায় তিনি 'জাতবেদাঃ' বলিয়া স্তুত হন।

নিরুক্তকার যাস্ক (৭।১৯) অগ্নিকে বলিয়াছেন—'জাতবিদ্য', 'জাতবিত্ত', 'জাতে জাতে বিদ্যতে'।

অগ্নির পৌরাণিক নাম

পুরাণে অগ্নির বিবরণ কিছু স্বতন্ত্র। মহাভারতে দেখা যায়, অগ্নি এক, কিন্তু তাঁর রূপ বহু। কোথাও কোথাও অগ্নি ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মে তাঁহার বহুত্ব—'বহুত্বং কর্ম্মসু'। সকল সময়ই তিনি 'সপ্তার্চ্চির্জ্জ্বলনঃ', তিনি 'সপ্তজিহ্বানন'। কখনও কখনও সাতটী আগুনের উল্লেখ দেখা যায়; তিনটী যাজ্ঞিক অগ্নি—'অগ্নিত্রেতা' বা 'ত্রেতাগ্নয়ঃ'; ইহাদের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি হইলেন পিতা, দক্ষিণাগ্নি হইলেন মাতা

এবং আহবনীয় হইলেন গুরু। আর বাকী চারিটী অগ্নি হইল—সভ্য, আবসথ্য, স্মার্ত্ত ও লৌকিক। হরিবংশ (১২-২৯২) বলেন, সপ্তার্চির পরিবর্ত্তে অগ্নির তিনটী শিখা আছে, তাই তাঁর নাম 'ত্রিশিখ'। পুরাণে অগ্নির এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে অগ্নি পঞ্চ—আত্মা, অগ্নি, পিতা, মাতা, গুরু। যজ্ঞাগ্নির হিসাব অনেক রকমে হয়—পাঁচ, ছয়, আট। অথর্ব্ববেদও এই আটের কথা বলিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্বে (৭।২১) পাওয়া যায়—ইন্দ্রের প্রসাদে অগ্নির সংখ্যা সাতাইশ। অন্যত্র (১৩।১০৩) ত্রিশ। পুরাণে অগ্নির একটী সাধারণ নাম 'যুগান্তার্ক,' 'সম্বর্ত্তক বহ্নি'। মহাভারতে সূর্য্যের ক্রোধ হইতে জাত অগ্নির নাম হইয়াছে—'পাতালজ্বলন'; হরিবংশ কিন্তু এই নামে বোঝেন, ঔর্ব ভার্গবের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি, তাঁহাকে; এ ছাড়া দেশ ও কালবিশেষে অগ্নির বহু নাম পুরাণে পাওয়া যায়; যেমন, 'তোয়াগ্নিঃ সাগরে'। 'কালাগ্নি' থাকেন মাল্যবান্ পর্ব্বতে অথবা নাগলোকে। 'সপ্তার্চি' প্রভাতে ও সায়ংকালে হেমকূটের উপরে উদিত হন।

বেদ বলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণ স্থির করিয়া দিলেন, তিনি ব্রহ্মার বড় ছেলে। কোন পুরাণ বলিলেন, অগ্নি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ধর্ম্মের বসুনামক পত্নীর গর্ভে কেহ অগ্নির জন্ম স্থির করিলেন। কাহারও মতে অগ্নি হইলেন অঙ্গিরার পুত্র, শাণ্ডিলের পৌত্র। কোন পুরাণমতে, দেবী শাণ্ডিলী শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতে থাকিতেন; অগ্নি তাঁহারই পুত্র। ভাগবত বলেন, এই অগ্নিমাতা শাণ্ডিলী দক্ষপ্রজাপতির অপর পত্নী। মহাভারত একস্থানে বলিয়াছেন, অগ্নি বায়ুদেবতা অনিলের পুত্র। রামায়ণও তাহা সমর্থন করিয়াছে। স্বাহা হইলেন অগ্নির স্ত্রী। ইনি কশ্যপের কন্যা। বায়ুপুরাণ মতে দক্ষের কন্যা। স্বধা ও বসুধারা তাঁহার অপর স্ত্রী। পূর্ব্বে পাবক, শুচি ও পবমান, অগ্নির এই তিন পুত্রের নাম করিয়াছি। পাবকের পুত্র 'কব্যবাহন'—ইনি পিতৃগণের অগ্নি। শুচির পুত্র 'হব্যবাহন'। ইনি দেবতাদিগের অগ্নি। পবমানের পুত্র 'সহরথ,' ইনি অসুরদিগের অগ্নি। বায়ু ও অগ্নিপুরাণে ইহাদের বিস্তৃত বংশবিবরণ আছে। কৌতূহলী পাঠক তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

কোন কোন পুরাণে অগ্নির কন্যার নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণে (২য় অঃ) অগ্নির কন্যার নাম 'ধিষণা'—ইনি হবির্দ্ধানের পত্নী। বায়ুপুরাণও তাহাই বলেন। তবে অগ্নির আর একটী কন্যা হবির্দ্ধানের ঊর্দ্ধতম পঞ্চম পুরুষ উরুর পত্নী।

পুরাণকারগণ অগ্নির নানারূপ সংখ্যা দিয়াছেন। বসুধারার পুত্র ও পৌত্র লইয়া ৪৫ জন অগ্নি। বায়ুপুরাণে এই ৪৫ জন অগ্নি, স্বয়ং অগ্নি ও পাবক, পবমান ও শুচি, এই কয়জনকে লইয়া ৪৯ অগ্নির বিষয় বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ মন্বন্তরে পুরাণোক্ত সর্ব্বমেলিতাগ্নির সংখ্যা ৬১।

পুরাণমতে অগ্নি পিতৃগণের রাজা। চতুর্থ মনু তমঃ যখন রাজা ছিলেন, তখন ইনি সপ্ত

ঋষির মধ্যে অন্যতম ঋষি ছিলেন। মহাদেবের রুদ্র নামক যে মূর্ত্তি, তাহারই নাম অগ্নি। অগ্নি, সকল দেবতা ও পিতৃলোকের মুখস্বরূপ।

পুরাণে কর্ম্মবিশেষে অগ্নির নামবিশেষে পূজার বিধি আছে। নবগৃহপ্রবেশকালে পাবক নামক অগ্নির আরাধনা করিতে হয়। গর্ভাধান উপলক্ষে মারুত, অন্নপ্রাশনে শুচি, নামকরণে পার্থিব, চূড়াকরণে সত্যনাম, গর্ভিণীর চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাসে কর্ত্তব্য সংস্কারে মঙ্গল, জাতকরণে সংস্কারবিশেষে প্রগল্‌ভ, প্রায়শ্চিত্তে (মহাব্যাহৃতি হোমে) বিধু, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, শান্তির জন্য বরদ, বরদানে দূষক ও বশীকরণে শমন নামক অগ্নির পূজার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

আমাদের ইতিহাস

আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এতদিন আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সে ভাবে আর চলিবে না। আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইউরোপীয়ানেরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছিলেন, আমরা এখনও সেই পথে চলিতেছি ; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না ; দুই দশখানি বই পড়িয়াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন। আমাদের দেশের অনেকের সংস্কার যে, আমরা যে পুরাণ জাতি, এটা বলিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। প্রথম প্রথম তাহাই বলিয়াছেন,—"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসই ছিল না ; রাজা-রাজড়া থাকিতে পারে, ছোট বড় রাজা থাকিতে পারে, কিন্তু সে বড় বিশেষ কোন কাজের নয়। তাহাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাই সেটা একেবারেই অগ্রাহ্য।"

"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ নানা ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ-করা ছিল। সেখানকার লোক অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর ছিল ; তাহাদের সভ্যতা ছিল না, মিথ্যা কথা তাহাদের স্বভাবের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ভাবে কিছু দিন চলার পর যখন অনেকে সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন, তখন বলিলেন,—"না, এরাও যেন একটু ভাল লোক ছিল, একটু যেন অমনি সভ্য হইয়াছিল ; কিন্তু ইতিহাস তাদের একেবারেই নাই। দুই চারিখানি কাব্য আছে, ব্যাকরণ আছে, একটু আধটু দর্শনশাস্ত্রও আছে, আর বাকী সব অগ্রাহ্য—ইতিহাস একেবারেই নাই।"

এই ভাবে দিন কতক গেল, তারপর খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হইল। রাশি রাশি তামার পাত বাহির হইতে লাগিল। সাহেবরা একটু চমকিয়া গেলেন। অশোক রাজার কতকগুলি স্তবকারী (পাথরের লেখা) বাহির হইল। আমাদের দেশের লোক সেগুলি পড়িতে পারিত না। সাহেবেরা পড়িলেন। শেষে স্থির হইল, সেগুলি চন্দ্রগুপ্তের নাতির সময়ের। কিন্তু সেগুলি থেকে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদের সময় পর্য্যন্ত মাঝখানটা খালি রহিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন—সাহেবেরা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং প্রায় ষোল শত বৎসর একটা ফাঁক পড়িয়া রহিল। তারপর ক্রমে তামার পাত আর পাথরের লেখা পড়া একটা বিস্তার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল।

অনেকে মনে করেন, সাহেবেরা এ বিদ্যা জানিতেন ; আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়াইয়া লইতেন—দেশের পণ্ডিতদের দিয়া। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক চালনা করাইয়া যে তাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। একটা কথা সম্প্রতি জানিয়াছি—অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইল্‌সন্ সাহেব ও প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের শিলালেখগুলি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিয়া দিতেন। ক্রমে এই সকল লেখ পড়িয়া ও সিক্কা পড়িয়া জানা গেল যে, ভারতবর্ষে অনেক রাজার রাজত্ব ছিল—স্বাধীন রাজারা লেখ দিতেন। তাঁহাদের প্রজারা লেখ দিবার সময় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিত। স্বাধীন রাজাদের সকলেই সিক্কা তৈয়ার করিতেন এবং সিক্কায় তাঁহাদের নাম থাকিত।

এইরূপে দেখা গেল, প্রায় হাজার দুই হাজার রাজা এই ষোল শত বৎসরের ভিতর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশলতাও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ের রাজা এবং কোন্ দেশের রাজা, সেটা পাওয়া গেল না। যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল ; পরস্পরের কি সম্বন্ধ, বুঝা গেল না ; সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হইল না।

দু চার দেশের দু চারখানি ছোট বড় ইতিহাসও পাওয়া গেল, তাহাতে ইতিহাসের ধারাটা ঠিক হইল না। এতবড় যে সংস্কৃত-সাহিত্যটা, সেটার দিকে ইতিহাসবাগীশেরা চোখও দিলেন না। সুতরাং যদিও কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, বেশ ঠাস গাঁথুনী হইল না।

সাহেবেরা কিন্তু বলিলেন যে, "ভারতবর্ষের সভ্যতাটা এই গুপ্তদের সময়েই হইয়াছিল—১৩।১৪ শত বৎসর আগে। তার আগে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, অলঙ্কার ছিল না, থিয়েটার ছিল না, সভ্যতার চিহ্ন বড় একটা ছিল না। তবে অশোকের সময় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটু চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু চর্চ্চা হইলে কি হয়। মোক্ষমুলার সাহেব বলিলেন যে, বুদ্ধদেব যেই জন্মিলেন, সংস্কৃত অমনি ঘুমাইয়া পড়িল ; সে ঘুম একেবারেই ভাঙ্গে নাই, গুপ্ত রাজারা কোন রকমে ভাঙ্গাইলেন। বুদ্ধদেবের আগে ইহাদের ইতিহাস টিতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। সব অন্ধকার।"

"আলোর মধ্যে বেদ। সে বেদও অনেকটা বুদ্ধদেবের পরের লেখা, কিন্তু আমরা ধরিতে পারিতেছি না। সুতরাং ঋগ্‌বেদ যিশু খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তার আগে কিছুতেই যাইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বোধ হয় হইয়াছিল, সেটা ১১।১২ শত বৎসর যিশু খৃষ্টের আগে।"

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস ক্রমে পিছাইয়া গিয়া যিশু-খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর আগে পর্য্যন্ত পৌঁছিল। তার মধ্যে আবার বুদ্ধদেবের পর থেকে সেটার একটু আঁট বাঁধিল। তার আগে সব ফসকা।

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যটা ভাল করিয়া সব দিক্ থেকে আরম্ভ করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের ছিল। সেটা ভাল করিয়া পড়িলে কিন্তু ইতিহাসের যে দুর্দ্দশাটা হইয়াছে, সেটা হইত না।

অনেক শাস্ত্র আছে, যে শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে হয়—প্রমাণ না দিলে শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করে না। প্রমাণ দিতে গেলেই আগে সে শাস্ত্রে যাঁহারা বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিতে হয় এবং তাঁহাদের কথা তুলিতে হয়। এই রকম করিয়া কথা তুলিতে তুলিতে একটা পূর্ব্বাপর ধারা দাঁড়ায়। স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ প্রামাণিক শাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে, অকাট্য প্রমাণ দিতে না পারিলে লোকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধাও করে না।

এই শাস্ত্রের যত পুথি আছে, সব পুথির একখানি ভাল ক্যাটালগ আজও তৈয়ারি হয় নাই। আর ইহা হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা এখনও লোকের ধারণাও হয় নাই। কিন্তু শুধু ক্যাটালগ হইতেই দেখা যায় যে, নূতন রাজত্ব হইলেই নূতন স্মৃতি হইয়াছে। ঋষিদের যে স্মৃতি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে, টীকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই ঋষিদের স্মৃতির টীকা করিয়াছেন।

তারপর মুসলমানরা যে সময় এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন, তথন হইতে ঋষিদের স্মৃতি ও টীকাকারদের টীকা চলিল না। ব্রাহ্মণেরা তথন প্রত্যেক দেশের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া এক একটা নিবন্ধ তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদের সময় যেখানে হিন্দুদের রাজনীতিতে একটু ক্ষমতা হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা নিবন্ধ তৈয়ারি করিয়াছেন। নিবন্ধে আর একটু বিশেষত্ব আছে। যেখানে হিন্দুরা স্বাধীন, সেখানে নিবন্ধের মধ্যে একখানি বই রাজনীতির আছে। কিন্তু যেটা মুসলমানের দেশ, সেটায় রাজনীতির গন্ধও নাই। অনেক জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানের দেশে আপনাদের দেওয়ানী মকদ্দমা করিতেন। সেখানে নিবন্ধের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একখানি বই আছে। যেখানে মুসলমানের দেশে হিন্দুরা স্বাধীন হইয়াছে, সেখানে রাজ্যাভিষেকের উপর একখানি বই আছে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্মৃতির বই লিখিতে গেলে প্রমাণ দেওয়া চাই। এই প্রমাণ ক্রমে খাটিয়া খুটিয়া দেখিতে গেলে, কোন্ বইখানি কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহা বেশ ধরা যায় এবং যদি আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের তেমন জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেশে হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া দেওয়া যায়।

সুতরাং ভাল করিয়া স্মৃতিটা পড়িলে ইতিহাসটা পাকাপাকি তৈয়ারি হইয়া যাইতে পারে। আমি যেরূপ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এরূপ জ্ঞান—এই ভাবে পড়া, পূর্ব্বে না হইলেও পূর্ব্বে যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের একটা আবছায়া আবছায়া এই রকম ভাব ও জ্ঞান হইয়াছিল। তাই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীতে "হেমাদ্রি"র প্রকাণ্ড নিবন্ধটী সব ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিন ভাগের দুই ভাগ ছাপান হইয়া গিয়াছে, হেমাদ্রির সময়ও জানা ছিল। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন,—দেবগিরির রামচন্দ্র রাজার অধীনে তিনি বড় বড়

রাজকার্য্য করিতেন। সেটা ১২৫০ খৃঃ হইতে ১৩০০ খৃঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং তিনি যে সকল বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি তাহার পূর্ব্বে হইবে নিশ্চয়ই। কারণ, তিনিও ত একজন বড় পণ্ডিত, বড় রাজার সভাসদ্। তিনি আর পুথি না দেখিয়া তাহা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করেন নাই।

এই রকম করিয়া বোম্বাইর মাণ্ডলিক সাহেব, মনুর উপর মেধাতিথির যে টীকা আছে, সেটা ছাপাইয়াছেন। মেধাতিথি যে সকল বইএর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি দেখিয়াছেন। এইরূপ করিতে করিতে গিয়াছেন।

বিউলার সাহেব বলিয়াছেন যে, গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র যিশুখৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে বলিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি না। গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে লেখা নয়,—পাণিনি যে সংস্কৃতের জন্য ব্যাকরণ করিয়াছেন, সে সংস্কৃতে লেখা নয়,—মাঝামাঝি এক অবস্থার সংস্কৃত। পাণিনির সময় এখন এক রকম ঠিক হইয়াছে—যিশুখৃষ্টের ৫ শত বৎসর আগে; গৌতম হাজার বৎসর আগে। গৌতমের ভাষার সঙ্গে পাণিনির ভাষা তুলনা করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

গৌতমও তাঁহার আগেকার স্মৃতির বই পড়িয়াছেন—তিনিও প্রমাণ দিয়াছেন। সে সব প্রমাণ আমরা খুঁজিয়া পাই না, লোপ হইয়াছে। তিনিও স্মৃতিরই প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা হইলে গৌতমের আগেও স্মৃতি ছিল। স্মৃতি ত স্বাধীন শাস্ত্র নয়। সবাই বলে, স্মৃতি বেদের অধীন। লোকের সংস্কার, অনেক বেদ লোপ হইবার পর ঋষিদের যে সকল কথা স্মরণ ছিল, তাহা একত্র করিয়া স্মৃতি হয়।

তাহা হইলে বেদ ছিল, বেদ লোপ হইয়াছিল, তারপর স্মৃতি হইয়াছে,—এই রকম করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসটা আরও পিছাইয়া যাইবে। কত পিছাইয়া যাইবে, তাহার একটা আভাস দিতেছি।

পুরাণে এক জায়গায় লেখা আছে, মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর মগধে পর পর ৫৯ জন রাজা হইয়াছিলেন। তার পর নন্দরাজারা রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। নন্দরাজারা যিশুখৃষ্টের ৪শত বৎসর পূর্ব্বে মগধে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পার্জিটার সাহেব এই ৫৯ জন রাজার নাম অনেক পুথিপাজি ঘাঁটিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। মোটামুটি ধরিতে গেলে এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজা হন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ৬০ জন রাজায় ১৫ শত বৎসর হইবে; ৪ শ আর ১৫শ যোগ করিলে ১৯০০ হয়। কিন্তু পার্জিটার সাহেব একশ বৎসরে ৪ জন রাজা ধরেন নাই—১০।১২ জন ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা যিশুখৃষ্টের পূর্ব্বে ১২শত বৎসরে অথবা তাহারও পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে কালের রাজারা এখনকার চেয়ে একটু দীর্ঘজীবী হইতেন। আমরা বরং একশতে তিন জন রাজা ধরিতে পারি। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরও পিছাইয়া যাইবে। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে বলে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যিশুখৃষ্টের ২৫শত বৎসর আগে হইয়াছিল। কেন না, তাঁহারা বলেন,

কলির ৬শত বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়, আর কলি ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়; সুতরাং ২৫ শত বৎসর তেরিজের হিসাবে পাওয়া যাইতেছে।

ঋষিদের তখন অসীম প্রভাব। তখন দেখা যায় যে, বেদ খানিক খানিক লোপ হইয়া আসিতেছিল। মহাভারতে যজ্ঞের যে সব বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল জাঁকজমকের বর্ণনা। যজ্ঞটা কেমন করিয়া হইল, সে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক্ দিয়াও যায় নাই। তাতেই বুঝিতে হয়, তখন যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং বেদও ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছিল। বেদ তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বে ভাগ হইয়াছে। তাহা হইলে বেদ বিস্তর পিছাইয়া পড়িল।

মহাভারতে লেখা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র রাজার এক কন্যা ছিল, একমাত্র কন্যা; তাহার বিবাহ হইল জয়দ্রথের সঙ্গে; এই জয়দ্রথ হইলেন সিন্ধু-সৌবীরের রাজা। সিন্ধুদেশে সৌবীর-বংশ অনেক দিন রাজত্ব করিতেছিলেন। সে বংশের জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইল। সম্প্রতি সিন্ধুদেশে সিন্ধু নদের দুইটী মরা গর্ভের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড নগর খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সুমেরদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এতদিন সুমেরদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যা পাওয়া গিয়াছে পারস্য উপসাগরের ধারে। অনেকে বলেন, সুমেররা মিশর দেশের অপেক্ষাও প্রাচীন। অনেকে বলেন—না, এরা মিশর-দের চেয়ে একটু নূতন। আমরা বলি, সুমেরদের যখন এতবড় একটা নিদর্শন সিন্ধুনদের ধারে পাওয়া গিয়াছে, তখন সুমেররা ভারতবর্ষ হইতে পারস্য উপসাগরে যাইতে পারে, পারস্য উপ-সাগর হইতে ভারতবর্ষেও আসিতে পারে। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ষের সৌবীর। সে ত যিশু খৃষ্টের ৩।৪ হাজার বৎসর আগে। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যদি তাহাদের সঙ্গে তুল্যকালে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতাটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইল, দেখিবার বিষয় হইয়াছে।

বেদ, স্মৃতি, এই দুইটী জিনিষ ছাড়িয়া দিলে আর একটা কথা আমাদের মনে করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ হস্তিনায় রাজা হন। তাঁহার ৪।৫ পুরুষ পরে হস্তিনা নগর গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যায় এবং পরীক্ষিদ্‌বংশ কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজত্ব করেন। হস্তিনা—গঙ্গার ধারে মিরাট জেলায় ছিল। কৌশাম্বী এলাহাবাদ হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ পশ্চিমে যমুনার ধারে। প্রায় এই সময় পরীক্ষিদ্‌বংশে অধিসীমকৃষ্ণ নামে একজন রাজা হন। তাঁহার সময় ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লেখা হয়। তাঁহার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি লিখিবার সময়ে অতীত কালের বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার নিজের সময়ের ঘটনাগুলি বর্ত্তমান কালের ব্যাপার, আর তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ভবিষ্যৎ কালের ব্যাপার। যাঁহারা পুরাণ পড়েন, সকলেই মনে করেন, পুরাণগুলি অধিসীমকৃষ্ণের সময়ের লেখা। বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎ কাল, অধিসীমকৃষ্ণের সময় হইতেই, হস্তিনা, অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি দেশের রাজাদের বংশতালিকা অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সেই বংশতালিকা হইতেই পার্জিটার সাহেব ৫৯ পুরুষ মগধের রাজা পাইয়াছেন। ইতিহাস মানে পুরাণ ঘটনা। ইতিহাস অতীত কালের হইয়া থাকে, বর্ত্তমানেও হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে কেমন

করিয়া হয় ? পুরাণের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করিয়া পরের ঘটনাগুলি পরে জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই ঘটনাগুলি একেবারে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখিতে পারেন না। তাঁহারা এটাকে হয় নির্ব্বোধের কাজ, না হয় জুয়াচোরের কাজ বলিয়া মনে করেন। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এবং ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসও অধিক। আর সে ইতিহাস যে প্রামাণিক, এ কথা পার্জিটার সাহেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্য লোককেও স্বীকার করিতে বলিতেছেন।

অধিসীমকৃষ্ণের সময় যখন পুরাণ আরম্ভ হইল, তাহার আগের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে বেদের ভিতর গিয়া খুঁজিতে হয়। পার্জিটার সাহেব সে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন পুরাণ পড়িয়াছেন। বয়স তাঁহার এখন ৭৫।৭৬ হইবে। তিনি যখন ভারতবর্ষে সিভিলিয়ান হইয়া আসেন, তখন হইতেই পুরাণের উপর তাঁহার বড় মায়া; আমি সে সময় হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইত। সুতরাং পুরাণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, সেটা একটু মন দিয়া শোনা উচিত। তিনি যখন বেদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিন্তু তিনি নিজের কোট ছাড়িলেন। তাঁহাকে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কারণ, ইঁহারাই এখন ইউরোপের মধ্যে বেদের সম্বন্ধে বেশী বই লিখিয়াছেন। পার্জিটার সাহেব খুব হুঁসিয়ার লোক। তিনি যে আপনার কোট ছাড়িয়াছেন, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। সত্য অনুসন্ধান করা তাঁহার কাজ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—আমি এখানে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছি। ম্যাকডোনাল্ড ও কীথে তোমাদের ভক্তি থাকে, আমাকে বিশ্বাস কর; না থাকে না কর; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের যে tradition, সেটা বিশ্বাসযোগ্য।

এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পুরামাত্রায় ঢালিয়া সাজিতে হইবে। একশত বর্ষ পূর্ব্বে একজন দশকুমারচরিতকে যিশু খৃষ্টের ৬ শত বৎসর পরের লেখা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশকুমারচরিত ভাল করিয়া পড়িয়া ইহাকে যিশু খৃষ্টের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। যাঁহারা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি—ইঁহাদের সময় লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একজন পাণিনিকে খৃষ্টের নয় শত বৎসর আগেকার বলিয়া গিয়াছেন। একজন দুইশত বৎসর আগের বলিয়াছেন। পতঞ্জলিকে কেহ দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, কেহ যিশু খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পরের বলিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখা গেল, এখন হইতে ১২শত বৎসর পূর্ব্বে রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় বলিয়া গিয়াছেন,—পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ইঁহারা সকলেই পাটলীপুত্রে পরীক্ষা দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। পাটলীপুত্র নগর যিশু খৃষ্টের ৫শত বৎসর পূর্ব্বে

রাজধানী হয় এবং হাজার বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান নগর বলিয়া গণ্য থাকে। সুতরাং পাণিনিকে ৫শত বৎসরের পূর্ব্বে দিবার আর উপায় নাই।

এইরূপে সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়া যাইবে। এ জিনিষটীকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শুধু ইংরাজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না। কিন্তু এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার ১৮৲।১৯৲ টাকায় একজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃতের কাজ সারেন। পণ্ডিত যাহা বলিয়া দেন, তাঁহাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। এই ভাবে ইতিহাস চালাইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যের না হইয়া মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী